বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আধ্যাত্মিক রাহবার
পীরে কামেল মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশ্‌বন্দী-এর বয়ান

খুতুবাতে যুলফিকার



খুতুবাতে যুলফিকার

[খণ্ড : ১১ ও ১২]

মূল

মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী

অনুবাদ

মুফতী শিহাবুদ্দীন খান

প্রথমরেখ, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ

লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক

সম্পাদনা

মাওলানা মোহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)

মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা

প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

দারুল উলুম লাইব্রেরী

[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৬

প্রকাশক ◆ মাওলানা শহীদুল ইসলাম, দারুল উলূম লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ◆ মোবাইল : ০১৯১৮১৮৮০৮৫, ০১৭১২৫০৭৮৭৭ ◆ স্বত্ব : প্রকাশককর্তৃক সংরক্ষিত ◆ বর্ণবিন্যাস : নবপ্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা ◆ প্রচ্ছদ : দি ব্রাইট, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য : ৪৫০ টাকা মাত্র

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-১১

- আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের পরিচিতি /২২
- এশ্‌ক ও মহব্বতের সফর /৭৮
- আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের গুরুত্ব /১১১
- শ্রম ও সাধনা /১৩০
- তালেবে ইল্‌মদের মর্যাদা /১৬২
- আযানের ফযিলত /১৮২
- রোযা ও তারাবির শারীরিক উপকারিতা /২০৬

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-১২

- আল্লাহ্ তা'আলার যথাযথ মূল্যায়ন /২৩২
- এখলাছের বরকত /২৮৬
- তাওবায়ে নাসূহা বা আন্তরিক তাওবা /৩২৪
- দীনের মধ্যেই সম্মান /৩৫২
- ইসলামে বিবাহের ধারণা /৩৭২
- ধ্বংসাত্মক সংস্কৃতি /৩৯৬
- ইচ্ছাশক্তি /৪১৪
- হেদায়াতের জ্যোতি /৪৩২

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সূচি নির্দেশিকা

খুতুবাতে যুলফিকার-১১

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের পরিচিতি /২২
আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অবশ্যই করণীয় /২২
বিবেক ও তীক্ষ্ণতায় মারেফত হাসিল হয় /২৩
জাহান্নামের চেয়েও কঠিন শাস্তি /২৪
জান্নাতে সর্বোত্তম পুরস্কার /২৪
সুখের অশ্রু /২৬
খোদাভীরুদের আসন /২৭
দরবেশের বিশেষ আলামত থাকে /২৮
ভালোবাসা ও পাপাচারের প্রতি আহ্বানকারী /২৮
জ্ঞানীদের কাছে আল্লাহপাকের মর্যাদা জিজ্ঞাসা করো /২৯
ইসমে জালাল 'আল্লাহ'-এর পরিচয় /৩০
الله نামক কিতাবের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি /৩০
পবিত্র কুরআনের সারাংশ /৩১
দুটি নির্দিষ্ট শব্দের সমন্বয়ে গঠিত নাম /৩৩
'নুকতা' বা বিন্দুবিহীন নাম আল্লাহর একত্ববাদের পয়গাম /৩৩
সবকিছুর ইঙ্গিত আল্লাহর প্রতি /৩৩
ঈমানের পূর্ণতা /৩৪
সাগর পাড়িদায়ক নাম /৩৫
আল্লাহর সত্তাগত নামের কল্যাণসমূহ /৩৬
ইসমে আযম /৩৬
সুফি-সাধকদের গুণাগুণ /৪০
আল্লাহ বলে ডাকার রহস্য /৪১
ইসমে জাত الله এর হরফসমূহের পরিচয় /৪১
হাতের আঙ্গুলসমূহ দ্বারা الله শব্দের নকশা /৪২
হযরত আবদুল আযীয দাব্বাগ (রহ.)-এর কাশ্‌ফ /৪২
ইসমে জাতের একক বৈশিষ্ট্য /৪৩

ইসমে জাতের বরকতে সিঙ্গায় ফুৎকারে বিলম্ব /৪৩
ইসমে জাতের সাথে আল্লাহর প্রসংশা /৪৩
আল্লাহর নাম যিকির করলে নূর বর্ষিত হয় /৪৪
সূরা মুজদালায় প্রত্যেক আয়াতে আল্লাহর নাম
উল্লেখিত হওয়ার কারণ /৪৫
৪০ সংখ্যার বিশেষ বরকত /৪৬
'আহ!' ও ইসমে জাত /৪৬
ইসমে জাতের ব্যবহার /৪৮
ইসমে জাতের মিষ্টতা /৫৬
শান্তির সন্ধান /৫৮
প্রকৃত বিশ্বাসের স্তর অর্জন করা অবশ্যক /৫৮
আল্লাহ আল্লাহ বলার সীমারেখা /৬০
সে নূরের তজ্জল্লি সহ্য করতে পারে না /৬১
অশ্রু থেকে সুগন্ধি /৬১
মুখ থেকে সুঘ্রাণ বেরিয়ে এল /৬২
ইসমে জাতের জন্য انا ও نحن এর ব্যবহার /৬২
প্রিয় বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা /৬৩
আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের পৃথিবীতে চারটি পুরস্কার দেন /৬৪
জান্নাতীদের চার গ্রুপ /৬৪
মহব্বতে এলাহী প্রার্থনার শিক্ষা /৬৫
ইহকাল ও পরকালের সুসংবাদ /৬৬
ইসমে জাতে মত্ত হওয়ার শেষ সীমা /৬৭
আল্লাহর শান জিজ্ঞাসা করতে হলে /৬৭
প্রিয়জনদের অভিবাদন /৬৯
আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের পরিচিতি /৬৯
কা'বা শরীফের গেলাফে আল্লাহর দুটি নামের আধিক্য /৭০
حنان নামের ভাবার্থ ও পরিচয় /৭০
منان নামের মর্ম ও পরিচিতি /৭১
كريم নামের তাৎপর্য ও পরিচিতি /৭২
رحيم ও رحمن নামের পরিচিতি /৭৩
রহমতে এলাহীর শেষ সীমা /৭৫

এশ্‌ক ও মহব্বতের সফর /৭৮

সৃষ্টিজগতের সূচনা

মাশুকের আলামত পেলে প্রশান্তি আসে /৭৯

তারকাসমূহের তাওয়াফ /৮০

যেসকল বস্তুর দ্বারা অন্তর তুষ্ট হয় না /৮২

ইসলাম গ্রহণের একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা /৮৪

মুলতাযাম-এর সম্মান /৮৫

মাশুকের স্মরণে গুঞ্জনের অনুমান /৮৬

মানুষের অন্তরের ওয়াশিং মেশিন /৮৭

হজের হেকমত /৮৭

হজের সফরে কষ্টের এক ঝলক /৮৮

কেমন দরিদ্র দেশ ছিল /৮৯

একটি শিশুর অন্তরে কা'বা শরীফের মহব্বত /৯০

মহব্বতে পাগলপারাদের ভাগ্যেই হজ নসিব হয় /৯০

একজন দুধবিক্রেতার প্রকৃত আবেগ /৯১

হযরত মাদানি (রহ.)-এর সত্যিকারের জযবা /৯৫

বেলালী ভালোবাসার প্রয়োজন /৯৬

বাইতুল্লাহ শরীফের একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা /৯৮

একটি সাধারণ নিয়ম /১০৩

হজের সম্পর্ক আমলের সাথে /১০৩

আশেকানের জমায়েত /১০৬

হাজীদের প্রার্থনার স্থান /১০৭

দুটি কাজ করা আবশ্যক /১০৭

সত্যিকার আবেগের সাথে হজের সৌভাগ্য প্রার্থনা করো /১০৮

আল্লাহ তা'আলার আদেশের গুরুত্ব /১১১

বিনয়ের দুয়ার /১১১

আল্লাহর আদেশের গুরুত্ব /১১১

প্রাণীদের আনুগত্য /১১২

কুকুরের বিশ্বস্ততা /১১৪

একটি নাজুক বিষয় /১১৬

আয়ায (রহ.)-এর হৃদয়ে শাহী বিধানের মূল্যায়ন /১১৭

আমি কার আদেশ লঙ্ঘন করছি? /১২০

একটা শয়তানি আমল /১২১
ক্ষমা চাইলে সম্মান বাড়ে /১২১
ইহুদিদের একটা মারাত্মক অপরাধ /১২৩
বান্দার হক থেকে মুক্তি নেওয়া অবশ্যক /১২৩
একটি গাভির ঘটনা /১২৪
মুজাহিদগণের ক্ষমা প্রার্থনা /১২৫
হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইলেন /১২৫

শ্রম ও সাধনা /১৩০

শ্রমের মধ্যে সম্মান /১৩০
বর্গা জিনিসের মূল্যায়ন বেশি হয় /১৩১
ইবাদাতের আগ্রহ প্রকৃত হিংসার পাত্র হতে পারে /১৩১
হযরত জুরজানি (রহ.)-এর আমল /১৩২
শিষ্য হলে এমন হও /১৩২
এক হাদীছের দ্বারা চল্লিশটি মাসয়ালার জবাব /১৩২
সেজদার মাধ্যমে নৈকট্য হাসিল হয় /১৩৩
হযরত জুয়াইরিয়া (রাযি.)-এর ইবাদাতের আগ্রহ /১৩৪
নবুওতের ভাবনা ও তার প্রসার /১৩৫
এখন তোমার ঘুম কোত্থেকে আসবে /১৩৭
কংকর মেরে শয়তান থেকে মুক্তি /১৩৮
ফতোয়া পড়তে পড়তে আল্লাহর কাছে চলে গেলেন /১৩৮
রাবেয়া বসরির ঈর্ষণীয় নেক আমল /১৩৮
মেহনতের চাকা /১৩৮
হযরত শিবলি (রহ.)-এর মহান সাধনার কাহিনি /১৪০
সাধনা কাকে বলে? /১৪৭
নফসকে লালনপালনকারী /১৪৭
সুন্নতের অনুসরণে নফস পরাজিত হয় /১৪৭
সুন্নত মহব্বতের যোগ্য /১৪৯
তাকবীরে উলার গুরুত্ব /১৪৯
হযরত কারী রহীমবখশ পানিপথি (রহ.)-এর সাধনা /১৫০
খাজা সিরাজুদ্দীন (রহ.)-এর সাধনা /১৫০
আত্মার বিরুদ্ধে সাধনা /১৫০
দুটি সাধনায় অবকাশ /১৫১

মহিলাদের থেকে কেউ খোদায়ি দাবি করল না কেন? /১৫২
বেশি খাওয়া অপরাধ /১৫২
বেশি খাওয়ার কতগুলো ঘটনা /১৫৩
বরকতের বহিঃপ্রকাশ /১৫৬

তালেবে ইল্‌মদের মর্যাদা /১৬২
ইল্‌ম একটি নূর /১৬২
ইল্‌ম অন্বেষণকারীর সম্মান /১৬২
প্রকৃত তালেবে ইল্‌ম কে? /১৬৩
ইল্‌মের বাতির চতুর্পার্শ্বে পতঙ্গের মহা সমাগম /১৬৪
ইল্‌মপিপাসার এক অনুপম উদারহণ /১৬৪
ইল্‌মের সন্ধানী এমনও ছিল! /১৬৫
ইল্‌মের তৃষ্ণার উত্তম দলীল /১৬৫
ইমাম শাফেয়ী (রাযি.)-এর আবেদন /১৬৬
ইল্‌মি আত্মমর্যাদার আশ্চর্য ঘটনা /১৬৬
ইল্‌মপিপাসুদের পরিতৃপ্তি /১৬৮
ইমাম মালেক (রহ.)-এর দরবারে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) /১৬৯
ইমাম বোখারির সাধনা /১৭০
ওলামায়ে কেরামের ধৈর্য ও অটলতাকে সালাম /১৭১
ইল্‌ম শিক্ষায় এক রাজপুত্রের সাধনা /১৭৩
তালেবে ইল্‌মের সেবায় আল্লাহর ওলী /১৭৮

আযানের ফযিলত /১৮২
আযানের সংজ্ঞা /১৮২
আযানের সূচনা /১৮২
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে চারজন মুয়াযযিন /১৮৩
আল্লাহপাকের মাহাত্ম্যের প্রচার /১৮৫
আল্লাহপাকের মাহাত্ম্যের ধারণা /১৯৩
আযানের জবাবের ফযিলত /১৯৩
স্বপ্নে আযান দেওয়ার বিভিন্ন ব্যাখ্যা /১৯৪
একজন ফকীহ (বিজ্ঞ আলেম)-এর সমমর্যাদার কর্মকার /১৯৫
আটা সদকা করার নিয়তে পাহাড় পরিমাণ ছাওয়াব /১৯৬
আযানের আদব ক্ষমার কারণ হয়ে গেল /১৯৭

হাদীছের আলোকে আযানের ফযিলত /১৯৭
সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়ে আযান দেওয়ার আবেগ /২০০
আযানের এক চিত্তাকর্ষক ভ্রমণ /২০০
আল্লাহপাকের মাহাত্ম্য বর্ণনার বিস্ময়কর ধরন /২০২
সাবধানতার চোখ খোলো /২০৩

রোযা ও তারাবির শারীরিক উপকারিতা /২০৬
প্রকৃত রাজাধিরাজের সরাসরি সম্বোধন /২০৬
রোযা আল্লাহপাকের নৈকট্যের মাধ্যম /২০৭
উপদেশমূলক কুরআনি নীতিমালা /২০৮
বাৎসরিক আত্মশুদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু /২০৮
বিদ্যার্জনের দীপ্তিমান কল্পনা /২০৯
ঈমানের চার্জিং /২১০
চিকিৎসা সম্পর্কে কুরআন-হাদীছের
নির্দেশনামূলক নীতিমালা /২১১
অধিক আহারসৃষ্ট ব্যাধিসমূহ /২১৩
অল্প আহারের অভ্যাস করো /২১৪
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
আহারের আমল /২১৪
সুস্থতার উত্তম রহস্য /২১৫
সুস্থতার বার্তা /২১৫
ইসলামের সততার সুস্পষ্ট প্রমাণ /২১৫
সিংহের সুস্থতার রহস্য /২১৬
কুমিরের সুস্থতার তথ্য /২১৬
দুর্বলতা আসে কেন? /২১৭
খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁদের খাবার /২১৭
রোযার কতিপয় হেকমত /২১৮
ওজন হ্রাস করার সহজ প্রেসক্রিপশন /২১৯
ক্ষুধার নিবারণ হওয়ার অনুভূতি /২১৯
স্লিমিং ক্লাবে (স্বাস্থ্যনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে) যাওয়ার প্রয়োজন নেই /২২০
তারাবির নামাযে দৈহিক উপকার /২২০
ইবাদাতের সাথে শারীরিক ব্যায়ামও রয়েছে /২২১
স্থায়ী সৌন্দর্যের রহস্য /২২২
ডায়বেটিক নিয়ন্ত্রণ করার উপায় /২২২
পবিত্র রমযান মাসের জন্য পূর্ব থেকে প্ল্যান করা জরুরি /২২৪
শবে কদর পাওয়ার সহজ পদ্ধতি /২২৬

খুতুবাতে যুলফিকার-১২

আল্লাহ্ তা'আলার যথাযথ মূল্যায়ন /২৩২
মূল্যায়ন করা কাকে বলে? /২৩২
একটি বিপদ বনাম দুটি উদারতা /২৩২
আল্লাহপাকের কাছে আমলের মূল্যায়ন /২৩৩
সত্য খোদার সত্য ওয়াদা /২৩৫
আল্লাহ্ তা'আলার যথাযথ মূল্যায়নের উদাহরণসমূহ /২৩৬
হযরত আছিয়া ও তাঁর গৃহপরিচারিকার প্রতি অনুগ্রহ /২৩৮
বিবি আছিয়ার সাথে আল্লাহর মূল্যায়ন কীভাবে হয়েছে? /২৪৩
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত /২৪৩
হযরত হাজেরা (আ.)-এর তাওয়াক্কুল ও তাঁর মূল্যায়ন /২৪৪
হযরত ওমর (রাযি.)-এর দু'আর মূল্যায়ন /২৪৬
হযরত যায়েদ (রাযি.)-এর ওপর অনুগ্রহ ও পুরস্কার /২৪৭
হযরত উসামা ইবনে যায়েদের মর্যাদা /২৪৮
হযরত সালমান ফারসি (রাযি.)-এর প্রতি অনুপম উৎসাহ প্রদান /২৪৯
হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর ওপর দয়া ও অনুগ্রহ /২৫৫
করজে হাসানা (উত্তম ঋণ) দেওয়ার বিনিময়ে
আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রকাশ /২৫৮
রোযাদারের মূল্যায়ন ও সম্মান /২৫৯
যার আমল উদ্দেশ্যবিহীন নয় /২৫৯
যুবায়দা খাতুনের ওপর অনুগ্রহের দৃষ্টি /২৬০
একজন মূর্তিপূজকের ডাক ও তার মূল্যায়ন /২৬২
পুরস্কারের আদেশ /২৬২
জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ /২৬৩
অপরাধ রেকর্ডের পরিসমাপ্তি /২৬৪
চিন্তার মুহূর্ত /২৬৪
নিকটতম আত্মীয়দের সম্মান করো /২৬৯
শায়খের সম্মান ও মর্যাদা /২৭১
ওস্তাদ ও পীরের প্রতি অশুভ ধারণা /২৭২
একটি অগ্রাহ্য আমলের পরামর্শ /২৭২

নেয়ামতে অকৃজ্ঞতার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি /২৭৩
বদ-দু'আ দেওয়া ও গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকো /২৭৩
দয়াবান প্রভুর মায়াময় সংবাদ /২৭৫
দয়াময় প্রভুর অনুগ্রহের পরিসীমা /২৭৬
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /২৭৮

এখলাছের বরকত /২৮৬
দীনের স্তর তিনটি /২৮৬
আমলের গ্রহণযোগ্যতার জন্য নিয়তের প্রভাব /২৮৮
রিয়া থেকে বেঁচে থাকা আসল অযিফা /২৯২
হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.)-এর এখলাছ /২৯৩
হযরত হুসাইন আহমদ মাদানি (রহ.)-এর এখলাছ /২৯৩
হযরত আবদুল মালিক সিদ্দিকী (রহ.)-এর এখলাছ /২৯৫
মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ জলন্ধরি (রহ.)-এর এখলাছ /২৯৭
মুখলিছ বান্দার কাজে আল্লাহর মদদ /২৯৮
এখলাছের কারণে (মহব্বতের) বন্ধন সৃষ্টি হয় /৩০৭
ধোঁকাবাজের নিদর্শন তিনটি /৩০৯
নিষ্ঠাবান বান্দার প্রশংসা অধিক হয় /৩১১
যেমন এখলাছ তেমন প্রতিদান /৩১১
ইমাম আবুদাউদ (রহ.)-এর এখলাছ /৩১২
আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি সন্ধানী /৩১২
এখলাছের চেকিং /৩১৮
মুখলিছের পরিচয় /৩১৯
আল্লাহ দুয়ার, আল্লাহর ভয় /৩১৯
প্রত্যেক কাজেরই মূল্য থাকে /৩১৯
আমি তোমাকে হাজী বলব, তুমি আমাকে কাজী বলো /৩২০

তাওবায়ে নাসূহা বা আন্তরিক তাওবা /৩২৪
গোনাহের প্রভাব /৩২৪
তাওবায়ে নাসূহ কাকে বলে? /৩২৫
গোনাহকে হালকা ও সজ্জিত করে উপস্থাপন করা /৩২৬
ছোট গোনাহকে ছোট মনে করো না /৩২৬
ভয়ানক বিষয় /৩২৯

বিশ্বাসঘাতকতা করো না /৩২৯
উদাহরণ জগতে মানুষের অনুরূপ আকার /৩৩০
মূর্খ ও অতি মূর্খের মধ্যকার পার্থক্য /৩৩১
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
কথার বাগ্মিতা ও অলংকার /৩৩২
গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ /৩৩২
জ্ঞান ও সংকল্পের মাধ্যমে গোনাহ পরিত্যাগ করার পুরস্কার /৩৩৩
গোনাহের প্রতি ঘৃণা ঈমানে লক্ষণ /৩৩৩
চারটা বিষয় গুনাহের চেয়েও নিকৃষ্ট /৩৩৫
কবীরা গোনাহের কুফল ১০টা /৩৩৫
গোনাহগার বান্দা আল্লাহ দৃষ্টি থেকে পতিত হয়ে যায় /৩৩৭
ঈমান হতে বঞ্চিতকারী অপরাধ /৩৩৭
গোনাহের শাস্তি তিন প্রকার /৩৩৯
ছটি কাজ অহেতুক হয় /৩৪২
তাওবায়ে নাসূহের জন্য চার কাজ /৩৪২
তওবায়ে নাসূহের পুরস্কার চারটি /৩৪৪
জনৈক মদ পানকারীর পুরস্কারের ঘটনা /৩৪৫
বাদশাহর সঙ্গে আলেমের কথন /৩৪৬
এক কাফন চোরের আন্তরিক তাওবা /৩৪৬

দীনের মধ্যেই সম্মান /৩৫২
প্রত্যেক অবস্থায়ই পরীক্ষা করা হয় /৩৫২
প্রকৃত অর্থে মানুষ নির্বোধ /৩৫২
মর্যাদা ও যৌবনের গোনাহ /৩৫৩
আখেরাতকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশ /৩৫৪
দুনিয়ার হাকীকত /৩৫৬
বাদশাহীতে এমন স্বাদ নেই /৩৫৬
খোদাপ্রেমিকদের খাদেম /৩৫৬
আল্লাহওয়ালাদের রাজত্ব /৩৫৭
উত্তম ধৈর্য উত্তম বিচ্ছেদ /৩৫৭
হক ও বাতিলের যুদ্ধ /৩৫৮
নবীজির দারিদ্র্যকে মনোনীতকরণ /৩৬০
গরিবদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য /৩৬১

উৎসাহ দিতে হলে এভাবে দাও /৩৬২
হৃদয়বান কাকে বলে? /৩৬২
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /৩৬৩
গরিবের আহ!-এর আগুন থেকে বেঁচে থাকো /৩৬৪
ইজ্জতের মানদণ্ড /৩৬৫
একটি গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্মতা /৩৬৬
লৌকিকতার দরুন প্রতিদান হতে বঞ্চিত /৩৬৬
আমলের ওজন এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব /৩৬৭
হেদায়াত খোদাপ্রেমিকদের জন্য /৩৬৯
মনোনীত লোকদের সমাবেশ /৩৭০
নতুন অঙ্গীকার করুন /৩৭১

ইসলামে বিবাহের ধারণা /৩৭২
আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে উপকার হাসিল করার নিয়ম /৩৭২
তাকওয়ার বরকত /৩৭৩
আজকের আলোচ্য বিষয় /৩৭৩
প্রত্যেক জিনিস জোড়া-জোড়া থাকে /৩৭৪
ইসলাম একটি প্রকৃতি /৩৭৪
উত্তম স্ত্রী কে? /৩৭৫
আম্বিয়ায়ে কেরামের চারটি সুন্নাত /৩৭৬
বুযুর্গগণের সতর্কতা /৩৭৯
বিবাহ এমনও হতো /৩৭৯
বিবাহ ও ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য /৩৮১
বিবাহের প্রচার-প্রসারের নির্দেশ /৩৮২
মসজিদে বিবাহ পড়ানোর উপকারিতা /৩৮৩
বিবাহের অনুষ্ঠানে ইসলাম গ্রহণ /৩৮৩
উগ্রতা ও শিথিলতা থেকে বেঁচে থাকো /৩৮৩
একটা দুঃখজনক ঘটনা /৩৮৪
দুনিয়াতে জান্নাতের স্বাদ /৩৮৪
পুণ্যবতী নারীদের নিদর্শন চারটি /৩৮৬
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হওয়ার কারণ /৩৮৭
একটি বিদ্যাগত সূক্ষ্মতা /৩৮৭
ঘরোয়া বিবাদের সহজ মীমাংসা /৩৮৮

সহনশীল মেজাজের প্রয়োজন /৩৮৮
সুন্নত আমলের কল্যাণ /৩৮৯
প্রেম-ভালোবাসার কথা /৩৯০
মেয়েদের তিনটি সূরা শিক্ষা দাও /৩৯০
সংযমের জীবন যাপন করো /৩৯১
মহিলাদের মধ্যে হুর-গেলমানের গুণ /৩৯১
নিষিদ্ধ ভাবনা থেকে বেঁচে থাকো /৩৯২
মহব্বতের নাম /৩৯২
ভুল ধারণা দূর করো /৩৯২
মিথ্যা থেকে দূরে থাকো /৩৯২
স্ত্রীর সঙ্গে দৌড়প্রতিযোগিতা /৩৯৩

ধ্বংসাত্মক সংস্কৃতি /৩৯৬

যেমন আবেগ তেমন ধারণা /৩৯৬
অন্তরের কেন্দ্রীয় শক্তি /৩৯৭
বিবেকের গুরুত্ব /৩৯৭
বিবেক কী বস্তু? /৩৯৮
ধারণার স্বয়ংক্রীয় নীতিমালা /৩৯৮
বিবেকের তেজস্বীত /৩৯৯
মানবজ্ঞান ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা /৪০১
মস্তিষ্কে ইনফরমেশন (সংবাদ) দেওয়া যায় কীভাবে /৪০৩
মিউজিক (গান-বার্জনা) কাফেরদের ধ্বংসাত্মক হাতিয়ার /৪০৫
ভিডিও গেমস-এর মাধ্যমে কাফেরদের প্রচেষ্টা /৪১০

ইচ্ছাশক্তি /৪১৪

ইচ্ছাশক্তি একটি মহান নেয়ামত /৪১৪
বিশ্ববিখ্যাত অনুবাদক ও তার ইচ্ছাশক্তি /৪১৪
জনৈক নোবেল বিজয়ীর ইচ্ছাশক্তি /৪১৫
বিজ্ঞানী নিউটন-এর ইচ্ছাশক্তি /৪১৬
পরমাণু বিজ্ঞানী আইনস্টাইন-এর ইচ্ছাশক্তি /৪১৬
সততায় ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি পায় /৪১৭
দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন /৪১৮
কাঠ আগুনের খাদ্য হলো কীভাবে? /৪১৯

ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করার রহস্য /৪২০
দুই কিশোরের ইচ্ছাশক্তি /৪২০
একজন মাজুর সাহাবীর সংকল্প /৪২১
আবুবকর (রাযি.)-এর মেয়ে আসমা (রাযি.)-এর ইচ্ছাশক্তি /৪২২
ফাতেমা বিনতে খাত্তাবের ইচ্ছাশক্তি /৪২৩
একজন ইউরোপিয়ান লোকের স্বীকারোক্তি /৪২৪
হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সংকল্প /৪২৫
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছাশক্তি /৪২৭
অটলতার শিক্ষা /৪২৭

হেদায়াতের জ্যোতি /৪৩২

দুনিয়ার বিশেষ মেহমান /৪৩২
হেদায়াতের জ্যোতিসমূহের উত্থান /৪৩২
কুদরতি নিয়মের প্রতিধ্বনি /৪৩৫
পর্দার বাধ্যবাধকতা /৪৩৬
জনৈক সরলপ্রাণ যুবক /৪৩৬
ইউরোপিয়ান সংস্কৃতি লা-হাওলার উপযোগী /৪৩৬
ভ্রষ্টতাপূর্ণ জ্যোতির উত্থান /৪৩৭
তালাকদানকারী ব্যভিচারী /৪৩৮
স্বদেশের মূল্য ও সম্মান /৪৩৯
যদি এই অধিকারও মানুষকে দেওয়া হতো,
তাহলে কী হতো /৪৪০
দীনের কাজে বাধাসমূহ /৪৪১
অভাবের যুগে বস্তুর মূল্যায়ন /৪৪২
খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে থাকো /৪৪৩
আল্লাহ তা'আলার প্রতি খারাপ ধারণা /৪৪৪
কুধারণাকারীর ব্যর্থ চেষ্টা /৪৪৫
আনন্দের সংবাদ /৪৪৫

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের পরিচিতি

'লক্ষ করুন। বন্দুকের গুলিতে বাঘ-সিংহ নিহত হয়। কিন্তু সেই গুলিকে গুলালে রেখে নিক্ষেপ করলে বাঘ তো দূরের কথা চড়ুই পাখিও মরবে না। পক্ষান্তরে বন্দুকে ফিট করে নিক্ষেপ করলে বাঘ, সিংহ, হাতি পর্যন্ত মারা যাবে। এমনিভাবে 'ইসমে আযম' তো ﷲ শব্দই এটা নগণ্য জবান দ্বারা বের হলে কী প্রভাব ফেলবে? যে জবান চোগলখোরি করে, অন্যের ওপর অপবাদ দেয়, অন্যকে গালমন্দ বলে, এমন জবান দ্বারা ﷲ উচ্চারিত হলে কী বরকত বিকাশিত হবে? এর কল্যাণ প্রকাশ হতে হলে আগে জবান ঠিক করতে হবে। ইসমে আযম হচ্ছে ﷲ শব্দ; সঠিক জবান থেকে নির্গত হলে তার প্রভাব বিকাশ হবে।'

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের পরিচিতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ.

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَ لَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ. اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ. وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অবশ্যই করণীয়

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ

'আল্লাহর প্রতি মুমিনগণের ভালোবাসা হয় গভীর।'[১]

এর সাধারণ অনুবাদ করলে অর্থ হবে– মুমিনরা আল্লাহপাকের মব্বতে ব্যাকুল থাকে।

আল্লাহকে ভালোবাসা একান্ত কর্তব্য। এটি ঈমানের ভিত্তি। হযরত হাসান বসরি (রহ.) একটি সুন্দর কথা বলেছেন যে, যেব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পেরেছে, সে তাঁকে ভালোবাসা ছাড়া থাকতে পারে না এবং যে পৃথিবীর মূলতত্ত্ব বুঝেছে, সে তাকে ঘৃণা করা ব্যতীত থাকতে পারে না।

আগেকার গ্রন্থাবলিতে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন– হে আমার বান্দারা! তোমাদের ওপর আমার যে দায়িত্ব রয়েছে, তার দরুন আমি

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৫

তোমাদেরকে আমার বন্ধু বানিয়ে নিলাম। এবার তোমরা আমাকে তোমাদের বন্ধু বানিয়ে নাও। এটি ভালোবাসার সংক্ষিপ্ত রাস্তা।

راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں

عشق کا ہے بہت بڑا احسان

এক পলকে বছরের পথ পাড়ি দিতে পারি,

প্রেমজগতে এই নেয়ামত জানবে অতি ভারী।

যেব্যক্তি ভালোবাসার পালকে ওড়ে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা তাঁর জন্য সহজ হয়ে যায়।

বিবেক ও তীক্ষ্মতায় মারেফত হাসিল হয়

বিজ্ঞান বলে, মানবজাতির পাঁচটি ইন্দ্রিয় শক্তি রয়েছে, যেগুলো দ্বারা মানুষ বিভিন্ন জিনিস অনুভব করে থাকে; যদিও ওলামায়ে কেরাম ইন্দ্রিয় ছয়টি বলেছেন। পাঁচটি হলো এই, যেগুলো বিজ্ঞানও স্বীকৃতি দেয়– ১. দর্শনশক্তি (চক্ষু) ২. শ্রবণশক্তি (কান) ৩. আহরণশক্তি (নাক) ৪. স্বাদ আস্বাদনশক্তি (জিহ্বা) ৫. স্পর্শশক্তি (ত্বক)। অপর একটি ইন্দ্রিয় হলো, বিবেক ও তীক্ষ্ম বুদ্ধি। বিজ্ঞান একে ইন্দ্রিয় বলে বিশ্বাস করে না। আমরা তা বিশ্বাস করি। এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টি সর্বোচ্চ ইন্দ্রিয়। কারণ, প্রথম পাঁচটি ইন্দ্রিয় অন্যান্য প্রাণীদেরও রয়েছে। আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষ অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যময় হয়েছে।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্র অনুভূতি রয়েছে। বিবেক ও তীক্ষ্মতায় আল্লাহ তা'আলার মারেফত অর্জন হয়। মারেফতের অনুভূতি সর্বাধিক হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো লোক অত্যন্ত সুন্দর একটি ফুল দেখছে। তখন সে তার দৃষ্টিশক্তি অনুপাতে সেই ফুলের ভালোবাসা উপলব্ধি করবে। যদি তার দৃষ্টিশক্তি সঠিক থাকে, তবে সে তা পূর্ণ অবলোকন করে অতিশয় আনন্দিত হবে। আর যদি তার দৃষ্টিশক্তি সঠিক না হয় এবং তার জন্য চশমার প্রয়োজন হয়; কিন্তু তখন তার কাছে চশমা ছিল না, তবে সে ফুলটি পূর্ণরূপে দেখতে পারবে না। ফুলের বৈশিষ্ট্য হলো, যা তার সৌন্দর্যকে সূক্ষ্মতার সাথে দেখা হয় এবং তার স্বাদ আস্বাদন করা হয়। যার সামনে ফুলের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট নয়, সে ফুলের ভালোবাসা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়।

এমনিভাবে যে মানবসন্তানের আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন হবে, সে এমন স্বাদ উপভোগ করবে, যা অন্য কোনো পন্থায় অর্জন করা সম্ভব নয়।

জাহান্নামের চেয়েও কঠিন শাস্তি

কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় শাস্তি হবে যে, আল্লাহ তা'আলা নাফরমান বান্দাদের আল্লাহর দীদার (দর্শন) হতে বঞ্চিত রাখবেন। এটা জাহান্নামে প্রেরণের চেয়েও বড় শাস্তি হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে কথোপকথন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ۝

'কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেন না।'[২]

একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে কুরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন-

كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۝

'কেয়ামতের দিন আল্লাহপাক ও গোনাহগারদের মধ্যখানে আড়াল (পর্দা) থাকবে।'[৩]

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত শোনে কান্না শুরু করে দিলেন।

জান্নাতে সর্বোত্তম পুরস্কার

আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে তাঁর দীদার হতে বঞ্চিত করা সবচেয়ে বড় তিরস্কার এবং কাউকে নিজের দর্শন দেওয়া সর্বোত্তম পুরস্কার। হাদীছ শরীফে এসেছে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- জান্নাতীদের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার হবে আল্লাহর দীদার।

اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَدْخُلُوْنَ عَلَى الْجَبَّارِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فَيُقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ

'নিশ্চয় জান্নাতবাসীগণ দৈনিক দুবার আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর আল্লাহ তাদের কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাবেন।'

---

২. সূরা আল-মুমিনূন : আয়াত ১০৮
৩. সূরা মুতাফিফফীন : আয়াত ১৫

সেই অনুষ্ঠানটি কেমন হবে! তার অনুভূতি ও আস্বাদন কেমন হবে! বর্তমানে যখন কোনো সুমধুর কণ্ঠধারী কারী সাহেব তার সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করেন, তখন তার তেলাওয়াত শুনে মানুষের শরীর শিউরে ওঠে, হৃদয়ে এক অদ্ভুত অবস্থার সঞ্চার হয়। সুতরাং যখন স্বয়ং আল্লাহপাক নিজের কালাম তেলাওয়াত করবেন আর মুমিনরা তা শুনবে; তখন স্বাদের অন্য জগৎ শুরু হবে।

কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, মানুষ কবর থেকে পুনরুত্থানের সময়ই কেউ-কেউ আল্লাহপাকের দীদার লাভ করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝

'কতক চেহারা সে দিন সমুজ্জ্বল থাকবে। তখন তাদের প্রতিপালকের চেহারা দর্শন করতে থাকবে।'[৪]

কেয়ামত দিবসের বিপদে তাদের কোনো আক্ষেপ থাকবে না। আল্লাহপাক বলেন–

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ

'মহা আতঙ্কে তাদের কোনো চিন্তা থাকবে না।'[৫]

অতএব, জান্নাতে মহান উপভোগের বিষয় হবে আল্লাহর দীদার।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ۝ فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

'নিশ্চয় পরহেজগাররা মহাশক্তিধর বাদশাহের কাছে বাগান, নদী ও সঠিক ঠিকানায় থাকবে।'[৬]

বর্তমানে পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী বাদশাহের শুভাগমন হলে মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সুতরাং যখন মহা রাজাধিরাজের উদয় হবে, তখন কেমন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে! তাই আল্লাহপাকের নৈকট্য ও দর্শনের স্বাদ ভোগ করার জন্য অধিক পরিমাণে দু'আ করা চাই। হযরত রাবেয়া বসরিকে আশীর্বাদ দিয়ে কেউ বলেছিলেন, আল্লাহপাক আপনাকে জান্নাত

---

৪. সূরা কিয়ামা : আয়াত ২২, ২৩
৫. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ১০৩
৬. সূরা কামার : আয়াত ৫৪, ৫৫

দান করুন! উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আগে প্রতিবেশী; তারপর অধিবাসী। অর্থাৎ– বাসস্থান পরে; প্রতিবেশী চাই আগে।

সুখের অশ্রু

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন–

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ

'আল্লাহর সন্তুষ্টি সবচেয়ে মহৎ বিষয়।'[৭]

আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জন মুমিনের জন্য অতিশয় আনন্দের বিষয়। মানুষ যখন অধিক আনন্দিত হয়। তখন তার চোখে সুখের অশ্রু উদ্ভাসিত হয়।

কথায় বলে, অতি সুখে কেঁদে ওঠে, অতি দুঃখে হাসি ফোটে। এক বুযুর্গ একটি পাথরকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কাঁদছ কেন? পাথর জবাব দিল, এজন্য কাঁদছি, যাতে জাহান্নামের ইন্ধন হয়ে না যাই। তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! এ পাথরটিকে আপনি জাহান্নামের ইন্ধন বানাবেন না। তাঁর দু'আ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। বুযুর্গ তাকে সুসংবাদ জানিয়ে চলে গেলেন। তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন পুনরায় তাকে কাঁদতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এবার কাঁদছ কেন? পাথর উত্তর দিল, জনাব! পূর্বে ছিল ভয়ের কান্না। এবার হচ্ছে সুখের কান্না। আর সেই সুখ হচ্ছে আমার মালিক আমার প্রতি রাজি হয়ে গেছেন।

একবার হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযি.) বসা ছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডেকে বললেন– সূরা বায়্যিনাহ পাঠ করে শোনাও। আমার প্রতি আদেশ হলো, তুমি সূরা বানিয়্যনাহ শোনাও। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। তাই বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহপাক কি আমার নাম ধরে বলেছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ; আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তোমার নাম ধরে বলেছেন, হে আমার হাবীব! উবাই ইবনে কা'বকে সূরা বায়্যিনাহ তেলাওয়াত করতে বলো। তুমিও শুনবে, আমিও শুনব। একথা শুনে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযি.)-এর চক্ষুদ্বয় দিয়ে আনন্দের অশ্রু ঝরতে শুরু করে।

---

৭. সূরা তাওবা : আয়াত ৭২

کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل
نسیم صبح تیری مہربانی

'আমি কোথায় আর বাগানের সুবাস কোথায়?
প্রভাতের মৃদ হাওয়া তোমরই অশেষ দয়া।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে চটের পোশাক পরিধান করে এলেন। সহায়সম্বল যা কিছু ছিল প্রিয়তমের খেদমতে পেশ করে দিলেন। এমন সময় উর্ধ্বজগত হতে হযরত জিবরাঈল (আ.) একই ধরনের পোশাক পরিহিত অবস্থায় এসে সালামপূর্বক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহপাক আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর আমলের দরুন এত খুশি হয়েছেন যে, আকাশের সকল ফেরেশতাকে চটের পোশাক পরিধান করতে আদেশ করেছেন। তাই আমি এই পরে উপস্থিত হয়েছি। আল্লাহপাক বলেছেন, যাও; আবুবকরকে জিজ্ঞাসা করো, সে এই অবস্থায় আমার প্রতি সন্তুষ্ট কিনা। হযরত আবুবকর (রাযি.) একথা শোনামাত্র তাঁর চক্ষুদ্বয় সুখের অশ্রুতে সিক্ত হয়ে গেল। বলতে লাগলেন, আমি সর্বাস্থায় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহু আকবার!

খোদাভীরুদের আসন

যে বান্দার অন্তরে এই চিন্তা বদ্ধমূল হবে যে, আল্লাহপাক যেন আমার প্রতি সন্তুষ্টি হয়ে যান এবং এ উদ্দেশ্যে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, মনে আল্লাহর ভয় রাখবে, এমন বান্দাকে আল্লাহপাক জান্নাত দান করবেন। আল্লাহপাক বলেন–

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

'যেব্যক্তি আল্লাহপাকের সম্মুখে উপস্থিতিকে ভয় করে এবং নিজেকে কুপ্রভৃতি থেকে বিরত রাখে। নিশ্চয় তার ঠিকানা জান্নাত হবে।'[৮]

সুবহানাল্লাহ! সাধারণ মানুষদের জান্নাত হবে একটি। আর আল্লাহপাক খোদাভীরুদের দুটি জান্নাত দান করবেন। মানুষর একটি ঘর নিজের জন্য

৮. সূরা নাযিআত : আয়াত ৪০, ৪১

নির্মাণ করে, আরেকটি মেহমানখানা তৈরি করে। এমনিভাবে আল্লাহপাক খোদাভীরুদের জান্নাতে যাওয়ার তাওফীক দান করবেন। সেখানে তার নিজগৃহ আলাদা হবে এবং মেহমানখানা আলাদা হবে।

দরবেশের বিশেষ আলামত থাকে

কোনো কবি বলেন–

همہ شہر پر ز خوباں منم خیال ما ہے
چہ کنم کہ چشم یک بیں نہ کند بہ کس نگاہے

'নগর জুড়ে রূপসী তাতে আমি তাপসী মগ্ন থাকি গভীর ধ্যানে,
নেত্র এতে মত্ত; কি করিবে চিত্ত; লগ্ন নাহি অন্য প্রাণে।'

দরবেশগণ! মূলত একবস্তু দর্শনকারী হয়ে যায়। এর মর্ম কী? মর্ম হলো তার দৃষ্টি শুধু তার উদ্দেশ্য হাসিলে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহকে পাওয়া তার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। এটি তার বিশেষ আলামত। তার অন্তর থেকে এটি নির্গত হয়। হে প্রভু! তুমিই আমার উদ্দেশ্য, আমি তোমার সন্তুষ্টিসন্ধানী; তুমি আমাকে মহব্বত ও মারেফত দান করো।

ভালোবাসা ও পাপাচারের প্রতি আহ্বানকারী

এ পৃথিবীতে দু-ধরনের গবেষক হয়ে থাকে।

১. দুনিয়াদার ব্যক্তিবর্গ, দুনিয়ার প্রতি আহ্বানকারী, ফিল্ম-এ কর্তব্যরত ব্যক্তিবর্গ ও সংগীতশিল্পীরা। দুনিয়ার প্রতি মত্ত লোকের মধ্যে কোনো-কোনো সময় তাদের আসল রূপ প্রকাশ পায়। তখন দেখা যায় তাদের মধ্যে কী পরিমাণ অকল্যাণ বর্ষিত হচ্ছে।

২. আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাঁদের খাদেমগণ। তাঁরা আল্লাহপাকের ভালোবাসার প্রতি আহ্বান করেন। স্মরণ রাখতে হবে, প্রকৃত ভালোবাসাই হচ্ছে ভালোবাসা। আর রূপক ভালোবাসা হচ্ছে পাপ আর তামাশা। আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রকৃত মহব্বতের প্রতি আহ্বান করেন এবং দুনিয়াদাররা পাপাচারের প্রতি আহ্বান করে। আল্লাহওয়ালাদের চেহারায় রহমত বর্ষিত হয়। আর দুনিয়াদারদের চেহারায় অকল্যাণ পরিলক্ষিত হয়। শয়তান তাদের সম্মুখে তাদের মন্দ কর্মকেও সুসজ্জিতরূপে উপস্থাপন করে।

আল্লাহপাক বলেন–

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا

'তাদের সম্মুখে তাদের মন্দ কাজসমূহ সুপরিপাটি করে উপস্থাপন করা হয়। তারা কি সেগুলো উত্তম মনে করবে? '[৯]

বুযুর্গগণ বলেন, পরিশ্রম করো, নিজের মালিকের সন্তুষ্টি অর্জন করো। পক্ষান্তরে দুনিয়াদাররা বলেন, দুনিয়ার স্বাদ ভোগ করো। আমাদের উচিত, কঠোর শ্রম ও সাধনার মাধ্যমে আমাদের মালিকের সন্তুষ্টি অর্জন করা।

জ্ঞানীদের কাছে আল্লাহপাকের মর্যাদা জিজ্ঞাসা করো

আল্লাহর মহব্বত আশ্চর্যের বিষয়। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন–

الرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيرًا

'আল্লাহর ব্যাপারে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো।'[১০]

বন্ধুগণ! যে যাকে ভালোবাসে, সে ব্যতীত অন্য কেউ তার প্রকৃত মূল্য জানতে পারে না। কোনো এক বাদশাহ জানতে পেরেছেন, লায়লার প্রেমে মজনু দেওয়ানা হয়েছে। এতে তিনি লায়লাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে গেলেন, না জানি লায়লা কত সুন্দর। কিন্তু যখন তিনি লায়লাকে দেখলেন, তখন আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কারণ, লায়লা খুবই কালো ও কুশ্রী ছিল। এমনকি রাতের অন্ধকারের মতো কালো ছিল বলে তার মাতাপিতা তার নাম লায়লা রেখেছিল। লাইলুন শব্দের অর্থ হচ্ছে রাত। লায়লার ব্যাপারে বাদশাহর ধারণা ছিল, সে হয়ত নায়িকা ও পরীর মতো সুন্দর হবে। যখন বাস্তবে দেখলেন, তখন বললেন– তুমি তো অন্যান্য মহিলাদের চেয়ে রূপসী নও...। লায়লা জবাব দিল, তুমি চুপ থাকো। তোমার কাছে মজনুর চোখ নেই। যদি মজনুর চোখ থাকত, তাহলে পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুন্দর কোনো রমণী দেখতে না।

দেখার মতো চোখ থাকতে হবে। এজন্যই আল্লাহপাক বলেন– যদি তোমরা দয়াময় প্রভুর সম্পর্কে জানতে চাও, তাহলে দুনিয়াদারদের জিজ্ঞাসা করো না। আল্লাহর সম্পর্কে তারা কোনো জ্ঞান রাখে না। ফুলের মর্ম জানতে হলে বুলবুলিকে জিজ্ঞাসা কর; গাধাকে নয়। যার মস্তিষ্ক মৃত বস্তুর দুর্গন্ধে

---

৯. সূরা ফাতির : আয়াত ৮

১০. সূরা ফুরকান : আয়াত ৫৯

ভরপুর, সে পুষ্পের সুবাস কীভাবে জানবে। তাই আল্লাহপাক বলেন, দয়াময় খোদার পরিচয় জানতে হলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো। আল্লাহর মান ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে হলে মর্যাদাবানদের জিজ্ঞাসা করো।

ইসমে জালাল 'আল্লাহ'-এর পরিচয়

আল্লাহপাক এরশাদ করেন–

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

'আল্লাহর অনেকগুলো সুন্দর নাম রয়েছে। সুতরাং তোমরা সেসব নামে তাঁকে ডাকো।'[১১]

আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত নাম একটি– 'আল্লাহ'। অন্যান্য সবগুলো হচ্ছে গুণবাচক নাম। সত্তাগত নাম 'আল্লাহ'কে ইসমে জালালুহু এবং শ্রেষ্ঠ নাম বলা হয়। আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম ৯৯ টি। এগুলোকে কুরআন পাকে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া হাদীছে আরও কিছু নাম বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু আল্লাহপাকের গুণের কোনো সীমা নেই, সেহেতু তাঁর গুণবাচক নামেরও কোনো সীমা নেই। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রার্থনা করতেন– 'হে আল্লাহ! আমি আপনার ওই নামসমূহের মাধ্যমে আপনার কাছে প্রার্থনা জানাই, যেগুলো আপনি স্বীয় নবীগণকে শিক্ষা দিয়েছেন অথবা ফেরেশতাগণকে শিক্ষা দিয়েছেন অথবা যেগুলো কাউকে শিক্ষা না দিয়ে নিজের কাছে সংরক্ষিত রেখেছেন।'

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামের কোনো সীমারেখা নেই।

جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا ● ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے

'যার নামের কোনো সীমা নেই, তার নামে শুরু করছি।'

فتح الله নামক কিতাবের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত নাম 'আল্লাহ'। এটি অসংখ্য মারেফতের বাহক। এ বিষয়ে আরবী ভাষায় লিখিত এক হাজার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'ফতহুল্লাহ' নামক একটি কিতাব রয়েছে। এ অধমের ওই কিতাবখানি পাঠ করার সুযোগ হয়েছে। সেখানে আল্লাহপাকের নামসমূহের পরিচিতি বর্ণনা করা হয়েছে।

---

১১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৮০

পবিত্র কুরআনের সারাংশ

الله শব্দটি পবিত্র কুরআনের সারসংক্ষেপ। জ্ঞানসম্পর্কীয় সূক্ষ্মতা স্মরণ রাখবে। কুরআন মাজীদের সূরাসমূহ তিন প্রকার–

এক. সূরা মুজাদালার প্রত্যেক আয়াতে الله শব্দটি এসেছে।

দুই. কিছু সূরায় ২নং ও ৩নং আয়াতে আল্লাহপাকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– সূরা আর-রাহমান। এ সূরায় এক-দুই আয়াত পরপর فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে 'রাব্বুন' শব্দটি এসেছে। আর এটি আল্লাহর তা'আলার নাম।

তিন. এছাড়া অন্যান্য সূরাসমূহেও গবেষণা করলে দেখা যায়, প্রত্যেক পাঁচ-সাত আয়াত পরপরই আল্লাহপাকের নাম এসেছে। الله শব্দটি পবিত্র কুরআনে ছয়শত আটান্নব্বইবার ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহতে একেকবার এসেছে। এগুলো মিলালে সর্বমোট সাতশতবার হয়। الرحمن ও الرحيم শব্দদ্বয়ও বহুবার ব্যবহার হয়েছে। পক্ষান্তরে رب শব্দ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়েছে। কয়েক আয়াত পরপরই رب শব্দ পাবেন। এর দ্বারা একথা অনুধাবন করা যায় যে, আল্লাহপাক ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজের নাম বারবার উল্লেখ করেছেন, যাতে স্বীয় বান্দার মুখে তাঁর নাম বারবার উচ্চারিত হয়। এমনকি কিছু-কিছু আয়াতে বাচনভঙ্গিতে বোঝা যায়, আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে হবে। অথচ আল্লাহপাক এমন বিচক্ষণতার সাথে আলোচনা করেছেন যে, আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর বরকতময় নামটি চলে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহপাক বলেন–

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ

'লোকেরা আযাবের জন্য ত্বরা করে।'[১২]

এ আয়াতে জবাব এতটুকু দেওয়া যেত যে, আযাব শ্রীঘই আসবে। কিন্তু আল্লাহপাক বলেছেন–

وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ

'আল্লাহ স্বীয় অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করবেন না।'[১৩]

---

১২. সূরা হাজ্জ : আয়াত ১৪৭

১৩. সূরা হাজ্জ : আয়াত ১৪৭

অন্য জায়গায় আল্লাহপাক বলেন–

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ

এগুলোই হচ্ছে যা তারা নিজহাতে প্রেরণ করেছে।'[১৪]

বাচনভঙ্গিতে বোঝা যায়, তারা জাহান্নামে যাবে। অথচ আল্লাহপাক জবাব দিয়েছেন–

وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

'নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার ওপর অত্যাচারী নন।'[১৫]

এখানে আল্লাহপাক নিজের নাম উল্লেখ করেছেন।

অপর এক জায়গায় আল্লাহপাক বলেন–

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ

'তুমি অনুসরণ কর ওই জিনিসের, যা তোমার দিকে প্রত্যাদেশ করা হয় এবং আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো।'[১৬]

এ সমস্ত আয়াতে গবেষণা করলে পরিলক্ষিত হয় যে, স্বর্ণকার যেমন গহনার মধ্যে রিং, পাথর ইত্যাদি স্থাপন করে অলংকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তেমনিভাবে আল্লাহপাক নিজের কথার মাঝে স্বীয় নাম উল্লেখ করে কথাকে অলংকৃত করেছেন।

ওলামায়ে কেরাম এখানে একটি সূক্ষ্মতা বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ কুরআনের তরজমার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে শুধু তেলাওয়াত করে, তবে তেলাওয়াতের মাধ্যমে বারবার আল্লাহপাকের নাম উচ্চারণ হওয়ার দরুন সে আল্লাহপাকের যিকির করার ফায়দা পাবে।

আমাদের জগদ্বিখ্যাত মুরশিদ (রহ.) বলতেন, যদি কাল্পনিকভাবে কুরআন মাজীদকে নিংড়ানো হয়, তাহলে নির্যাস হিসেবে যে ফোঁটাটি বের হবে, তা হবে মহান আল্লাহর মোবারক নাম اللّٰه। অর্থাৎ اللّٰه শব্দ সমগ্র কুরআনের নির্যাস বা সারসংক্ষেপ।

---

১৪. সূরা আনফাল : আয়াত ৫১
১৫. সূরা আনফাল : আয়াত ৫১
১৬. সূরা ইউনুস : আয়াত ১০৯

দুটি নির্দিষ্ট শব্দের সমন্বয়ে গঠিত নাম

প্রিয় বন্ধুগণ! আরবী ভাষায় বিশেষ্য দু-প্রকার। (১) নির্দিষ্ট (২) অনির্দিষ্ট। অনির্দিষ্ট বিশেষ্যগুলোকে নির্দিষ্ট বানানোর আবার বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে। যেমন, শব্দের শুরুতে ال، حرف ندا، اضافت ইত্যাদি। নির্দিষ্ট শব্দগুলোকে নির্দিষ্ট বানানোর কোনো পদ্ধতি দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা আবরী ব্যাকরণবহির্ভূত। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো الله শব্দের শুরুতে ال থাকার কারণে এটি معرف বা নির্দিষ্ট বিশেষ্য। এর শুরুতে পুনরায় يا حرف ندا ব্যবহার করা ব্যাকরণবহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও এতে يا حرف ندا ব্যবহার হয়। এটি একমাত্র الله শব্দের স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য। যেমন– يالله এখানে ال ও يا উভয়টি ব্যবহার হয়।

'নুকতা' বা বিন্দুবিহীন নাম আল্লাহর একত্ববাদের পয়গাম

আল্লাহপাক নিজের জন্য এমন একটি ত্রুটিমুক্ত নাম চয়ন করেছেন, যাতে কোনো নুকতা বা বিন্দু নেই। এটা আল্লাহর একত্ববাদের চাহিদা। কেননা, যদি নামের মাঝে নুকতাবিশিষ্ট হরফ ব্যবহার হতো, তাহলে মুশরিকরা কোনো প্রকার সুযোগ সন্ধানে লিপ্ত হতো। সুতরাং নুকতাবিহীন নাম চয়নের মাধ্যমে আল্লাহপাক জানিয়ে দিলেন, আল্লাহর সত্তা ও গুণের মধ্যে সুযোগ সন্ধানের প্রয়াস নেই। আল্লাহর সত্তায় কোনো ত্রুটি বের করার অবকাশ নেই। তাঁর সত্তা অংশীদারি হতে মুক্ত। সর্বপ্রকার ত্রুটি হতে পবিত্র।

সবকিছুর ইঙ্গিত আল্লাহর প্রতি

প্রিয় ভায়েরা! الله এমন একটি নাম যার একেকটি করে হরফ বা বর্ণ পৃথক করলে অবশিষ্ট অংশ ও আল্লাহপাকের দিকে ইশারা করে। যেমন– একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যায়, الله শব্দটি নিয়ে তার প্রথম বর্ণ ا (আলিফ) আলাদা করলে لله অবশিষ্ট থাকে। এটা আল্লাহপাকের প্রতি ইশারা করে। আল্লাহপাক এরশাদ করেন–

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ؕ

'আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর জন্য।'[১৭]

এভাবে যদি প্রথম ل টি আলাদা করা হয়, তাহলে لله বাকি থাকে। তা-ও আল্লাহপাকের প্রতি ইঙ্গিত করে।

---

১৭. সূরা বাকারা : আয়াত ২৮৪

যেমন– আল্লাহপাক বলেন–

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

'আসমান জমিনের যা কিছু আছে সব তারই জন্য ।'[১৮]

এমনিভাবে যদি দ্বিতীয় ل টি পৃথক করা হয়, তাহলে ه বর্ণটিও আল্লাহর প্রতি ইশারা করে । যেমন– আল্লাহপাক বলেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

'তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মা'বুদ নেই ।'[১৯]

বন্ধুগণ! ওই সত্তার প্রতি সবকিছু নিবেদিত, যিনি নিজের জন্য এমন একটি নাম চয়ন করেছেন, যার প্রতিটি বর্ণ আলাদা করলেও তাঁর নামের দিকে ইশারা করে ।

ঈমানের পূর্ণতা

আল্লাহপাক এরশাদ করেন–

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ

'তোমার প্রভুর নাম বরকতময় ।'[২০]

আল্লাহপাক নিজেই বলছেন, এ নাম বরকতময় । সেই নামের দরুন আমাদের ঈমান হাসিল হয় । ওলামায়ে কেরাম বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি নিম্নের বাক্যটি পাঠ করে, তবে তার ঈমান অর্জিত হবে না । যথা–

لا اله الا الرؤوف محمد رسول الله

لا اله الا الرحمن محمد رسول الله

لا اله الا الرحيم محمد رسول الله

কেননা, গুণবাচক নাম আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয় । যেমন– سميع ও بصير অন্যের জন্যও ব্যবহার হয় । সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত لا اله الا الله محمد رسول الله না বলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানে পূর্ণতা আসবে না ।

---

১৮. সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৫

১৯. সূরা হাশর : আয়াত ২২

২০. সূরা আর-রাহমান : আয়াত ৭৮

সাগর পাড়িদায়ক নাম

এটি এমন একটি বরকতময় নাম যে, তা যেখানেই আসে, সেখানে সমস্ত দূরত্বকে গুটিয়ে আনে। সমুদ্রতুল্য দূরত্বকে নিঃশেষ করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, একটি মেয়ে বেগানা ছিল। শরীয়ত বলে, তার দিকে তাকানো না-জায়েয। তার সঙ্গে নির্জনে বসা অবৈধ ছিল। কিন্তু যখন বিবাহের মাধ্যমে ওই মেয়েকে গ্রহণ করা হয়, তখন সেই অপরিচিত মেয়েটি আপনজন থেকেও আগে বেড়ে নিজের হয়ে যায়। এমনকি নিজের জীবনের সাথী বলা হয়। কুরআনপাক বলে–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

'তারা তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের পোশাক।'

বন্ধুগণ! একটু ভেবে দেখুন। দেহের সবচেয়ে নিকটতম বস্তু হচ্ছে পোশাক। এ আয়াতের মাধ্যমে একথা বোঝানো হয়েছে, স্বামীর জন্য সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি হচ্ছে তার স্ত্রী এবং স্ত্রীর জন্য হচ্ছে তার স্বামী। দুটি দেহ, দুটি হৃদয় একটি প্রাণের মতো হয়ে যায়। এত নৈকট্যতম সম্পর্ক কিসের মাধ্যমে হলো? একমাত্র আল্লাহর নামের বরকতে। কুরআন বলে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا-

'হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা ভয় করো ওই প্রভুকে, যিনি তোমাদের একই আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই আত্মা থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং এই জোড়া আত্মা (স্বামী-স্ত্রী) থেকে অসংখ্য নারী-পুরুষের বিস্তার ঘটিয়েছেন। আর ভয় করো ওই আল্লাহকে, যার জন্যে তোমরা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ কর এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর।'[২১]

বন্ধুগণ! الله এমন বরকতময় সত্তা যে, সেই সত্তার বরকতে আমরা পরস্পরে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করি। যদি সেই নাম মাধ্যম না হতো, তবে বৈবাহিক সম্পর্ক হতো না। যখন সেই নাম মাধ্যম হয়, তখন মধ্যবর্তী দূরত্ব সংকুচিত হয়ে আসে। অচেনা ব্যক্তিকে আপনজনে রূপান্তরিত করে।

---

২১. সূরা নিসা : আয়াত ১

এমনকি যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা অবৈধ ছিল, তার প্রতি তাকানো পুণ্যের কাজ হয়ে যায়।

আল্লাহর সত্তাগত নামের কল্যাণসমূহ

এই নামের কল্যাণ অপরিসীম। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমরা সে বিষয়ে অবগত নই। যদি আমরা এমন লোকের সান্নিধ্যে থাকি, যারা এই নামের কল্যাণ দেখেন; বরকত উপভোগ করেন, তবে তারা সেই নামের কল্যাণ ও বরকত আমাদের সম্মুখে বিকশিত করে দেখিয়ে দেবেন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইসমে আযম

হাদীছ শরীফে এসেছে, আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মধ্যে একটি নাম হলো 'ইসমে আযম'। এ নামের উসিলায় যে দু'আ করা হয়, তা আল্লাহপাকের দরবাবে কবুল হয়। হযরত ইমাম আবুহানীফা (রহ.) গভীর গবেষণার পর বলেছেন, আল্লাহপাকের সত্তাগত নাম الله হচ্ছে 'ইসমে আযম'।

তাফসীরে মাযহারীর প্রণেতা হযরত কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) এ বিষয়ে বিস্তর আলোকপাতের পর ফলাফল বের করেছেন যে, আল্লাহপাকের সত্তাগত নাম الله হচ্ছে 'ইসমে আযম'।

হযরত সুলাইমান (আ.)-এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আসিফ ইবনে বরখিয়্যা (রহ.)-এর ইসমে আযম জানা ছিল, যার মাধ্যমে তিনি বিলকিছ রানির সিংহাসন মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত করেছিলেন।

কিন্তু জেনে রাখা দরকার, তা প্রত্যেক জবান দ্বারা কার্যকর হয় না। বিশেষ কিছু জবান এমন মর্যাদাবান হয়, যার মাধ্যমে الله শব্দটি উচ্চারিত হলে ইসমে আযমের গুণাগুণ প্রকাশ পায়। যেমন– হযরত ঈসা (আ.) মৃত ব্যক্তিকে قم باذن الله (উঠো তোমার প্রভুর আদেশে) একথা বললে মৃতব্যক্তি সামান্য সময়ের জন্য জীবিত হয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে আমরা যদি قم باذن الله বলি, তাহলে মৃত ব্যক্তি দূরের কথা ঘুমন্ত ব্যক্তিও জাগ্রত হবে না। ঈসা (আ.) এর বাক্য আর আমাদের বাক্য একই। অথচ একবার নয় লাখোবার বললেও মৃতের সামান্য অনুভূতি আসবে না। বাক্য একই রয়েছে; কিন্তু

জবান পরিবর্তন হয়েছে। সেটি ছিল নবীর জবান আর এটা হলো আমাদের জবান।

লক্ষ্য করুন। বন্দুকের গুলিতে বাঘ-সিংহ নিহত হয়। কিন্তু সেই গুলিকে গুলালে রেখে নিক্ষেপ করলে বাঘ তো দূরের কথা চড়ুই পাখিও মরবে না। পক্ষান্তরে বন্দুকে ফিট করে নিক্ষেপ করলে বাঘ, সিংহ, হাতি পর্যন্ত মারা যাবে। এমনিভাবে 'ইসমে আযম' তো اللّٰه শব্দই এটা নগণ্য জবান দ্বারা বের হলে কী প্রভাব ফেলবে? যে জবান চোগলখোরি করে, অন্যের ওপর অপবাদ দেয়, অন্যকে গালমন্দ বলে, এমন জবান দ্বারা اللّٰه উচ্চারিত হলে কী বরকত বিকাশিত হবে? এর কল্যাণ প্রকাশ হতে হলে আগে জবান ঠিক করতে হবে। ইসমে আযম হচ্ছে اللّٰه শব্দ; সঠিক জবান থেকে নির্গত হলে তার প্রভাব বিকাশ হবে।

উদাহরণত– (১) একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নিচে তরবারি খোলা রেখে শুয়ে পড়লেন। হযরত ছুমামা ইবনে আছাল তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি এদিকে এলেন। দেখলেন, এটা মুসলমানের নবীকে হত্যা করার সুবর্ণ সুযোগ। তিনি চুপচাপ হেঁটে সামনে এসে তরবারি উন্মুক্ত করে দাঁড়ালেন। ইতোমধ্যে নবীজি সজাগ হয়ে গেলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাগ্রত দেখে তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! এখন বলো কে তোমাকে আমার কবল থেকে রক্ষা করবে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ। এই শব্দের এমন প্রভাব হলো যে, ছুমামা ইবনে আছাল ভয়ে কাঁপতে শুরু করলেন এবং তরবারিটা হাত থেকে পড়ে গেল। এবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তলোয়ার হাতে নিয়ে বললেন, এখন বলো তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? একথা শুনে সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কাকুতিমিনতি শুরু করল, মুহাম্মদ! আপনি কুরাইশ বংশের সম্ভ্রান্ত লোক। আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। শত্রুদের ক্ষমাকারী। তার অনুনয়বিনয় শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও! আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার পর হযরত ছুমামা ইবনে আছাল দাঁড়িয়ে রইলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ছুমামা! আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি; যাচ্ছ না কেন? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দাঁড়িয়ে আছি, যাতে আপনি আমাকে

কালেমা পাঠ করিয়ে দেন এবং আপনার মতো আল্লাহপাক যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন।

(২) হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে তাতারি জনগোষ্ঠীর ফেতনা এত অধিকহারে বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, মুসলমানদের মুকুট ও সিংহাসন তারা ছিনিয়ে নিয়েছিল। সারা বিশ্বে কোথাও মুসলমানদের শাসন ছিল না। তাতারি গোষ্ঠীর এমন প্রাধান্য ছিল যে, বাগদাদে একদিনে দুই লক্ষ মুসলমানকে জবাই করে হত্যা করেছিল। মুসলমানদের অন্তরে তাদের ভয় এরূপ হয়েছিল যে, এক তাতারি মহিলা একজন মুসলমান পুরুষকে বলল, সাবধান এক পাও নড়বে না। সে ওই স্থানে দাঁড়িয়ে রইল আর ওই মহিলা ঘর থেকে খঞ্জর এনে সেই মুসলমান পুরুষকে জবাই করল। তারা যে শহরে যেত, মুসলমানরা সেই শহর তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিত। দরবন্দ নামক একটি শহর ছিল। এক তাতারি শাহজাদা তার দলবল নিয়ে সেই শহরে উপস্থিত হলে সমস্ত মুসলমান সেখানে থেকে চলে গেল। সে উল্লসিত কণ্ঠে বলতে লাগল, আমাদের বাহাদুরি দেখো! আমাদের নাম শুনেই মুসলমানরা পালিয়ে গেছে। পুলিশ তাকে সংবাদ দিল, দুজন লোক এখনও আছে। একজন সাদা দাড়িবিশিষ্ট বৃদ্ধ লোক এবং তার খাদেম। তারা উভয়ে মসজিদে অবস্থান করছে। শাহজাদা বলল, কী তারা এখনও যায়নি? তারা বলল না। সে বলল, তাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে আমার কাছে নিয়ে এসো। পুলিশ গিয়ে হাতকড়া পরিয়ে তাদের রাজপুত্রের সম্মুখে নিয়ে এল। সাদা দাড়িওয়ালা ব্যক্তি ছিলেন হযরত শায়খ আহমদ দরবন্দি (রহ.)। তিনি নকশবন্দি তরিকার পীর ছিলেন। রাজপুত্র তাকে বলল, তোমরা কি জানতে পারনি, আমি এখানে এসেছি? তিনি বললেন, হ্যাঁ জেনেছি। সে বলতে লাগল, তবে শহর ছেড়ে চলে যাওনি কেন? সে রেগে আগুন। বলছে, এবার আমার শাস্তি থেকে তোমাদের কে বাঁচাবে? তিনি উচ্চৈঃস্বরে জবাব দিলেন– 'আল্লাহ'। যখন তিনি আল্লাহ নামটি উচ্চারণ করলেন, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর হাত থেকে হাতকড়া খুলে মাটিতে পড়ে গেল। সুবহানাল্লাহ! শাহজাদা যখন এ দৃশ্য দেখল, তখন বুঝতে পারল, তিনি সাধারণ লোক নন। সুতরাং বলতে লাগল, ঠিক আছে; আমি তোমাদেরকে এ শহরে থাকার অনুমতি দিলাম।

(৩) আমাদের এলাকায় হযরত খাজা গোলাম হাসান সোওয়াগ নামক একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। হাজার-হাজার মানুষ সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। কোনো এক স্থানে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায় একসাথে বাস করত। এক হিন্দু নেতা হযরতের জ্বালালিয়াতের

দরুন মুসলমান হয়েছে। হিন্দুরা হযরতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল, তিনি জাদুর মাধ্যমে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে মুসলমান বানাচ্ছেন। এ মামলার জজ সাহেব হিন্দু ছিলেন। যে পুলিশরা তাঁকে গ্রেফতার করেছিল, তারাও সবাই হিন্দু ছিল। তাঁকে হাকিমের সামনে উপস্থিত করা হলো। চতুর্দিক সিপাই পুলিশে ঘিরে রাখল। জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ওই হিন্দু নেতাকে মুসলমান বানালে কেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি তাকে ধর্মান্তরিত করিনি। সে নিজের থেকেই মুসলমান হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি অন্তরে اللّٰہ শব্দের তাওয়াজ্জু এনে এক ওসির দিকে আঙ্গুলের ইশারা করে বললেন, তবে কি আমি এই ওসিকেও মুসলমান বানিয়েছি? সঙ্গে-সঙ্গে ওই ওসি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। ক্রমান্বয়ে যার দিকে ইশারা করলেন, সে-ই মুসলমান হয়ে গেল। এভাবে ওই মজলিসেই পাঁচজন হিন্দু মুসলমান হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে জজ সাহেব অন্য কামরায় চলে গেলেন, কী জানি আমার দিকেও আঙ্গুলের ইশারা পড়ে যায়। পাশের কক্ষ থেকে আদেশ দিলেন, খাজা সাহেবকে সসম্মানে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। তিনি যেন এক্ষুনি চলে যান। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর নামের এমন বরকত! কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আমরা এ নামের যিকির করি না। সত্য কথা হলো, এটা হচ্ছে একটা কালো খালি ব্ল্যাকবোর্ড, যা ইচ্ছা তাতে লিখতে পার।

(৪) হযরত খাজা আবুল হাসান খিরকানি (রহ.) আমাদের তরিকায়ে নকশবন্দির শীর্ষ বুযুর্গ ছিলেন। একদিন তিনি ইসমে জাত 'আল্লাহ' এর ফযিলত বর্ণনা করছেন যে, ইসমে জাতের মাধ্যমে মানবদেহ সুস্থতায় বরকত হয়। মানুষের আমলে, রিযিকে ও সম্মানে বরকত হয়। সে-সময় সেখানে দার্শনিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবু আলী সীনা উপস্থিত ছিলেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা জ্ঞানীই হয়ে থাকেন। বিবেক নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। বেচারার বিবেকেও ওই কথার গবেষণা চলছে। সুতরাং মাহফিল শেষে বলতে লাগলেন, জনাব! সাধারণ একটি শব্দের যিকিরই এমন পরিবর্তন আনে? খাজা সাহেব বললেন, হে গাধা! আল্লাহ শব্দের এ্যাকশন ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে তুমি কী জান?

একটা ভরা মাহফিলে একজন সুপরিচিত দার্শনিক ব্যক্তিকে গাধা বলায় তার চেহারায় ঘাম বের হতে লাগল। খাজা সাহেবও আধাত্মিক ডাক্তার ছিলেন। তিনি তার মুখমণ্ডলে ঘাম দেখে বললেন, হেকিম সাহেব! ঘাম বের

হয়ে আসছে যে! হেকিম বললেন, খাজা সাহেব! কী করব! আপনি ভরা মজলিসে এমন শব্দ বললেন। খাজা সাহেব বললেন, হেকিম সাহেব! আমি জনসম্মুখে একটিমাত্র শব্দ 'গাধা' উচ্চারণ করায় তোমার দেহে এত পরিবর্তন দেখা দিল; পানি বেরিয়ে এল; তাহলে 'আল্লাহ' শব্দের এ্যাকশনে মানুষের অন্তরে পরিবর্তন আসবে না কেন?

প্রত্যেক বস্তুর আলাদা প্রভাব থাকে। টক জিনিসের আলোচনা বারবার করলে মুখে পানি এসে যায়। মিষ্টি দ্রব্যের নাম উচ্চারণ করলে 'মাশাআল্লাহ' মুখে মিষ্টতা অনুভব হয়। মানুষ যদি টক ও মিষ্টি দ্রব্যের স্বাদ অনুভব করতে পারে, তাহলে আল্লাহ শব্দের স্বাদ অনুভব করতে পারে না? পারে! তবে সেই ব্যক্তি পারবে, যে আল্লাহকে মহব্বত করে। সবাই পারে না। তার স্বাদ আমাদের অন্তরে অনুভব হয়। আল্লাহওয়ালা জীবন যাপন তিনি ওই সত্তা, যার ইবাদাতে সোনার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তার ভয়ের মধ্যে মুসলমানরা আনন্দ পায়। সুফিয়ায়ে কেরাম জনসমক্ষে বলে নির্জনতার স্বাদ উপলব্ধি করেন। মানবজাতি আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে তা অর্জন করে। বরং আমি বলি, মিষ্টতাও এর মাধ্যমে অর্জন হয়।

সুফি-সাধকদের গুণাগুণ

আমাদের পীর-মাশায়েখগণ বলেছেন, সাধকগণ بائن ৪ بائن ('দূরে থাকেন, কাছে থাকেন) হন। অর্থাৎ– তারা সৃষ্টজীব বলেই মনে হয়; তবে অন্ত র্নিহিতভাবে সবকিছুর ত্যাগী হন।

সুফী ওই বান্দাদের বলে, যারা নিজেদের আত্মার পরিশুদ্ধির প্রত্যাশী হন। صوفی শব্দটি صفا শব্দ হতে নির্গত হয়েছে। এর বিশ্লেষণ জানতে হলে আত্মশুদ্ধি বিষয়ক কিতাবাদি দেখা যেতে পারে।

মাশায়েখগণ আরও বলেন, সাধকগণ 'দূরে থাকেন, কাছে থাকেন'। অর্থাৎ– পরিবারপরিজন ও বন্ধুবান্ধব থেকে এই দৃষ্টিতে দূরে থাকেন যে, তাদের অদৃশ্য অবস্থা আপনজন হতে ছিন্ন থাকে। কাছে থাকেন এ অর্থে যে, বাহ্যিকভাবে আত্মীয়দের সাথে ভালোবাসা ঠিকই থাকে। কিন্তু অন্ত র্নিহিতভাবে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহপাকের সঙ্গে গভীর প্রেমে মত্ত থাকেন। তাদের আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়। তারা সৃষ্টিকূল থেকে বিরাগী। স্রষ্টার জন্য ত্যাগী। একারণে কেউ-কেউ বলেছেন, তারা فرشی وعرشی হন। অর্থাৎ– 'দৈহিকভাবে বিছানায় শয়ন এবং আত্মিকভাবে আরশে গমনকারী'

হন। আল্লাহ ওই সত্তার নাম, যিনি বিছানায় শয়িত বান্দাকে আরশে পরিভ্রমণ করিয়ে থাকেন।

আল্লাহ বলে ডাকার রহস্য

স্মরণ রেখো! আল্লাহ বলে ডাকার মধ্যে অনন্য রহস্য রয়েছে। কেন? এর মধ্যে কী হেকমত বা রহস্য রয়েছে? যদি يَارَحْمٰنُ বলে ডাক, তাহলে শুধু আল্লাহর 'দয়াগুণ'কে ডাকা হবে। এতে আল্লাহপাকের অন্যান্য গুণ সম্পৃক্ত নয়। যেমন– ক্ষমা ও গোপনকারী আসবে না। এমনিভাবে যদি يَا سَتَّارُ বলে ডাক, তাহলে অন্যান্য গুণ বোঝাবে না।

মোদ্দাকথা, আল্লাহপাকের যেকোনো গুণবাচক নাম দিয়ে ডাকলে শুধু সেই গুণটিই বোঝাবে। কিন্তু যদি কোনো বান্দা 'ইয়া আল্লাহ!' বলে ডাকে, তাহলে আল্লাহপাকের সমস্ত গুণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। প্রার্থনাসূচক অব্যয়গুলোর মধ্যে يَا অব্যয়টি স্বতন্ত্র। এটি দ্বারা দূরে ও কাছে উভয়টি বোঝায়। هٰ, শব্দ দ্বারাও এভাবে বোঝা যায়। এমনিভাবে আল্লাহর সত্তাগত নাম اللهُ শব্দের মধ্যেও সর্বাধিক পূর্ণতা রয়েছে। সুতরাং যখন يَا اللهُ বলে ডাক দেওয়া হয়, তখন আল্লাহপাকের সমস্ত গুণ একত্রিত করে ডাক দেওয়া হয়।

ইসমে জাত اللهُ এর হরফসমূহের পরিচয়

اللهُ শব্দটি লেখা হলে ৪টি হরফ দৃশ্যমান হয়। যথা– ه.ل.ل.ا মূলত এখানে ৫টি হরফ রয়েছে। যথা- ه.ا.ل.ل.ا আমাদের বুযুর্গগণ 'আল্লাহ' শব্দের হরফগুলোর পরিচয় এভাবে দিয়েছেন। যথা-

ا-দ্বারা আল্লাহ, যাঁর এই নাম তিনি কে? যিনি একক।

ل-দ্বারা جمال যিনি তাঁর সৌন্দর্যে একক।

ل-দ্বারা جلال যিনি তার জালালিয়াতে একক। পরের আলিফ বিলুপ্ত করা হয়েছে।

ه-এটি গোলাকার বৃত্ত। যার কোনো শুরু ও শেষ নেই। অর্থাৎ– তুমি সারা জীবন তাঁর পরিচিতির জন্য ভ্রমণ করলে এ গোলাকারের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারবে না। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এ গোলাকার বৃত্ত হচ্ছে ইবাদাতের বেড়ি। এর দ্বারা বান্দাদের বোঝানো হয়েছে, আল্লাহপাক তোমাদের গলায় এবাদতের শিকল পড়িয়ে দিয়েছেন।

হাতের আঙ্গুলসমূহ দ্বারা আল্লাহ শব্দের নকশা

বন্ধুগণ! আপনারা হাতের আঙ্গুলের প্রতি তাকিয়ে দেখুন। কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে বৃদ্ধাঙ্গুল শব্দের দ্বারা আল্লাহ নকশা হয়। আমাদের বুযুর্গরা আঙ্গুল দ্বারা আল্লাহ শব্দের নকশা তৈরি করে আশেকের অন্তরে স্থাপন করে দিতেন। হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দি (রহ.)-এর ওপর আল্লাহপাক এই মূল্যবান রহস্য উদঘাটন করেছিলেন। তিনি আশেকের অন্তরে 'আল্লাহ' শব্দের নকশা আঙ্গুল দ্বারা স্থাপন করে 'রূহানী' তাওয়াজ্জুহের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতেন।

বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ শব্দের নকশা আশেকের অন্তরে লিখে দিতেন। আশেক অনুভব করত যে, কেউ যেন তার হৃদয়ে 'আল্লাহ' লিখে দিয়েছে। তাঁর নাম বাহাউদ্দীন ছিল। নকশবন্দি তরিকা তাঁর মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তিনি মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ শব্দ লিখে দিতেন।

এবার একটি দৃষ্টান্ত শোনো! ওয়েল্ডিং করতে তুমি অবশ্যই দেখে থাকবে, যখন দুটি টুকরো ওয়েল্ডিং করার ইচ্ছা হয়, তখন একটি বড় নেওয়া হয়; যাতে হাই বোল্ডেজ থাকে। মিস্ত্রি যখন বড়কে সেই হাই বোল্ডেজের সঙ্গে লাগায়, তখন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হয়। আর দুটি টুকরো মিলিত হয়ে যায়। আল্লাহওয়ালাগণও এমন করেন। তাদের কাছে আত্মার হাই বোল্ডেজ থাকে। তারা আঙ্গুলকে রড বানিয়ে আল্লাহর আকৃতি বান্দার আন্তরে এঁটে দেন। এতে আল্লাহপাকের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। এজন্য খাজা ফজলে আলী (রহ.) বলতেন, যার অন্তরে এই আঙ্গুলের দাগ লেগেছে, সে ঈমান ব্যতীত মরতে পারে না।

হযরত আবদুল আযীয দাব্বাগ (রহ.)-এর কাশ্‌ফ

এই নাম (আল্লাহ) এর মাধ্যমে সকল সৃষ্টি আল্লাহপাকের যিকির করে। আল্লাহপাক বলেন–

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

'সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহপাকের গুণকীর্তন করে।'[২২]

এ আয়াতের প্রেক্ষিতে হযরত আবদুল আযীয দাব্বাগ (রহ.) বলেন, আমি কাশ্‌ফ বা অন্তরদৃষ্টির মাধ্যমে দেখেছি, প্রতিটি বস্তু এমনকি তার অনুকণা পর্যন্ত 'আল্লাহ আমার প্রভু আল্লাহ আমার প্রভু' বলে যিকির করে।

---

২২. সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত ৪৪

ইসমে জাতের একক বৈশিষ্ট্য

আল্লাহপাকের এ নাম মানবেতিহাসে আল্লাহ ব্যতীত কারও জন্য ব্যবহার হয়নি। কোনো-কোনো লোক খোদায়ি দাবি করেছে। তবু নিজের জন্য الله নাম ব্যবহার করতে পারেনি। ব্যবহার হলে একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়েছে। ফেরাউন খোদায়িত্ব দাবি করেছে; ঈশ্বরত্ব দাবি করতে পারেনি। 'হে আমার মালিক কত মহান নাম তুমি নিজের জন্য নির্দিষ্ট রেখেছ।'

ইসমে জাতের বরকতে সিঙ্গায় ফুৎকারে বিলম্ব

হাদীছ শরীফে এসেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে একজন লোক 'আল্লাহ' নাম যিকিরকারী থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। বোঝা যায়, 'আল্লাহ' নামের বরকতেই পৃথিবী চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া থেকে বেঁচে আছে।

তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে এসেছে, রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আল্লাহপাকের পক্ষ হতে জিবরাঈল-এর প্রতি নির্দেশ হচ্ছে, যখন তুমি আমার বান্দার মুখে আমার নাম শুনবে, তখন থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত সিঙ্গায় ফুঁ দিতে দেরি করবে। যতবার শুনবে, ততবার দেরি করবে। সুতরাং সর্বশেষবার আল্লাহর নাম শোনার পার ইসরাফিল (আ.) চল্লিশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। তারপর যখন আর কেউ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে না, তখন তিনি সিঙ্গায় ফুঁ দেবেন এবং আল্লাহপাক কেয়ামত কায়েম করবেন। এ কেমন আশ্চর্যজনক নাম, যার উচ্চারণ শুনে সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিলম্বিত হবে! হে আল্লাহর বান্দাগণ! যে নাম শুনে ফেরেশতা সিঙ্গায় ফুঁ দিতে দেরি করতে পারেন, আমরা সকাল-সন্ধ্যা এ নাম পাঠ করলে পেরেশানী আমাদের কাছে আসতে দেরি হতে পারে না? (অবশ্যই পারে)।

ইসমে জাতের সাথে আল্লাহর প্রসংশা

ইমাম রাযী (রহ.) বলেন, হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করার পর তিনি চতুর্দিক দেখতে শুরু করলেন। তখন সর্বপ্রথম তাঁর মুখ দ্বারা যে বাক্যটি উৎসারিত হচ্ছিল, তা হলো الحمد لله। তিনি সর্ব প্রথম ইসমে জাতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রসংশা করেছেন। জান্নাতীরা যখন জান্নাতে যাবে, তখন তারা হযরত আদম (আ.)-এর অনুসরণে জান্নাতে প্রবেশকালে বলবে–

اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'নিশ্চয় সকল প্রসংশা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা।'[২৩]

কুরআন পড়ো, আল্লাহর মর্যাদা অবলোকন করো। আল্লাহপাক বলেন–

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا

'খোদাভীরুদের জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।'[২৪]

ফেরেশতাগণও এ নাম দ্বারা আল্লাহপাকের প্রসংশা করেন। যেমন–

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

'এবং দেখবে, ফেরেশতারা আরশের চতুর্দিকে সারিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তারা আল্লাহর প্রসংসা করছে। তাদের সম্মুখে সত্যের ফয়সালা হবে এবং বলা হবে, সকল প্রসংশা জগতের পালনকর্তার জন্য।'[২৫]

কেউ মান্নত করল, আমার অমুক কাজ সমাধা হলে আমি সর্বদিক থেকে আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করব, তবে ওই ব্যক্তি তার কাজ সমাধা হওয়ার ওপর শুধু একবার الحمد لله বললেই তার মানত আদায় হয়ে যাবে।

আল্লাহর নাম যিকির করলে নূর বর্ষিত হয়

আল্লাহ তা'আলার নাম যিকির করলে রহমত ও নূর বর্ষণ হতে থাকে। কেননা, আল্লাহপাক নিজের জন্য নূর নাম ব্যবহার বরেছেন। আল্লাহ বলেন–

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

'আল্লাহপাক নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি।'[২৬]

আল্লাহর নূর আশ্চর্য জিনিস। হাদীছ শরীফে এসেছে–

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ

---

২৩. সূরা ইউনুস : আয়াত ১০
২৪. সূরা যুমার : আয়াত ৭৩
২৫. সূরা যুমার : আয়াত ৭৫
২৬. সূরা নূর : আয়াত ৩৫

'মুমিনের অন্তরদৃষ্টিকে ভয় করো। কারণ, তারা আল্লাহর জ্যোতির মাধ্যমে দেখতে পায়।'

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) বলেন– গাফলতের সাথে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলেও ফায়দা হয়। আরে ভাই! অমনোযোগিতার সাথে আল্লাহর নাম নিলে যদি উপকার হয়, তবে যেব্যক্তি মহব্বতের সাথে আল্লাহর নাম যিকির করল, তাকে আল্লাহপাক কেমন পুরস্কার দিতে পারেন!

সূরা মুজদালায় প্রত্যেক আয়াতে আল্লাহর নাম উল্লেখিত হওয়ার কারণ

কুরআন মাজীদে এমন একটি সূরা রয়েছে, যার প্রতিটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সূরার নাম হচ্ছে সূরা 'মুজদালা'। আর তালেবে ইল্‌মদের মনে এ প্রশ্ন আসতে পারে যে, সূরা ইয়াসীনকে কুরআনপাকের অন্তর এবং সূরা 'ফাতেহা'কে কুরআনের উদ্ভাবক বলা হয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটি আয়াতে اللّٰه শব্দ উল্লেখ করা হলো না কেন?

এ প্রশ্নের জবাব এভাবে দেওয়া হয় যে, কুরআনপাকে মোট একশত চৌদ্দটি সূরা রয়েছে। তার অর্ধেক হচ্ছে সাতান্নটি। আর সূরা মুজাদালা হচ্ছে আটান্ন নং সূরা। অর্থাৎ– দ্বিতীয় অর্ধেকের প্রথম সূরা এবং সূরা ফাতেহা হচ্ছে প্রথম অর্ধেকের প্রথম সূরা। অর্থাৎ ফাতেহাতুল কিতাব। আল্লাহপাক প্রথম অংশের জন্য اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পছন্দ করেছেন, যার মধ্যে মানুষের জন্য রয়েছে মহান শিক্ষা আর নামাযের মধ্যে রয়েছে এ সূরা পাঠ করার নির্দেশ। তারপর যখন মানুষ কুরআন পড়তে-পড়তে অর্ধেক শেষ করে, তখন তার মধ্যে আল্লাহপাকের বিশেষ পরিচিত লাভ হয়। তারপর দ্বিতীয় অংশের প্রথম সূরায় আল্লাহপাকের নাম প্রত্যেকটি আয়াতে উল্লেখ করে বান্দাদের এই সংবাদ দিচ্ছেন যে, তোমরা অর্ধেকের সবক গ্রহণ করেছ; এখন বাকি অর্ধেকের সারসংক্ষেপ জেনে নাও। প্রথম সূরার প্রতিটি আয়াতে আমার নামের দ্বারা ইঙ্গিত গ্রহণ করো যে, তোমাদের প্রত্যেকটি কর্মে আমার নাম থাকা উচিত। যদি আমার নাম তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে তোমাদের প্রত্যেকটি কর্ম সফল হবে। অন্যথায় তোমাদের আমল গ্রহণযোগ্য হবে না।

উল্লেখ্য, আল্লাহপাক উক্ত সূরায় নিজের নাম চল্লিশবার আলোচনা করেছেন। তাই আল্লাহর নামের এবং '৪০' সংখ্যার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

৪০ সংখ্যার বিশেষ বরকত

৪০ সংখ্যাটির বিশেষ বরকত রয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মতের চল্লিশ দিন রোযা রাখার হুকুম হয়েছিল। আল্লাহপাক বলেন–

وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوسٰٓى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

'আমি যখন মূসার সঙ্গে চল্লিশ রাতের অঙ্গীকার করেছিলাম।'[২৭]

হযরত মূসা (আ.) চল্লিশ রাত পূর্ণ করেছিলেন। আল্লাহপাক বলেন–

فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

'সুতরাং পূর্ণ হয়েছে তোমার প্রভুর চল্লিশ রাত।'[২৮]

আমাদের বুযুর্গগণ এ থেকেই চল্লিশ দিনের চিল্লা সংগৃহীত করেছেন। মাতৃগর্ভে যে সন্তান লালিত হয়, তার আকৃতি প্রতি চল্লিশ দিন পরপর পরিবর্তন হয়। যেহেতু চল্লিশ দিন পরপর বাচ্চার অবস্থা পরিবর্তন হয়, সেহেতু চল্লিশ দিন আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকলে আত্মার পরিবর্তন ঘটে। এজন্যই আমাদের পীর-মাশায়েখগণ এতেকাফ অবস্থায় চল্লিশ দিন অতিবাহিত করেন। একে 'চিল্লা' বলে। আমাদের তাবলীগী সাথীগণও চিল্লা লাগান। কারণ, চিল্লা লাগালে বাস্তবিক মানুষের অন্তরের পরিবর্তন ঘটে। হাদীছে এসেছে, যেব্যক্তি চল্লিশ নামায তাকবীরে উলার সাথে আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে দুটি ঘোষণা আসে। এক. মুনাফেকী থেকে মুক্তি। দুই. জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি।

'আহ!' ও ইসমে জাত

একটি আশ্চর্য কথা শুনুন। اللهُ শব্দের প্রথম অক্ষর। আর শেষ অক্ষর ه দুটি মিলে হয় اه। যা একান্ত ভালোবাসায় আসক্ত হয়ে মানুষ বলে থাকে। আল্লাহপাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ব্যাপারে বলেন–

إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيْمٌ

'নিশ্চয় ইবরাহীম অত্যন্ত কোমলহৃদয় ও সহনশীল মানুষ।'[২৯]

---

২৭. সূরা বাকারা : আয়াত ৫১
২৮. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৪২
২৯. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৪

এটি আল্লাহপাকের ভালোবাসার আহ! পূর্ণ আক্ষেপ। যখন মানুষ ভালোবাসায় লাচার হয়ে যায়, তখন অজ্ঞাতসারে তার কণ্ঠ থেকে এরূপ বাক্য বেরিয়ে আসে। আশেকের পরিচয় এরকমই হয়। যেমন– কোনো কবি বলেন–

آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے

آہ نکلی اور پہچانے گئے

'আহ!' এর সম্পর্কে প্রেমিকের সাথে 'আহ!' বেরিয়ে আসে আশেকের পরিচয় দিতে। 'আহ!' দ্বারা উপলব্ধি হয়, তার মধ্যে লেগেছে ভালবাসার ছোঁয়া; তার সর্বস্ব গিয়েছে খোয়া। এটা হলো আল্লাহর প্রেমের 'আহ!'। তাই আল্লাহর নাম এমনভাবে স্মরণ করা চাই যে, সেই নামের বিনিময়ে যেন আমরা সবকিছু আয়ত্ত করতে পারি। আল্লাহপাক বলেন–

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ

'আল্লাহপাক কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নন।'[৩০]

আমাদের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর নামই যথেষ্ট। অর্থাৎ– যেমনিভাবে আল্লাহর সত্তা আমাদের জন্য যথেষ্ট, তেমনি আল্লাহর যিকির সবকিছুর জন্য যথেষ্ট। কোনো কবি বলেন–

رہ حیات کی تاریک رہ گزاروں میں

تمہارا نام ہی کافی ہے روشنی کے لئے

অমানিশা এলে আসুক জীবন চলার পথে,
ভয় কিসে যে থাকতে তব নামটি আমার সাথে।

ইসমে জাতের ব্যবহার

আযান ও নামায উভয়টির শুরু ও শেষ আল্লাহর নাম দ্বারা হয়। মুয়ায্যিন শুরুতে আল্লাহু আকবার বলে এবং শেষে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। এমনিভাবে ইকামাতের মধ্যেও হয়। তদ্রূপ নামাযের শুরু হয় আল্লাহু আকবার দ্বারা আর শেষ হয় আসসলামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ দ্বারা।

---

৩০. সূরা যুমার : আয়াত ৩৬

মানুষের ওপর শয়তানের হামলা হলে তারা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে। যেহেতু শয়তানের সঙ্গে আল্লাহর জাতের মৌলিক শত্রুতা, সেহেতু শয়তানের আক্রমণের সময় আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বান্দাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

'আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

যখন তোমরা একথা বলবে, তখন আমি তোমাদেরকে শত্রু থেকে নিরাপদে রাখব।

'বিসমিল্লাহ'র মধ্যেও আল্লাহপাক নিজের নাম ব্যবহার করেছেন। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার সময় শিক্ষকগণ বলেন– 'আলিফ' খাড়া থাকবে আর 'বা' শুয়ে থাকবে। কেননা, ب লিখলে শুয়ে থাকে। কিন্তু بسم الله লেখতে ب খাড়া থাকে। ওলামায়ে কেরাম বলেন– আল্লাহর নামের এমন বরকত যে, শুয়ে থাকা ب আক্ষরটি আল্লাহর নামের সঙ্গে সংযুক্তিকালে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা যদি আল্লাহর নামের সাথে সম্পৃক্ত হতে পার, তবে আল্লাহ তোমাদেরও অবহেলিত অবস্থা থেকে উঠিয়ে নেবেন।

আল্লাহপাক অগণিত নেয়ামত প্রদান করার জন্য কুরআনে তাঁর নাম বারবার উল্লেখ করেছেন। সামান্য দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে, আল্লাহপাক কোন-কোন স্থানে তাঁর নাম ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ দেখে নাও। যথা–

❖ আল্লাহপাক যেখানে নিজের বন্ধুদের আলোচনা করেছেন, সেখানে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন–

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

'ঈমানদাররা আল্লাহর বন্ধু।'[৩১]

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ

'আল্লাহ মুমিনদের বন্ধু।'[৩২]

---

৩১. সূরা বাকরা : আয়াত ২৫৭

৩২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৬৮

আল্লাহর উত্তম বান্দারা বলে থাকেন। যথা-

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

'নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক।'[৩৩]

আল্লাহপাক নিজের দয়া ও করুণার ক্ষেত্রে বলেন। যথা-

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾

'এটা আল্লাহর দয়া, যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন। আল্লাহ অত্যন্ত দয়াবান।'[৩৪]

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

'আল্লাহপাক মুমিনদের ওপর দয়াবান।'[৩৫]

এক জায়গায় বলেছেন। যথা-

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

'যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর দয়া না হতো।'[৩৬]

অন্যত্র বলেন। যথা-

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ ۚ

'বলে দিন নিশ্চয় করুণা আল্লাহর হাতে।'[৩৭]

আল্লাহপাক নিজের রহমতের জন্য তাঁর নাম ব্যবহার করেছেন। যথা- ورحمة الله 'আল্লাহ তা'আলার রহমত।'

আল্লাহপাকের বিশেষ দয়া 'প্রশান্তি' বর্ষণ করেন। এক্ষেত্রেও আল্লাহর নাম ব্যবহার করেছেন। যথা-

فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ

'আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করেছেন।'[৩৮]

---

৩৩. সূরা আন'আম : আয়াত ১৬২
৩৪. সূরা হাদীদ : আয়াত ২১
৩৫. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৫২
৩৬. সূরা নূর : আয়াত ২১
৩৭. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৭৩
৩৮. সূরা ফাত্হ : আয়াত ২৬

ইহকাল ও পরকালের আলোচনার ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম ব্যবহার করেছেন। যথা-

فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

'দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিদান আল্লাহর হাতে।'[৩৯]

বান্দাকে নেক আমলের তাওফীক তিনিই দেন। এক্ষেত্রে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। যথা-

وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ

'আমার তাওফীক একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে।'[৪০]

ইবাদাতের আলোচনায়। যথা-

اُعْبُدُوا اللّٰهَ

'আল্লাহর ইবাদাত করো।'[৪১]

যোগ্যতার সম্পর্ক আল্লাহর দিকে । যথা-

وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا

'আল্লাহর কালেমা সর্বোচ্চ।'[৪২]

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ায় পুনরাবৃত্তি করবেন। যেমন–

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহর মুমিনদের প্রতি দয়া করেছেন।'[৪৩]

অন্যত্র বলেন–

كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

'পূর্বে তোমরা এমনই ছিলে। আল্লাহ তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেন।'[৪৪]

---

৩৯. সূরা নিসা : আয়াত ৩৪
৪০. সূরা হূদ : আয়াত ৮৮
৪১. সূরা নিসা : আয়াত ৩৬
৪২. সূরা তাওবা : আয়াত ৪০
৪৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬৪
৪৪. সূরা নিসা : আয়াত ৯৪

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾

'আল্লাহ আমাদের ওপর অনুগ্রহ করে কষ্টদায়ক লূ-হাওয়ার শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছেন।'[৪৫]

যেখানে মুমিনদের প্রশংসা ও সাহায্যের কথা আলোচনা করেছেন। যথা-

وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

'আল্লাহ যাকে চান তাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি ও বল দান করেন।'[৪৬]

কাউকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রদান করার ক্ষেত্রে। যেমন–

وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ

'আল্লাহ যাকে চান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করেন।'[৪৭]

হযরত মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনার কথা শিক্ষা দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে আল্লাহ বলেন–

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا

'মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং ধৈর্য ধারণ করো।'[৪৮]

আল্লাহপাক নিজের বান্দাদের পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে। যেমন–

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى

'তারা ওই সকল লোক, আল্লাহপাক তাক্ওয়ার ব্যাপারে যাদের অন্তরের পরীক্ষা নিয়েছেন।'[৪৯]

শরীয়তের সীমারেখা বর্ণনা করতে। যথা-

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ

'এটা আল্লাহর সীমারেখা।'[৫০]

---

৪৫. সূরা তূর : আয়াত ২৭
৪৬. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৩
৪৭. সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৭
৪৮. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১২৮
৪৯. সূরা হুজুরাত : আয়াত ৩
৫০. সূরা তালাক : আয়াত ১

কোনো বস্তুর সম্মান বর্ণনা করার ক্ষেত্রে। যেমন–

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ

'যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সম্মান করে।'[৫১]

হালাল ও হারামের আলোচনার ক্ষেত্রে। যেমন–

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

'যে সকল জন্তু জবাই করার সময় আল্লাহপাকের নাম উল্লেখ করা হয় না, সেগুলো আহার করো না।'[৫২]

কেননা, যতক্ষণ এতে আল্লাহর নাম নেয়া না হবে, ততক্ষণ এ জবাই পরিপূর্ণ হয় না। যেখানে আল্লাহর মহত্ত্বের ওপর তাগিদ দেওয়া হয়। যথা-

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

'আল্লাহপাক তাদের অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন।'[৫৩]

যেখানে ভয়ের আলোচনা করা হয়, সেখানে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়। যেমন–

وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ

'তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না।'[৫৪]

এক জায়গায় আল্লাহপাক বলেন–

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

'বান্দাদের মধ্যে একমাত্র ওলামায়ে কেরাম আল্লাহকে ভয় করে।'[৫৫]

যেখানে আল্লাহপাক বান্দাদের সাথে কোনো প্রতিশ্রুতি নেন। যেমন–

وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

'সবার সঙ্গে আল্লাহপাক উত্তম অঙ্গীকার করেছেন।'[৫৬]

---

৫১. সূরা হাজ্জ : আয়াত ৩২
৫২. সূরা আন 'আম : আয়াত ১২১
৫৩. সূরা বাকারা : আয়াত ৭
৫৪. সূরা আহযাব : আয়াত ৩৯
৫৫ . সূরা ফাতির : আয়াত ২৮
৫৬. সূরা হাদীদ : আয়াত ১০

অন্যত্র আল্লাহপাক বলেন-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ①

'যারা ঈমানদার এবং নেক কাজ করে, তাদের ক্ষমা ও উত্তম প্রতিদান দেওয়া আল্লাহপাকের প্রতিশ্রুতি।'[৫৭]

যেখানে মানুষ কোনো প্রশ্ন করে এবং আল্লাহপাক উত্তর দেন, সেখানে। যেমন–

يَسْتَفْتُوْنَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ؕ

'লোকেরা তোমার কাছে ফতুওয়া চায়। বলে দাও, আল্লাহপ নিঃসন্তান ও পিতামাতাহীন ব্যক্তির ব্যাপারে ফতুওয়া দিচ্ছেন।'[৫৮]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহপাক ফতুওয়া দেন।

আল্লাহপাক কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচার করবেন। যেমন–

فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

'আল্লাহপাক তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন।'[৫৯]

আল্লাহপাক নিজের সততা বর্ণনা করতে বলেন। যেমন–

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ

'বলে দিন, আল্লাহপাক সত্য বলেছেন।'[৬০]

অন্যস্থানে বলেন-

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا

'আল্লাহপাক থেকে অধিক সত্যবাদী কে হতে পারে।'[৬১]

যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, তাদের আলোচনার ক্ষেত্রে বলে থাকেন। যেমন–

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

---

৫৭. সূরা মায়েদা : আয়াত ৯
৫৮. সূরা নিসা : আয়াত ১৭৬
৫৯. সূরা বাকারা : আয়াত ১১৩
৬০. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৯৫
৬১. সূরা নিসা : আয়াত ১২২

'যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে হিজরত করে ঘর থেকে বের হয়।'[৬২]

আল্লাহপাক যখন নিজের ভালোবাসার কথা প্রকাশ করেন। যেমন–

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ

'আল্লাহ ধৈর্য ধারণকারীদের ভালোবাসেন।'[৬৩]

একস্থানে বলেছেন-

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۛ

'আল্লাহ তা'আলা পুণ্যবানদের ভালোবাসেন।'[৬৪]

অন্যস্থানে বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।'[৬৫]

আল্লাহপাক বান্দাদের নিজের যিকির শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে। যেমন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝

'হে ঈমানদাররা! আল্লাহকে বেশি-বেশি স্মরণ করো।'[৬৬]

একজায়গায় বলেছেন–

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ

'আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী নারী ও পুরুষ।'[৬৭]

আমাদের যিকির করার নিয়মও এটাই। আল্লাহপাক নকশবন্দি তরিকার মাশায়েখগণের ওপর কোটি কোটি রহমত নাযিল করুন, যারা নিজের অন্তরে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা এ পরিমাণে হাসিল করেছিলেন যে, আল্লাহপাক তাদের সম্মুখে তাঁর বরকতময় নামের পরিচিতি উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। এমনকি তারা এ নামের যিকির করে আল্লাহর পরিচয় পর্যন্ত পেয়েছিলেন।

---

৬২. সূরা নিসা : আয়াত ১০০
৬৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৪৬
৬৪. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৪৮
৬৫. সূরা বাকারা : আয়াত ২২২
৬৬. সূরা আহযাব : আয়াত ৪১
৬৭. সূরা আহযাব : আয়াত ৩৫

তাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের তারা এ নামের যিকির শিক্ষা দিয়েছিলেন। সুতরাং আমাদের সৌভাগ্য যে আল্লাহ হচ্ছে আমাদের সব সময়ের যিকির। আল্লাহপাক চান তোমরা এই নামের যিকির করো। ইয়া আল্লাহ! কীভাবে করব? আল্লাহপাক বলেন–

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ

'যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়িত অবস্থায়।'[৬৮]

অর্থাৎ– বসতে হলে আল্লাহ, দাঁড়াতে চাইলে আল্লাহ, শুতে চাইলে আল্লাহ, উঠতে চাইলে আল্লাহ, চলতে গেলে আল্লাহ। যখন সর্বদা আল্লাহ, আল্লাহ জপতে থাকবে, তখন আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি হবে। তখন এ পরিমাণ যিকির করবে যে, অন্য সবকিছু ভুলে যাবে।

یاد میں تیری سب کو بھلا دو کوئی نہ م جھکو یاد رہے
تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے
سب خوشیوں کو آگ لگادوں غم سے تیرے دل شاد رہے
سب کو نظر سے اپنی گرادوں تجھ سے فقط فریاد رہے
اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ

لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ

হে আল্লাহ! তোমার স্মরণে সবকিছু ভুলিয়ে দাও। কোনো কিছু যেন স্মরণ না থাকে। তোমার জন্য সব ঘরবাড়ি বিধস্ত করে দাও। অন্তর যেন আবাদ থাকে। সকল আনন্দ জ্বালিয়ে দাও; তোমায় স্মরণে হৃদয়ে শান্তি থাকবে। পরিশেষে তুমিই থাকবে হে আমার মালিক! শেষ নিঃশ্বাসে যেন জবান দ্বারা বেরিয়ে আসে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কোনো ব্যক্তি একটি সুন্দর কথা বলেছেন–

بتاؤ آپ کو کیا عاشقوں کا کام ہوتا ہے ● دل ان کی یاد میں اور لب پہ ان کا نام ہوتا ہے

'বলো আশেকদের কাজ কী? হৃদয়ে তাদের কল্পনা এবং মুখে তাদের নামের জপনা।

---

৬৮. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯০

ইসমে জাতের মিষ্টতা

যে বান্দা আল্লাহর নামের কল্যাণ সম্পর্কে অবগত হয়, তার জীবনে বসন্তের সুবাস আসে।

'আল্লাহ' নামটি সর্বাধিক সুস্বাদু। যে বুঝতে চায়, সে যেন চেটে দেখে। কোনো বিজ্ঞজন অতি উত্তম একটা কথা বলেছেন–

مومنا ذکر خدا بسیار ہو ● تا بیابی در دو عالم ابرو

হে মুমিনগণ বেশি-বেশি যিকির করো খোদার নাম; দেখবে, তোমার দোজাহানে বৃদ্ধি পাবে দাম।

ذکر کن ذکر تا ترا جان است ● باکی دل ز ذکر رحمٰن است

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করতে থাকো। কেননা, যিকিরের দ্বারা অন্তর পবিত্র হয়।

যদি অন্তরে আল্লাহপাকের ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তাহলে আল্লাহর নাম যিকির করতে স্বাদ পাওয়া যায়। এক লোক আমাকে বলল, আপনি যে আল্লাহ, আল্লাহ বলেন, এর মাহাত্ম্য কী? তখন আমার একটি কবিতা স্মরণ হলো। আমি তাকে বললাম, ভাই! ব্যাপার হলো এই যে,

ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو ● ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے

আমি সারাক্ষণ তোমায় স্মরণ করে যাব যদিও কিছু না পাই। কারণ, আমি তোমার নামের পাগল।'

যার হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা থাকে। আল্লাহর নাম শুনে তার শরীর শিউরে ওঠে। এটা মুমিনের পরিচয়। কুরআনের ভাষ্য দিলের কানে শোনো। আল্লাহপাক বলেন–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

'নিশ্চয় মুমিনদের সামনে আল্লাহর নাম পাঠ করলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে।'[৬৯]

কোনো কবি বলেন– যখন কেউ তোমার নাম স্মরণ করে; সে একটা মুহূর্তও তোমার ভালোবাসা থেকে নীরব থাকবে পারে না।

---

৬৯. সূরা আনফাল : আয়াত ২

আল্লাহর নাম সম্পর্কে কবিগণ সুন্দর-সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করেছেন। এক কবি বলেন–

نام لینے ہی نشہ سا چھا گیا ● ذکر میں تاثیر وردِ جام ہے

তোমার নাম স্মরণ করতেই নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে যাই। তোমার যিকিরে বিপ্লবের পেয়ালার লক্ষণ পাই।

আরেকজন খোদা প্রেমিক সুন্দর একটি কথা বলেছেন–

ہر وادیِ ویراں میں گلستاں نظر آیا ● قرباں میں تیرے نام کی لذت سے خدایا

প্রতিটি বিরান ভূমিতে বাগান পরিলক্ষিত হয়। তোমার নামের স্বাদে আমি মত্ত হে আমার খোদা!

আল্লাহর নামে অফুরন্ত স্বাদ রয়েছে। কোনো কবি বলেন–

نام چو بر زبانم می رود ● ہر بن مو از عسل جوئے شود

যখন তাঁর নাম আমার মুখ দ্বারা বেরিয়ে আসে, দেহের প্রতিটি লোমের গোড়া দিয়ে মধুর ঝরনা ভাসে।

দেহের মধ্যে মিষ্টতা উপলব্ধি হয়। কবি বলেন–

اللہ اللہ ایں چہ شیریں است نام ● شیر و شکر می شود جانم تمام

আল্লাহ আল্লাহ কেমন মধুর নাম জানি,
প্রাণ যে আমার হয় অমৃত দুধ-চিনি।

এক কবি বলেন–

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے ● جو رٹے وہ لائق انعام ہے

আল্লাহ আল্লাহ, মধুমাখা কেমন প্রিয় নামটি তাঁর,
জপে যেজন, পাবে সেজন, পুরস্কারের অধিকার।

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے ● عاشقوں کا مینا ہے اور جام ہے

আল্লাহ আল্লাহ কী মধুর নাম জেনে নাও,
প্রেমাস্পদের সুরার পাত্র বুঝে নাও।

যেমনিভাবে পানকারী ব্যক্তি পেয়ালা ও মগ দিয়ে পান করে, তেমনি আল্লাহর নাম আশেকদের জন্য মগ ও পেয়ালা। তারা আল্লাহর নাম জপলে তাদের অন্তরে মিষ্টতা আসে। আল্লাহু আকবার!

অবশ্য যদি আমরা আল্লাহর ভালোবাসার শুধা পেতাম, তাহলে অনুভব হতো, সেই নামে প্রশান্তি কত। এ নাম জপলে সৃষ্টির ভালোবাসা অন্তর থেকে দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর ভালোবাসা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। এমনকি যদি কোনো লোক লৌকিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে, তবু এ নামের ছাপে সত্বর সাধুতা অর্জন হয়ে যায়। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.) অপূর্ব একটি কথা বলেছেন যে, কোনো ব্যক্তি জীবনে একবার আল্লাহর নাম পাঠ করে থাকলে এই নাম একদিন না একদিন তাকে জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ!

শান্তির সন্ধান

স্মরণ রাখবে! আল্লাহ তা'আলার নাম যেমন বরকতময় তদ্রূপ তাঁর সত্তাও বরকতময়। আল্লাহপাক বলেন–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ

'বরকতময় তাঁর সত্তা যার হাতে রয়েছে পরিপূর্ণ ক্ষমতা।'[৭০]

বান্দা যখন তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে তখন বান্দার জীবনেও কল্যাণের ঝরণা ধারা বয়ে আসে। আজ আমাদের জীবনে কল্যাণ নেই। কেন? দৈন্যতার প্রভাব নেই। ঘর-বাড়ি ও সন্তানের অভাব নেই। আছে গাড়ি, আছে বাড়ি, আছে মনোরম উদ্যান। কিন্তু শান্তি নেই; অশান্তি ছেয়ে বসার কারণ কী? কারণ, আমাদের আমলে বরকত নেই। এই বরকত আসবে কীভাবে? যখন আমরা আল্লাহপাকের নাম বেশি-বেশি যিকির করব। আল্লাহর ভালোবাসা অন্তরে ঠাঁই দেব। সাথে-সাথে নিজের জীবন শরীয়তের বিধান কল্যাণ নেমে আসবে। অকৃপণ শান্তিকামীদের এটা আমরণ সুসংবাদ।

প্রকৃত বিশ্বাসের স্তর অর্জন করা অবশ্যক

একটা সূক্ষ্ম বিষয় আলোচনা করছি। গভীর মনোযোগে শুনুন। বিশ্বাসের স্তর তিনটি– (১) علم اليقين (বিশ্বাসের জ্ঞান) (২) عين اليقين (প্রকৃত বিশ্বাস) (৩) حق اليقين (বিশ্বাসের চাহিদা।)

উদাহরণের মাধ্যমে এভাবে বুঝতে পার। যেমন– তোমার প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগেছে। এমতাবস্থায় তোমার কোনো বন্ধুর বাড়ি গেলে। বন্ধু তোমাকে

---

৭০. সূরা মুল্‌ক : আয়াত ২

দেখে বলছে সর্বনাশ! বন্ধু তোমার তো ঠান্ডা লেগেছে। বস, বস! আমি তোমার জন্য চা নিয়ে আসছি। বন্ধু চা নিয়ে আসার কথা বলায় তোমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে, তিনি গরম চা নিয়ে আসবেন। এরকম বিশ্বাসকে علم اليقين বা বিশ্বাসের জ্ঞান বলে। আর যদি বন্ধু চায়ের কাপ সামনে উপস্থিত করে দেয় এবং আপনি স্বচক্ষে পেয়ালা থেকে বাষ্প উড়তে দেখেন, তাহলে এটা হবে علم اليقين বা বাস্তব বিশ্বাস। এবার আপনি চায়ের কাপ নিয়ে পান করে উপলব্ধি করলেন, বাস্তবিকই এটা গরম চা। এটা হচ্ছে حق اليقين বা বিশ্বাসের চাহিদা।

সাহাবায়ে কেরামদের حق اليقين-এর স্তর অর্জিত হয়েছিল। হযরত আলী (রহ.) বলেন, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে আমার এমন বিশ্বাস রয়েছে যে, যদি এ দুটো আমার সামনে উপস্থিত করা হয়, তবে এগুলোকে বাস্তবে দেখে আমার বিশ্বাসে কোনো প্রকার আধিক্য আসবে না। অর্থাৎ– আমার বিশ্বাসে যেমন আছে, বাস্তবেও অনুরূপই হবে। এখানে একটি সূক্ষ্মতা রয়েছে। আমাদের বুযুর্গগণ বলেছেন– যার কমপক্ষে عين اليقين এর স্তর অর্জিত হয়েছে, মৃতকালে তার ঈমান নিরাপদ থাকবে। আর علم اليقين স্তরের লোকদের ঈমানের ব্যাপারে; মানে যারা উদাসীন জীবন কাটায়, লোকদেখানের নামায পড়ে; তারা শুধু শারীরিকভাবে উপস্থিত– মনে প্রাণে নয়; সারা দিন দোকানের ভেতরে থাকে আর নামাযের সময় দোকান তাদের ভেতরে থাকে, এমন নামাযের দ্বারা ঈমান ও বিশ্বাসে পূর্ণতা আসে না। এর জন্য শ্রম দিতে হয়, আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দিতে হয়। তাই নিজের বিশ্বাসকে علم اليقين হতে কমপক্ষে عين اليقين এ উপনীত করা চাই। আর এই স্তর তখন অর্জিত হবে, যখন আল্লাহর যিকির অধিকহারে আদায় করবে এবং তার কল্যাণ স্বচক্ষে অবলোকন করবে। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে প্রত্যেক জিনিসের স্বরূপ দেখিয়ে দাও।

আমাদের কি কোনো সময় কোনো বস্তুর মূলতত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়? প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহর যিকির করে। প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহর নামের তাসবীহ পাঠ করে। কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না।

আমাদের অন্তরে কী এমন আগ্রহ জাগে যে, আহ! যদি আমরা এগুলোর তাসবীহ বুঝতে পারতাম। হ্যাঁ, আল্লাহওয়াদের অন্তরদৃষ্টি পরিচালিত হলে

অনেক দৃশ্য তাঁরা দেখতে পান। আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, খোদাভক্তগণ যখন যিকির করতে-করতে সুলতানুল আযকার সবকে পৌঁছেন, তখন তাঁরা এমন স্তর হাসিল করেন যে, তাঁদের গায়ের প্রত্যেকটি লোম তাদের সাথে আল্লাহর যিকির করতে থাকে। তারা প্রত্যেক বস্তুর যিকির শুনতে থাকেন। হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরি (রহ.) বলেন, আমাকে কাপড়ের যিকির শোনানো হতো, বাতাসের যিকির শোনানো হতো। সুবহানাল্লাহ!

তারা দুনিয়াতে আল্লাহর নিদর্শন দেখেছেন। আমরা কি কোনো নিদর্শন দেখতে পাই? কে দেখবে? আমরা তো ছায়াছবি দেখতে-দেখতে অন্য কিছুর সময় থাকে না।

আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলার সীমারেখা

আমরা যদি আল্লাহপাকের নামের বরকত সম্পর্কে অবগত হতে চাই, তাহলে এ নাম দিলে বারবার পরিচালনা করে সামান্য যাচাই করে দেখো। হাজারবার নয়– লক্ষ-কোটিবার জপতে থাকো। দেখবে, তোমার অন্তরে এর প্রভাব পড়ে গেছে। দেখো! প্রত্যেকটি বস্তুর নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। আল্লাহপাক বলেন–

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

'আল্লাহর কাছে প্রত্যেক বস্তুর পরিমাপ নির্ধারিত রয়েছে।'[৭১]

কারও গায়ে জ্বর এলে ডাক্তার তাকে দৈনিক তিনবার এন্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ওষুধ সেবন করতে বলে। এটা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ। যদি কেউ পাঁচ দিনের ওষুধ দুদিনে খেয়ে ফেলে, তাহলে তৃতীয় দিন আবার জ্বর বা অন্য কোনো মারাত্মক সমস্যা হতে পারে। ডাক্তার তাকে পুনরায় পাঁচ দিনের ওষুধ দেবে। যার হেপাটাইটিস হয়, তাকে আনুমানিক নব্বইটি টিকা নিতে হয়। মাঝখানে বাদ দেওয়া যাবে না। লাগাতার নিতে হবে। একদিন ফাঁকা পড়লে আবার নতুন করে নব্বইটি নিতে হবে। এখানে নব্বইটি টিকা একটি নির্ধারিত মেয়াদ; তা পূর্ণ করতে হবে। যদি মেয়াদ পূর্ণ করে, তাহলে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা থাকে। নতুবা কবরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

টিবি রোগী একটানা নয় মাস পর্যন্ত ওষুধ সেবন করতে হয়। বলা হয়, যদি এক দিন ফাঁকা যায়, তাহলে পূর্বের ওষুধের এ্যাকশন শেষ হয়ে যায়।

---

৭১. সূরা রা'দ : আয়াত ৮

নতুন করে আবার নয় মাস সেবন করতে হয়। এমনভাবে আল্লাহর নামের বরকত জানতে হলে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত যিকির করতে হয়। যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ হবে, তখন অন্তরের ব্যাধি দূর হয়ে যায় এবং সেই নামের বরকত প্রকাশ পায়। একটি দৃষ্টান্ত মনে রেখো! যদি পানির পাত্রকে ছিদ্র করে দেওয়া হয় এবং তা থেকে পানি ফোঁটা-ফোঁটা করে কোনো কাঠ অথবা পাথর বা বিছানায় পড়ে, তবে কোনো এক সময় সেটা ছিদ্র হয়ে যাবে। এখন বলো, পানির ফোঁটা এক নাগাড়ে পড়তে থাকলে যদি পাথর ছিদ্র করে রাস্তা করতে পারে, তাহলে আল্লাহর নাম বারবার জপ করা হলে অন্তরের রাস্তা খুলতে পারে না? অবশ্যই পারে। বর্তমানের সালেকগণ বেশ শান-শওকতে থাকেন। তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, মুরাকাবা কী? তখন বলবে, এটা তো মনে নেই। মুরাকাবার সুযোগ পাই না।

সে নূরের তজ্জল্লি সহ্য করতে পারে না

ফাছ শহরে সৈয়দ আহমদ বদয়ী নামে একজন প্রসিদ্ধ ওলী ছিলেন। তাঁর জীবনীতে লেখা হয়েছে, তিনি সারাদিন মুরাকাবায় বসে থাকতেন। এই মুরাকাবায় তিনি এমন একটি নূর অর্জন করেছিলেন, যার দরুন কেউ তার চেহারার প্রতি তাকিয়ে তার জ্যোতির তাজাল্লি সহ্য করতে পারত না। লোকজন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি চেহারা আবৃত করে রাখতেন। আবদুল মজীদ নামে তাঁর একজন খাদেম ছিল। সে কয়েক বছর তাঁর সেবা করেছে। একদিন শায়খ তার প্রতি খুশি হয়ে দু'আ দিতে লাগলেন। সুযোগ পেয়ে সে বলতে লাগল, হুজুর অনেক দিন যাবৎ আপনার চেহারা মোবারক দেখার প্রত্যাশী ছিলাম। আজ আপনাকে অত্যন্ত খুশি দেখা যাচ্ছে। অনুগ্রহপূর্বক যদি আপনার চেহারা মোবারক দেখাতেন। তার অনুরোধে তিনি চেহারার নেকাব সরিয়ে দিলেন। আবদুল মজীদ হযরতের চেহারার তাজাল্লী সহ্য করতে সক্ষম হলো না। সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং সাথে-সাথে পরপারে পাড়ি জমাল। আল্লাহু আকবার!

অশ্রু থেকে সুগন্ধি

শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ.) শায়খ আবদুল হামদ সায়লানী সম্পর্কে লেখেন, আল্লাহর এশকে কাঁদার সময় তাঁর চক্ষু দ্বারা যে অশ্রু নির্গত হতো, তা থেকে মেশকের সুঘ্রাণ বের হতো। আল্লাহু আকবার! আল্লাহর মহব্বতের অশ্রুর মূল্য কত! মানুষ তাঁর অশ্রুর সুগন্ধি উপভোগ করত।

মুখ থেকে সুঘ্রাণ বেরিয়ে এল

ইমাম আসিম (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর মুখ থেকে অপূর্ব সুঘ্রাণ বেরিয়ে আসত। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হুজুর! আপনার মুখে কী রাখেন? এত সুগন্ধি কোথা থেকে বেরিয়ে আসে? তিনি জবাব দিলেন, আমি তো মুখে কিছু রাখিনি। তারা বলল, জনাব আমরা আপনার মুখে মেশকে আম্বরে চেয়ে অধিক সুঘ্রাণ উপলব্ধি করি। তিনি বললেন, হ্যাঁ; একবার আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, আসিম! তুমি সারাদিন নিষ্ঠার সাথে কুরআন তেলাওয়াত কর এবং অন্যকে শিক্ষা দাও। তবে আমি তোমার মুখে চুমু দেব না কেন? সুতরাং যখন থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মুখে চুমু দিয়েছিলেন, সেই থেকে আমার মুখ হতে এ সুঘ্রাণ আসতে থাকে।

বন্ধুগণ! আল্লাহর ভালোবাসা তৈরি কর; তবে এ কল্যাণ দেখতে পাবে। নফস ও শয়তান তো আমাদের অগ্রসর হতে দিচ্ছে না। আমরা তো সৃষ্টির মধেই আটকা পড়ে যাই। আমরা কি আল্লাহর ভালোবাসার সুধা উপলব্ধি করতে পারি না?

ইসমে জাতের জন্য انا ও نحن এর ব্যবহার

তালেবে ইল্‌মদের জন্য একটি সূক্ষ্ম বিষয় আলোচনা করছি। দেখো! আল্লাহপাক নিজের জন্য কোথায় انا (আমি – একবচন) এবং কোথায় نحن (আমরা – দ্বি-বচন) ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে তুমি একটি কথা স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন শুধু নিজের সত্তার কথা আলোচনা করেন, তখন انا শব্দ ব্যবহার করেন। আর যখন সত্তা ও বৈশিষ্ট্য উভয়টির কথা আলোচনা করেন, তখন نحن (আমরা) শব্দ ব্যবহার করেন। উদাহরণ দেখ! যথা-

إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى

'আমিই প্রভু। আমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই; আমারই ইবাদাত করো।'[৭২]

নিজের জাত ও সিফাতের ক্ষেত্রে বলেন–

---

৭২. সূরা তাহা : আয়াত ১৪

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

'আমরা তার শাহ্‌রগ থেকেও নিকটে।'[৭৩]

প্রিয় বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা

আল্লাহর প্রিয় বান্দারের প্রতি তাঁর এমন ভালোবাসা যে, কুরআন মাজীদে তাদের আলোচনা করতে আল্লাহপাক বলেন–

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

'আল্লাহপাক তাদের ভালোবাসেন এবং তারা আল্লাহকে ভালোবাসে।'[৭৪]

যুক্তির নিরিখেও এমনটি প্রতীয়মান হয়। কথাটি এভাবে হওয়া উচিত ছিল যে, তারা আল্লাহকে মহব্বত করলে আল্লাহ তাদের মহব্বত করবেন। তবে না। ভালোবাসা ভিন্ন জিনিস। নিজের আশেকদের প্রতি আল্লাহর অতুলনীয় মহব্বত। তাই বলেছেন– আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন এবং তারা আল্লাহকে ভালোবাসে। নিজের ভালোবাসার কথা আগে বর্ণনা করেছেন। এজন্য হাদীছে কুদসীতে আল্লাহপাক বলেন–

'জেনে নাও, নেক বান্দাদের প্রত্যাশা আমার সাক্ষাতের জন্য অধীর আর আমি তাদের সাক্ষাতের জন্য তাদের চেয়ে অধিক প্রত্যাশী।'

কিন্তু এজগতের মুয়ামালা ভিন্ন। এখানে প্রতীয়মান হয় যে, আশেকের অন্তরে আল্লাহর জন্য যতটুকু ভালোবাসা হয়, তাদের জন্য আল্লাহর ভালোবাসা এর চেয়ে গভীর হয়। এজন্যই আল্লাহপাক বলেন, আমার বান্দা আমার দিকে এক কদম অগ্রসর হলে আমার রহমত তার দিকে দু-কদম অগ্রসর হয়। আমার বান্দা আমার দিকে হেঁটে-হেঁটে অগ্রসর হলে আমার রহমত দৌড়ে গিয়ে তাকে সংবর্ধনা জানায়। এতে প্রতীয়মান হয়, বান্দা আল্লাহপাকের সাথে যতটুকু ভালোবাসা রাখে, বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা তার চেয়ে বহুগণ বেশি থাকে। সৌভাগ্যবান ওই বান্দা, যে আল্লাহর ভালোবাসায় লুটিয়ে পড়ে।

---

৭৩. সূরা কাফ : আয়াত ২১

৭৪. সূরা মায়েদা : আয়াত ৫৪

আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের পৃথিবীতে চারটি পুরস্কার দেন

(১) সর্বপ্রথম তাকে বংশীয় নীচুতার মধ্যেও অপার সম্মানে ভূষিত করেন। কোনো-কোনো লোক বংশীয় মর্যাদার দরুন সম্মানিত হয়। কিন্তু সে আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায়। সে সাধারণ বংশের লোক হলেও আল্লাহপাক সবার অন্তরে তাঁর ভালোবাসা ও সম্মান বদ্ধমূল করে দেন। এতে সে অতিশয় সম্মানের অধিকারী হয়।

(২) কষ্ট ব্যতীত আল্লাহপাক তাকে অতুলনীয় জ্ঞান দান করেন। কিছু জ্ঞান চেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয়। যেমন– মাদরাসায় শিক্ষার মাধ্যমে। আর এক প্রকার ইল্‌ম বা জ্ঞান হচ্ছে 'খোদাপ্রদত্ত ইল্‌ম। সেই ইল্‌ম তাদের দান করা হয়। আল্লাহপাক হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে বলেন–

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

'সুতরাং সে আমার একজন অনন্য বান্দাকে পেয়েছে (খিজির আ.), যাকে আমি দিয়েছিলাম আমার পক্ষ থেকে অতুলনীয় রহমত ও জ্ঞান।'[৭৫]

(৩) আল্লাহপাক তাঁদের সম্পদ ছাড়াই অসংখ্য আহার্য দিয়ে থাকেন। বাহ্যিকভাবে তাঁরা ফকীর হয়; কিন্তু অন্তরের ধনী হয়। অঢেল সম্পদের মালিকও এমন হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে না।

(৪) আল্লাহপাক তাদের সৈন্য-সামগ্রী ব্যতীতই অত্যধিক শক্তি-সামর্থ্য দান করেন।

জান্নাতীদের চার গ্রুপ

ঘরে সাধারণ কোনো মেহমান এলে মানুষ নিজের চাকর-বুয়াকে পানি নয়ে মেহমানকে পান করাতে বলে। কিন্তু যদি কোনো বিশেষ অতিথির আগমন হয়, তাহলে নিজে জগ হাতে নিয়ে অতিথিকে অভ্যর্থনা জানায়, পানি পান করায়। এটি সম্মানের তারতম্যের কারণে হয়। এমনিভাবে জান্নাতীরা চারটি দলে বিভক্ত থাকবে।

একদলকে জান্নাতের খাদেমরা আপ্যায়ন করবে। আল্লাহপাক বলেন–

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾

'তাদের চতুর্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করবে জান্নাতে স্থায়ী বসবাসরত শিশুরা।'[৭৬]

---

৭৫. সূরা কাহাফ : আয়াত ৬৫

৭৬. সূরা ওয়াকেয়া : আয়াত ১৭

অপর দলকে ফেরেশতারা আপ্যায়ন করবে। আল্লাহপাক বলেন–

بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۝

'সাদা রংবিশিষ্ট, পানকারীদের জন্য আনন্দদায়ক।'[৭৭]

অন্য দলকে জান্নাতের দারোগারা পান করাবে। আল্লাহপাক বলেন, 'জান্নাতে ফোয়ারা থেকে মিশ্রিত পানীয়' জান্নাতের দারোগা রেজওয়ান ফেরেশতা পান করাবেন।

বিশেষ একটি দলকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পান করাবেন। আল্লাহপাক বলেন–

وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا

'তাদের প্রভু তাদের সুস্বাদু পবিত্র পানীয় পান করাবেন।'[৭৮]

ওলামায়ে কেরাম বলেন– আল্লাহপাক একজন নীরবচ্ছিন্ন রোযাদারকে দেখে আনন্দচিত্তে বললেন- হে আমার আশেক! তুমি আমার জন্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত পানাহার করনি। তুমি অতিথি, আমি তোমার আপ্যায়ক; আমার আতিথিয়েতা গ্রহণ করো। সন্তোষচিত্তে পানাহার করো। অতিক্ষিত তৃষ্ণা নিবারণ করো। আল্লাহপাক কুরআনে বলেন–

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ۝

'এটা দয়াময় প্রভুর পক্ষ থেকে আতিথেয়তা।'[৭৯]

মহব্বতে এলাহী প্রার্থনার শিক্ষা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আল্লাহপাকের ভালোবাসা প্রার্থনা করার শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ

'আমি তোমার ভালোবাসা চাই এবং তোমাকে যারা ভালোবাসে তাদের ভালোবাসা চাই।'

---

৭৭. সূরা সাফফাত : আয়াত ৪৬
৭৮. সূরা দাহর : আয়াত ২১
৭৯. সূরা হামীম সেজদা : আয়াত ৩২

অন্যস্থানে বলেন-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

'হে আল্লাহ! তোমার মহব্বত আমার অন্তরে ঠান্ডা পানীয় থেকে অধিক প্রিয় করে দাও।'

বান্দা যখন মরুভূমির বালুকাময় পথে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে চলতে-চলতে পানির তৃষ্ণায় প্রাণবায়ু উড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তার কাছে ঠান্ডা পানীয়র চেয়ে অধিক প্রিয় কিছুই হতে পারে না। এ সময় পানি পেলে অতি আকর্ষণে পান করতে থাকে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আর মধ্যে এই প্রার্থনা-ই করেছেন যে, হে আল্লাহ! ওই বান্দা পানির প্রতি যেরূপ আসক্ত হয়, আমাকে তোমার ভালোবাসার তার চেয়ে বেশি ভক্ত বানিয়ে দাও।

হাদীছে এসেছে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রার্থনা করলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ شَوْقًا اِلٰى لِقَائِكَ وَلَذَّةَ النَّظْرَةِ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ

'হে আল্লাহ! আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী এবং তোমার অপূর্ব চেহারা দর্শনের প্রত্যাশী।'

ইহকাল ও পরকালের সুসংবাদ

আল্লাহপাকের কাছে তার প্রিয় বান্দাদের অতুলনীয় মর্যাদা রয়েছে। ইহকাল ও পরকালে তারা সম্মানী হয়। পৃথিবীতে তাদের সুসংবাদ হলো,

رِجَالٌ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ

'তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা; তাদের সাথীরা কখনও দুষ্কৃতকারী হবে না।'

পরকালে কিভাবে সম্মানী হবে? কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পর আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ! কিসের বিনিময়ে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিলেন? আল্লাহপাক বললেন, হে আমার বান্দা! তোমার আমলনামায় একটি নেক আমল রয়েছে, যার বিনিময়ে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সমস্ত কর্মই তো অপ্রিয়; আমি উদাসীন ছিলাম। দুষ্কৃতকারী ছিলাম। আমার কোন সেই আমল, যা আপনার পছন্দ হয়েছে? আল্লাহপাক বললেন, তোমার আমলনামায় আমার পছন্দনীয় একটি

আমল হচ্ছে, একদিন আমার প্রিয় বান্দা বায়জীদ বোস্তামী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তুমি তাকে চিনতে না। অন্যজনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইনি কে? সে বলছিল, ইনি বায়জীদ বোস্তামী। তবে তুমি আগে থেকে জানতে, বায়জীদ বোস্তামী নামে একজন আল্লাহর ওলী আছেন। তাই সেই সময় তুমি আল্লাহর ওলীর প্রতি গভীর ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলে। আল্লাহর ওলীর প্রতি ভালোবাসার সেই দৃষ্টির কারণে আমি তোমার জীবনের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ!

ইসমে জাতে মত্ত হওয়ার শেষ সীমা

আল্লাহপাকের যিকির করতে-করতে দুনিয়ার সবকিছু ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করো। অন্তরে কালেমায়ে তায়্যেবার চোট অবিরাম লাগাতে থাকো। কালেমার ঘর্ষণ দিয়ে অন্তরের মরিচা দূর করো। ইসমে জাতে এমনভাবে মত্ত হও যে, তাকে ব্যতীত সবাইকে ভুলে যাও। যখন কেউ বলে, আমি আল্লাহর যিকির করি, তখন আমার অবাক লাগে। সে যেন একথা বলতে চায় যে, আমি আল্লাহকে ভুলে যাচ্ছি; আমি তাকে স্মরণ করার সময় কবে আসবে। বাস্তবতা হলো, আমি মহব্বতের পেয়ালা সম্পূর্ণ পান করেছি। তবু সেই সুরা শেষ হয়নি এবং আমিও পরিতৃপ্ত হইনি।

আল্লাহওয়ালাদের মহব্বতের বিষয় আলাদা। তারা ভরা পেয়ালা পান করেন; তবু তৃষ্ণা মেটে না।

আল্লাহর শান জিজ্ঞাসা করতে হলে

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا

'আল্লাহর ব্যাপারে অবগত বান্দাদের জিজ্ঞাসা করো।'[৮০]

আল্লাহপাক বলতে চাচ্ছেন, আমার ভালোবাসা ও মহব্বত সম্পর্কে জানতে চাইলে আমার ভক্তদের জিজ্ঞাসা করো। কোনো অজ্ঞদের জিজ্ঞাসা করো না। তারা কী জানে? আমার সৌন্দর্য ও গুনাগুণ সম্পর্কে আমার প্রেমিকদের জিজ্ঞাসা করো, আমার মাহাত্ম্য কী?

আমি কেমন লজ্জাশীল যে, আমার কোনো বান্দা যখন অন্যের প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকায়, তখন তার প্রতি আমার মন ক্ষুণ্ন হয়। আমি

---

৮০. সূরা ফুরকান : আয়াত ৫৯

তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই। আমার দুয়ার থেকে তাকে তাড়িয়ে দেই। সে যদি আমার এককত্বের শান জানতে চায়, তাহলে যেন আমার ভক্তদের জিজ্ঞাসা করে নেয়।

তিনি এমন অমুখাপেক্ষী যে, বালআম বাউরের চারশত বছরের ইবাদাত লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন। মিশরের মিনারে আযান দিতে উঠে গায়রে মাহরাম মহিলার প্রতি তাকানোর কারণে ঈমান হরণ করা হয়। নিচে নেমে মুরতাদ হয়ে যায়। সুতরাং আমার সম্মান আমার বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করো।

আল্লাহপাক বলেন, 'হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেব। কিন্তু আমার সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করলে অথবা আমার ভালোবাসায় অন্যকে সায় দিলে তা আমি কস্মিনকালেও ক্ষমা করব না।

কোনো এক মুহাদ্দিছ সাহেবকে প্রশ্ন করা হলো, শিরকও একটি গোনাহ। তবে তা ক্ষমার যোগ্য হবে না কেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, তুমি যখন আমার অপূর্ব সৌন্দর্য জানা সত্ত্বেও অন্যের প্রতি তাকাবে, তখন তোমাকে আমার দরজায় আসতেও অনুমতি দেওয়া হবে না।

আল্লাহপাক বলেন, কোনো ব্যক্তি যখন আমার সামনে নাচ-গান করে, তখন আমি তার সবকিছু ধূলিসাৎ করে দেই। কেউ আত্মম্ভরিতা করলে আমি তাকে শাস্তি দেই। কারণ, আত্মম্ভরিতা আমার গায়ের চাদর।

আমার রাজত্ব চলবে। আমার বান্দারা আমার সামনে মাথানত করবে। হযরত আদম (আ.) জান্নাতে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ চেয়েছেন পৃথিবীতে আসবে; সুতরাং আসতেই হয়েছে। কারণ, আদেশটি আল্লাহ তা'আলার। হযরত নূহ (আ.) ভেবেছিলেন তাঁর সন্তান বেঁচে যাক। কিন্তু আল্লাহপাক সেটা চাননি। সে কাফেরদের সাথে মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হলো। ইবরাহীম (আ.) ছেলেকে ছুরির নিচে রেখে জবাই করতে ইচ্ছে করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহপাকের উদ্দেশ্য সেটা ছিল না। নির্দেশ কারটা বাস্তবায়িত হয়েছে? আল্লাহর। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংকল্প করেছিলেন, মধু খাব না।

আল্লাহপাক ওহী নাযিল করে বললেন–

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ

'হে নবী! আমি যা হালাল করেছি তা তুমি হারাম করছ কেন?।'[৮১]

---

৮১. সূরা তাহরীম : আয়াত ১

আল্লাহর নির্দেশের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ইচ্ছার ওপর আমল করলেন। কার আদেশ প্রতিফলিত হয়েছে? আল্লাহর। কেয়ামতের দিন আল্লাহপাক বলবেন– 'আজ ক্ষমতা কার?' কেউ উত্তর দেবে না। এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে। সবাই নিস্তব্ধ থাকবে। তারপর আল্লাহপাক নিজেই বলবেন, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর। আল্লাহু আকবার! আল্লাহ সম্বন্ধে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো।

প্রিয়জনদের অভিবাদন

এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহপাক হযরত মূসা (আ.)কে বললেন, হে আমার প্রিয় মূসা! আমার এমন কিছু বান্দা আছে, যারা আমার সঙ্গে চুপিসারে কথা বলে। তখন আমি তা কান পেতে শুনি। তারা আমাকে ডাকে, আমি তাদের প্রতি মনোনেবেশ করি। তারা আমার দিকে আসে, আমি তাদের নিকটে চলে যাই। তারা আমার নৈকট্য তালাশ করে, আমি তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাই। তারা আমাকে তাদের শিরোমণি বানিয়ে নেয়, আমি তা গ্রহণ করি। তারা একমাত্র আমাকে মহব্বত করে, আমিও তাদের মহব্বত করি। তারা নেক কাজ করে, আমি তার প্রতিদান দেই। আমি তাদের কাজের পরিচালক, অন্তরের রক্ষক, আমি তাদের সকল অবস্থার জিম্মাদার। অসুস্থের ডাক্তার। আমি তাদের হৃদয়ের জ্যোতি, অন্তরের প্রশান্তি। তাদের হৃদয়ের প্রশান্তি আমার স্মৃতিপটে, তাদের আসন আমার নিকটে। আমাকে ব্যতীত তাদের চিত্ত শান্ত হতে পারে না।

আফসোস! যদি আল্লাহর মহব্বতে আমার এমন অবস্থা হতো! আল্লাহর স্মরণে যদি আমি অধীর থাকতাম। যেভাবে কোনো মানুষ এক বেলা না খেলে অন্য বেলায় স্বল্পতা অনুভব করে। এভাবে যদি একবার অযীফা আদায় না করলে অন্য সময় হৃদয়গতভাবে অপূর্ণ উপলব্ধি হতো! যিকির ছাড়া আমাদের আহার-বিশ্রাম শান্তিময় না হতো, কতইনা উত্তম হতো।

বন্ধুগণ! এমন অবস্থা অর্জন করতে পারলে আল্লাহপাক আমাদেরকে তাঁর আশেকদের সঙ্গে গণ্য করবেন। আল্লাহ কবুল করুন। আমীন।

আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের পরিচিতি

এতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহপাকের সত্তাগত নাম اللّٰه -এর কল্যাণের কথা শুনেছ। এখন কিছু গুণবাচক নামের আলোচনা করা হবে। আল্লাহ তা'আলার

গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে দুটি নামের আলোচনা হাদীছের মধ্যে এসেছে। অন্য তিনটি নামের আলোচনা এখানে করা হবে।

কা'বা শরীফের গেলাফে আল্লাহর দুটি নামের আধিক্য

আল্লাহপাকের দুটি গুণবাচক নাম হলো حنان ও منان। এদুটি নাম اسماء الحسنى-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে হাদীছে এগুলোর আলোচনা এসেছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, আপনি যদি হজ বা ওমরাহ করতে যান, তাহলে দেখতে পাবেন, কা'বা শরীফের গেলাফের প্রত্যেকটি দুই ও তিন নং লাইনে يا حنان ও يا منان লিখিত রয়েছে। চতুর্দিকে পূর্ণ লাইনে এদুটি নাম লিখিত আছে। অন্যান্য নামও আছে। তবে কোনো নাম পূর্ণ লাইনে লিখিত নয়। এ অধম বহুদিন যাবত এ-বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেছে যে, ওলামায়ে কেরাম এদুটি নাম দ্বারা পূর্ণ লাইন লেখার রহস্য কী? শেষ পর্যন্তএদুটি নামের মর্ম অধমের সামনে উদ্ভাসিত হলো। মনোযোগ দিয়ে শোনো!

حنان নামের ভাবার্থ ও পরিচয়

'হান্নান' ওই সত্তাকে বলে, যে যদি কোনো মানুষ তাঁর থেকে দূরে সরে যেতে চায়, তবে তাকে যেতে বারণ করে। এজন্য যদি কোনো মানুষ আল্লাহর দরবারে উদাসীন থাকে, তাহলে আল্লাহপাক তাকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে রাখেন। কখনও তার ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্বেগ, কখনও স্বাস্থ্যের দুর্বলতা, কখনও হরেকরকম অস্থিরতায় ভুগতে বসে। এটা এজন্যই করেন, যাতে সে পুনরায় আল্লাহর দুয়ারে ফিরে আসে।

এখানে এক বুযুর্গ একটি সূক্ষ্মতা বয়ান করেছেন যে, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের অস্থিরতার রশ্মিতে আবদ্ধ করে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। যেভাবে মাছশিকারী পলায়নরত মাছকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসে, তেমনি যে বান্দা গোনাহের কারণে আল্লাহর দরবার থেকে পলায়ন করতে চায়, আল্লাহপাক পরিস্থিতি এমন করে দেন, যার কারণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আল্লাহর দরবারে এসে প্রার্থনা করতে থাকে।

কুরআন মাজীদে আল্লাহপাক কত সুন্দর কথা বলেছেন–

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ

'হে আমার বান্দারা তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'[৮২]

---

৮২. সূরা তাকবীর : আয়াত ২৬

অন্যত্র বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ

'হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের দয়াময় মালিক থেকে বিমুখ হতে কোন বস্তু তোমাদের প্রতারণায় ফেলেছে।'[৮৩]

যেমন কোনো মা তার সন্তানকে অশুভ কর্ম থেকে অতি আদরের সাথে বারণ করে বলে, হে আমার সোনামণি! তুমি আম্মাজানের প্রতি রাগ করেছ? এমনিভাবে আল্লাহ বলতে চান, তোমরা আমার প্রতি অভিমান করছ কেন?

منان নামের মর্ম ও পরিচিতি

মান্নান এমন সত্তাকে বলে, যে অনুগ্রহ করে তার গঞ্জনা করে না। কেউ-কেউ অন্যের ওপর অনুগ্রহ করে আবার খোটা দিতেও কার্পণ্য করে না। কিন্তু আল্লাহপাক এমন দয়াবান যে, দয়া করে খোটা দিতে পারেন না। আমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ একটু লক্ষ্য করো, ভালো করে স্মরণ রাখো!

আল্লাহ যদি আমাদের দৃষ্টিশক্তি না দিতেন, তবে আমরা অন্ধ থাকতাম।

শ্রবণশক্তি না দিলে আমরা বধির থাকতাম।

বিবেক না দিলে পাগল থাকতাম।

সুস্থতা না দিলে রোগে কাতর থাকতাম।

ধনসম্পদ না দিলে নিঃস্ব থাকতাম।

সম্মান না দিলে লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার গ্লানি সইতাম।

সন্তান না দিলে আমরা আটকুড়া থাকতাম।

আপনি জানেন কি, আমরা যে সম্মানজনক জীবন যাপন করছি, তা ওই মালিকেরই অবদান?

অনস্বীকার্য যে, আল্লাহপাক আমাদের এমন একটি নেয়ামত দিয়েছেন, যা এর পূর্বে একেবারেই ছিল না। আল্লাহপাক বলেন-

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

'নিশ্চয় আল্লাহপাক মুমিনদের অতুলনীয় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি মুমিনদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন।'[৮৪]

---

৮৩. সূরা ইনফিতার : আয়াত ৬

৮৪. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬৪

গোটা সৃষ্টজীবের মধ্যে কারও ওপর এ অনুগ্রহ করা হয়নি। তেমনি আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জন্য আনন্দদায়ক। তাই সেই নেয়ামত পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন, আমি মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছি।

كريم নামের তাৎপর্য ও পরিচিতি

আল্লাহপাকের সুন্দর নামসমূহের মধ্যে একটি নাম হচ্ছে 'কারীম'। কারীম এমন সত্তাকে বলে, যিনি কোনো ভিখারিকে দেখে তার প্রয়োজনীয় জিনিসের অনুমান করে সে চাওয়ার পূর্বেই দিয়ে দেন। এমন কিছু মহৎ ব্যক্তি রয়েছেন, যারা মানুষ দেখেই তাদের আবদারের পূর্বে তাদের চাহিদা পূরণ করেন। তেমনিভাবে আল্লাহপাক কিছু লোকের সত্য মনে তাওবার সদিচ্ছা দেখে সে লজ্জিত হয়ে ঘর থেকে বের হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহর দরবারে হাত উঠানোর পূর্বেই তাদের ক্ষমা করে দেন। সুবহানাল্লাহ!

বোখারি শরীফের এক হাদীছে এসেছে, এক ব্যক্তি একশ মানুষকে হত্যা করেছিল। পরিশেষ তাওবার উদ্দেশ্যে পুণ্যবানদের লোকালয়ে যাচ্ছিল। এখনও রাস্তায় আছে; গন্তব্যে পৌঁছেনি। এমতাবস্থায় মৃত্যু হয়ে যায়। জান্নাতের ফেরেশতারগণ এলেন। জাহান্নামের ফেরেশতাগণও এলেন। উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শুরু হলো। জাহান্নামের ফেরেশতারা দাবি করলেন, এই লোক একশজন মানুষের হত্যাকারী। তাই আমরা তাকে নিয়ে যাব। জান্নাতের ফেরেশতারা বললেন, যেহেতু তাওবা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, তাই আমরা তাকে নিয়ে যাব। বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থাপন করা হলো। আল্লাহপাক বললেন, তোমরা জমিনের উভয় বস্তি মেপে দেখো, সে কোন বস্তির নিকটতম ছিল। যদি নিজের গ্রামের নিকটতম হয়, তবে সে পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি পুণ্যবানদের লোকালয়ের নিকটবর্তী হয়, তাহলে পুণ্যবানদের মধ্যে গণ্য হবে।

জমিন মাপা শুরু হলো। আল্লাহপাক জমিনকে বললেন, তুমি নেককারদের গ্রামের দিকে একটু গুটিয়ে যাও। জমিন আল্লাহর আদেশ পালন করল। মেপে দেখা গেল, উভয় দিকের জমিন সমান। একেবারে মধ্যখানে তার মৃত্যু হয়েছে। তবে তার লাশ নেককারদের লোকদের অভিমুখী ছিল। শেষ পর্যন্ত তার মরদেহ পুণ্যবানদের মধ্যে গণ্য করেন। অর্থাৎ– মুক্তির ফয়সালা দিলেন।

এতে প্রতীয়মান হয়, মৃত্যুলগ্নেও যদি আমাদের লাশ নেককারদের অভিমুখী থাকে, তাহলে আল্লাহপাক আমাদের নেককারদের মধ্যে গণ্য করবেন। আর যদি জীবিত অবস্থায় তাদের মাহফিলে গিয়ে তাদের সান্নিধ্য অর্জন করি, তাহলে সেই আসা-যাওয়া কবুল করবেন না কেন?

কেয়ামতের দিন ওই 'কারীম' সত্তার দয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। এজন্যই কোনো আল্লাহওয়ালা বলেছেন, আমি দয়াময়ের কাছে কোনো পাথেয় ছাড়া উপস্থিত হয়েছি। আমার কাছে কোনো আমলও নেই। কোনো পরিশুদ্ধ অন্তরও নেই। তাছাড়া দয়াময় সত্তার কাছে গমনকারীদের জন্য পথের উপকরণ সাথে রাখা অশুভ মনে করি।

মনে করুন, যদি কোনো মন্ত্রী আপনাকে তার বাসায় নিমন্ত্রণ করে আর আপনি বক্সে করে আপনার বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে যান, তাহলে কি মন্ত্রী সাহেব আপনার এ কাজ পছন্দ করবেন? তিনি বলবেন, আপনি আমার দাওয়াতে এলেন আর নিজের বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এলেন?

ওলামায়ে কেরাম 'কারীমের' একটি অর্থ এও করেছে যে, কারীম ওই সত্তাকে বলে, যিনি কোনো জিনিস দেওয়ার পর ফিরিয়ে নিতে অভ্যস্ত নন। আল্লাহপাক কোনো নেয়ামত ফিরিয়ে নেননি; বরং আমরা সেই নেয়ামতের মূল্যায়ন না করে ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দিই।

رحمن ও رحيم নামের পরিচিতি

আল্লাহপাকের 'রহমত' নামটি এক আশ্চর্য গুণ। এতে আশ্চর্যের বিষয় হলো, আল্লাহপাকের যত গুণ রয়েছে, প্রত্যেকটির জন্য একটি করে নাম রয়েছে। কিন্তু 'রহমত' গুণের জন্য দুটি নাম রয়েছে رحمن ও رحيم। এতে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহর অন্যান্য গুণের তুলনায় এই গুণটির প্রাধান্য রয়েছে।

আল্লাহপাক বলেন–

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

'আমার রহমত সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।'[৮৫]

এখন প্রশ্ন হয়, এগুণের ক্ষেত্রে দুই নামের কারণ কী? অথচ رحمن ও رحيم উভয়টি দ্বারা রহমত উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু চিন্তা করলে এ-বিষয়টি সুস্পষ্ট

---

৮৫. সূরা আরাফ : আয়াত ১৫৬

হয়ে যায়। যেমন মনে করুন– কোনো ব্যক্তির ধনী হওয়া তার একটি গুণ। আবার দানশীল হওয়া আরেকটি গুণ। অবশ্য সম্ভাবনা আছে, এক লোক বড় ধনী; কিন্তু হাড়কিপটে। একটা টাকাও খরচ করে না। আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে তার অন্তরে চোট লাগে। সুতরাং ওই লোক ধনী বটে; কিন্তু দানশীলতার গুণ তার মধ্যে নেই। আরেকজন হৃদয়ের দিক থেকে বিখ্যাত দানশীল হাতেম তাই-এর মতো। তবে তার কোনো সম্পদ নেই। সুতরাং তার দানশীলতার কোনো মূল্য নেই। সম্পদ থাকা আলাদা গুণ আর সম্পদ ব্যয় করা আলাদা গুণ। এজন্যই আল্লাহপাক নিজের 'রহমত' গুণের জন্য দুটি নাম নির্ধারণ করেছেন। একটি رحمن অপরটি رحيم। বোঝা যায়, আল্লাহপাক বলছেন- হে আমার বান্দারা! আমার রহমতের খাজানাও অগণিত এবং তার ব্যয়ও হচ্ছে অগণিত।

رحمن অর্থ হলো, তিনি পর-আপন সবার জন্য দয়াবান। মুসলমানদের ওপরও দয়াবান এবং কাফেরদের জন্যও দয়াবান। কেননা, কাফেররাও আল্লাহর সৃষ্টি। তাই তাদেরও সন্তান দেন; সম্মান দেন। তাদের ব্যবসায় উন্নতি দান করেন। পৃথিবীতে তাদেরকে ভোগ-বিলাসিতা দিয়ে থাকেন। তাদের অনেক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। আল্লাহপাক তাদের ভালো কাজের বিনিময় পৃথিবীতে দিয়ে দেন। আর رحيم নামের মর্ম হলো, কেয়ামতের দিন আল্লাহপাকের রহমত মুমিনদের জন্য নিদিষ্ট থাকবে। আল্লাহপাক বলেন–

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا

'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি রহীম।'[৮৬]

আল্লাহপাকের রহমতের দুটি অংশ রয়েছে। এক. রহমানিয়াত দুই. রাহীমিয়াত। আল্লাহপাক পুরুষের মধ্যে রাহীমিয়্যাতের প্রভাব রেখেছেন এবং মহিলাদের মধ্যে রাহীমিয়াতের প্রভাব রেখেছেন। এজন্যই লক্ষ করে দেখুন, পিতা সন্তানকে ভালোবাসেন। কিন্তু যখন সুশৃঙ্খল বা পরিপাটির বিষয় সামনে আসে, তখন পিতা সন্তানকে পরিপাটি করে রাখেন। পিতার মধ্যে আল্লাহপাক সবকিছুর ব্যবস্থাপনা সুষম রাখেন। তাই পিতার মধ্যে আল্লাহপাক এই বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন। পিতা হৃদয়বানও হন, আবার কঠোরও হন। পিতা সন্তানকে স্নেহ করেন, আবার ব্যাঘ্রচোখে শাসনও করেন।

---

৮৬. সূরা আহযাব : আয়াত ৪৩

আর মায়ের মধ্যে আল্লাহপাক 'রাহমানিয়াতের' প্রভাব দিয়েছেন। তাই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র মাতাই নিজের ভদ্র ও অভদ্র উভয় সন্তানকে ভালোবাসেন। পিতা নিজের অবাধ্য সন্তানকে ঘর থেকে বের হতে নির্দেশ দেন। কিন্তু মা কখনও এমন কথা বলতে পারেন না। এমনকি মার ব্যাপারে একটি প্রসিদ্ধ কথা রয়েছে যে, তিনি নিজে অত্যাচার সহ্য করেন। কিন্তু অন্যকে অত্যাচারিত হতে দেন না। পিতা যোগ্য সন্তানের প্রতি মমতা দেখান। কিন্তু অযোগ্য সন্তানের প্রতি কোনো-কোনো সময় অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করেন। অথচ, মা এমন ভাব প্রকাশ করতে পারেন না। তিনি বলেন, ভালো-মন্দ আল্লাহর হাতে। ভালোবাসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে সকল সন্তানকে সমানভাবে স্নেহ-মমতা দিতে হবে। মাতা ধনসম্পদের প্রত্যাশী হন না। মায়ের স্নেহ তার হৃদয়ের আবেগের কারণে হয়, যার দ্বারা তিনি উপলব্ধি করেন, এ আমার কলিজার টুকরা; নয়নের মণি; হৃদয়ের প্রশান্তি।

রহমতে এলাহীর শেষ সীমা

মাসিক আল কাউসার
বর্ষ: ১৯,সংখ্যা: ০৭,২০২৩

আল্লাহপাকের রহমতে সর্বশেষ স্তর হলো এই যে, এক মূর্তিপূজারি বসে বসে يا صنم . يا صنم হে দেবতা! হে দেবতা!) এর তাসবীহ পাঠ করেছে। সে তাসবীহ পাঠ করতে-করতে রাত হয়ে গেছে। তার চোখে তন্দ্রা এসেছে। এমতাবস্থায় তার মুখে يا صنم-এর পরিবর্তে يا صمد শব্দ বেরিয়ে এল। এটি আল্লাহপাকের একটি গুণবাচক নাম। অর্থ হচ্ছে অমুখাপেক্ষী। তার মুখে এই শব্দ বের হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহপাক জবাব দিলেন لبيك يا عبدى হে আমার বান্দা! আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত। কী চাও বলো।

ফেরেশতারা অবাক হয়ে বললেন, হে আল্লাহ! এ তো মূর্তিপূজক। সারা রাত দেবতার নামের তাসবীহ পাঠ করেছে। এখন ঘুমের প্রাবল্যে তার মুখ দিয়ে তোমার নাম বেরিয়ে এসেছে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই আপনি এর ডাকে সাড়া দিয়ে ফেললেন, 'তুমি কী চাও'! এর রহস্য কী? আল্লাহপাক বললেন– হে আমার ফেরেশতারা! সে সারা রাত তার দেবতাকে ডেকেছে। কিন্তু দেবতা তার ডাকে সাড়া দেয়নি। পরিশেষে যখন তার মুখ দিয়ে আমার নাম বের হলো, এতে আমিও যদি জবাব না দেই, তাহলে আমার আর দেবতার মধ্যে প্রার্থক্য কোথায়?

ভিত্তিহীন কিসসা

আল্লাহপাক এমন দয়াময় যে, তন্দ্রাবস্থায় অলক্ষে তাঁর নাম উচ্চারণ করলেও তিনি জবাব দেন। তার প্রার্থনা গ্রহণ করেন। আমরা সচেতন

অবস্থায় আল্লাহকে ডাকলে তিনি আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করবেন না কেন? দু'আ করি, আল্লাহপাক আমাদেরকে সত্যিকারের ভালোবাসা দান করুন এবং মৃত্যুকালে যেন আমাদের ঈমানের নেয়মাত নিরাপদ থাকে এবং মহাপ্রলয়ের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝান্ডার ছায়াতলে আমাদের আশ্রয় হয়। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

এশ্‌ক ও মহব্বতের সফর

'বাইতুল্লার দর্শনে কখনও মানুষের মন ভরে না। বাইতুল্লাহ দর্শনের সৌভাগ্য যার নসিব হয়েছে, সে ভালো করেই জানে, যখন মানুষ বাইতুল্লার পানে চোখ ফেলে, তার সৌন্দর্য ততই বেড়ে যায় এবং মন চায়, বসে-বসে একে দেখতেই থাকি। ওখানে নূর আর নূর। ওখান কার দৃশ্য এতই মনকাড়া, পরিবেশ এতই শান্তিময় যে, সে একটি ভিন্ন জগত। রাজা-বাদশাহদের দরবার যেমন আলাদা, তেমনি শানও হয় তার স্বতন্ত্র।'

এশ্‌ক ও মহব্বতের সফর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ.

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

সৃষ্টিজগতের সূচনা

'নিঃসন্দেহ সর্বপ্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে সেটিই হচ্ছে এই ঘর যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য হেদায়াত ও রহমত। এতে রয়েছে মাকামে ইবরাহীমের মতো সুস্পষ্ট নিদর্শন। আর যেলোক এর মধ্যে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপদ রয়েছে। আর এ ঘরের হজ করা হলো মানুষের ওপর আল্লাহর প্রাপ্য, যার সামর্থ্য রয়েছে এ ঘরে পৌঁছার।'[৮৭]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন এ সৃষ্টিজগত সৃজন করেন, তখন শুরুলগ্নে চতুর্দিকে শুধু পানি আর পানি ছিল। সেই পানির ওপর এক ধরনের ফেনা ছিল। তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে জমিনের অস্তিত্ব আসে। যেস্থান থেকে এই ফেনা বা বাষ্প উদ্‌গত হয়েছিল, তা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল হয়ে যায়। তাই সেই স্থানকে পৃথিবীর অগ্রস্থল, কেন্দ্রস্থল ও মধ্যস্থল বলা হয়। তাকে বাইতুল্লাহ বলে। আল্লাহর ঘর বলার কারণ হলো সেখানে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ জ্যোতি সর্বদা বর্ষণ হতে থাকে।

বিষয়টি এভাবে বলা যেতে পারে যে, মনে করো, সেখানে আল্লাহপাকের জাতি নূরের একটি ফোয়ারা স্থাপন করা হয়েছে, যা আল্লাহর আরশ থেকে

---

৮৭. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৯৬

নির্গত হয়ে পাতালপুরি পর্যন্ত গমন করে। আমরা সেদিকে মুখ করে নামাযে নত হই। আমরা নামাযে নিয়ত করি, কাবা শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম। সুতরাং যদি কোনো মানুষ উড়োজাহাজের মাধ্যমে আকাশ পথে ভ্রমণ করে অথবা কোনো নভোচারী নভোমণ্ডলে থাকে অথবা কোনো ডুবুরি গভীর সমুদ্রে কয়েক কিলোমিটার নিচে চলে যায় এবং সেখানে নামায পড়তে চায়, তাহলে সেখানেও নামায পড়তে পারবে। এই নির্দিষ্ট স্থান তার সম্মুখে থাকা অবশ্যক নয়; বরং শুধু সেদিকে মুখ করে দাঁড়ালেই যথেষ্ট হবে। আল্লাহপাক বান্দাদের ওপর সীমাহীন দয়া করেছেন। আমাদের জন্য দিক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যদি দিক নির্ধারিত না থাকত, তবে আমরা হতাশায় পড়ে যেতাম। কেউ পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়াত আর কেউ পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়াত। এমনিভাবে একমুখী হতে পারত না এবং পূর্ণ প্রশান্তির সঙ্গে ইবাদাত করা সম্ভব হতো না।

মাশুকের আলামত পেলে প্রশান্তি আসে

যদি পৃথিবীতে বাইতুল্লাহ শরীফ না থাকত, তাহলে মহব্বতে এলাহীর জযবা পূর্ণ করা মুশকিল হয়ে যেত। কেননা, আল্লাহপাকের সত্তা বাস্তব অনুভূতিতে আসা দুষ্কর। যখন আশেক তার মাশুকের দেখা না পায় তখন তার বিভিন্ন নিদর্শন দেখে সে প্রশান্তি লাভ করে। আল্লাহপাক এ ঘরকে নিজের ঘরের সমতুল্য করে আমাদেরকে দান করেছেন। তাই বান্দা যখন পৃথিবীতে তাঁর ঘর দর্শন করে তখন তার অন্তরে প্রশান্তি আসে। কারণ, এটা আল্লাহর ঘর।

মজনু সম্পর্কে বলা হয়, সে একবার একটা কুকুরের পায়ে চুমু দিতে লাগল। কেউ জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার মজনু? সে জবাব দিল, এই কুকুরটা আমার প্রিয়তমের বাড়ির কাছে দিয়ে হেঁটে এসেছে। এ কারণেই আমি তার পায়ে চুমু দিচ্ছি। মাশুকের সঙ্গে যখন মহব্বত সৃষ্টি হয়, তখন তার ঘরবাড়ি, অলিগলি ইত্যাদির প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যায়। আর মুমিন ব্যক্তি যেহেতু আল্লাহকে ভালোবাসে, তাই এতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, কুরআন, আল্লাহ ও আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। কেননা, এসকল বস্তু প্রকৃত প্রিয়তমের নিদর্শন এবং মুমিন বান্দারা সেগুলো দেখে আনন্দিত হয়। এবার তার জন্য নামাযে এখলাছ হাসিল করা সহজ হয়ে যায়।

ভালোবাসার চাহিদা হচ্ছে, প্রিয়তমকে যদিও দেখতে না পাওয়া যায়, তবু তার কিছু নিদর্শন যেন দেখা যায়। এ কথাটি আল্লামা ইকবাল (রহ.) খুব সুন্দর বলেছেন–

کبھی اے حقیقت منتظر آ لباس مجاز میں

کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں

রূপক জামায় আবৃত হয়ে আমার প্রিয়তম কবে আসবে।

হাজারো সেজদায় স্পন্দিত হচ্ছে আমার প্রার্থনার ললাট।

বন্ধুগণ! আমরা মাটির তৈরী। কোনো বস্তু সামনে উপস্থিত দেখে শান্ত হওয়া আমাদের স্বভাব। আল্লাহপাক পৃথিবীতে একটি স্থানকে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত করে বান্দার ওপর অসীম দয়া করেছেন। এতে আমরা আল্লাহর ভালোবাসার প্রবল আগ্রহ পূর্ণ করা সহজ হয়েছে। এ কারণেই আমরা যখন বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে দণ্ডায়মান হই, তখন মনে করি, আমরা আমাদের মাহবুবের সামনেই দাঁড়িয়েছি।

তারকাসমূহের তাওয়াফ

বাইতুল্লাহ শরীফ যেমন আমাদের কেবলা তেমনিভাবে ফেরেশতাদের জন্য আকাশে একটি কেবলা আছে। তাকে বাইতুল মা'মুর বলে। মানুষ বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করে এবং ফেরেশতারা বাইতুল মা'মুরকে তাওয়াফ করেন।

একটি অদ্ভূত বিষয়ের আলোচনা শোনো। আমেরিকার নভোমণ্ডল বিষয়ক বিজ্ঞানীরা তারকা নিয়ে একটি চলচিত্র তৈরি করেছে। তার নাম দিয়েছে The Star। এ সম্পর্কে যিনি আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন, জনাব! এ ফিল্মে মানুষের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সেখানে কতিপয় ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। তাদের সঙ্গে আমি অধমও নিয়ত করলাম, চলো আমরা তারকা সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে আসি। কেননা, আল্লাহপাক কুরআনে বলেছেন–

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ

'তারা তারকা দেখে পথের দিশা পেত।'[৮৮]

---

৮৮. সূরা নাহ্‌ল : আয়াত ১৬

আমরা চার-পাঁচজন মিলে সেখানে গেলাম। সেখানে গিয়ে এক অদ্ভুত বিষয় দেখতে পেলাম। আমাদেরকে যে কামরায় বাসানো হয়েছিল, তার ছাদ আকাশের মতো গোলাকার করে নির্মাণ করা হয়েছে এবং তাতে চাঁদ ও তারা স্থাপন করা হয়েছে। সেগুলো বাস্তব চাঁদ-তারার মতো দেখায়। এ ছবি নির্মাণে তাদের দুটি উদ্দেশ্য ছিল। এক. দিক পরিচয় করা। দুই. সময় নির্ধারণ করা। মনে করুন, যদি কেউ রাতের অন্ধকারে কোনো মরুভূমিতে অবস্থান করে, যেখানে দিক নির্ণয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই এবং সময় বোঝার কোনো উপায় নেই, তখন ওই ব্যক্তি নিজের রাস্তার দিক এবং সময় কীভাবে নির্ণয় করবে? তারা অত্যন্ত আশ্চর্য নির্দেশনা দিয়েছে যে, যদি কোনো লোক এভাবে দাঁড়ায়, তাহলে সে দিক নির্ণয় করতে পারবে। এমতাবস্থায় তার এদিকে পূর্ব, সেদিকে পশ্চিম, ওদিকে উত্তর, সেই দিকে দক্ষিণ। আরও বলেছে, যদি ওই তারকাটি এখানে আসে, তাহলে রাত অর্ধেক হয়েছে। আর সেই তারকা ওখানে এলে রাত ভোর হয়েছে ইত্যাদি।

বন্ধুগণ! ভেবে দেখুন! পৃথিবীতে যখন ঘড়ি ছিল না, তখন আমাদের পূর্ব পুরুষগণ তারকার মাধ্যমেই দিক ও সময় নির্ধারণ করতেন। আর বর্তমানে সে বিষয়টি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করে দিয়েছে।

তারা একটি আশ্চর্য কথা বলেছে যে, আকাশের সমস্ত তারকা চলমান। তবে একটি তারকা তার নিজ স্থানে স্থির থাকে। তারা বলল, আমরা যদি এ ফিল্মের স্পীড বাড়িয়ে দিই, তাহলে তোমরা আসমানকে অতি নিকটে দেখতে পাবে। আমরা বললাম, তাহলে স্পীড বাড়িয়ে দাও। সামান্য বাড়িয়ে দেওয়ার পর আমরা দেখলাম, একটি তারকা তার স্বস্থানে চমকাচ্ছে আর অন্যান্য তারকারাজি তার চার পাশে তাওয়াফ করছে। দেখে আমাদের সাথের একজন আলেমকে বলতে লাগলাম, ভাই! যদি এ তারকার অবস্থা সত্য হয়, তাহলে অবশ্যই এর ওপর বাইতুল মা'মুর এবং নিচে কা'বা শরীফ রয়েছে। আর মধ্যখানে যে আল্লাহপাকের জ্যোতি রয়েছে, তা হচ্ছে এই তারকাটি। আর যদি বাস্তব এমনই হয়ে থাকে, তাহলে বলা যায়, ওপরে ফেরেশতারা তাওয়াফ করে এবং নিচে মানুষ তাওয়াফ করে। আর মাঝখানে তারকাসমূহ তাওয়াফ করে। বন্ধুগণ! বাস্তবতা এ-রকমই। আর সবাই সেই মোমবাতির পতঙ্গ। কোনো কবি বলেন–

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ● اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے

আমরা, তোমরা আর যত নেতারা, সবাই তার বন্দি খাচায় ধরা।

যেসকল বস্তুর দ্বারা অন্তর তুষ্ট হয় না

ওলামায়ে কেরাম বলেন, এমন কিছু জিনিস রয়েছে, যার দ্বারা মানুষের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। উদাহরণস্বরূপ-

১. আকাশ : আকাশ আমরা প্রতিদিন দেখি। আবার, মেঘ, চাঁদ, সুরুজ, তারকা ও নীলিমা ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিদিন দেখেও এতে আমাদের আরও দেখার আগ্রহ জাগে। তুমি কোনো দিন এমন কোনো বান্দা পাবে না, যে বলতে পারবে, আকাশ দেখে-দেখে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি; আর দেখতে ইচ্ছে হয় না। বরং সবাই ঝিলিমিলি তারকার চিত্তাকর্ষী দৃশ্য দেখার পর আল্লাহর প্রসংশায় তারা পঞ্চমুখ হয়।

২. পানি পান করা : পানি পান করে মানুষের মন ভরে না। শত বছরের বৃদ্ধও পানির সন্ধানে থাকে। সে-ও পানি পান করে। তুমি কি এমন কোনো লোক পাবে যে, সে পানি পান করতে-করতে পরিশ্রান্ত হয়েছে?

৩. কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত : আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এমন জোশ দিয়েছেন যে, যেব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াতের মহ্ববত অর্জন করতে পেরেছে, তার হৃদয় কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত হয় না। তবে এ স্বাদ সবাই অর্জন করতে পারে না। এ সৌভাগ্য তারাই অর্জন করতে পারে, যাদের অন্তর ব্যাধি থেকে মুক্ত। তারা বারবার পড়তে থাকে। যত পড়ে তত আগ্রহ বাড়ে। প্রচণ্ড গরমে মরুভূমির পথিক যেমন ঠান্ডা পানি পেলে অতিশয় আগ্রহ ও আবেগের সাথে পান করতে থাকে, তেমনিভাবে আল্লাহর নেক বান্দাগণ কুরআন পড়তে থাকেন। হাফেজ ও কারী সাহেবগণ সারাজীবন কুরআন পাঠ করেন। পড়ান, শোনেন, শোনান। তারা প্রত্যেক দিন কুরআনের নতুন স্বাদ উপলব্ধি করেন। তুমি পৃথিবীতে এমন কোনো লোক পাবে না, যদি তার বিবেক ঠিক থাকে, তাহলে বলবে, কুরআন পড়তে-পড়তে আমার পেট ভরে গেছে; আর পড়তে মন চায় না।

৪. বাইতুল্লাহ শরীফ দেখা : বাইতুল্লাহ শরীফ দেখে মানুষের অন্তর ভরে না। যেব্যক্তির কা'বা শরীফ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, সে একথা ভালো করেই জানে যে, মানুষ যখন কা'বা শরীফের দিকে তাকায়, তখন যত বেশি দেখতে থাকে, ততই তার সৌন্দর্য আরও প্রস্ফুটিত হতে থাকে। বসে-বসে সেটাই দেখতে থাকে। সেখানে শুধু নূর আর নূর। সেখানের দৃশ্য এমন আকর্ষণীয় এবং আশপাশ এমন মনোরম হয় যে, তথায় গিয়ে মানুষ সারা দুনিয়া ভুলে যায়। সেটা যেমন অন্য জগৎ মনে হয়। কোনো বাদশাহর

দরবার যেমন বিলাসপূর্ণ হয়, তেমনি সেখানেও অতিশয় জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্য দেখা যায়। তবে সবাই দেখতে পায় না– দৃষ্টিবানগণ দেখতে পারেন। কোনো কবি বলেন–

آنکھ والا ترے جوبن کا تماشا دیکھے
دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

দৃষ্টিবান লোক তোমার যৌবনে কারিশমা দেখবে,
প্রতিবন্দী লোক তোমার সৌন্দর্য কী দেখবে।

মানবিক অন্তরের চুম্বক

তুমি পৃথিবীতে লৌহচুম্বক দেখে থাকবে। তার বৈশিষ্ট্য হলো, সে যেখানেই থাকবে লোহাকে নিজের দিকে টেনে নেবে। লোহা নিকটে এসে তার সাথে মিলে যায়। তুমি যদি মানুষের অন্তরে চুম্বক দেখতে চাও, তাহলে কা'বা শরীফকে দেখে নাও। সেটা দেখার জন্য সবার হৃদয়ে টান সৃষ্টি হয়ে যায়। কী পুরুষ, কী নারী, কী ধনী, কী গরিব, কী যুবক কী বৃদ্ধ সবাই তার জন্য পাগল পারা হয়ে যায়।

যাকেই তুমি জিজ্ঞাসা করবে, কাবা শরীফের কাছে যাওয়ার সুযোগ হোক বা না হোক দেখার জন্য অন্তরে অস্থিরতা থাকবেই। সে নির্জনে কেঁদে-কেঁদে আল্লাহপাকের দরবারে দু'আ করতেই থাকবে, হে আমার মালিক! আমাকে তোমার ঘর দেখার তাওফীক দাও। আমি যেন তোমার ঘর তাওয়াফ করতে পারি। তারা কতই-না ভাগ্যবান, যারা এহরামের কাপড় পরে বের হয়। لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ বলতে থাকে। কেউ তোমার ঘর প্রদক্ষিণ করে, কেউ মাকামে ইবরাহীমে সেজদা করে। কেউ কা'বার গেলাফ ধরে প্রার্থনা করে। কেউ মুলতাযামে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। আমি যেন আমার প্রতীক্ষিত বাসনা পূর্ণ করতে পারি।

যে সৌভাগ্যবান সেখানে যায়, সে পিছিয়ে থাকে না। সে মসজিদে হারামে অবশ্যই পৌঁছে তাওয়াফের জায়গায় আসে। তাওয়াফ করে। তাওয়াফ করতে-করতে শেষ পর্যন্ত মুলতাযামের সাথে মিলে যায়।

হাদীছ শরীফে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুলতাযামের সাথে এভাবে মিশে যেতেন যেমন দুধপানকারী শিশু মায়ের বুকের সাথে মিশে থাকে। কা'বা শরীফ দেখলে অন্তরের এক বিস্ময়য়কর অবস্থার আবির্ভাব ঘটে।

ইসলাম গ্রহণের একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা

আমেরিকার একটা জায়গা সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে, এখানে একজন ভদ্র মহিলা থাকেন, তিনি আগে ইহুদি ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বর্তমানে মুসলমান। একেবারে খাঁটি মুসলমান। তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে নামায আদায় করেন। নামায আদায় করার সময় তিনি নামাযে ডুবে যান। গুরুত্বের সাথে উজু করেন। তারপর নামাযের জন্য নির্ধারিত কাপড় পরিধান করেন। তারপর অতি গুরুত্বসহকারে নামাযের রুকনগুলো আদায় করেন। এমনকি মুসলমান মহিলারা তাকে দেখে আক্ষেপ করেন এবং সঠিকভাবে ইসলামের বিধান পালন করতে সচেষ্ট হন।

আমাকে বলা হলো, তিনি কিছু মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতে চান। আমি বললাম, ভালো। তিনি পর্দার আড়ালে থেকে ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করলেন। মাসআলা জানতে শুরু করলেন। তিনি প্রায় দুঘন্টা পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে বড়-বড় প্রশ্ন করলেন। বাস্তবে তার অন্তরে ইল্‌ম হাসিল করার অভিপ্রায় ছিল। পরস্পর আলোচনার এক ফাঁকে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার জন্য ওই মুহূর্তটা কেমন ছিল, যখন আপনার হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে আপনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন?

তিনি বলতে লাগলেন, আমার স্বামী জেদ্দায় চাকরি বরতেন। আমিও তার সঙ্গে থাকতাম। এর আগে আমরা আমেরিকায় এক অফিসে চাকরি করতাম। কর্তৃপক্ষ বললেন, আমরা জেদ্দায় একটি শাখা চালু করেছি। যদি কেউ স্বেচ্ছায় সেখানে যান, তাহলে বেতনও বৃদ্ধি করা হবে আর ডিউটিও কম হবে। এ সুবাদে তার আরেকটি দেশ ভ্রমণ করার সুযোগও হয়ে যাবে। আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজন সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। এভাবেই আমরা জেদ্দায় চলে গেলাম। আমি ইহুদি ধর্মের এবং আমার স্বামী খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন। সেখানে আমি কিছু সাদা পোশাক পরিহিত কিছু লোকদের দেখলাম, তারা যেন কোথায় যাচ্ছেন। কখনও প্রাইভেট কারে, কখনও বাসে। তাদের দেখে আমি কিছু হতাশা হলাম যে, এভাবে তারা কোথায় যাচ্ছে।

আমি তাদের ব্যাপারে আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এখানে মুসলমানদের কা'বা শরীফ বিদ্যমান। তারা সেখানে যায়। একবার আমার অন্তরে এ আবেগ সৃষ্টি হলো যে, আমরা একবার গিয়ে তাদের কা'বা শরীফ দেখছি না কেন? তিনি উত্তর দিলেন, সেখানে মুসলমান ব্যতীত কেউ

যেতে পারে না। আমি বললাম, আমরা যদি যেতে না পারি তবে চেষ্টা তো করতে পারি। হতে পারে, আল্লাহপাক আমাদের সুযোগ করে দেবেন। সে বলতে লাগল, পরের দিন। আমি মুসলমান মহিলাদের মতো একটি রুমাল নিয়ে মাথায় দিলাম এবং আমার স্বামীও মাথায় একটি টুপি পড়লেন। তারপর আমরাও সেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

আল্লাহর কুদরতের ফয়সালা ছিল। তখন ট্রাফিক পুলিশ খাবার খাচ্ছিল। তারা একজনকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল চেক করার জন্য। ট্রাফিক অনেক ছিল। কিন্তু চেক করার জন্য মাত্র একজনকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। সময় ছিল রাতের বেলা। সুতরাং ওই লোকটি দূর থেকে মানুষদের চলে যেতে ইশারা করতে লাগল। এভাবেই আমরাও ট্রাফিক পয়েন্ট পার হয়ে পবিত্র মক্কা শরীফে পৌঁছে গেলাম। লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম, মুসলমানদের কা'বা শরীফ কোথায়? লোকেরা হেরেমের প্রতি ইশারা করে বলল, এখানেই! আমরা হেরেমে প্রবেশ করলাম। হাঁটতে শুরু করলাম। যখন মাতাফে পৌঁছলাম, তখন আমরা কা'বা শরীফের প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম। আমরা সেখানে এত বরকত, এত রহমত ও এ পরিমাণ নূর দেখতে পেলাম যে, আমাদের উভয়ে দৃষ্টি কা'বা শরীফের সাথে চুম্বকের মতো আকর্ষিত হয়ে গেল। আমি কাদঁতে লাগলাম। আমার স্বামীও কাঁদতে শুরু করলেন। আমরা অনেকক্ষণ সেখানে কেঁদেছিলাম। আমাদের হৃদয়জগৎ পরিবর্তন হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আমরা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ স্থানের হাকীকত বুঝতে পেরেছ কি? আমরা উভয়ে জবাব দিলাম, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। সুতরাং সেই মুহূর্তেই আমরা কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। আমাদেরকে কোনো মুসলমান ইসলাম গ্রহণ করতে বলেনি। পবিত্র কা'বা শরীফ আমাদের মুসলমান বানিয়েছে।

সুবহানাল্লাহ! পৃথিবীতে এমন লোকও আছে, যারা একমাত্র কা'বা শরীফ দেখেই মুসলমান হয়েছে! ঈমানের মতো দৌলত তাদের নসিব হয়েছে।

মুলতাযাম-এর সম্মান

কা'বা শরীফের আশেপাশে ১৭টি স্থান রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে উপস্থিত হয়ে আল্লাহপাকের দরবারে দু'আ করলে আল্লাহপাক দু'আ কবুল করে থাকেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে মুলতাযাম। এ মুলতাযাম জড়িয়ে ধরে দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নেন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে দু'আ গ্রহণযোগ্য নয়, সেই দু'আ ওই স্থানে গেলে স্মরণই থাকে না। এ বিয়ষটি অনেকবার যাচাই করে দেখেছি। ভাবতে থাকি, এ দু'আ করব, ওই দু'আ করব। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর এ দু'আ আর মনে থাকে না।

আমার একজন ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু সেখানে গিয়ে দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ আমার ছেলেকে কুরআনের হাফেজ বানাও। তিনি বলেন, আমি ওমরাহর কাজ শেষ করে আমাদের আবাসস্থলে গেলাম। সেখানে গিয়ে দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে ফোন বেঁজে উঠল। রিসিভ করে দেখি, পাকিস্তান থেকে আমার স্ত্রী ফোন করেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, এমুহূর্তে কেন ফোন করেছ? আমার স্ত্রী জবাব দিল, অনেক দিন যাবৎ আমার আশা ছিল, ছেলেটিকে হাফেজ বানাব। আজ আমি ছেলেকে সেই উদ্দেশ্যে কারী সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে এসেছি। এই সংবাদটি দেওয়ার জন্যই আপনাকে কল করেছি। সুবহানাল্লাহ! এদিকে আমি সবে আল্লাহর দরবারে এ প্রার্থনাটিই করে এসেছি। আর সঙ্গে-সঙ্গে ওই দিকে তা বাস্তবায়নের সূচনা দেখা যাচ্ছে।

শায়খুল হাদীছ আল্লামা যাকারিয়া (রাযি.) ফাযায়েলে হজ নামক কিতাবে লিখেছেন, মুলতাযামে দু'আ করার যেসব হাদীছ রয়েছে, সেগুলো সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত ধারাবহিকভাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে। হাদীছগুলোর প্রত্যেক বর্ণনাকারী যেখানে দু'আ কবুলের কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে একথাও বলেছেন যে, এখানে দু'আ করলে তা কবুল হয়। এটা আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। প্রথমে এক বর্ণনাকারী বলেছেন, আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। তখন দ্বিতীয়জন এটা আবার যাচাই করেছেন। তিনিও বাস্তবে দু'আ কবুল হওয়ার প্রমাণ পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন– এ হাদীছের বর্ণনা যেমন ধারাবাহিক এসেছে। তেমনি এ হাদীছের বাস্তব প্রমাণের সত্যতাও ধারাবাহিক বর্ণনা হয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত বলেছেন, আমি এ কিতাবে এ হাদীছ লিপিবদ্ধ করছি। সাথে-সাথে স্বীকার করছি, আমিও এ হাদীছের বাস্তব প্রমাণ পেয়েছি। আমি মুলতাযাম জড়িয়ে ধরে দু'আ করেছি। আল্লাহ তা'আলা আমার দু'আ কবুল করেছেন। আল্লাহু আকবার!

মাশুকের স্মরণে গুঞ্জনের অনুমান

কা'বা শরীফের চতুর্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করাও একটি বিস্ময়ের বিষয়। বাতির চতুর্দিকে যেমন পতঙ্গরা ঘুরতে থাকে, তেমনিভাবে আল্লাহপাক বান্দাদের

জন্য এমন একটি ইবাদাত নির্ধারণ করেছেন যে, আমার ঘরের চতুর্পার্শ্বে মাতালের মতো ঘুরতে থাকো। এ ঘরের নিকটে আসার সময় সুসজ্জিত কাপড় পড়তে পারবে না। সেলাইবিহীন দুটি সাদা কাপড়ে আবৃত হয়ে যাও। যেভাবে মৃত মানুষ সাদা কাপড়ে আবৃত থাকে। এবার দুনিয়ার সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। যখন কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকার খোঁজে বের হয়, তখন হৃদয়ে থাকে দীর্ঘশ্বাস। মুখে থাকে প্রিয়তমের স্মরণে গুণগুণ শব্দের প্রেমসম্পর্কিত বাক্য। এজন্যই মুমিনদের বলা হয়েছে, তোমরা যখন এহরামের কাপড় পরিধান করে আসল মাহবুবের খোঁজে বের হবে, তখন এ গুঞ্জন করতে থাকবে–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

মানুষের অন্তরের ওয়াশিং মেশিন

একলোক আমাকে একদিন প্রশ্ন করল, জনাব! তাওয়াফের মাধ্যমে এই চক্কর দেওয়ার মানে কী? আমি বললাম, ভাই! এটি ইবাদাত। কিন্তু উত্তরটা তার মনঃপূত হলো না। পরে আমার মস্তিষ্কে একটি কথা এল। আমি একটু বাড়িয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। বললাম, তোমার ঘরে কি ওয়াশিং মেশিন আছে? সে বলল, আছে। আমি বললাম, কাপড় ময়লা হলে কী কর? সে বলল, ওয়াশিং মেশিনে রেখে কয়েকবার ঘুরিয়ে দেই। তারপর বের করলে কাপড় পরিষ্কার হয়ে যায়।

আমি বললাম, ভাই! আল্লাহপাক মানুষের অন্তরের ময়লা পরিষ্কার করার জন্য ওয়াশিং মেশিন বানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহপাক বলেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা দুনিয়াতে থেকে অন্তর কালো করে ফেল। সৃষ্টির ভালোবাসার প্রতি ধাবিত হয়ে যাও। দুনিয়াদারিতে বন্দি হয়ে যাও। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে নোংরা অন্তর নিয়ে আস। সুতরাং যখন আমার ঘরে আসবে, তখন সাতটা চক্কর দাও; আমি তোমাদের ধৌত করে বের করব। সুবহানাল্লাহ!

হজের হেকমত

এখন হজ ফরজ করার কিছু হেকমত শুনে নাও। মুমিন বান্দা কালেমা পাঠ করে আল্লাহপাকের সাথে ভালোবাসার দাবি করে। ফলে আল্লাহপাক বান্দাদের পরীক্ষা করার কৌশল অবলম্বন করলেন। প্রথমে যদি তার কাছ

থেকে মালের পরীক্ষা নেওয়া হয়, তখন অনুমান করা যাবে, সে তার প্রিয়তমের নির্দেশে মাল খরচ করতে আগ্রহী কি-না।

সুতরাং বান্দাদের যাকাত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা ধনী, তারা যাকাত দেবে। সুতরাং যারা যাকাত আদায় করবে, তারা যেন প্রথম পত্রের পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেল। তারপর আল্লাহপাক তার থেকে দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা নিতে রমযানে রোযার নির্দেশ দিয়েছেন, যার দ্বারা আল্লাহপাক শারীরিক পরীক্ষা নেন। আল্লাহপাক যেন একথা বলতে চান যে, হে আমার বান্দারা! তোমরা যাকাত দিয়ে সম্পদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। এবার কিছু সময় খানাপিনা বন্ধ রেখে দৈহিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও। সুতরাং যে বান্দা রমযানের রোযা ঠিক মতো রাখল, সে যেন দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায়ও পাশ হয়ে গেল।

সাধারণ নিয়ম হলো, যখন কেউ পরীক্ষায় সুনামের সাথে পাশ করে, তখন সে বিভিন্ন পুরস্কার পায়। এইমর্মে আল্লাহপাক তার ঘরের দিকে বান্দাদের ডাকেন। এসো তোমাদের পুরস্কার নিয়ে যাও। সুতরাং রমযান শেষ হওয়ার সাথে-সাথে হজের মৌসুম শুরু হয়ে যায়। তাই কেউ যদি ঈদের আগের দিনই ইহরাম বাঁধতে চায়, তাহলে বাঁধতে পারবে। এখন যে দিন অতিবাহিত হচ্ছে হজেরই মৌসুম। এখন তো হাজী সাহেবগণ হজে যাওয়া শুরু করে দিচ্ছেন। খোদাপ্রেমিকরা বিভিন্ন শহর ও দেশ থেকে যাওয়া শুরু করেছেন। কেউ বিমানে, কেউ জাহাজে চড়ে যাচ্ছেন।

এই সুযোগ যেহেতু বছরে একবার আসে তাই এই সুযোগ সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি। বান্দা যখন হজের সফরে বের হয়ে যায়, তখন আল্লাহপাক বলেন, এবার তোমরা সুসজ্জিত সকল পোশাক খুলে ফেলো। ধনী, গরিবের বৈষম্য দূর করে দাও। রাজা-প্রজা সবাই এরকম হয়ে যাও। তোমরা সবাই আমার কাঙাল। সুতরাং দুই কাপড়ে আবৃত হও। 'তালবিয়া' পাঠ করতে-করতে আমার ঘরের দিকে অগ্রসর হও। তাই মানুষ আল্লাহর ঘরের দিকে যায় এবং সেখানে গিয়ে তাওয়াফ করে। সায়ী করে হজের বিধানসমূহ পালন করে।

হজের সফরে কষ্টের এক ঝলক

আমাদের বুযুর্গগণ অত্যন্ত কষ্টের মাধ্যমে হজের সফর করতেন। বর্তমানে তো অনেক সহজ হয়েছে। জেদ্দা পৌঁছার পর এয়ারকন্ডিশন গাড়িতে চড়ে এয়ারকন্ডিশন রুমে পৌঁছে যায়। শুধু সড়কপথটি এয়ারকন্ডিশন

করা হয়নি। বাকি সবকিছুতে তাপানুকুল ব্যবস্থা হয়ে গেছে। মসজিদও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

আমাদের ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, আমরা যখন জাহাজের মাধ্যমে হজ করতে যেতাম, তখন জাহাজ নোঙর করার পর মাসের-পর-মাস অপেক্ষা করতে হতো। বর্তমানে বিমান থেকে নামার পর দুই তিন ঘন্টার মধ্যেই বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে মক্কায় যাওয়া যায়। তারপর জেদ্দা থেকে আবার উটের পিঠে চড়ে মক্কায় যেতে হতো। কয়েকবার তো উটও ভাড়া করতে পাইনি। নিজের মালপত্র উটের মধ্যে রেখে আমরা পায়ে হেঁটে মক্কায় যেতাম। পাহাড়ি রাস্তা। একবার পাহাড়ে উঠতে হতো আবার নামতে হতো। বর্তমানে তো পাহাড় কেটে সমতল রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। মাত্র এক ঘন্টায় জেদ্দা থেকে মক্কায় পৌঁছা যায়। হযরত বলেন, পানাহারের বস্তু, উজু-গোসলের পানি সঙ্গে রাখতে হতো। কারণ, রাস্তায় কোনো পানি পাওয়া যেত না। কত কষ্ট হতো। সহজ তো এখন হয়েছে। আগেকার যুগে হজের সফর খুবই কষ্টকর ছিল।

কেমন দরিদ্র দেশ ছিল

তৎকালীন যুগে আরবের অধিবাসীরা অসহায়ত্বের জীবন যাপন করত। যুগপৎ আল্লাহ তা'আলা সেখানে তেল ও স্বর্ণের খনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। যার কারণে তারা স্বচ্ছলতা পেয়েছে। প্রথম যুগে তাদের জীবন এমন দুর্বিষহ ছিল যে, আমাদের পীর-মুরশিদগণ একবার মক্কা থেকে মদীনায় যাচ্ছিলেন। পথে এক জায়গায় তাঁবু স্থাপন করলেন। আচমকা একবৃদ্ধ আরব কোথা থেকে এসে ইশারা করে বলছে, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। আমাকে কিছু খাবার দাও। হযরত তাঁর বিবিকে বললেন, ওই লোকটিকে খাবার বানিয়ে দাও। তিনি আটা বের করলেন, যাতে খামির তৈরি করে রুটি বানানো যায়। ওই বৃদ্ধ লোকটি কাঁচা আটা দেখামাত্রই ক্ষুধার তাড়নায় ঠিকে থাকতে না পেরে একটি পানির পাত্র হাতে নিয়ে ওই কাঁচা আটাকে মাটিতে রেখে পানি দ্বারা মিশিয়ে খেতে শুরু করছে আর বলছে, রুটি পাকানো পর্যন্ত সময় আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। আরও দেখা যায়, হাজী সাহেবরা ফল খেয়ে ছিলকা নিক্ষেপ করলে স্থানীয় শিশুরা সেগুলো উঠিয়ে নেওয়ার জন্য পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যেত। এটা ১৯৬০ খিস্টাব্দের পূর্বের ঘটনা।

একটি শিশুর অন্তরে কা'বা শরীফের মহব্বত

হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) একটি অপূর্ব ঘটনা শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমরা হারাম শরীফে অবস্থানকালে একটি শিশু মাঝে-মাঝে আমাদের তাঁবুর কাছে আসত। আমরা তাকে রুটি দিতাম। সে খুশি মনে চলে যেত। সে বারবার আসার দরুন তার প্রতি আমাদের মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যায়। সে আমাদের প্রতি দুর্বল হয়ে যায়। যখন সেখানে আমাদের অবস্থান পূর্ণ হয়ে যায়, তখন আমরা অন্যত্র যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী ওই ছেলেটিকে ডেকে বললেন, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে? গেলে আমরা তোমাকে নিয়ে যাব। সে বলল কোথায়? আমার স্ত্রী বললেন, আমাদের দেশে। সে বলল, সেখানে কী আছে। আমার স্ত্রী বললেন, সেখানের আবহাওয়া খুবই মনোরম, সময়মতো খাবার পাবে, পানি পাবে, তোমার কোনো কষ্ট হবে না। কোনো অভাব থাকবে না। ভালো পোশাক পাবে। মোটকথা, সব ধরনের ব্যবস্থাপনা থাকবে। তিনি অত্যন্ত আদরের সাথে ছেলেটিকে এসমস্ত কথা বললেন। ছেলেটি গভীর মনোযোগ কথাগুলো শুনে জবাব দিল। সে কা'বা শরীফের দিকে ইশারা করে বলছে, আপনাদের দেশে কী এ ঘরও আছে? আমার স্ত্রী বলল, না; সেখানে এ ঘর নেই। ছেলে বলল, সেখানে যদি এ ঘরটি না থাকে, তাহলে আর সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, আমি তো একমাত্র এঘরের প্রতিবেশিত্ব চাই। আল্লাহু আকবার!

মহব্বতে পাগলপারাদের ভাগ্যেই হজ নসিব হয়

হজের সম্পর্ক মানুষের ভালোবাসার সঙ্গে। শুধু সম্পদের মাধ্যমেই যদি হজ করা যেত, তাহলে এ পৃথিবীর সকল ধনাঢ্য ব্যক্তি হাজী হয়ে যেত।

অধিকাংশ সম্পদশালীদের কপালে এ সৌভাগ্য জোটে না। এমনও লোক আছে, যারা প্রতিদিন এখন থেকে টিকিট করে গিয়ে ওমরাহ করে আসতে পারবে। বোঝা যায়, তারা বছরে তিনশত পয়ষট্টিটি ওমরা করতে পারবে; কিন্তু তাদের সারা জীবনেও একবার বাইতুল্লাহর যিয়ারত নসিব হয় না। পক্ষান্তরে চিন্তা করলে দেখা যায়, অনেক নিঃস্ব মানুষ কষ্ট করে টাকা জমা করে অন্তরের গভীর ভালোবাসার বিনিময়ে হজ করে আসেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আল্লাহপাকের দরবারে এ সফরের আবদার করে থাকেন। আল্লাহ তাদের কোনো প্রকার উপকরণ ব্যতীত হজের মতো সৌভাগ্য উপহার দেন।

একজন দুধবিক্রেতার প্রকৃত আবেগ

জামেয়া আশরাফিয়াতে একজন বুযুর্গ ছিলেন হযরত মাওলানা ইদরীস কান্দলভী (রহ.) তিনি পবিত্র কুরআন শরীফের তাফসীর লিখেছেন 'মা'আরীফুল কুরআন'। তিনি একটি ঘটনা শোনাতেন। তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তার ঘটনাটি আমিও তোমাদের শোনাতে সাহস করেছি।

লাহোরে এক গোয়াল ছিল। তার অন্তরে হজ করার প্রবল আগ্রহ ছিল। তাই লোকজন হজ থেকে এলে সে অত্যন্ত আবেগের সাথে হজের সফর সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করত। এমনকি হজের মৌসুমে মানুষদের জিজ্ঞাসা করতে লাগল, মানুষ হজে কিভাবে যায়। একজন বলল, মানুষ করাচি থেকে হজে যায়। এবার সে লোকজনদের জিজ্ঞাসা করতে লাগল, করাচি কীভাবে যেতে হবে। কেউ বলে দিল, স্টেশন থেকে যেতে হয়। কোথায় থেকে স্টেশন যাওয়া যায়। কোনো ব্যক্তি তাকে স্টেশনে পৌঁছে দিল। এখন স্টেশনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, আমি করাচি যেতে চাচ্ছি; কীভাবে যাব। সে কয়েকদিন পর্যন্ত লাহোর স্টেশনে ঘোরাফেরা করল।

শেষ পর্যন্ত ট্রেনের এক কন্ডাক্টর বুঝতে পারল, লোকটি কয়েকদিন যাবৎ করাচি যাওয়ার চেষ্টা করছে; তাকে একটু সাহায্য করা প্রয়োজন। টিটি বলল, তুমি আমার সঙ্গে বসে যাবে; আমি তোমাকে করাচি নিয়ে যাব। এভাবে সে করাচি চলে গেল।

করাচি স্টেশনে পৌঁছে সে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, আমি হজে যেতে চাই; কীভাবে যেতে হবে। কেউ তাকে হাজীক্যাম্প দেখিয়ে দিল। সে ওখানে চলে গেল। সেখানে লোকসমাগম খুব বেশি ছিল। মানুষ প্রতিদিন উঠতে দেখত। তখন তার মহব্বতের সাগরের উত্তাল ঢেউ প্রবল হতো। যদিও তার কাছে পথের কোনো খরচ নেই। না টিকিট আছে, না পাসপোর্ট আছে, না টাকা-পয়সা আছে। কিন্তু তার অন্তরে হজ করার জন্য সত্য ভালবাসা ছিল। সুতরাং সে ওখানেও বলতে লাগল, আমি হজে যেতে চাই, আমি হজে যেতে চাই।

একদিন তার মনে একটি চিন্তা এল, হাজীদের মালপত্র বহনকারী কুলিদের পরিচয়পত্র থাকে। তাতে তারা জাহাজে ওঠার অনুমতি থাকে। সুতরাং কোনো কুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। তাই সে এক কুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব জমাল। তাকে বলল, ভাই আপনার অনুমতিপত্রটি আমাকে দিন। আমি হাজীদের মালপত্র উঠিয়ে দেব। মালপত্র উঠানো শেষ হলে আমি তোমার

অনুমতিপত্র তোমাকে দিয়ে দেব। আর এতে আমারও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে। সুতরাং সেই কুলি তার পরিচয়পত্রটি দিয়ে দিল এবং এই গোয়াল বেচারা মালপত্র উঠানোর বাহানায় জাহাজে আসা-যাওয়া করছে। যখন মালপত্র উঠানো শেষ হলো, তখন কুলির পরিচয়পত্রটি তাকে দিয়ে সে জাহাজের ভেতরে আত্মগোপন করল। জাহাজে হাজার-হাজার মানুষ থাকে। কে কাকে চেনে। তার অন্তরে হজের জন্য এমন আবেগ ছিল যে, আল্লাহপাক তাকে পাসপোর্ট, টিকিট ব্যতীতই জোশের ঘোড়ায় সাওয়ার করে তাঁর ঘরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। লোকজন বিছানা বিছিয়ে বিশ্রাম করছে। আর ওই বেচারা বসে-বসে অপেক্ষার প্রহর গুনছে।

তারপর সে জাহাজে এক লোকের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ল এবং বলল, ভাই! জেদ্দা এলে আমাকে জানাবেন। যখন জেদ্দার আলোকসজ্জা দৃষ্টিগোচর হতে লাগল আর জাহাজ বন্দরের নিকটবর্তী হয়ে গেল, তখন ওই লোক বলল, এই যে ভাই! তাকিয়ে দেখো, আমরা জেদ্দায় পৌঁছে গেছি। এমন সময় ওই ব্যক্তি দেখল, সেই যুবক জাহাজের ছাদের ওপর উঠে গেছে এবং দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে সমুদ্রে পড়ে গেছে। পড়ার পর সে আর ওঠেনি। হয়তবা সে সাঁতার জানত না। ওই লোক যখন দেখল, যুবক আর ওপরে ভাসছে না, তখন বুঝে গেল, লোকটি সাগরে ডুবে গেছে। পরে এটাই মনে করল যে, লোকটির এমন অবস্থা হওয়া আল্লাহপাকেরই ইচ্ছা ছিল। আর ভেবে লাভ কী।

বন্ধুগণ! লোকটি মক্কায় গিয়ে হজের কাজ সমাধা করে হারাম শরীফ থেকে বের হচ্ছে। সম্মুখপানে তাকিয়ে সে আশ্চর্য এক দৃশ্য দেখে অপলক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। কী সেই দৃশ্য? আল্লাহপাকের কী কারিশমা! সে কী দেখল? দেখছে তার সামনে দিয়ে একটি লোক হারাম শরীফ থেকে বের হচ্ছে। সেই লোকটি হচ্ছে তার চোখের সামনে জাহাজের ছাদ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া সেই গোয়াল।

সুবহানাল্লাহ! আরবদের পোশাকপরিহিত সেই যুবককে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি ওই যুবক তো যে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে? সে বলল, হ্যাঁ, আমি সেই যুবক। তারা দুজন পরস্পর আলিঙ্গন করার পর লোকটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপারটা খুলে বলুন। সে বলল, সামনে চল; একটু পরে বলছি। লোকটি তার সাথে গিয়ে দেখল, সামনে একেবারে নতুন একটি গাড়ি; ড্রাইভার তার অপেক্ষা করছে। গোয়াল সোজা গিয়ে গাড়িতে

বসে গেল। লোকটিও তার সাথে গাড়িতে উঠল। ড্রাইভার তাদের নিয়ে একটি বাড়িতে গেল। সে দেখল, এ বাড়িটা ও নবনির্মিত এবং ঝকঝক করছে। ভেতরে গিয়ে দেখল, মনোরম পরিবেশ, সুসজ্জিত কামরায় যেন তার জন্যই সাজিয়ে রাখা হয়েছে। গোয়াল যুবক তাকে একটি কামরায় বসিয়ে চাকরদের বলল, মেহমানের জন্য নাস্তা নিয়ে এস। ভৃত্য অতিশয় সুস্বাদু পানীয় এবং ফল নিয়ে এল। লোকটি অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ভাই ঘটনা কী? সে বলল, কাহিনি পরে বলছি। আগে শোনো, এখানে যা দেখছ, গাড়ি, বাড়ি, ড্রাইভার, চাকর সবকিছুই আমার। সে আরও অবাক হয়ে বলল, ভাই এগুলো তুমি কীভাবে পেলে? বলতে লাগল, ভাই! এটা অত্যন্ত রহস্যময় বিষয় তুমি আমার অপরিচিত লোক হওয়াতে আমি তোমাকে বলছি।

ভাই! আমার হৃদয়ে আল্লাহর ঘর দেখার খুব আগ্রহ ছিল। যখন জেদ্দা পৌঁছলাম, তখন বললাম, হে আল্লাহ! আমি তোমার ঘর দেখার জন্য এসে গেছি। এবার আমাকে তোমার কাছে সোপর্দ করে দিলাম। একথা বলেই আমি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমি সাঁতার জানতাম না। এমনিতেই হাত-পা মারতে লাগলাম। ফলে সাগরের ঢেউই ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে আমাকে বন্দরের দিকে নিয়ে এল। আমার ভেতরে পানি ঢুকে যাওয়াতে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। বন্দরে পৌঁছার পর সামান্য হুঁশ এল। এ অবস্থায় বাইরে বের হয়ে অচেতন হয়ে শুয়ে গেলাম। তাহাজ্জুদের সময় আমার ঘুম ভাঙল। তখন এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখি, বাইরে যাওয়ার সকল রাস্তা বন্ধ। বন্দরের সাথে গ্রিল লাগানো ছিল। আমি এখানেই বসে গেলাম।

কিছুক্ষণ পর দেখলাম, গ্রিলের অপর পার্শ্বে সুন্দর একটি বালাখানা। এর আঙিনায় একটি গাভি বাঁধা রয়েছে। সকালে দুজন লোক গাভিটা দোহন করতে এল। তারা দোহন করতে চাইলে গাভি তাদের পোষ মানছে না। তারা বসতে চাইলে গাভি তাদের বসারই সুযোগ দিচ্ছে না। গাভি নিয়ে তারা অত্যন্ত বিপদে পড়েছে। একজন ধরে আরেকজন দোহন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু গাভি অন্য দিকে চলে যায়। প্রায় আধা ঘন্টা তারা গাভির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করল; কিন্তু দোহন করতে পারল না। আমি এ দৃশ্য দেখে আক্ষেপ করলাম। আমার কাজই তো এটা ছিল। সুতরাং তাদের ইশারা করে বোঝাতে চাচ্ছি, আপনারা অনুমতি দিলে আমি গাভি দোহন করে দেব। তারা তো আরবী ভাষার লোক; তাই ইশারাতে বুঝিয়ে দিলাম। তারা বলল, এসো। আমি বললাম, গ্রিল বন্ধ; আসতে পারছি না।

ভাই! আল্লাহপাকের কী অপার কৃপা, এই বালাখানাটার মালিকই ছিল এই বন্দরের ডাইরেক্টর। তার এক ছেলের জন্য ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিল, তাকে গাভির দুধ খাওয়াতে হবে। কারণ, তৎকালীন সময় তো 'ফিটারের মারও জন্ম হয়নি'। এ কারণেই সে তার ছেলের জন্য স্পেশাল একটি গাভি ক্রয় করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, গাভির ভেতরে তো দুধ আছে; অথচ গাভি দুধ বের করতে দিচ্ছে না। ফলে তারা স্বামী-স্ত্রী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল যে, সন্তান তো ঠিক মতো দুধ পাচ্ছে না। এবার আমি যখন বললাম, আমি গাভি দোহন করতে পারব, সঙ্গে-সঙ্গে তারা ডাইরেক্টরের কাছে গিয়ে সংবাদ দিল, ভেতরে একজন মুসাফির আছে; সে গাভি দোহন করতে পারবে। মালিক বলল, চাবি নিয়ে যাও; ওই লোকটিকে বের করে নিয়ে এসো। তারা গেইট খুলে আমাকে মালিকের কাছে নিয়ে গেল। আল্লাহর কুদরত। আমি গাভির গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু কথা বলতেই গাভি পোষ মেনে নিল। আমি নিচে বসে ইচ্ছামতো দোহন করলাম এবং প্রায় আট থেকে দশ কেজি দুধ দোহন করলাম।

ডাইরেক্টরের স্ত্রী দুধ দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল, আজ আমার ছেলে সারা দিন দুধ পান করতে পারবে। তারপর বলল, এ লোকটিকে যেতে দেবেন না। মালিকের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি উত্তর দিলাম, জনাব আমি পাকিস্তান থেকে হজের উদ্দেশ্যে এসেছি। তিনি বললেন, আমি তোমাকে যেতে দেব না। তুমি খুব ভালো দুধ দোহন করতে পার। আমি বললাম, ঠিক আছে আমি আপনার গাভির দুধ দোহন করে দেব। তবে আমাকে হজ করতে হবে। তিনি বললেন, তুমি কোনো চিন্তা করো না; আমি তোমার হজের ব্যবস্থা করব।

দ্বিতীয় দিন ডাইরেক্টরের স্ত্রী তার পিতাকে ফোন করে সম্পূর্ণ ঘটনা বল। তার পিতা আমার বিষয় শুনে আনন্দে বাগবাগ। কারণ, তার দুইশত গরু ও মহিষের ফার্ম ছিল। সে বলল, এরকম একজন লোক আমার অতি প্রয়োজন। পরে তিনি ডাইরেক্টর সাহেবকে ফোন করে বললেন, লোকটাকে আমার এখানে পাঠিয়ে দাও। তারপর ডাইরেক্টর সাহেব আমাকে তার গাড়িতে করে তার শ্বশুরালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তার শ্বশুর আমাকে বললেন, তুমি আমার এখানে থাকবে। সকাল-বিকাল আমার গাভি ও মহিষগুলো দোহন করবে। আমি এখানে রইলাম। সময়মতো তার পঁচিশ-ত্রিশটি গাভি ও মহিষের দুধ দোহন করে প্রায় মনখানেক দুধ তাকে দেই। সে অবাক হয়ে বলল, কী এ পরিমাণ দুধ দোহন করা যায়! তিনি বললেন, তুমি এখানেই থাকবে। আমি

তাকে বললাম, জনাব! আমাকে হজ করতে হবে। আমি হজের উদ্দেশ্যে এসেছি। বারবার তিনি সেখানে থাকতে বললেন। আমিও একই জবাব দিলাম যে, আমার হজ করতে হবে। তিন দিন পর্যন্ত এভাবে কথা চলল। তৃতীয় দিন তিনি বললেন, বেটা! আমি তোমাকে হজও করিয়ে দেব। তবে তুমি এখানেই থাকতে হবে। আমি বললাম, জনাব! আমি আগে হজ করি; বাকি আলোচনা পরে হবে। তিনি আমাকে হজ করালেন, হজ করে আমি তাকে বললাম, জনাব! আমার হজ করা হয়ে গেছে। এবার আমি বাড়িতে চলে যেতে চাই। তিনি বললেন, না তুমি এখানেই থাকতে হবে। আমি বললাম, জনাব! দেশে আমার বিবি-বাচ্চা আছে। তিনি বললেন, চিন্তা করো না। আমি একটি নতুন বাড়ি বানিয়েছি। সে বাড়ি আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। এটা আমার নতুন গাড়ি; তাও তোমাকে দিলাম। তাই ড্রাইভারও তোমাকে দিলাম। এবার তোমার স্ত্রী-পুত্রের নাম ঠিকানা বলো, আমি সংবাদ পাঠাচ্ছি; আগামী জাহাজে তোমার বিবি-বাচ্চারা আসবে। তারপর একটি কেন প্রতি বছর হজ করতে থাকবে।

ভাই! আগামী এক সপ্তাহের ভেতরে আমার স্ত্রী-সন্তানরা আমার কাছে পৌঁছে যাবে। আমি হজ করে নিলাম। বাড়ি পাইলাম। গাড়ি পাইলাম। আল্লাহপাকের ঘর দেখার বরকতে আল্লাহপাক আমাকে দুনিয়ার অসংখ্য নেয়ামত দান করছেন। এখন আমি এখানেই থাকব; প্রতি বছর ইনশাআল্লাহ বাইতুল্লাহ শরীফ যেয়ারত করব।

বন্দুগণ! ওই গোয়াল তো আমাদের চেয়ে অনেক উত্তম। সে দুধ দোহনের বরকতে বাইতুল্লাহ শরীফ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সত্যিকারের ভালোবাসা থাকলে উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় হয়।

হযরত মাদানি (রহ.)-এর সত্যিকারের জযবা

হযরত হুসাইন আহমদ মাদানি (রহ.) সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁর হজের সফরের কোনো উপকরণ ছিল না। কিন্তু আবেগ ছিল, আমি হজে যাব। যিলহজ মাস শুরু হলে তিনি প্রতিদিন খাওয়ার সময় আফসোস করতেন, হায়! আল্লাহর কত বান্দা হজ করতে গেছে আর আমি এখানে পড়ে আছি। একথা স্মরণ করলে তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ইচ্ছা হতো না। রাতে ঘুম আসত না। বারবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতেন, জানি না আশেকরা এখন কী করছেন। অর্থাৎ– যারা হজে যায়, তাদের আশেক এবং আল্লাহকে মাশুক বলা হয়। তিনি বারবার বলতেন। হয়তবা কেউ গেলাফ ধরে মাশুকের কাছে

প্রার্থনা করছে। কেউ মুলতাযাম জড়িয়ে ধরে আল্লাহর সামনে আহাজারি করছে। যিলহজের দশ দিন তাঁর জন্য খুবই কষ্টকর হতো। তাঁর সেই জযবা আল্লাহপাকের পছন্দ হয়ে গেল। আল্লাহ্ তাঁর জন্য মক্কা-মদীনার দরজা খুলে দিলেন। একটানা আঠারো বছর পর্যন্ত মদীনার মসজিদে বসে হাদীছের দরস দিলেন। কোথায় মাক্কায় যাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করতেন আর আজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের মুহাদ্দিছ হয়ে গেলেন। আল্লাহু আকবার!

মদীনার মসজিদে শিক্ষাদানের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মদীনার সাথে সম্পৃক্ত করে দিলেন যে, জন্ম ইন্ডিয়া, লালনপালন ইন্ডিয়া, শিক্ষাগ্রহণ ইন্ডিয়া, জীবন কাটালেন ইন্ডিয়া, দাফনও হলেন ইন্ডিয়া। কিন্তু আল্লাহ্পাক 'মাদানি' শব্দ তাঁর নামের সাথে যুক্ত করে দিলেন। বর্তমানে কেউ তার নাম উচ্চারণ না করে শুধু 'মাদানি' বললেই হুসাইন আহমদ মাদানিকেই লোকেরা বুঝতে পারে। সুবহানাল্লাহ!

বেলালী ভালোবাসার প্রয়োজন

অন্তরে জযবা থাকলে আল্লাহপাক সবকিছু সহজ করে দেন। এ জযবা মহব্বত ব্যতীত সামনে অগ্রসর হয় না। আর তা-ও মহব্বতে বেলালী হওয়া চাই। সায়্যেদুনা হযরত বেলাল (রাযি.)-এর কেমন মহব্বত ছিল? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত বেলাল (রাযি.) ভাবলেন, আগে আযান দিলে আমার মাহবুবের সাক্ষাৎ হতো। এবার আযান দিলে যখন প্রিয়তমকে দেখতে পাব না, তখন আমি আর বাঁচতে পারব না। তাই মদীনা ছেড়ে শাম চলে গেলেন। সুবহানাল্লাহ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত বেলাল (রাযি.) মাত্র দুবার আযান দিয়েছেন।

একবার হযরত ওমর (রাযি.)-এর খেলাফতকালে বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পর। তখন হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, আজকে বিজয়ের দিনে মুসলমানদের প্রথম কেবলায় বেলালের আযান শুনতে চাই। হযরত ওমর (রাযি.)-এর আদেশে বেলাল (রাযি.) আযান দিলেন। তখন সাহাবায়ে কেরামের মন গলাকাটা মোরগের মতো ছটফট করতে লাগল। সুবহানাল্লাহ!

দ্বিতীয়বার হলো, তিনি স্বপ্নযোগে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করেছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেলেন, বেলাল! এটা কেমন পাষাণহৃদয়ের পরিচয় যে, তুমি আমার সঙ্গে

সাক্ষাৎ করতে আসছ না! একথা শোনামাত্রই হযরত বেলাল (রাযি.)-এর ঘুম ভেঙে যায়। তখন স্ত্রীকে জাগিয়ে বললেন, আমি এখনই মদীনার দিকে সফর করতে চাই। তৎক্ষণাৎ উটের ওপর সাওয়ার হয়ে গেলেন। মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায় উপস্থিত হয়ে সালাম জানালেন। তারপর মসজিদে নববীতে গিয়ে নামায পড়লেন। দিনের বেলায় সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে ঢেউ খেলছে যে, আমরা আজ হযরত বেলাল (রাযি.)-এর আযান শুনছি না কেন? ফলে কয়েজন সাহাবা তাঁর কাছে নিজেদের আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তিনি আযান দিতে অসম্মতি জানালেন। কারণ, আযান দিলে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্ছেদে ধৈর্যধারণ করতে পারব না। তারপর কয়েকজন সাহাবা (রাযি.) হযরত হাসান ও হুসাইন (রাযি.)কে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বললেন, আপনারা হযরত বেলালের কাছে আযান শোনার জন্য অনুরোধ করুন। তাঁরা গিয়ে বললেন, আমরা নানাজির যুগের আযান শুনতে চাই। এখনকার অনরোধ এমন ছিল যে, হযরত বেলাল (রাযি.) আর আপত্তি করতে পারছে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত বেলাল (রাযি.)-এর এটি দ্বিতীয়বারের আযান ছিল। হযরত বেলাল (রাযি.) আযান দিতে শুরু করলেন। সাহাবায়ে কেরাম যখন ওই আযান শুনলেন, যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দেওয়া হতো, তখন কেউ তাদের অন্তরকে কাবু করতে পারেননি। এমনকি পর্দানশীল মহিলারা পর্যন্ত আযানের আওয়াজ শুনে কাঁদতে-কাঁদতে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। মদীনার মসজিদে কান্নার রোল শুরু হয়ে গেল। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, একটি শিশু বাচ্চাকে তার মা ওপর দিকে উঠিয়ে রেখেছিলেন। সে বলছে, আম্মাজান! হযরত বেলাল তো অনেকদিন পরে ফিরে এসেছেন। বলুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবে আসবেন? একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম ডাঙায় রাখা জীবিত মাছের মতো ছটফট করতে লাগলেন। আল্লাহু আকবার এই ছিল ভালোবাসার রূপ। যখন বেলালি মহব্বত অর্জন করা যাবে, তখন আল্লাহপাক সব রাস্তা সহজ করে দেবেন।

বাইতুল্লাহ শরীফের একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা

কা'বা শরীফের বরকতের একটি ঘটনা এখন আমার স্মরণ হয়েছে। এক যুবক কোনো এক কোম্পানিতে আমাদের সাথে কাজ করত। সে এত সুন্দর ছিল যে, তাকে দেখে লোকজন অস্থির হয়ে যেত। তার নিপুণ অবয়ব,

দৈহিক কাঠামো দেখার মতো ছিল। হাঁটলে বোঝা যেত, একজন নওজোয়ান আসছে। যেমন তার দৈহিক সৌন্দর্য ছিল, তেমনি আল্লাহ তাকে সম্পদও দিয়েছিলেন। সে চাষাবাদের যোগ্য অনেক জমির ওয়ারিশ হয়েছিল। তার আরেক ভাই মেজর ছিল। এই যুবক ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে নাস্তিক হয়ে গেল।

আমরা যখন তার নাস্তিকতার কথা জানতে পারলাম, তখন সবাই হতাশ হয়ে গেলাম। আমার ইঞ্জিনিয়ারকে আমি বলে দিলাম, ওই লোকের সঙ্গে কোনো বিষয়ে তর্ক হলে আপনারা কোনো কিছু বলবেন না। যদি কোনো বিষয়ে তর্ক আসে, তাহলে আমি অধম তার সঙ্গে কথা বলব। আমরা একই বিভাগে কাজ করার কারণে সে আমার সঙ্গে কোনো কথা বলতে হলে ভেবেচিন্তে বলত। সে বিভিন্ন ধরনের বাক্যালাপ করতে শুরু করল। একদিন কোনো একজনকে বলল, বন্ধু! তোমরা যে রকম আল্লাহকে ভয় কর, আমি তা করি না। কখনও এটা, কখনও সেটা বলত। কোনো কর্মচারী এসে বলত, জনাব! আমি ছুটি চাই। সে বলত, কেন? তারা বলত আমরা তাবলীগে যাব। তখন সে বলত, যাও মূর্খতা বিস্তার করে আসো।

একদিন এসে সে ইঞ্জিনিয়ারকে বলল, বন্ধু! আজ আমি জানাযা পড়তে গিয়েছিলাম। কয়েকটি কবরে হাত রেখে দেখলাম, কই কোনো কবরে তো গরম অনুভব হয়নি? এভাবে সে তিরস্কার করত। এ অবস্থা দেখে আমরা তার জন্য দু'আ করতাম। আর অপেক্ষা করতাম যে, সুযোগ পেলে তার সঙ্গে কিছু কথা বলব।

একদিন সে বলল, আমার মা আমার বিবাহের প্রোগাম ঠিক করেছেন। আমরা বললাম, বেশ, খুবই সুসংবাদ। সে একথা প্রকাশ করার পর এদিক-সেদিক থেকে প্রস্তাব আসতে শুরু করল। কর্নেলের মেয়ের জন্য, বড় নেতার মেয়ের জন্য, ডাক্তারের মেয়ের জন্য, কখনও প্রফেসরের মেয়ের জন্য ইত্যাদি। আমরা হতবাক হলাম যে, এক মাসে তার কাছে ১০৯ টি প্রস্তাব এল। কারণ ছিল সবাই মনে করত, ওই লোকটি আমার আত্মীয় হলে ভালো হতো। সে আমার সঙ্গে পরামর্শ করল, ভাই! এখন আমি কী করতে পারি। আমি বললাম, তুমি সবার সম্পর্কে যাচাই কর; তারা কেমন লোক। তারপর যে-পাঁচ-দশজনকে তোমার উপযোগী মনে করবে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া তোমার জন্য সহজ হবে। সে বলল, ঠিক আছে তা-ই করব। তারপর তার বিয়ের কথাবার্তার আলোচনাকালে একদিন বললাম, জনাব আল্লাহ সম্পর্কে এমন দুঃসাহসপূর্ণ কথা বলবেন না। কারণ,

আল্লাহর লাঠির আওয়াজ নেই। সে বলল, আপনি বললে ভবিষ্যতে আমি আর এমন কথা বলব না। তবে আমি এতটা ভয় করি না। আমি বললাম, ঠিক আছে; আপনিও প্রস্তুত হয়ে যান। কেননা, যেব্যক্তি আল্লাহপাকের প্রতি এমন দুঃসাহস দেখাতে পারে, আল্লাহপাক তাকে বাহাদুরির নাচ নাচিয়ে দেন। কারণ, 'কথাতে মানে না যে লাথি ছাড়া বোঝে না সে'। তুমি শুধু কথার বাহাদুরিতে এমন করছ। এবার সে বলল, ঠিক আছে দেখা যাবে। আমি এখানে আছি, তুমিও এখানে আছ। আমিও বলে দিলাম–

فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ

'অপেক্ষা করো; আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।'[৮৯]

দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন সংবদাদ পেলাম, সে মটর সাইকেলে এক্সিডেন্ট করেছে। সামান্য কিছু আঘাত পেয়েছে; তাই আজকে ছুটি নিয়েছে। আমরা তাকে দেখার জন্য তার বাড়িতে গেলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, জনাব! এক্সিডেন্টটা কিভাবে হলো। সে বলল, আর বল না আকস্মাৎ অক্সিডেন্ট হয়ে গেল; কিছু বলতে পারি না। রাস্তা একেবারে ফাঁকা ছিল, আমি শান্তভাবেই মটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছি। সহসা চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসে আর আমার সাইকেলটা নিচে পড়ে যায়। দু-চার দিন পর আবার শোনা গেল, সে পায়চারি করছিল। এমন সময় হঠাৎ করে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে। তারপর মাংসপেশীতে সমস্যা দেখা দিয়েছে; অপারেশন লাগবে। তার ভাই নজন বিশেষজ্ঞের একটি টিম গঠন করল। যারা সবাই বহির্বিশ্বে লেখাপড়া করে প্রাক্টিক্যাল অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসেছে। তারপর একটি সামরিক হাসপাতালে তাকে অপারেশন করা হয়।

আট ঘন্টা অস্ত্রোপচারের পর তার অপারেশন সম্পন্ন হয়। বাড়িতে আসার পর কিছুদিন সুস্থ থেকে আবার জ্বরে আক্রান্ত হয়। আরও কয়েকদিন পর জ্বর ভালো হলে সে অফিসে আসে। একদিন সে আমাকে বলল, বন্ধু! আমার দৃষ্টিতে প্রতিটি বস্তু দুটি করে দেখা যায়। অর্থাৎ– তার চোখের মনি নষ্ট হতে যাচ্ছে। তাই প্রত্যেকটি বস্তু পৃথকভাবে দুটি দেখতে পায়। এমনকি মানুষও একজনকে দুজন দেখে। এখন সালাম ওকে করবে, নাকি তাকে বরবে। এমন লোক কীভাবে ফ্যাক্টরিতে কাজ করবে। সে অচলের মতো হয়ে গেল। দু-চার দিন পর আবার এমন অবস্থা হলো যে, তার হাত থেকে ঘাম

---

৮৯. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৭১

নির্গত হতে শুরু করল। এমন ঘাম যে, হাত নিচের দিকে রাখলে পানি ফোঁটা-ফোঁটা হয়ে পড়তে থাকে। সে তিন-চারটা তোয়ালে হাতে রাখত। সেগুলো এমন অবস্থা হতো যেমন সবে ধুয়ে নিয়ে এসেছে। একটা এখনও শুকায়নি; তার আগেই দ্বিতীয়টা ভিজে যেত। এতে সে কোনো কাগজে সাইন করতে পারত না। সে এক অদ্ভুত বিপদে পড়ে গেল।

আমি বললাম, ভাই! এটা আল্লাহপাকের অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা। তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার একটাই পথ যে, নিজের প্রতিপালককে মেনে নাও। আর তার কাছে ক্ষমা চাও। এ সমস্ত কথা সে হেসে উড়িয়ে দিত আর বলত, সুস্থতা আর অসুস্থতা মানুষের জীবনে আসাটাই স্বাভাবিক। মুসলমানরা কি অসুস্থ হয় না? কাফেররা কি সুস্থতা পায় না। আমি বললাম, ঠিক আছে আরও দেখে নাও।

তারপর সে আবার জ্বরে আক্রান্ত হলো। সে দীর্ঘ ছুটি নিয়ে বাড়িতে চলে গেল। এক মাস পর আমরা জানতে পারলাম, সে তার জীবনের প্রায় শেষ প্রহর গুনছে। তাকে দেখার জন্য আমরা তার বাড়িতে গেলাম। দেখলাম, বর্তমানে সে হাড়ের কংকল হয়ে গেছে। তার ওজন ৪০ কেজিতে নেমে এসেছে। এমন দুর্বল হয়েছে যে, পাশ পরিবর্তন নিজে নিজে করতে পারে না। তার মা তাকে পাশ ফিরিয়ে দেন। নিজহাতে রুটি উঠিয়ে খেতে পারে না। নিজের কাপড় পরিবর্তন করতে পারে না।

একটু ভেবে দেখুন, কেমন লোক কেমন হয়েছে। তার যৌবনকাল আমরা দেখলাম আর বর্তমানের এই নাজেহাল অবস্থাও দেখলাম।

তার অবস্থা দেখে আমার খুব আক্ষেপ হলো। আমি তাকে বললাম, তোমার চিকিৎসার একটি ব্যবস্থাপত্র তৈরি করে দাও; আমরা তোমাকে বাইরে কোথাও চিকিৎসার জন্য পাঠাব। আশা করি, আল্লাহপাক তোমাকে সুস্থতা দান করবেন। তবে ফিরে আসার সময় ওমরা করে আসবে তো? সে মাথা দ্বারা ইশারা করে বলল, হ্যাঁ।

কোম্পানির যে বড় কর্তা ছিল, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো ছিল। যুবক মানুষ, দুরারোগ্য রোগে ভুগছে। আমি আপনাকে বলব, এ পৃথিবীর যে দেশে তার রোগের চিকিৎসা হয় আপনি তাকে সেখানে পাঠিয়ে দিন এবং তার চিকিৎসা খরচ আপনি বহন করুন। তিনি আমার কথায় সম্মত হলেন। বললেন, ঠিক আছে; আমি তোমাকে দায়িত্ব দিলাম। টিকিটের ব্যবস্থা করো; খরচপাতি আমি দেব।

আমি সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থায় চিঠি লেখলাম, বিশ্বে কোথায় এ রোগের চিকিৎসা রয়েছে, অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন। তারা উত্তর লিখল, এ রোগের চিকিৎসা কানাডায় মাত্র একজন ডাক্তারের কাছে পাওয়া যেতে পারে। বিশ্বের আর কোথাও পাওয়া যাবে না। আর এ রোগ থেকে ওই ডাক্তারের চিকিৎসায় এ পর্যন্ত মাত্র নজন রোগী সুস্থ হয়েছে। আমরা ওই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তিনি বললেন, আমার স্ত্রীও এ রোগের আক্রান্ত ছিলেন। আমি দিনরাত প্রাণপণ চেষ্টা করার পর সে সুস্থ হয়েছে। এ পর্যন্ত নজন রোগী সুস্থ হয়েছে। আপনারা ইচ্ছা করলে আসতে পারেন। এ পরিমাণ খরচ লাগবে।

আমরা তার জন্য কানাডার টিকিট করলাম। তার ভাইকে সঙ্গে দিলাম। আল্লাহ মহান! আমি যখন কানাডার টিকিট করলাম, তখন ফেরত সৌদি আরবের টিকিটও করলাম। আমি তার ভাইকে বললাম দেখো! আমি যখন তাকে ওমরার কথা বলি, তখন সে হ্যাঁসূচক জবাব দিয়েছিল। সুতরাং সুস্থ হলে ফেরার পথে তুমি নিজেও ওমরাহ করবে এবং তাকেও করাবে। সে বলল, ঠিক আছে।

আল্লাহপাকের কুদরত দেখুন। ফেরত আসার সময় এভাবেই এল, যা আমরা পূর্বে আশা করেছিলাম। সেখানে চিকিৎসা করার পর সে সুস্থ হয়ে বাড়িতে এল। আমরা তাকে দেখতে গেলাম। একটুক্ষণ বসেই বলল, নামাযের সময় হয়েছে; আমি নামায পড়ব।

আমি তার চেহারার প্রতি তাকিয়ে বললাম, ভালো আছেন তো। সে বলল, নামাযের ব্যবস্থা করো। আমি বললাম, নামাযের আরও আধা ঘন্টা বাকি আছে। এখন তুমি আমাদেরকে সফরের উল্লেখযোগ্য ও দর্শনীয় বিষয় সম্পর্কে কিছু বলো। তারপর ইনশাআল্লাহ নামায আদায় করব। এবার সে তার দেখার বিষয়গুলো বলতে লাগল। বন্ধু! যখন আমরা এখান থেকে কানাডায় যাই, তখন ডাক্তার আমাকে মেশিনের ওপর শুইয়ে দিল। আমার সঙ্গে কম্পিউটার ফিট করল। লিবারট্রিতে কোনো কিছু বোঝা যায়নি। তারপর আমার প্রতিটি অঙ্গ মনিটরের স্কিনে আনল। Misthemea Gravous নামক রোগ ধারা পড়ল। সে আমার শরীরের সমস্ত রক্ত Centrifugol Machine-এর মাধ্যমে বের করে তা পরিষ্কার করল। তারপর রোগের মূল উপকরণ আলাদা করে বাকি রক্ত আবার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। এভাবে সে কিছুদিন অন্তর-অন্তর তিনবার করার পর আমার ভাইকে ডেকে

বলল, জনাব! আপনার ভাইয়ের জীবনের মাত্র কয়েকটা দিন বাকি আছে। বেঁচে থাকার আশা নেই। আমার ভাই বললেন, সে এখন কেমন আছে।

ডাক্তার বলল, আমি যতজন রোগীর চিকিৎসা করেছি, সবার ক্ষেত্রে মাত্র একবার পরীক্ষা করেছি। এতে তারা ভালো হয়ে গেছে। এ রোগীর ক্ষেত্রে আমি তিনবার পরীক্ষা করেছি; অথচ সে ভালো হচ্ছে না।

আমার ভাই বললেন, ডাক্তার সাহেব! আপনার পক্ষ থেকে যেহেতু নিরাশার জবাব আসছে, তাহলে অপেক্ষা করে লাভ নেই। ভাইয়ের লাশ নিয়ে যাওয়ার চেয়ে জীবিতই নিয়ে যাই। তাহলে শেষবারের মতো একবার মাকে দেখতে পারবে। ডাক্তার বলল, হ্যাঁ, নিয়ে যাও।

এভাবে আমরা চিকিৎসা ব্যতীতই সেখান থেকে চলে আসি। ফেরত টিকিট সৌদি আরবের থাকার কারণে জেদ্দায় পৌঁছলাম। সেখানে এসে পরবর্তী ফ্লাইট পেলাম না। আমার ভাই এয়ারপোর্ট কর্মকর্তাকে বললেন, জনাব আমার সঙ্গে রোগী আছে; দয়া করে আমার ফ্লাইটটা দিয়ে দিন। তারা বলল, রোগী থাকলেও ফ্লাইট দেওয়া অসম্ভব। কারণ, টিকিট বুকিং হয়ে গেছে। তোমরা এখানে দুদিন অপেক্ষা করতে হবে। আমার ভাই বললেন, জনাব! আমার সঙ্গে মুমূর্ষু রোগী। তারা বলল, রোগী আছে তো আমরা কী করব। অপেক্ষা করতেই হবে। আমরা তোমাকে এয়ারপোর্টের বাইরে যাওয়ার অনুমোদনপত্র দিতে পারি; তাহলে তুমি শহরে গিয়ে দুদিন থেকে আবার চলে আসবে। সে বলল, তারপর আমরা জেদ্দা শহরে চলে এলাম।

শহরে ভাইজান আমাকে বললেন, তুমি যে তার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলে; আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব? আমি বললাম, হ্যাঁ, ভাই আমাকে সেখানে নিয়ে যাও। ভাই আমাকে মক্কায় নিয়ে গেলেন আর আমার জীবনে প্রথমবারের মতো আমি কা'বা শরীফ দেখলাম। সে বলল, কা'বা শরীফ দেখে আমার অন্তরে বিস্ময়কর প্রভাব দেখা দিল।

দেখুন বন্ধুগণ! সে নাস্তিক ছিল। আল্লাহকে বিশ্বাস করত না। সে বলল, আমার অন্তরে আশ্চর্য প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। আমি বসে-বসে দু'আ করতে লাগলাম– হে আল্লাহ! আপনি যদি বাস্তবেই থাকেন, তাহলে আমাকে সুস্থতা দান করুন। আমি আগামীকালই আপনার ঘর তাওয়াফ করব। তারপর আমার অন্তরে যেন এক ধরনের আনন্দের ঢেউ খেলছে মনে হলো। আমি ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিলাম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ভোরের মনোরম মৃদ হাওয়ার স্বাদ উপভোগ করলাম এবং ভাইয়ের সঙ্গে

বাইতুল্লায় চলে গেলাম। সেখানে এসে কালেমা পড়লাম এবং নিজে নিজেই কা'বাঘর তাওয়াফ করলাম। আল্লাহু আকবার!

আমার বন্ধুগণ! আল্লাহপাক যদি ওই ঘরে আগত নাস্তিকের দু'আ কবুল করতে পারেন এবং তাকে হেদায়াত দিতে পারেন এবং তার উদ্দেশ্য পুরা করতে পারেন, তাহলে যে মুমিন বান্দা এখান থেকে আল্লাহর ঘর দেখার জন্য যায়, সে আল্লাহর রহমতের কত বড় অংশ পাবে একটু ভেবে দেখুন।

একটি সাধারণ নিয়ম

পৃথিবীর একটি সাধারণ নিয়ম হলো, ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে, তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। আর যার সাথে শত্রুতা হয়, তাকে গলিতেও যেতে দেয় না; বরং বলে, তোমাকে যেন আমার মহল্লায় না দেখি। বন্ধুকে ঘরে নিতে কোনো চিন্তাও করে না। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা ওই বান্দাকেই হজ করার তাওফীক দেন, যাকে তিনি ভালোবাসেন।

হজের সম্পর্ক আমলের সাথে

হজের সম্পর্ক মালের সাথে নয়। মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এ আলোচনার কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য শেষ করব।

এক ব্যক্তি অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিল। সে তার স্ত্রীকে মাসিক খরচ দশ লক্ষ টাকা দিত। এক সাক্ষাতে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই! তুমি কি কোনো সময় হজ বা ওমরাহ করেছ। বলল, না; এখন পর্যন্ত তাওফীক হয়নি। দেখুন, হজের সম্পর্ক যদি মালের সঙ্গে হতো, তাহলে ওই লোক হাজারোবার হজ করতে পারত। ইউরোপে ডজনবার সফর করে এর পথে সৌদি আরব থেকেও কা'বা শরীফ দেখার সৌভাগ্য হয় না!

কয়েক বছর আগের কথা। পাকিস্তানে এমন সম্পদশালী একজন লোক ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে প্রতিদিন সৌদি আরব গিয়ে ওমরাহ করে আসতে পারতেন। ডজন খানেকবার ইউরোপ, আমেরিকা গেছেন। কিন্তু হজ করার তাওফীক হয়নি। একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার! হজ-ওমরাহ থেকে বঞ্চিত থাকছেন কেন? সে হজ করার প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করল। হজের মৌসুম আসার পর ইনকামট্যাক্সে আটকা পড়ে গিয়েছিল। হজে যাওয়ার সুযোগ হলো না। পরে জিজ্ঞাসা করলাম, কী খবর, হজে গেলেন না যে। সে বলল, ইনকামট্যাক্সে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম; তাই

যেতে পারিনি। আমি বললাম, ভাই! তুমি ব্যস্ত হওনি; বরং আটকানো হয়েছে। তাই তাওবা করো।

এক ইঞ্জিনিয়ার চাকরি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর আমরা তাকে বললাম, জনাব! আপনার ওপর হজ ফরজ হয়েছে। আপনার বয়সও প্রায় পয়ষট্টি। যেহেতু সর্বদিক দিয়ে আপনি সামর্থ্যবান আছেন, তাই ফরজ দায়িত্বটা আদায় করে নিন। তিনি হজের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। পাসপোর্ট-টিকিট সব ঠিক হয়েছে। একটি গ্রুপের প্রধান করে তার ফ্লাইট ঠিক করা হয়েছে। যাওয়ার দুদিন পূর্বে তিনি বড় ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তার ভাই তাকে কোনো কারণে কিছু কটুকথা বললেন। এতে তিনি হজে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নিলেন। আমরা তাকে অনেক বোঝালাম; কিন্তু তিনি মানলেন না। বললেন, এ বছর আর যাব না। আগামী বছর যাব। আল্লাহ মহান! তার টিকিটে আসা ও যাওয়ার তারিখ নির্ধারণ ছিল। কিন্তু তিনি যাননি। আফসোস! যে তারিখে তিনি হজ থেকে ফেরত আসার কথা ছিল, ওই তারিখের তিন দিন পর হার্টএ্যাটাক করে পৃথিবী থেকে চলে গেলেন। যদি তিনি আমাদের পরামর্শমতো হজে যেতেন, তাহলে তার পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যেত। এদিকে হজ থেকে ফিরে আসার তিন দিন পর তো তার পরকালের ফ্লাইট নির্ধারিত ছিল। সুতরাং নিষ্পাপ হয়ে বিদায় নিতে পারতেন। কিন্তু এটা আল্লাহর মর্জি ছিল না; তাই হয়নি।

আমাদের দাদাপীর হযরত আবদুল মালেক ছিদ্দীকি সাহেব একবার স্বপ্নে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ হলে তিনি বললেন, আবদুল মালেক! তুমি আমার সাক্ষাতের জন্য আসছ না কেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাক্ষাতের তামান্না গভীর। কিন্তু যাওয়ার উপকরণ তো আমার নেই। মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। ফলাফল এই হলো যে, পরের বছর হজের মৌসুমে তাঁর কয়েকজন আশেক এসে বলছে, হুজুর আমি ইচ্ছা করেছি আপনি যদি আমার প্রতি দয়া করেন, তাহলে আমার পক্ষ থেকে আপনি হজটা আদায় করে নেবেন। সবাই এধরনের আবদার জানাল। তারপর তিনি একজনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। পরবর্তী কালে অন্যজনের আবদার গ্রহণ করা হবে। এমনি প্রত্যেক বছর পাঁচ-সাতজন লোক এসে এরকম আবদার জানাল। তারপর তিনি সাতাশ বছর জীবিত ছিলেন। প্রত্যেক বছরই আল্লাহর অশেষ কৃপায় তাঁর ঘরের যিয়ারত করেছেন।

দেখুন! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নযোগে বলেছিলেন, আমি বলে দিচ্ছি। এতে আল্লাহপাক এমন ব্যবস্থা করলেন যে, যার নিজের খরচে একটি হজ করার সামর্থ্য ছিল না, তিনি সাতাশবার হজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

গত বছর হজের মৌসুমে সৌদি আরবের পত্রিকায় ইয়ামানের এক হাজী সাহেবের ছবিসহ সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল যে, ওই লোকটির বয়স বর্তমান ১২০ বছর। তিনি ২০ বছর বয়স থেকে হজ করে আসছিলেন। এ বছর তার ১০০ তম হজ পূর্ণ হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! তিনি বলেন, আমি ২০টি হজ উট, ঘোড়া ইত্যাদির মাধ্যমে করেছি। আর ৮০টি সম্পন্ন করেছি পায়ে হেঁটে।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) নিশাপুর থেকে হজের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে আড়াই বছরে মক্কায় পৌঁছেন। তিনি প্রত্যেকটি কদমের পর দুই রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। মক্কায় পৌঁছে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! মানুষ হজে আসে পায়ে হেঁটে আর আমি আপনার সাক্ষাতের জন্য এসেছি চোখের ভ্রুর মাধ্যমে। সুবহানাল্লাহ!

এজন্য বলা হয়, হজের সম্পর্ক আমলের সাথে হয়– মালের সাথে নয়। কথাগুলো স্মরণ রাখবেন; ফায়দা হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাজী করার আমল করো; আল্লাহপাক রাস্তা খুলে দেবেন।

কোনো এক দেশে একজন ডাক্তারের সাথে দেখা হলে তিনি আমাকে তার কাহিনি শোনালেন। তিনি বলেন, আমরা স্বামী-স্ত্রী ওমরা করতে গেলাম। ছেলেকেও সাথে নিলাম। সে-ও ডাক্তার ছিল। কেউ পি.এইচ.ডি ডাক্তার হয় আর কেউ শুধু পি.এইচ.ডি. হয়। এর অর্থ কী? তিনি বললেন, পি মানে *ফু* (দূষিত), এইচ মানে *হাওয়া* (বাতাস) ডি মানে, *দিমাগ* (মস্তিষ্ক)। অর্থাৎ– দূষিত বায়ুসম্পন্ন মস্তিষ্ক। তিনি বলেন, আমরা ইহরাম বেধেঁ মক্কায় পৌঁছলাম। ওমরাহ করার জন্য যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করার ইচ্ছা করলাম, তখন আমার ছেলে বলল, আমার শরীরটা ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আমি ভেতরে যেতে পারব না। আমরা বললাম, ঠিক আছে; এখানে বসে পড়ো, যাতে তুমি স্বাভাবিক হও। আমরা ওমরা করে আসার পর ছেলে রুমে গিয়ে কাপড় পরিবর্তন করে সোজা দেশে ফিরে এল। আল্লাহপাক তাকে বাইতুল্লাহ শরীফের দরজা থেকে ফিরিয়ে দিলেন। দরজা পর্যন্ত পৌঁছার পরও বাইতুল্লাহ শরীফ দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

কোনো কবি বলেন–

حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر

جو تھک کے گیا منزل کے سامنے

আক্ষেপ হয় ওই ক্লান্ত মুসাফিরের অবস্থার ওপর, যে গন্তব্যের সামনে এসে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে আছে।

আশেকানের জমায়েত

কত শত আশেকানরা আসে এর কোনো সীমা নেই। আমি এ সমস্ত হাজী সাহেবদের আশেকানের জমায়েত বলি।

اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں

سنا ہے کہ محل تیرے در پر ہجوم عاشقان ہوگا

অনুমতি থাকলে আমিও এসে তাতে অংশ গ্রহণ করতাম। শুনেছি আগামীকাল নাকি আপনার দরবারে আশেকানদের ভিড় হবে। হজ হচ্ছে আল্লাহপাকের দররারে আশেকানদের জনকোলাহল। সুবহানাল্লাহ! কেউ নিজের তাহাজ্জুদ নিয়ে আসে। কেউ পবিত্র জীবন নিয়ে আসে। কেউ ধর্মের সেবা নিয়ে আসে। কেউ তাকওয়া ও পরহেজগারি নিয়ে আসে। কেউ ভালোবাসার সমস্যা সমাধান করে আসে।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.) বলেন, আমি একবার তাওয়াফকালে দেখলাম, এক যুবতি মনমাতানো কবিতা পাঠ করেছে। কোনো প্রেমিক যেমন ভালোবাসার অথৈই সাগরে হাবুডুবু খেয়ে তার প্রিয়তমের সাক্ষাতের জন্য অধীর হয়, তেমনি সেই মেয়েটিও অস্থিরতায় ভুগছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ছে আর প্রেমাস্পদের কবিতা আবৃত্তি করছে। আমি সেই মেয়েটিকে বললাম, প্রেরণাময়ী কবিতা পাঠ করা তোমার জন্য শোভা পায়নি। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, জুনায়েদ! আগে বলো, তুমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছ, নাকি এই ঘরের মালিকের তাওয়াফ করছ? আমি বললাম, বাইতুল্লাহর তওয়াফ করছি। আমার কথা শুনে মেয়েটি মুচকি হেসে বলল, হ্যাঁ, যার অন্তর পাথর সে পাথরের ঘরের তাওয়াফ করে। আল্লাহু আকবার! কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা ঘর দেখে আসে। আর কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের তজল্লি দেখে আসে।

এজন্যই হজের পরের তাওয়াফকে তাওয়াফে যিয়ারত বা সাক্ষাতের তওয়াফ বলে। অবশ্যই ভাগ্যবানদের সাক্ষাৎ নসিব হয়। এটা কিভাবে সম্ভব হয় যে, কেউ নিজের ঘরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে সাক্ষাৎ করবে না। কেউ এসে যদি নিজ থেকে সাক্ষাৎ করতে অনীহা প্রকাশ করে, সেটা ভিন্ন কথা। নিজে আমন্ত্রণ জানিয়ে তো কেউ সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করতে পারে না। আল্লাহপাক নিজেই মানুষদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নেন।

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

'মানুষদেরকে হজের জন্য ঘোষণা দাও।'[৯০]

হে আমার বন্ধু ইবরাহীম! আযান দাও। ঘোষণা দাও; আমার বান্দারা! তোমরা হজ করতে আসো। সেই মাশুক যখন ডাকেন, তখন তিনি সাক্ষাৎও করেন। হে আমার মালিক! সেটা অত্যন্ত বিস্ময়কর স্থান। সেখানে আল্লাহর জ্যোতি বৃষ্টির মতো অবিরাম বর্ষিতে থাকে।

হাজীদের প্রার্থনার স্থান

সেখানে যাওয়ার পর যদি আমাদের আমলের ভিত্তিতে ক্ষমা পাওয়া যেত, তাহলে তো কোনো কথা-ই ছিল না। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন, যার কোনো পরিবর্তন নেই।

হাদীছ শরীফে এসেছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ময়দানে গিয়ে দু'আ করতেন– 'হে আল্লাহ! তুমি হাজীদের ক্ষমা করো এবং তারা যাদের জন্য দু'আ চায়, তাদেরকেও ক্ষমা করো। কেমন দয়াবান নবী আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

তাই হাজীগণ সেখানে গেলে নিষ্পাপ হয়ে যান। এটা তাদের আমলের বিনিময়ে নয়– হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর বরকতে হয়। কেয়ামত পর্যন্ত আগত ব্যক্তিদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!

দুটি কাজ করা আবশ্যক

যখন কোনো হাজী সাহেব হজে যান, তখন আপনার জন্য দুটি কাজ করা একান্ত জরুরি।

---

৯০. সূরা হাজ্জ : আয়াত ২৭

এক. ওই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে বলে দেবেন, জনাব! অনুগ্রহপূর্বক মুলতাযাম, আরাফার ময়দান ইত্যাদি স্থানে আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবেন।

দুই. যখন হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা যিয়ারত করবেন, তখন আমার পক্ষ থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসলামু আলাইকুম ও দরুদ পৌঁছাবেন।

বর্তমানে এটা প্রায় বিলুপ্তির পথে। লোকজন হজ করতে যায় অথচ মানুষ তাদের মাধ্যমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দরুদ ও সালামের হাদিয়া পাঠায় না। এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া একান্ত জরুরি।

সত্যিকার আবেগের সাথে হজের সৌভাগ্য প্রার্থনা করো

এ সমস্ত মাহফিল আল্লাহপাকের বিশেষ দয়া, এটি প্রার্থনার সময়। তাই এ সমস্ত দিনে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবে। যখন কোনো কাজের প্রস্তুতি নেওয়া হয়, তখন সেই অনুযায়ী দু'আও কবুল হয়। আজকের এই আয়োজনও সেই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। বর্তমানে খোদাপ্রেমিকগণ আল্লাহর দিদার লাভ করতে যাচ্ছেন। প্রতিদিন সংবাদ আসছে, আজ এতজন হাজী গমন করেছেন। আমরা এর অনুভূতি অর্জন করি এবং একাকি, দিনে, রাতে, নির্জনে ও জনসমক্ষে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি। যদি আল্লাহপাক রাস্তা উন্মোচন করে দেন, তাহলে আমদের যাওয়া সহজ হয়ে যাবে। এর সম্পর্ক ধনসম্পদের সঙ্গে নয়; বরং সত্যিকারের প্রবল আবেগের সঙ্গে। আল্লাহপাক আমাদের সেই সৌভাগ্য দান করুন এবং জীবনে বারবার কা'বা শরীফ যিয়ারত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হাদীছ শরীফে এসেছে, বান্দা যখন হজ শেষ করে ফিরে আসে, তখন সে এমনভাবে নিষ্পাপ থাকে যেমন মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্টের দিন নিষ্পাপ ছিল। সুবহানাল্লাহ!

যেহেতু এমন সৌভাগ্য অর্জন হয়, তাই আমরা যাব না কেন? বারবার যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো। যারা যেতে পারেনি তারা চাইবে, হে আল্লাহ! আমাকে সেখানে যাওয়ার পথ আসান করে দাও। শর্ত হলো তার অন্তরে সত্যিকারের জযবা থাকতে হবে। হে আল্লাহ! আমরা তোমার ঘর দেখার সৌভাগ্য চাই।

কোনো কবি বলেন–

بہ مکہ بینی از توحید نورے

بیثرب از حبیب اللہ ظہورے

گرایں دو شہر مارا تو نہ دیدے

چہ دیدی گر دریں دنیا رسیدے

মক্কায় তাওহীদের নূর দেখো এবং ইয়াছরিব ও আল্লাহর হাবীবের আত্মপ্রকাশ হয়েছে দেখ। এদুটি শহর যদি না দেখ, তাহলে এ পৃথিবীতে এসে তুমি কী দেখবে।

একটি কথা স্মৃতিপটে বদ্ধমূল রাখবেন। যদি সত্যিকারের আবেগ অন্তরে থাকে, তাহলে আল্লাহপাক হজ করার রাস্তা আপনার জন্য উন্মোচন করে দেবেন। যদিও দুনিয়াতে হজের সৌভাগ্য না হয়, তবু কেয়ামতের দিন আল্লাহপাক তাকে হাজীদের মধ্যে গণ্য করবেন। আল্লাহপাক আমাদের মতো অসহায় ও দরিদ্রদের বারবার এই সৌভাগ্য নসিব করুন। আমীন।

আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের গুরুত্ব

'আল্লাহর আদেশ, আল্লাহর আদেশ, আল্লাহর আদেশ। যুগপৎ বিপর্যয়ের মধ্যে একটি হলো আল্লাহর বিধানের মাহাত্ম্য অন্তর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। শরীয়তের বিধানের সম্মুখিন হলে তা যদি নিজের ইচ্ছার অনুকূল না হয়, তাহলে বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়। শরীয়তের বিধান থেকে পলায়নের রাস্তা বেছে নেয়। প্রশ্ন করে, শরীয়তে এমন বিধান কেন? স্মরণ রাখবেন, বান্দা কালেমা পড়েছে এবং বলেছে–

قَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ

'আমি আল্লাহপাকের সমস্ত বিধান মেনে নিলাম।'

তখন আর প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। গ্রহণ যখন করে নিচ্ছেন এখন শুধু আমল করা বাকি– প্রশ্ন নয়।'

আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের গুরুত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ.

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

বিনয়ের দুয়ার

আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন মহান ও মর্যাদাবান। তিনি এ সৃষ্টিকুল সৃজন করেছেন। তিনি সবকিছুর মালিক। আসমান ও জমিনে তাঁর আদেশ চলে। এগুলোর মধ্যে তাঁর রাজত্ব ব্যাপৃত। এই জ্ঞান ও মাহাত্ম্য তাঁর সৌন্দর্য। তাই হাদীছে কুদসীতে আল্লাহপাক বলেন– বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য আমার চাদর। নিঃসন্দেহে এ চাদর তাঁর জন্যই শোভা পায়। এজন্যই বান্দার বিনয় অবলম্বন করা চাই। বিনয় এমন একটি নেয়ামত, যা ব্যতীত কোনো মানুষ আল্লাহর মারেফত হাসিল করতে পারে না। যারাই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে, তাদের বিনয়ের সাথেই যেতে হয়েছে। বিনয়ের দুয়ার ছাড়া কোনো বান্দা আল্লাহর দরবারে পৌঁছতে পারে না। সেই বিনয় অর্জন করানোর জন্য পীর-মাশায়েখগণ সাধনা করান। আল্লাহর দরবারে নত হওয়া এবং তার প্রতি অনুগত হওয়ার শিক্ষা দেন। আর আল্লাহর বিধানের মাহাত্ম্য অন্তরে স্থাপন করে দেন।

আল্লাহর আদেশের গুরুত্ব

আল্লাহর আদেশ, আল্লাহর আদেশ, আল্লাহর আদেশ। যুগপৎ বিপর্যয়ের মধ্যে একটি হলো আল্লাহর বিধানের মাহাত্ম্য অন্তর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। শরীয়তের বিধানের সম্মুখিন হলে তা যদি নিজের ইচ্ছার অনুকূল না হয়, তাহলে বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়। শরীয়তের বিধান থেকে

পলায়নের রাস্তা বেছে নেয়। প্রশ্ন করে, শরীয়তে এমন বিধান কেন? স্মরণ রাখবেন, বান্দা কালেমা পড়েছে এবং বলেছে–

قَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ

'আমি আল্লাহপাকের সমস্ত বিধান মেনে নিলাম।'

তখন আর প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। গ্রহণ যখন করে নিচ্ছেন এখন শুধু আমল করা বাকি– প্রশ্ন নয়।

প্রাণীদের আনুগত্য

আল্লাহপাক সকল প্রকার প্রাণীদের মানুষের অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ–

১. উট : এত বড় একটি প্রাণী। সে একটি লাথি মারলে মানুষ তার জীবনের বর্ডার অতিক্রম করতে বাধ্য হবে। অথচ একটি ছোট শিশুর হাতে উটের লাগাম তুলে দিলে উট শিশুরটির পেছনে-পেছনে চলতে থাকে। এই আট-দশ বছরের শিশুর প্রতি আল্লাহপাক উটকে অনুগত করে দিয়েছেন। সে তার মালিকের সাথে ঝগড়া করে না যে, আমার কোমরে বোঝা দিও না। উটের দেহ দেখো আর ওই শিশুর আচরণ দেখো। কোনো প্রকার সমতা নেই। আল্লাহপাক উটকে অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন। তাই মাথা নত করে পেছনে-পেছনে যায়। মালিক তাকে যেখানে চায়, সেখানে নিয়ে যায়। সে কোনো প্রকার কৌশল বা যুক্তি-প্রমাণ ব্যতীত পেছনে চলতে-চলতে হাজার মাইলের পথ অতিক্রম করে।

২. ঘোড়া : আল্লাহপাক ঘোড়াকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। সে মানুষের তাঁবেদারি করে। মনে করুন, যদি আল্লাহপাক ঘোড়াকে কথা বলার যোগ্যতা দিতেন। আর সে কদমে-কদমে অভিযোগ করে বলত, তুমি আমাকে দানা-পানি দেওনি। বিশ্রামের সুযোগ দেওনি। আমি অসুস্থতার ছুটি চাই। কারণ, আজ আমার শরীরটা ক্লান্ত, তাহলে আমাদের জন্য বিপদ হতো।

মানুষে অবস্থা দেখো, সে সারাদিন ঘোড়াকে কাজে লাগায়। বিকালে ঘোড়াকে খাবার দিতে ভুলে যায়। সামান্য ঘাস থাকলে যা আছে তাই দিয়ে দেয়। তার পেট ভরে বা না ভরে যা পায় তা খেয়ে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। শীতকালে মালিক কাঁথা-কম্বল মুড়িয়ে শুয়ে থাকে। এমনকি মাঝেমধ্যে ঘোড়াকে ঘরে আনতেও ভুলে যায়। ঘোড়া সারারাত শীতের মধ্যে বাইরে

দাঁড়িয়ে থাকে। তার খাট-পালঙ্ক, বিছানা-লেফ থাকে না। ঠান্ডায় ঘুমও আসে না। শুতেও পারে না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে সারাটা রাত এভাবেই কাটায়। পরের দিন তার অসুস্থতার ছুটি মিলে না। সে এ কথা বলে না যে, আজ আমার শরীর খারাপ, কাজে যাব না। রাতে ঠিকমতো ঘুমও হয়নি। মালিক পরের দিন তাকে আবার গাড়িতে জুড়ে দিয়ে সারাদিন গাড়ি টানে।

আমি অনেক দিন দেখেছি, মালিক ঘোড়াকে পানি পর্যন্ত দিচ্ছে না। গাড়ি টেনে এসে দুর্গন্ধযুক্ত নালায় পানি পান করতে শুরু করছে। সে তার মালিকের বিপক্ষে অভিযোগও করে না যে, আপনার জন্য পেপসি আর কোক; অথচ আমার জন্য পানিও নেই। আমি এমনও দেখেছি যে, সারাদিন গাড়ি টেনে ঘোড়া ক্লান্ত হয়েছে। এমন সময় মালিক আবার স্টেশনে যাওয়ার যাত্রী পেয়েছে। সে বলে, আমি তোমাকে পাঁচ টাকা বেশি দেব। ঘোড়াকে দ্রুত দৌড়াবেন। ঘোড়া সারাদিন গাড়ি টেনে ক্লান্ত হয়ে আছে। কিন্তু মালিক চাবুক মারতে শুরু করেছে। সে মালিককে একথা বলতে পারে না, আমি তো সারাদিন দৌড়িয়েছি। তারপর পাঁচ টাকার জন্য আমার ওপর এত অত্যাচার কেন? বেচারা চাবুক খাচ্ছে আর দৌড়াচ্ছে। শুধু তা-ই নয়। এই চলন্ত অবস্থায় যদি তার মল ত্যাগের প্রয়োজন হয়, তবে তাকে এই সুযোগটুকুও দেওয়া হচ্ছে না। তাই সে দৌড়ানো অবস্থার মধ্যে পায়খানা করে। ঘোড়া পায়খানাও করে আবার চলার গতিও ঠিক রাখে। তার গায়ে আঘাত থাকলে বলতে পারে না, জনাব আমার ক্ষতস্থানে কিছু লাগিয়ে দিন, যাতে মাছি বসতে না পারে। এভাবে কষ্ট করে আসার পর মালিক পরের দিন আবার তাকে কাজে নিয়োজিত করে। তার ক্ষতস্থানে জিন পরিয়ে দেয়, যার দরুন তার পুরাতন জখম আবার বাড়তে থাকে। কিন্তু সে অভিযোগ করতে পারে না। এবার বুঝতে পেরেছেন, ঘোড়া তার মালিকের কতটুকু অনুগত্য করে? সব কাজ মাথা পেতে সম্পাদন করে। তার কথা বলার কোনোই সুযোগ নেই।

৩. কুকুর : পাহাদারির জন্য লোকেরা কুকুর পালে। কুকুরের ক্ষুধা লাগলে সে বারান্দায় এসে বসে যায়। কুকুরের কখনও এমন দুঃসাহস হয় না যে, দস্তরখানা থেকে কিছু গোশত নিয়ে যাই। অথচ তার এমন ক্ষমতা আছে যে, ইচ্ছা করলে খাবার টেবিলে বসে মানুষের হাত থেকে রুটিও ঝাপটা দিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তবু সে তা করে না। তার বসার স্থানে গালিচা থাকে না। তার বসা বারান্দায় হয়। সে বলে, আমি তার অধীন; আমার বসার জায়গা এটাই। আপনি ভেবে দেখেছেন কি, কুকুর বারান্দা থেকে সামনে অগ্রসর

হতে পারে না, কোনো জিনিস ছিনিয়ে নেওয়ার দুঃসাহস করে না কেন? কেননা, আল্লাহপাক তাকে বশীভূত বানিয়ে দিয়েছেন। সারারাত জেগে সে মালিকের বাড়ি পাহারা দেয়। সকালে তার শোওয়ার জন্য কোনো বিছানা মিলে না। তার আলাদা কোনো ঘর থাকে না। কখনও এ দেওয়ালের নিচে, কখনও ওই গাছের নিচে জীবন কাটায়। কোনো কারণে মালিক তাকে জুতা পেটা করলে কিছুক্ষণের জন্য কোথাও চলে যায়। পুনরায় ওই মালিকের দরজায় এসে শুয়ে থাকে। এটাই তার স্বভাব। সে কোন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভক্ত প্রাণী, জুতাপেটা খেয়েও আবার মালিকের দরজায় তার আগমন? আর আমরা মালিকের পুরস্কার গ্রহণ করে তাঁর দরবার থেকে দূরে সরে যাই।

কুকুরের বিশ্বস্ততা

কুকুরের আনুগত্যের প্রায় বিশটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়।

১. হায়াতুল হাওয়ান নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, একলোক সফরে বের হরে রাস্তায় একটি অপূর্ব সুন্দর মিনার দেখতে পায়। সেটা দেখেই মনে হয় যে, তা নির্মাণ করতে অনেক টাকা ব্যয় হয়েছে। তার ফটকে লেখা আছে, যেব্যক্তি এটি নির্মাণের কারণ জানতে চায়, সে যেন এ গ্রামে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

ওই লোকের অন্তরে অনুপ্রেরণা জাগল, এই গ্রামে গিয়ে তার কারণ জানা দরকার। সে গ্রামের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলে সবাই বলল, আমরা জানি না। শেষ পর্যন্ত খুঁজতে-খুঁজতে একলোকের সন্ধান পেল, যার বয়স দুইশত বছর। তার কাছে জিজ্ঞাসা করলে বৃদ্ধ বলল, আমার পিতার কাছ থেকে আমি শুনেছি, এ গ্রামে এক জমিদার ছিল। তার একটি কুকুর ছিল, যে কখনও তার সঙ্গ ত্যাগ করত না। সে যেখানে যেত, কুকুরটাও সেখানে যেত।

একদিন জমিদার কোথাও সফরে যাওয়ার সময় কুকুরকে ঘরে বেঁধে রাখল, যাতে তার সঙ্গে যেতে না পারে। বাবুর্চিকে বলে গেল, আমার জন্য দুধের খাবার তৈরি করে রাখবে। এটি জমিদারের প্রিয় খাবার ছিল। জমিদারের বাড়িতে একটি বোবা দাসিও ছিল। জমিদার বের হয়ে যাওয়ার পর ওই দাসি গিয়ে কুকুরটার কাছে বসল। এতক্ষণে বাবুর্চি খানা তৈরি করে একটি পাত্রে করে দাসি ও কুকুরের পার্শ্বে উঁচুস্থানে রেখে এল। জমিদার ফিরে এলে যেন তার খাবার হাতের নাগালে পেয়ে খেতে পারে।

বাবুর্চি চলে যাওয়ার পর একটা বিষাক্ত সাপ এসে এই উঁচু জায়গা থেকে কিছু দুধ খেয়ে চলে গেল। জমিদার ফিরে এসে যখন তার প্রিয় খাবার

খাওয়ার জন্য পেয়ালা হাতে নিল, তখন বোবা দাসি হাতে তালি দিল এবং হাত দ্বারা দুধ পান করতে নিষেধ করল। কিন্তু জমিদার মেয়েটির কথা বুঝতে পারল না। একবার তার প্রতি তাকায়, আরেকবার পেয়ালার দিকে তাকায়। এতক্ষণে সে খাবার খাওয়ার জন্য হাত বাড়াল। এমন সময় কুকুরটা বিকট একটা আওয়াজ দিল। এভাবে বারবার ঘেউ-ঘেউ করতে-করতে প্রচণ্ড আবেগে শিকল ভেঙে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

দাসি ও কুকুরের আচরণে জমিদার চিন্তা করতে লাগল, ব্যাপারটা কী? এরা এমন করছে কেন? এবার জমিদার পেয়ালা রেখে দিল। কুকুরটা লাফ দিয়ে পেয়ালার নিকটে এসে পেয়ালাটা মাটিতে ফেলে দিল। জমিদার ভাবল, কুকুরটা খাবার খাওয়ার জন্য এমন অস্থির হয়েছে। নিজের প্রিয় খাবারের প্রতি এমন আচরণের কারণে জমিদার ক্ষিপ্ত হয়ে কুকুরটাকে মারপিট করল। এদিকে পেয়ালায় এখনও কিছু দুধ অবশিষ্ট ছিল। এবার কুকুরটা মুখ বাড়িয়ে পেয়ালা অবশিষ্ট দুধটুকু খেয়ে ফেলল। পেয়ালার দুধ কুকুরের কণ্ঠনালীতে যেতে না যেতেই কুকুরটা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে-করতে মরে গেল।

জমিদার হতবাক হয়ে বোবা দাসিকে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কী? দুধ পান করে কুকুরটা মারা গেল কেন? দাসি ইশারার মাধ্যমে বিষয়টা বুঝিয়ে দিল, একটা কালনাগ এসে এখান থেকে কিছু পান করেছে, যার বিষক্রিয়ায় কুকুরটা মরে গেছে। আমরা এজন্যই আপনাকে দুধ পান করা থেকে বারণ করেছিলাম। জমিদার সবকিছু বুঝতে পেরে বাবুর্চিকে ডেকে এনে শায়েস্তা করল, তুমি খাবার খুলে রেখেছিলে কেন? তারপর জমিদার কুকুরটা দাফন করে এর ওপর এই মিনার নির্মাণ করল।

বন্ধুগণ! ভেবে দেখুন, কুকুরের মধ্যে কেমন বিশ্বস্ততা রয়েছে যে, নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে নিজের মালিককে রক্ষা করেছে।

৪. 'আজাইবুল মাখলুকাত' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, এক ব্যক্তি অপর একজনকে হত্যা করে একটি নির্জন কূপে ফেলে দেয়। ঘটনার সময় নিহত ব্যক্তির একটা কুকুর তার সঙ্গে ছিল। কুকুরটা প্রতিদিন এই কূপের কাছে এসে পা দ্বারা এখানে মাটি সরাত। আর বোঝাতে চাইত, আমার নিহত মালিক এখানে আছে। হত্যাকারীদের কেউ কুকুরটার সামনে এলে ঘেউ-ঘেউ শুরু করে দিত। বিষয়টি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলে তারা জায়গাটা খনন করে নিহতের লাশ বের করল এবং হত্যাকারীকে চিহ্নিত করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করল।

একটি নাজুক বিষয়

আল্লাহপাক প্রাণীকে যেমন করে মানুষের অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা সর্বাবস্থায় মানুষের সামনে মাথা নত করে, তদ্রূপ মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধীন করে দিয়েছেন। তাই সবার জন্য উচিত সর্বাবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত বিধানে হাজিরি দেওয়া এবং সানন্দে গ্রহণ করে নেওয়া। যেমন– তাঁর প্রদর্শিত বিধান অস্বীকার করা যাবে না, তেমনি তার সুন্নাতও অস্বীকার করা যাবে না। কালেমা পড়ে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি, হে আল্লাহ! যেভাবে প্রাণীরা আমাদের আনুগত্য মেনে নেয়, এভাবে আমরাও আপনার ও আপনার হাবীবের আনুগত্য মেনে নিলাম। হে আল্লাহ! আমরা যে রকম আমাদের প্রাণীদের মালিক, তেমনি আপনি আমাদের মালিক।

বন্ধুগণ! আমাদেরও আল্লাহর আনুগত্য নতশিরে মেনে নিতে হবে। কোনো বিধানে খুঁত বের করতে গেলে বা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করলে দৌলতে ঈমান থেকে মাহরুম হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বর্তমানে অনেকে এ বিষয়ে গভীর গবেষণায় লিপ্ত হয় যে, শরীয়তে এ বিধানটি কেন? ওই বিধানটি সেই রকম কেন? এতে তারা ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়। জেনে রাখুন, এটা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়।

কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) 'মালাবুদ্দা মিনহু' নামক কিতাবে লিখেছেন, যদি দুজন গল্পের ছলে বলে, বন্ধু এটা তো শরীয়তের বিধান আর অপরজন বলে, আরে রাখ তোর শরীয়ত, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। অর্থাৎ– এমন সাধারণ কথায় তার ঈমান চলে যাবে। এটা কোনো সাধারণ বিষয় নয়। স্মরণ রাখবে, যেখানেই সুন্নতকে তুচ্ছ মনে করবে, সেখানেই ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। নিজের অলসতা বা উদাসীনতার দরুন যদি সুন্নাতের ওপর আমল না করে, সেটা ভিন্ন কথা। এর দ্বারা সে গোনাহগার হবে বটে; কিন্তু কাফের হবে না। পক্ষান্তরে যদি কোনো সুন্নতকে অস্বীকার করে অথবা সুন্নত নিয়ে ঠাট্টা করে অথবা এমন কথা বলে, যার মাধ্যমে সুন্নতকে তুচ্ছ করা হয়, তাহলে তার ঈমান চলে যাবে। অন্তরে আল্লাহপাকের বিধানের গুরুত্ব স্থাপন করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আশেকের অন্তরে আল্লাহপাকের আদেশের গুরুত্ব সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নফস-এর মুখে লাগাম লাগাতে পারবে না। নফস শরীয়তের মধ্যে সর্বদা তার ইচ্ছার

আনুকূল্য সন্ধান করে। এমনকি কতক আলেম পর্যন্ত কুরআন পাঠ করতে আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে নিজের ইচ্ছার সুবিধা তালাশ করেন। আমাদের উচিত কুরআনে আল্লাহর উদ্দেশ্য তালাশ করা। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন নফস নামক ঘোড়াকে লাগাম লাগানো যাবে এবং অন্তরে আল্লাহর বিধানের গুরুত্ব পয়দা হবে।

আয়ায (রহ.)-এর হৃদয়ে শাহী বিধানের মূল্যায়ন

সুলতান মাহমুদ গজনবি (রহ.) একজন বিখ্যাত মুসলিম বাদশাহ ছিলেন। তাঁর 'আয়ায' নামে এক গোলাম ছিল। সে একজন গ্রাম্যলোক ছিল। কিন্তু বাদশাহর দরবারে আসার পর একজন সচেতন সেবক হিসেবে খেতাব পেয়ে যায়। তার সেবা বাদশাহর পছন্দ হওয়াতে তাকে বিশেষ খাদেমের মধ্যে গণ্য করেন।

অন্যান্য সাথীরা এতে ঈর্ষান্বিত হলো যে, সে এত সম্মান কীভাবে পেল। স্বতঃসিদ্ধ কথা হলো, যেখানে ফযল ও কামালিয়াত থাকে, সেখানে হিংসুকও জন্ম নেয়। এবার হিংসুকেরা পরামর্শ করল, বাদশাহর দৃষ্টি থেকে তাকে কীভাবে সরানো যায়। তবেই আমাদের বিপদ কেটে যাবে। তারা সুযোগের সন্ধানে রইল। হিংসার চোখ থাকে না; কিন্তু তার কান খুব বড় হয়। এজন্যই হিংসাকারীরা ছোট-ছোট কথা শুনে পরস্পরে আলোচনা করে তাকে বিশাল বানিয়ে নেয়।

একদিন তারা সমবেত হয়ে বাদশাহর দরবারে গিয়ে বলল, বাদশাহ সালামত! আমরা আপনার কাছের লোক। আমরা শিক্ষিত ও উচ্চ বংশের লোক। আবার সম্পদশালীও বটে। কিন্তু আয়াযের প্রতি আপনার যে ভালোবাসা, আর কারও প্রতি এমন নয়। বাদশাহ বললেন, ঠিক আছে; আমি কোনো এক সময় তোমাদের একথার জবাব দেব।

বাদশাহ একদিন একটি তিক্ত ফল সংগ্রহ করিয়ে কেটে টুকরো-টুকরো করে কর্মকর্তাদের প্রত্যেককে একটা করে টুকরো দিলেন। একটা টুকরো আয়াযকেও দিলেন। তারা ফল খেয়ে তিক্ততা অনুভব করে বলতে লাগল, বাদশাহ সালামত! এটা তো অত্যন্ত তিক্ত ফল। কিন্তু আয়ায খুব মজা করে ফলটি খাচ্ছে দেখে বাদশাহ বললেন, আয়ায! ফলটি তোমার তিক্ত অনুভব হয় না? সে উত্তর দিল, জাহাঁপনা, তিক্ত তো সীমাহীন। বাদশাহ বললেন, তুমি দেখছি, খুব মজা করে খাচ্ছ! সে বলতে লাগল, আলমপানাহ! আমার মনে একথার উদয় হলো যে, আপনার যে হাতে আমি জীবনে অনেকবার

মিষ্টি ফল খেয়েছি, সেই হাতে যদি আজ তিক্ত ফলও এসে থাকে, তবু আমি এটি ফেরত দিতে পারি না। তাই আমি ফেরত দেওয়ার লজ্জা অনুভব করে খুশি মনেই খেয়েছি।

মাওলানা রোমী (রহ.) বলতেন, আফসোস! যদি আমাদের মধ্যে এমন গুণ অর্জিত হতো! আমরা সারা জীবন আল্লাহপাকের নেয়ামত ভোগ করে শুকরিয়া আদায় করি। যিনি আমাদের হাজারো আনন্দ দিয়ে থাকেন। যদি কখনও কোনো কষ্ট বা চিন্তার সম্মুখিন হই, তখনও যেন আমরা আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে পরিচয় না দেই। আল্লাহর সান্নিধ্য যেন ছেড়ে না যাই। বর্তমানেও আমরা অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করছি। কিন্তু শুকরিয়া আদায় করার কোনো খবর নেই।

সুলতান মাহমুদ গজনবি (রহ.)-এর গোলাম আয়ায সম্পর্কে আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। একদিন তার সাথীরা বাদশাহর দরবারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, বাদশাহ সালামত! আয়াযের একটি নিদিষ্ট সিন্দুক আছে। মাঝেমধ্যে এটা খুলে কি যেন দেখে; অন্য কাউকে দেখতে দেয় না। আমাদের সন্দেহ হয়, আপনার ধনভান্ডারের মূল্যবান মনি-মুক্তা সে গোপন করতে পারে। আপনি একবার অভিযান চালিয়ে চেক করতে পারেন। বাদশাহ এ সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ আয়াযকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী কোনো স্বতন্ত্র সিন্দুক আছে? সে বলল, জি আছে।

বাদশাহ : সেটা তুমি তালাবদ্ধ রাখ?

আয়ায : জি।

বাদশাহ : অন্য কাউকে দেখতে দাও না?

আয়ায : জি না।

বাদশাহ : তুমি প্রতিদিন সেটা দেখো?

আয়ায : জি হুজুর।

বাদশাহ বললেন, চাবি নাও। বাদশাহ একজনকে চাবি দিয়ে বললেন, ওই সিন্দুকে যা কিছু আছে এখানে নিয়ে আস। হিংসুকরা আনন্দে বাগবাগ। এবার তার আসল রূপ প্রকাশ পাবে। চুরির মাল ধরা পড়লে বাদশাহ তাকে ঘাড়টা ধরে বের করে দেবেন।

আল্লাহপাক কত মহান! লোকটি সিন্দুক খুলে তিনটি জিনিস নিয়ে বাদশাহর দরবারে হাজির করল। ১. পুরাতন এক জোড়া জুতা ২. একটি

পুরাতন লুঙ্গি ৩. একটি পুরাতন জামা। বাদশাহ বললেন, সিন্দুকে আর কিছু নেই? লোকটি বলল, না মহারাজ!

বাদশাহ আয়াযকে বললেন, কী ব্যাপার; এতে অন্য কিছু নেই? আয়ায বলল, না; এগুলোই ছিল। বাদশাহ বললেন, আয়ায! এগুলো তো এত মূলবান বস্তু নয় যে, এর জন্য তুমি সিন্দুক তালাবদ্ধ রাখবে। অন্যকে দেখতে দেবে না। আবার নষ্ট হওয়ার মতোও কিছু নেই যে, তুমি প্রতিদিন সেটা চেক করতে হবে। এর রহস্যটা কী?

আয়ায উত্তর দিল, হুজুর! এগুলো এজন্য রেখেছি যে, আমি আপনার দরবারে আসার সময় এগুলো আমার পরনে ছিল। তাই এগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছি এবং প্রতিদিন এগুলো দেখে আমার নফসকে সর্তক করি, আয়ায তোমার অতীতকাল এমন ছিল; সেটা তুমি ভুলে গেলে চলবে না। বর্তমানে তুমি যে সুখে আছ, এটা তোমার ওপর বাদশাহর দয়া। সুতরাং বাদশাহর দয়া সর্বদা তোমাকে স্মরণ রাখতে হবে। বাদশাহর সান্নিধ্য থাকার কারণে আমি আজ এত সম্মানে আছি।

বন্ধুগণ! আমাদেরও যদি এমন অবস্থা হতো! আমরা সর্বদা আল্লাহর নেয়ামত ও আমাদের কষ্টের দিনের অবস্থা স্মরণ রাখতে হবে। সুখের সময় দুঃখের দিনের কথা ভোলা যাবে না। আল্লাহ কবুল করুন। আমীন।

সুলতান মাহমুদ গজনবির গোলাম আয়ায সম্পর্কে আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একদিন বাদশাহ তাঁর কোষাগার থেকে একটি হীরা আনতে বললেন। সাথে একটি হাতুড়িও আনালেন। দরবারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বললেন, আজ আমি তোমাদের মেধার পরীক্ষা নেব। সবাই বলল, ঠিক আছে; নিন; এ অনেক ভালো পদক্ষেপ। বাদশাহ দরবারের এক কর্মকর্তার হাতে হীরাটা দিলেন এবং হাতুড়িটাও দিলেন। তারপর বললেন, এটি ভেঙে টুকরো-টুকরো করে ফেলো। কর্মকর্তা ভাবল, এ তো মেধার পরীক্ষা। খানিক চিন্তা করে বলল, মহারাজ! এটা অনেক দামি জিনিস– আপনার কোষাগারের সৌন্দর্য। সুতরাং এটা ভাঙা ঠিক হবে না। বাদশাহ বললেন, বেশ! বেশ! তুমি খুব ভালো পরামর্শ দিয়েছ। কর্মকর্তা মনে-মনে ভাবল, জ্ঞানের পরীক্ষায় আমি নিশ্চয় উত্তীর্ণ হয়েছি।

বাদশাহ হীরাটা আরেকজনকে দিয়ে তাকেও এই আদেশ করলেন। কিন্তু সে-ও ভাঙতে অস্বীকৃতি জানাল।

এবার এল আয়াযের পালা। হীরা আর হাতুড়িটা গোলাম আয়াযের হাতে দিয়ে বাদশাহ বললেন, হীরাটা ভেঙে ফেলো। সাথে-সাথে আয়ায হীরাটা মাটিতে রেখে কুড়াল দ্বারা একটা কোপ মেরে ভেঙে টুকরা-টুকরা করে ফেলল। উপস্থিত সবাই ব্যাপারটা দেখে মনে-মনে বলল, কত বড় বেকুফ! রাজকোষাগারের এত বড় ক্ষতিটা করে ফেলল! বাদশাহ তাকে অবশ্যই দরবার থেকে তাড়িয়ে দেবেন।

বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, আয়ায! আমি বললাম আর হীরাটা এভাবে নষ্ট করে ফেললে! এমন একটা দামি জিনিস! আয়ায উত্তর দিল, 'বাদশাহ নামদার! আমার সামনে দুটি পথ খোলা ছিল। হয় আপনার নির্দেশ অনুসারে হীরাটা চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলব, নাহয় আপনার আদেশ অমান্য করব। আমি চিন্তা করলাম আপনার একটি আদেশ এরকম হাজারো হীরার চেয়ে বেশি দামি। তাই আমি হীরাটা নষ্ট করে আপনার আদেশের মূল্য বজায় রেখেছি।

মাওলানা রুমি বলেন, আয়াযের অন্তরে বাদশাহর নির্দেশের যেটুকু গুরুত্ব ও মর্যাদা ছিল, আল্লাহর নির্দেশের দাম যদি আমাদের কাছে অতটুকুও থাকত!

আমি কার আদেশ লঙ্ঘন করছি?

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী! আল্লাহওয়ালাদের যদি কোনো কারণে আল্লাহর বিধান পালনে সামান্য ত্রুটি প্রকাশ পায়, তখন তারা হতাশ হয়ে যান। সত্তরবার ভাবতে থাকেন, আমি কার বিধান লঙ্ঘন করছি। কেননা, বান্দা যখন আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে বা তাঁর সীমা অতিক্রম করে, তখন আল্লাহপাক রাগে এমন অস্থির হয়ে যান যেমন কোনো বাঘ তার শিকার দেখে অস্থির হয়। আমরা যদি আল্লাহকে রাগান্বিত দেখতে পাই, তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে? তাই আল্লাহ কুরআনে স্থানে-স্থানে বলেছেন–

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا

'এটা আল্লাহর সীমানা। এর ধারে কাছেও এসো না।'[৯১]

তাই খোদাপ্রেমিকদের জন্য উচিত সর্বদা আল্লাহর বিধানের গুরুত্ব দেওয়া এবং এটা মনে রাখতে হবে যে, আমরা যেন কোনোক্রমেই আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন না করি। আর এটিই হচ্ছে তাসাউফের প্রথম পদক্ষেপ।

---

৯১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৮২

একটা শয়তানি আমল

বর্তমানে মানুষ নিজের ইচ্ছামতো খেয়ে পেট বড় করার কারণে তাদের কাছে আল্লাহপাকের নেয়ামতের মর্যাদা থাকে না। এজন্যই তাদের স্বভাব আমিত্ব, বৈরিতা ও হঠকারিতায় ভরপুর হয়ে যায়। হঠকারিতা কী? নিজে ভুল করে এর ওপর নিজেকে শক্ত অবস্থানে রাখা। ভুল করে অনুতপ্ত না হয়ে অপব্যাখ্যার সন্ধান করে নিজেকে সত্য প্রমাণ করতে চায়। জেনে রাখবেন! হঠকারিতা একটা শয়তানি কাজ। এ কাজ সর্বপ্রথম মিস্টার ইবলিসই করেছিল। বর্তমানে একাজ এমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, শতকরা প্রায় নব্বইজন লোকই এ রোগে আক্রান্ত।

ঘরের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখুন, স্ত্রী ভুল করে। তারপর স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হয়। উভয়জন কথা কাটাকাটি করে। স্ত্রী বোঝে, এখন আমার স্বামী আমাকে শায়েস্তা করবে। তবু নিজের ভুল মেনে নিতে রাজী নয়। এভাবে স্বামীও বোঝে, আমি আমার স্ত্রীর ওপর জুলুম করছি। আমি শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করছি। তারপরও নিজের হঠাকারিতা ছাড়তে রাজী নয়। এমনিভাবে দুই ভাই কোনো বিষয় নিয়ে বিতণ্ডা করছে। সবাই স্বস্থানে অটল। একজন অপরজনের ওপর প্রাধান্য পেতে চায়। এভাবে তাদের লক্ষ-লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে যায়; তবু প্রত্যেকে নিজ-নিজ অবস্থার ওপর অটল থাকে। কেউ নিজের ভুল স্বীকার করতে রাজী নয়।

ক্ষমা চাইলে সম্মান বাড়ে

প্রিয় বন্ধুগণ! একটি বাক্য অত্যন্ত সুন্দর। কী সেই বাক্যটি? তা হলো 'ভুল হয়েছে ক্ষমা করো'। আমরা যদি একথাটি বলতে শিখি, তাহলে দেখবে, হাজারো বিবাদের অবসান হয়ে গেছে। স্ত্রীর প্রতি স্বামী নারাজ থাকলে একথাটি বললেই বিবাদ মিটে যায়। ছেলের প্রতি পিতা রাগান্বিত থাকলে একথার দ্বারা পুনরায় ভালোবাসা ফিরে পায়। আরও অনেক বড়-বড় সমস্যা এ কথার দ্বারা সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের কে কেউ এ কথাটি শিখিয়েছে? এটি পীর-মুরশিদের কাজ। স্মরণ রাখবেন, আজ একে অপরের কাছে ক্ষমা চাওয়া খুবই সহজ কাজ। কিন্তু কেয়ামতের দিন এই বিবাদ মিটানো অত্যন্ত কঠিন হবে।

কেয়ামতের দিন একজনকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি অমুক ব্যক্তিকে কমবখত বলেছিলে কেন? অমুককে অপমান করেছিলে কেন?

অমুককে বে-ঈমান বলেছিলে কেন? এর উত্তর দাও। ভাই! ভেবে দেখুন, তখন আমাদের কী দুর্দশা হবে? তাই আজ একে অপরের কাছে ক্ষমা চাইতে শিখুন। এটি অত্যন্ত ভালো গুণ। এটি হযরত আদম (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল। এতে সম্মান রয়েছে। হযরত আদম (আ.) যখন গন্দম খেয়েছিলেন, তখন আল্লাহর তিরস্কার আর ধমক এসেছিল। আল্লাহপাক বললেন, আমি কি তোমাকে এটা খেতে নিষেধ করিনি? আমি নিষেধ করার পরও খেয়েছ কেন? হযরত আদম (আ.) প্রথমে একথা বললেন যে, হে আল্লাহ! আমার ভুল হয়েছে। আমি মনে করেছি, নিষিদ্ধ গাছ অন্যটি হতে পারে। আমি ইচ্ছা করে এ কাজ করিনি; বরং সোজা একটি কথা বলে দিলেন–

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

'হে আমার রব! আমি আমার নফসের ওপর জুলুম করেছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমার ওপর রহমত নাযিল না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'[৯২]

বোঝা গেল, ভুল স্বীকার করা হযরত আদম (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য। সুতরাং প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি, যে নিজের ভুল সহজে স্বীকার করে নেয়। বর্তমানে মানুষ ভুল স্বীকার করার পরিবর্তে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। অফিস-আদালতে দেখবে, কালেক্টর-কেরানিরা নিজের দোষ ঢাকার জন্য অফিসারের সামনে মিথ্যা বলতে থাকে। সে বোঝে না, আমার থেকে মিথ্যার একটি সিরিজ শুরু হয়েছে। এর চেয়ে ভুল স্বীকার করা সহজ নয় কি? অফিসার তাকে দোষারোপ করলে সে যদি বলে, জনাব, আমার ভুল হয়েছে ভবিষ্যতে আর এমন হবে না, তাহলে অফিসার তার প্রতি ক্রোধের পরিবর্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে।

পক্ষান্তরে দেখুন, শয়তানও ভুল করেছিল। আল্লাহপাক আদেশ করা সত্ত্বেও ইবলিস হযরত আদম (আ.)কে সেজদা করেনি। আল্লাহপাক বললেন, ইবলিস! তুমি আদমকে সেজদা করনি কেন? তখন সে তার ভুল স্বীকার করার পরিবর্তে যুক্তি উপস্থাপন করে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দ্বারা আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। ভুল স্বীকার না করে যখন হঠকারিতা প্রকাশ করল, তখন আল্লাহপাক বললেন, বের হও তুমি এখান থেকে; তুমি অভিশপ্ত।

---

৯২. সূরা আরাফ : আয়াত ২৩

আল্লাহর আদেশ অমান্য করার পরিণাম দেখছেন? শুধু দরবার থেকে বের করেই দেননি; বরং আল্লাহপাক বলেছেন, নিশ্চয় তোমার ওপর কেয়ামত পর্যন্ত আমার অভিশাপ। সুতরাং যে বান্দা ভুল করে উল্টো হঠকারিতা দেখাবে, তার প্রতি আল্লাহপাক এমন আচরণই করবেন। হযরত আদম (আ.)কে আদব ও সম্মানের সাথে স্মরণ করা হয়। পক্ষান্তরে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য আদেশ করা হয়েছে।

جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کرکے دیکھ

جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مرکے دیکھ

যেমন কর্ম তেমন ফল; না বুঝলে করে দেখ। বেহেশত আছে দোযখ আছে; না মানলে মরে দেখ।

ইহুদিদের একটা মারাত্মক অপরাধ

বন্ধুগণ! হঠকারিতা বর্তমানে সীমা অতিক্রম করে চলছে। ছোট ভাই বড় ভাইয়ের কথা শোনে না। সন্তান পিতামাতার কথা শোনে না। কোনো কিছু বললে রেগেমেগে আগুন হয়ে যায়। আবার এ গুনাহ থেকে কেউ তাওবাও করছে না। এমনকি কোনো আলেম কোনো ভুল মাসয়ালা বর্ণনা করলেও তিনি হার মানতে রাজী নন। বরং কিতাব তালাশ করেন, কোথাও কোনো তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করেন। এখন কুরআন-হাদীছে আল্লাহপাকের নির্দেশ বের না করে নিজের ইচ্ছার অনুকূল সমাধান সন্ধান করতে থাকেন। স্মরণ রাখবেন, এর দ্বারা ভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পায়। ইহুদিদের এটাই বড় অপরাধ ছিল। মনগড়া কথা বলে দিত। তারপর তাওরাতে সন্ধান চালাত কোথাও কোনো আয়াত তাদের স্বপক্ষে পাওয়া যায় কি-না। এ কারণেই তাদের তিরস্কার করা হয়েছে।

বান্দার হক থেকে মুক্তি নেওয়া অবশ্যক

স্মরণ রাখবেন! যদি ভুল স্বীকার করে সত্বর ক্ষমা চেয়ে নেন, তাহলে বড়-বড় সমস্যা নিমিষেই শেষ হয়ে যাবে। আমরা যদি আল্লাহপাকের কোনো হক নষ্ট করি, তাহলে তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু বান্দার হক বান্দা থেকে ক্ষমা করাতে হবে। একটু ভেবে দেখুন! কতজনের গীবত করেছেন; কতজনকে অপবাদ দিয়েছেন। কতজনের সঙ্গে হিংসা করেছেন।

কতজনকে দুঃখ দিয়েছেন। কতজনের প্রতি খারাপ ধারণা করেছেন। কতজনকে হাতের দ্বারা কষ্ট দিয়েছেন। কতজনকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেছেন। কিন্তু আমরা কি কারও কাছে ক্ষমা চেয়েছি? দেখতে মাশাল্লাহ্ সূফী সাহেব মনে হয়। স্মরণ রাখবেন, এই দরূদ ও তাসবীহ্ কোনো কাজে আসবে না। বান্দার হক যেখানে থাকবে, সেখান থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। সুতরাং এখন থেকেই এ কাজের অভ্যাস গড়ে নিন। দুনিয়াতে মাফ চাওয়া সহজ; কিন্তু কেয়ামতের দিন জবাব দেওয়া কঠিন।

একটি গাভির ঘটনা

মুহাম্মদ শাহ্ নামে একজন ধার্মিক বাদশাহ্ ছিলেন। একদিন তিনি সিপাহীদের নিয়ে শিকারে গেলেন। বাদশাহ্ শিকারে মগ্ন থাকা অবস্থায় সিপাহীরা এক বৃদ্ধার একটি গাভি জবাই করে খেয়ে ফেলল। মহিলা বিনয়ের সাথে বলল, আপনারা আমাকে কিছু টাকা দিয়ে দেন; তাহলে আমি আরেকটি গাভি খরিদ করে নেব। কিন্তু সিপাহীরা তাতে অসম্মতি জানাল। নিরূপায় হয়ে মহিলা একজন আলেমকে বলল, হুজুর! আমি এখন কী করতে পারি! এই গাভিটি ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন। আলেম বললেন, তুমি একটা কাজ করো। সরাসরি বাদশাহর কাছে গিয়ে অভিযোগ জানাও। বাদশাহ্ খুব দীনদার মানুষ; অবশ্যই তোমার ফয়সালা করবেন। মহিলা বলল, সিপাহীরা আমাকে বাদশাহর সামনে যেতে দিচ্ছে না। হুজুর বললেন, বাদশাহ্ আগামীকাল বাড়িতে যাবেন। তুমি তার বাড়িতে যাবে। সেখানে দেখতে পাবে, বাদশাহর বাড়িতে প্রবেশের একটি মাত্র পথ রয়েছে। আর বাড়িতে প্রবেশের আগে একটি পুল আছে। এই পুল ছাড়া বাদশাহ্ বাড়িতে ঢুকতে পারেন না। তাই তুমি সেই পুলে বসে থাকবে। তারপর বাদশাহ্ যখন ওই পুলে উঠবেন, তখন তুমি দাঁড়িয়ে বাদশাহর বাহনের গতি রোধ করে তোমার অভিযোগ পেশ করবে।

হুজুরের কথামতো বুড়ি পরের দিন ওই সেতুতে গিয়ে বসে রইল। বাদশাহ্ আসার পর বুড়ি দাঁড়িয়ে তাঁর বাহন থামাল। বাদশাহ্ বললেন, মা তুমি কী চাও? আমার বাহন আটকালে কেন? বুড়ি বলল, আপনার ও আমার মধ্যে একটি জঠিল বিষয় আছে। এর সমাধান আপনি এই পুলের ওপর করবেন, নাকি পুলসিরাতে করবেন? পুলসিরাতের কথা শুনতেই বাদশাহর দু' নয়ন অশ্রুতে সিক্ত হয়ে গেল। বাহন থেকে নেমে এসে বললেন, মা কী

তোমার অভিযোগ? বলো, আমি এখানেই সমাধান করতে চাই। পুলসিরাতে কোনো বিষয়ের সমাধান করার যোগ্যতা আমার নেই। তারপর বুড়ির অভিযোগ শুনে তাকে সত্তরটি গাভির মূল্য দিলেন এবং তার কাছে ক্ষমা চাইলেন, যাতে পুলসিরাতে তার হাত হতে মুক্তি পান।

মুজাহিদগণের ক্ষমা প্রার্থনা

আমাদের অভ্যাস হলো, ভুল করি; তবু ক্ষমা চাই না। আর আল্লাহওয়ালাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা নেকির কাজ করেন। তারপরও ক্ষমা চান। হে আল্লাহ! যেভাবে তোমার ইবাদাত করার কথা ছিল, সেভাবে করতে পারিনি। কুরআনে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যারা আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে গিয়ে জিহাদ করেন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন–

وَ كَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَ هَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ مَا ضَعُفُوْا وَ مَا اسْتَكَانُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ۝

'অনেক নবী অতিবাহিত হয়েছে; তাদের সঙ্গে অসংখ্য খোদাপ্রেমিক জিহাদ করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে অসহনীয় বিপদের সম্মুখিন হয়েও তারা সাহস হারায়নি এবং পিছপা হয়নি। আল্লাহ এ-ধরনের ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।'[৯৩]

বন্ধুগণ! যারা এমন কিছু অনড় অবস্থায় নিজের জান আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে দিয়েছেন, তারা নিজের অবদানের ওপর দয়ারপ্রকাশ করেননি; বরং তারা বলেন–

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِيْۤ اَمْرِنَا

'হে আল্লাহ! আমাদের অপরাধ এবং আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করে দিন।'[৯৪]

হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইলেন

আল্লাহপাক হযরত নূহ (আ.)কে বললেন, তোমার সম্প্রদায় অনেক নাফরমানি করেছে। তাই আমি তোমাকে এবং তোমার পরিবারবর্গকে রক্ষা

---

৯৩. সূরা আলে-ইমরান : আয়াত ১৪৬

৯৪. সূরা আলে-ইমরান : আয়াত ১৪৭

করব এবং জালেম সম্প্রদায়কে ধ্বংস করব। তুমি আমার নির্দেশমতো একটি জাহাজ তৈরি করো আর জালেমদের পক্ষে কোনো সুপারিশ করো না। প্লাবন আসার পর যখন ঈমানদাররা জাহাজে আরোহণ করল, তখন হযরত নূহ (আ.) তার অবাধ্য সন্তান কেনানকে লক্ষ করে বললেন–

يٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا

'হে ছেলে! তুমি আমার সঙ্গে কিশতিতে আরোহণ করো।'[৯৫]

কিন্তু ছেলে বলল, আমি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করব আর সেই চূড়া আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে। বাপ-বেটার কথাবার্তার মধ্যেই একটি বিরাট ঢেউ এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পিতার চোখের সামনে সন্তান পানিতে নিমজ্জিত হয়ে মারা গেল। যেহেতু আল্লাহপাক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমি তোমার পরিজনকে রক্ষা করব, তাই পিতৃত্বের সহানুভূতির প্রবল আবেগে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন–

اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ

'হে আল্লাহ! আমার ছেলে তো আমার পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত। তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য। তুমি মহাবিচারক।'[৯৬]

একথা বলার সাথে-সাথেই আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধপূর্ণ জবাব এল–

اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ

'হে নূহ! সে তোমার পরিবারের মধ্যে নয়। তার আমল সংশোধিত নয়।'[৯৭]

এরপর আল্লাহপাক আরও অনেক কথা বললেন; মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আল্লাহপাক বলেন–

فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۖ اِنِّيْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

'হে নূহ! তুমি আমাকে এমন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না, যে সম্পর্কে তুমি অবগত নও। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। এমন যাতে না হয় যে, তুমি অজ্ঞদের দলভুক্ত হয়ে যাও।'[৯৮]

---

৯৫. সূরা হূদ : আয়াত ৪২
৯৬. সূরা হূদ : আয়াত ৪৫
৯৭. সূরা হূদ : আয়াত ৪৬
৯৮. সূরা হূদ : আয়াত ৪৬

আল্লাহপাকের এই রাগান্বিত সম্বোধন শুনে হযরত নূহ (আ.) কোনো প্রকার আপত্তি পেশ করেননি; মনক্ষুণ্নও হননি; বরং ক্ষমা চাইতে শুরু করলেন–

رَبِّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُ بِکَ اَنۡ اَسۡـَٔلَکَ مَا لَیۡسَ لِیۡ بِہٖ عِلۡمٌ ؕ وَ اِلَّا تَغۡفِرۡ لِیۡ وَ تَرۡحَمۡنِیۡۤ اَکُنۡ مِّنَ الۡخٰسِرِیۡنَ ﴿۴۷﴾

'হে আমার মালিক! আমি আপনার দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি যে, ভবিষ্যতে আপনার কাছে এমন কোনো বিষয়ে আবদার জানব না, যে বিষয়ে আমি জ্ঞাত নই। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আপনার অশেষ রহমত দান না করেন, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব।'[৯৯]

আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে সঠিক জ্ঞান দান করুন। আমাদেরকে এ পৃথিবীতে নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

৯৯. সূরা হুদ : আয়াত ৪৭

শ্রম ও সাধনা

'বন্ধুগণ! দীনের কাজ করে ক্লান্ত হলে খুশি হওয়া চাই। যত বেশি ক্লান্ত হবে, তত বেশি খুশি হবে। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তত বেশি ইবাদাত করো, যাতে সৃষ্টিকুল তোমাদের দেখে হতাশ হয়ে যায়।

সাধারণ নিয়ম হলো, মানুষ বর্গা বস্তু দ্বারা অল্প সময়ে অধিক কাজ নিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, যদি কোনো লোকের ইস্ত্রি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে অন্যের কাছে থেকে চেয়ে আনে। তারপর সেটা দিয়ে শুধু নিজের কাপড় ইস্ত্রি করে না; বরং বিবি-বাচ্চা সকলের কাপড় ইস্ত্রি করে। কারণ, সে জানে, এটা চেয়ে এনেছি; বেশি সময় রাখতে পারব না; দিয়ে দিতে হবে।

এমনিভাবে আমাদের এ দেহ আমাদের কাছে বর্গা দেওয়া হয়েছে। মূল মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। সামান্য সময়ের জন্য আমাদের কন্ট্রোলে রয়েছে। তাই ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারি।'

শ্রম ও সাধনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ.

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

শ্রমের মধ্যে সম্মান

জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে কর্ম– বিশ্রাম নয়। বিশ্রামের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত রেখেছেন। এ পৃথিবীতে ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ যারা সম্মান ও মর্যাদা পেয়েছেন, তারা শ্রমের বিনিময়েই পেয়েছেন। যেহেতু শ্রমের মধ্যেই সম্মান রয়েছে, তাই যুবকরা গুরুত্ব দিয়ে পরিশ্রম করার দরকার। শ্রম হতে প্রাণ বাঁচানো আর গা ঢাকা দেওয়া ভালো কাজ নয়। শান্তি চাওয়া আর গা ঢাকা দেওয়ার মতো কাজ মুমিনের জীবনে আসতে পারে না; বরং তাদের জীবনে কষ্ট, শ্রম ও সাধনা হয়। তাই কথাটি নোট করে রাখুন যে, জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্ম আর সামান্য বিশ্রাম। বিশ্রাম নেবে আবার কাজ করবে। যারা শ্রম-সাধনায় লিপ্ত থাকে, তাদের বিশ্রামেও আল্লাহপাক ছাওয়াব দান করেন।

হাদীছ শরীফে এসেছে–

হাদীসের নামে জালিয়াতি ৩৩৮ পৃ:

نَوْمُ الْعُلَمَاءِ عِبَادَةٌ

'আলেমদের ঘুম ইবাদাত।'

অর্থাৎ– যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম দীনের কাজ করেন, তারপর শরীরকে কিছু বিশ্রাম দিয়ে আবার ধর্মের কাজ করেন, আল্লাহপাক তাদের বিশ্রামের সময়কেও দীনের কাজে গণ্য করেন।

বর্গা জিনিসের মূল্যায়ন বেশি হয়

বন্ধুগণ! দীনের কাজ করে ক্লান্ত হলে খুশি হওয়া চাই। যত বেশি ক্লান্ত হবে, তত বেশি খুশি হবে। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তত বেশি ইবাদাত করো, যাতে সৃষ্টিকুল তোমাদের দেখে হতাশ হয়ে যায়।

সাধারণ নিয়ম হলো, মানুষ বর্গা বস্তু দ্বারা অল্প সময়ে অধিক কাজ নিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, যদি কোনো লোকের ইস্ত্রি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে অন্যের কাছে থেকে চেয়ে আনে। তারপর সেটা দিয়ে শুধু নিজের কাপড় ইস্ত্রি করে না; বরং বিবি-বাচ্চা সকলের কাপড় ইস্ত্রি করে। কারণ, সে জানে, এটা চেয়ে এনেছি; বেশি সময় রাখতে পারব না; দিয়ে দিতে হবে।

এমনিভাবে আমাদের এ দেহ আমাদের কাছে বর্গা দেওয়া হয়েছে। মূল মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। সামান্য সময়ের জন্য আমাদের কন্ট্রোলে রয়েছে। তাই ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারি। যারা মেশিনের মাধ্যমে শিল্পের কাজ করে, তারা স্বাভাবিক ডিউটি ৮ ঘন্টা চালিয়ে ১৬ ঘন্টা বন্ধ রাখে না। বরং তারা তিন শিফটে কাজ চালিয়ে যায়। মানুষ পরিবর্তন হয়; কিন্তু মেশিন বন্ধ করে না। এমনিভাবে আল্লাহপাকের বান্দা এ দেহকে যথেষ্ট কাজে লাগিয়ে তারা আল্লাহপাকের ইবাদাত করে। বর্গা মেশিন দিয়ে তারা রাতদিন ইবাদাত করে উপকৃত হন।

ইবাদাতের আগ্রহ প্রকৃত হিংসার পাত্র হতে পারে

আমাদের মাশায়েখদের অন্তরে ইবাদাতের প্রবল আগ্রহ থাকত। কথিত আছে, এক বুযুর্গ সত্তর বছর বয়সে পবিত্র কা'বা শরীফ দৈনিক সত্তরবার তাওয়াফ করতেন। আমরা দৈনিক পাঁচবারের বেশি করতে সক্ষম হই না। ভেবে দেখুন, সাত চক্কর দিলে এক তাওয়াফ হয়। এ হিসেবে পাঁচবার তাওয়াফ করলে মোট পঁয়ত্রিশ চক্কর হয়। আর তিনি সত্তর তাওয়াফে মোট চারশত নব্বই চক্কর দিতেন। সুবহানাল্লাহ!

প্রত্যেক তাওয়াফের পর দুই রাকাত নফল নামায পড়তেন। এ হিসেবে একশত চল্লিশ রাকাত নামায পড়তেন। চিন্তা করে দেখুন! আমরা জীবনে একবার এক সঙ্গে পঞ্চাশ রাকাত নামায পড়লে কী পমিাণ ক্লান্ত হব? শেষ রাকাতে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ এর স্থলে اوفى الله বেরিয়ে আসবে। এবার দেখুন যেব্যক্তি দৈনিক সত্তর তাওয়াফ ১৪০ রাকাত নামায পড়েন। তার অন্যান্য

ইবাদাত কী পরিমাণ হতে পারে। সুতরাং একথা বললে ভুল হবে না যে, তারা চব্বিশ ঘন্টার প্রতিটি মিনিট সঠিক কাজে ব্যবহার করেছেন।

হযরত জুরজানি (রহ.)-এর আমল

খাজা সিররি সাকতি (রহ.) বলেন, আমি একদিন হযরত জুরজানি (রহ.) কে ছাতু পাকাতে দেখে বললাম, হযরত ছাতু পাকাচ্ছেন কেন? রুটিই বানিয়ে নিন। তিনি বললেন, রুটি পাকানোর চেয়ে ছাতু পাকাতে সময় কম লাগে। আমি হিসাব করে দেখেছি, রুটি পাকাতে যে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়, তাতে মানুষ কমপক্ষে সত্তরবার 'সুবহানাল্লাহ' বলতে পারে। তাই আমি বিগত চল্লিশ বছর যাবৎ রুটি পাকানো ত্যাগ করে ছাতু পাকিয়ে জীবন কাটাচ্ছি। এতে প্রতীয়মান হয়, আমাদের পূর্বপুরুষগণ নিজের প্রয়োজনীয় সময় থেকেও সাশ্রয় করে আল্লাহপাকের ইবাদাত করতেন।

শিষ্য হলে এমন হও

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ছিলেন ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর ছাত্র। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এক জায়গায় দরস দিয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর প্রবল আগ্রহ ছিল, আমি অমুক কিতাবটিও মুহাম্মদ (রহ.)-এর কাছে পড়ব। কিন্তু সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে একদিন তিনি মুহাম্মদ (রহ.)-এর কাছে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বললেন, বাবা! সময়ের অবস্থা তো তুমি নিজেই দেখছ। এক জায়গায় দরস শেশ করার আগে অন্য জায়গায় ঘোড়া প্রস্তুত রাখা হয়। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বললেন, হুজুর! আপনি যখন ঘোড়ায় চড়ে অন্যত্র যাবেন, তখন আমি দৌড়িয়ে আপনার ঘোড়ার সঙ্গে যাব এবং আপনি ঘোড়ার ওপর থেকে পড়াবেন; আমি নিচে থেকে শুনব। তবু আমি আপনার কাছে হাদীছ শিক্ষা করব।

এক হাদীছের দ্বারা চল্লিশটি মাসয়ালার জবাব

একদা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম মালেক (রহ.)-এর দরবারে গিয়ে সারা রাত সজাগ রইলেন। ইমাম মালেক (রহ.) বললেন, তুমি সারা রাত ঘুমাওনি কেন? ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বললেন, আমার একটি হাদীছের কথা স্মরণ হয়েছিল যে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আনাস (রাযি.)-এর ছোট ভাইকে – যিনি শিশু ছিলেন – বললেন–

يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ

'হে আবু উমাইর তোমার পাখিটা কী করেছে।'

তিনি একটি পাখি পুষেছিলেন। পরে সেটা মারা যায়। তাই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গে দেখা হলেই খুশি মনে বলতেন, তোমার পাখি তোমার সঙ্গে কী করেছে। অর্থাৎ– সেটা মরে গেছে আর তোমাকে রেখে গেছে। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী বলেন, আমি হাদীছের এই ছোট বাক্যটি গবেষণা করতে লাগলাম আর এর মাধ্যমে আমি ফেকাহ শাস্ত্রের চল্লিশটি মাসয়ালার জবাব বের করলাম। ছোট বাচ্চাদের تصغير-এর সীগার দ্বারা ডাকা যায়। উপনাম দিয়ে কীভাবে ডাকা যায়। সুবহানাল্লাহ! তাই ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন, হে আল্লাহ! তোমার স্মরণ ব্যতীত দিন সুখের নয় এবং তোমার রহস্য ও প্রার্থনা ব্যতীত রাতও সুখের নয়।

সেজদার মাধ্যমে নৈকট্য হাসিল হয়

হাদীছ শরীফে এসেছে, আল্লাহপাক বলেন–

يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ عَبْدِيْ بِالنَّوَافِلِ

'আমার বান্দা সেজদার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করে।'

কুরআনপাকে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

'সেজদা করো আর নৈকট্য অর্জন করো।'[১০০]

নফল নামাযে যেহেতু সেজদা থাকে, তাই হাদীছে বলা হয় সেজদার মাধ্যমে নৈকট্য হাসিল হয়। কুরআন মাজীদেও সে কথাই বলেছে। সেজদা করো নিকটে আস। কিন্তু আমরা সেজদা করতে ভয় পাই। নফল পড়ার সুযোগ হয় না। ফরযের সাথে নফল পড়তেই কষ্ট হয়। বাকিগুলো কী পড়ব। সুতরাং নফল যদি না পড়, তাহলে নৈকট্য হাসিল করবে কীভাবে। কুরআন ও হাদীছের ভাষ্য তো মিথ্যা হতে পারে না। নফল ছাড়া কোনো উপায় নেই। একারণেই ইমাম আবু হানীফা (রাযি.) ঈশার উজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করতেন। এভাবে চল্লিশ বছর কাটিয়েছেন।

---

১০০. সূরা আলাক : আয়াত ১৯

হযরত জুয়াইরিয়া (রাযি.)-এর ইবাদাতের আগ্রহ

হাদীছ শরীফে এসেছে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাযের পর ফজরের সময় হলে মসজিদে চলে যান। যাওয়ার সময় দেখলেন, তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়াইরিয়া (রাযি.) মুসল্লায় বসে আল্লাহপাকের যিকির করছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিনের মতো দীর্ঘ কেরাতের মাধ্যমে ফজরের নামায শেষ করে মসজিদে বসে সাহাবায়ে কেরামদের নসীহত করলেন। এতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হলো। চাশতের সময় হয়ে গেল। মনে করুন বর্তমানকার সকাল ৯টা বেজেছে। তারপর তিনি ঘরে গিয়ে দেখলেন, হযরত জুয়াইরিয়া (রাযি.) এখনও জায়নামাযে বসে আল্লাহপাকের যিকির করছেন। সুবহানাল্লাহ!

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, জুয়াইরিয়া! তুমি কি তখন থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত যিকিরই করছিলে? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মধ্যখানে শুধু ফজরের নামায পড়েছি। আর এখন পর্যন্ত বাকি সময় আল্লাহর যিকিরই করেছি।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, মুমিনদের মাতা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ ঘণ্টার পর ঘন্টা জায়নামাযে বসে আল্লাহর যিকির করা তাঁদের অভ্যাস ছিল। উম্মতের নেককার মহিলাগণেরও এ অভ্যাস ছিল। তাদের অন্তরে ইবাদাতের আগ্রহ ছিল। জায়নামাযের সাথে মহব্বত ছিল। স্মরণ রাখবেন, যে বান্দা দেখতে চায়, আল্লাহপাকের সাথে আমার ভালোবাসা কতটুকু রয়েছে, সে যেন দেখে নেয়, সে জায়নামাযে বসে কতটুকু প্রশান্তি পায়। যদি আল্লাহপাকের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকে, তাহলে সে জায়নামাযে এমন প্রশান্তি পাবে, যেমনটি ছোট শিশু তার মায়ের কোলে পেয়ে থাকে।

যাক, তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী জুয়াইরিয়া (রাযি.)কে বললেন, জুয়াইরিয়া! আমি তোমাকে কিছু বাক্য শেখাব; সেগুলো তুমি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার পাঠ করলে আজ তাহাজ্জুদের সময় থেকে এ পর্যন্ত যিকির করে যে-পরিমাণ ছাওয়াব পেয়েছ, সেই পরিমাণ ছাওয়াব পাবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো আমাকে তাড়াতাড়ি বলে দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই কালেমা হচ্ছে–

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

নবুওতের ভাবনা ও তার প্রসার

হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আয় কী পরিমাণ গভীরতা ছিল, তা পূর্ববর্ণিত বাক্যের দ্বারাই বোঝা যায়। একটু লক্ষ করুন।

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ আমি আল্লাহপাকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রসংশা করছি।

عَدَدَ خَلْقِهٖ অর্থাৎ– আমি আল্লাহপাকের এ পরিমাণ প্রসংশা করছি, যে-পরিমাণ তাঁর সৃষ্টি রয়েছে। সুবহানাল্লাহ! হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাঁর উম্মতকে এমন শিক্ষা না দিতেন, তাহলে তাদের বিবেক এদিকে ধবিতই হতো না যে, এমন দু'আ তারা স্মৃতিপটে এনে প্রার্থনা করতে পারে। এটা হলো উম্মতের ওপর মনুষ্যত্বের দয়া। তিনি প্রিয়-প্রিয় বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। তাতে আমরা অল্প সময়ে অধিক ছাওয়াব হাসিল করতে পারি। এখন প্রশ্ন হয়, আল্লাহপাকের সৃষ্টির সংখ্যা কত? বর্তমানে পৃথিবীতে জনসংখ্যা প্রায় বিলিয়ন হবে এবং প্রায় ট্রিলিয়ন মানুষ চলে গেছে। কেয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে কয়েক ট্রিলিয়ন হবে। এ পরিমাণ যদি শুধু মানুষই হয়, তাহলে অন্যান্য প্রাণী কেমন হবে? পাখি কেমন হবে? সামান্য নিচে গেলে জীবাণু কেমন হবে? বলা হয়, এক গ্রাম মাটিতে প্রায় কয়েক মিলিয়ন জীবাণু হবে। ব্যাকটেরিয়া কী পরিমাণ হবে? আমরা একটি শ্বাস গ্রহণ করলে প্রায় কয়েক মিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া আমাদের ভেতরে চলে যায়। তাহলে সারা পৃথিবীতে কী পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া হবে? আল্লাহু আকবার! জিন, ফেরেশতা, হুর-গেলমান, গাছপালা সবকিছুই তো আল্লাহর মাখলুক। সবগুলো কী গণনা করা সম্ভব?

আল্লাহপাক বলেন–

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ

'নিশ্চয় আল্লাহপাকের সৈন্যবাহিনী তিনি ব্যতীত কেউ জানে না।'[১০১]

সুতরাং আল্লাহপাকের মাখলুক যদি এ পরিমাণ হয়, তাহলে ভেবে দেখুন, আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ দু'আ করেছেন। اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا কথাটি ছোট কিন্তু এতে আল্লাহপাকের কী পরিমাণ প্রসংশা করা হয়!

---

১০১. সূরা মুদ্দাছছির : আয়াত ৩১

وَ رِضٰى نَفْسِهٖ অর্থাৎ– হে আল্লাহ আমি তোমার এ পরিমাণ প্রসংসা করি, যে-পরিমাণ করলে তুমি খুশি হও। কী পরিমাণ প্রসংশা করলে আল্লাহপাক খুশি হবেন তা একমাত্র তিনিই জানেন।

وَ زِنَةَ عَرْشِهٖ হে আল্লাহ! তোমার আরশের ওজন পরিমাণ প্রসংশা করি। আর তা-ও একমাত্র আল্লাহপাকই জানেন।

وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ হে আল্লাহ! তোমার কালেমা পরিমাণ প্রসংশা করি। সুতরাং আল্লাহপাকের কালেমা ও সিফাত কী পরিমাণ। আসুন কুরআন মাজীদে একটু আলোকপাত করি। আল্লাহপাক বলেন–

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۝

'হে আমার হাবীব! আপনি বলে দিন, যদি সমস্ত পৃথিবীর সকল সমুদ্রের পানি কালি বানিয়ে তা দ্বারা তোমার প্রভুর প্রসংশা লিখতে শুরু করা হয়, তবে এক সময় সেই কালি শেষ হয়ে যাবে; তবু তাঁর প্রসংশা লেখা শেষ হবে ন।'[১০২]

অন্য জায়গায় বলেছেন– যদি পৃথিবীর সমস্ত গাছ কলম বানানো হয় আর সারা দুনিয়ার সমস্ত সাগরের পানিও তার মতো আরও সাত সাগরের পানি একত্রিত করে কালি বানিয়ে আল্লাহর প্রশংসা লেখা হয়, তাহলে একসময় সমস্ত কলম ক্ষয় হবে এবং সমস্ত কালি শেষ হবে; তবু আল্লাহপাকের প্রসংশা লেখা শেষ হবে না। সুবহানাল্লাহ!

সুতরাং বন্ধুগণ! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিন্তার সৌন্দর্য ও বিস্তার কেমন ছিল বুঝে নাও। মূলত এটা নবুওতের চিন্তা, যা আল্লাহপাকের প্রসংশা অতি সুচারুভাবে বর্ণনা করেছেন।

এবার ভেবে দেখুন! ছোট একটি দু'আ যা শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ সবাই মুখস্থ করতে পারে। সুতরাং আমরা সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করে এর প্রতিদান গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু বর্তমানে আমরা কজন নিয়মতান্ত্রিক এ দু'আ পাঠ করি। নিজেকে একবার প্রশ্ন করে দেখুন। উত্তর পাবেন, অধিকাংশই এ দু'আ পড়তে অলসতা করে। স্মরণ রাখবেন, আমাদের অবসর সময় যেন আমরা ইবাদাতে ব্যয় করি। ইবাদাতও এমনভাবে

---

১০২. সূরা কাহাফ : আয়াত ১০৯

করতাম, যাতে অল্প সময়ে অধিক সওয়াবের অধিকারী হই। তাহলে আল্লাহপাকের অধিক নৈকট্য হাসিল করতে পারব।

বর্তমানে কজন পাবেন, যারা এ আশা পোষণ করে যে, আমরা তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহপাকের দরবারে হাজিরি দেব। যারা তাহাজ্জুদের সময় জাগ্রত হয়, ফেরেশতারা তাদের নাম লিখে তালিকা তৈরি করে আল্লাহর দরবারে পেশ করেন। আমাদের এ আশা থাকা দরকার যে, যদি আমাদের নাম খোদাপ্রেমিকদের তালিকায় উঠানো হতো!

এখন তোমার ঘুম কোত্থেকে আসবে

যিকিরের সারিতে উঠে যাও। বিশেষ করে আল্লাহওয়াদের সান্নিধ্যে অবস্থান করে দেখো। ইবাদাতে আগ্রহ বেড়ে যায়। ঘুম উড়ে যায়। আমাদের শায়েখের কাছে আমরা কখনও তিন, দিন কখনও পাঁচ দিনের জন্য যেতাম। তখন তাঁদের খানকায় এমন বরকত দেখতাম যে, ঘুম আসতই না। একবার নয়– বিশবার বিষয়টি পরীক্ষা করেছি। দিনে-রাতে কোনো সময় ঘুম আসত না। শেষ পর্যন্ত চার-পাঁচ দিনের সময় শরীর ক্লান্ত হয়ে যেত; তবু আত্মার প্রশান্তি পাওয়া যেত। শরীর ক্লান্ত হলে ঈশার পর দু-রাকাত নামায পড়ে শান্তিময় ঘুমের জন্য দু'আ করতাম। তবু ঘুম আসত না। একদিন আমার শায়েখকে বললাম, হুজুর! ব্যাপার কী? আপনার খানকায় এলে দিনে-রাতে কখনও ঘুম আসে না। তিনি মুচকি হেসে বললেন, হ্যাঁ; আমার মুরশিদ আমাকে জাগিয়ে রেখেছিলেন আর আমি তোমাদের জাগিয়ে রেখেছি। এখন তোমার ঘুম কোথা থেকে আসবে? কবি বলেন–

موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام
نیند بھر کے وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا

যেব্যক্তি পৃথিবীতে জাগ্রত থাকবে, সে কবরজগতে সুখনিদ্রায় থাকবে। তাই আমাদের অন্তরে ইবাদাতের আগ্রহ পয়দা করা দরকার। বিশেষ করে আলেম ও ছাত্রসমাজ এদিকে অগ্রসর হও।

আল্লাহপাক বলেন–

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ۝

'তোমরা মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহপাকের ইবাদাত করো।'[১০৩]

---

১০৩. সূরা হিজর : আয়াত ৯৯

কংকর মেরে শয়তান থেকে মুক্তি

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মৃত্যুযন্ত্রণাকালে তাঁর এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, শয়তানের ওপর কংকর মারা পায়ে হেঁটে ভালো, নাকি আরোহণ করে। সে জবাব দিল, আরোহণ করে। তিনি বললেন, না। সে বলল, পায়ে হেঁটে। তিনি বললেন, না। তারপর কোন সময় পায়ে হেঁটে উত্তম আর কোন সময় আরোহণ করে উত্তম সেই মাসয়ালা বলতে শুরু করলেন। এই মুহূর্তে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।

সর্বশেষ তিনি এ মাসায়েল বলতে লাগলেন কেন? ওলামায়ে কেরাম লিখেন যে, মানুষের অন্তিমকালে শয়তান তার কাছে আসে। সম্ভবত তখন শয়তান তাঁর নিকটে এসেছিল আর শয়তানকে দেখে তিনি কংকর নিক্ষেপের মাসয়ালা বলতে শুরু করেছেন এবং এর দ্বারা আল্লাহপাক তাঁকে শয়তান থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

ফতোয়া পড়তে পড়তে আল্লাহর কাছে চলে গেলেন

দেওবন্দ মাদরাসার একজন মুফতী সাহেবের জীবনীতে লেখা হয়েছে, তাঁর মৃত্যুর সময় একটি ফতোয়ার কিতাব তাঁর বুকের ওপর পাওয়া গেছে। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, ফতোয়া পড়া অবস্থায় তাঁর প্রাণবায়ু বের হয়ে গেছে আর কিতাবটি তাঁর বুকের ওপর পড়ে আছে। সুবহানাল্লাহ! আমাদের বুযুর্গগণ সময়কে এমন অমূল্য সম্পদ মনে করতেন আর ইবাদাতের মধ্যে সময় কাটাতেন।

রাবেয়া বসরির ঈর্ষণীয় নেক আমল

হযরত রাবেয়া বসরি (রহ.) নামায আদায়কালে একলোক দু'আ চাওয়ার জন্য তাঁর কাছে গেল। তিনি নামাযে আছেন বলে সে চলে গেল। একটু পরে এসে দেখল, তিনি নফল পড়ছেন। তারপর আসরের নামায পড়ে যিকিরে বসে গেলেন। এদিকে ওই লোক বারবার আসছে। কিন্তু কথা বলার কোনো সুযোগই পাচ্ছে না। তারপর মাগরিব পড়ে আওয়াবীন পড়লেন। তারপর ঈশা পড়ে আবার নামাযে লিপ্ত হয়ে গেলেন। লোকটা এসে বসে আছে আর অপেক্ষার প্রহর গুনছে। শেষ পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে পড়ল যে, সকালে কথা বলব। সকালে তিনি ফজর পড়ে যিকিরে বসলেন, এশরাকের নামায পড়ে সামান্য বিশ্রাম নিলে ওই লোক উপস্থিত হলো। লোকজন তাকে বলছে- তিনি সারা রাত জাগ্রত থেকে এখন একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন; তুমি পরে এসো। লোকটি

সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগল। অল্পক্ষণ পরেই রাবেয়া বসরি ঘুম থেকে উঠে চক্ষু মুছতে-মুছতে বলছেন, হে আল্লাহ! যে চোখ এ ঘুমে তুষ্ট নয় এমন চক্ষু থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সুবহানাল্লাহ! একথা বলেই উঠে প্রয়োজন সেরে আবার ইবাদাতে বসে গেলেন।

ইমাম আবুহানীফা (রহ.) দুপুরের সময় সামান্য বিশ্রাম নিতেন। বাকি সময় আল্লাহর ইবাদাতে ব্যস্ত থাকতেন। বন্ধুগণ! একথাটি তখন বুঝতে পারলাম যে, আমাদের মাশায়েখগণ সারাটি জীবন কীভাবে ইবাদাতে ব্যয় করতে পেরেছেন। আল্লাহপাক তাঁদের ঘুমের মধ্যে বরকত দিতেন। তাই সামান্য সময় ঘুমিয়ে তারা দেহের পরিপূর্ণ আরাম পেতেন। তাদের ঘুম তো ঘুমের উদ্দেশ্যে হতো না; বরং অল্প সময় ঘুমিয়ে শরীরকে একটু বিশ্রাম দিয়ে আবার ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত করতেন। তাই আমার মুরশিদ (রহ.) জীবনের শেষলগ্নে বলতেন, বর্তমানে আমার দিন-রাতের পার্থক্য শেষ হয়ে গেছে।

মেহনতের চাকা

স্মরণ রাখবে, ইবাদাতের আগ্রহ তৈরি করতে চেষ্টা করতে হলে ভয় পাবে না– আনন্দিত হবে। কারণ, এ দুনিয়ার জন্য তো হাজারবার ক্লান্ত হয়েছ। এখন শুকরিয়া আদায় করো যে, আজ আল্লাহর জন্য ক্লান্ত হয়েছ। আমাদের বুযুর্গগণ বলতেন, আল্লাহকে পেতে চাও; অথচ অন্তরে সন্ধানের আগ্রহ থাকে না তা হতে পারে না। বরং এটা মনে করো যে, আল্লাহকে তালাশ করা মানে বিপদকে আহ্বান করা। এর মর্ম হলো, আল্লাহকে পেতে হলে চেষ্টা করা জরুরি। দুনিয়া পেতে হলে আটার চাক্কি পিষতে হয়। সুতরাং দীনের জন্য নিজে পিষ্ট হতে শুরু করো। নতুবা দুনিয়ার জন্য পেষানো হবে। পেষণ ছাড়া জীবন চলবে না। আল্লাহপাক বলেন–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝

'আমি মানুষদের চেষ্টা ও সাধনার (চাকা পেষার) জন্য সৃষ্টি করেছি।'[১০৪]

এ চাকা নবীগণ, সাহাবাগণ, ওলীগণ সবাই পেষণ করেছেন। তারপর উম্মতের পিষতে হবে। স্মরণ রাখবে! যদি কেউ দীনের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়, তাহলে আল্লাহপাক তাকে দুনিয়ার অফিসে নিয়োজিত করেন। সেখানে সে গাধার মতো কাজ করতে থাকে। কর্মকর্তারা তাকে ওভারটাইম

---

১০৪. সূরা বালাদ : আয়াত ৪

কাজ করায়। তারপরও সন্তুষ্টি হয় না। ফাঁসির আসামির মতো অস্থির থাকে যে, আজ আমার বস (ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা) আমার ওপর ক্ষেপে বসবেন। অবশ্যই যে আল্লাহকে রাজি করতে চায় না, আল্লাহ তাকে তার বসকে রাজি করার ভাবনায় লিপ্ত করেন। সুতরাং চাক্কি যেহেতু পিষতে হবে, তাই উত্তম হলো দীনের চাক্কিই পিষতে থাকো। তাহলে সত্যিকারার্থে মানবতার উন্নত শিখরে পৌঁছে যাবে। কবি বলেন–

فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا

مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ

মানুষ ফেরেশতার চেয়েও সম্মানিত হতে পারে যদি সঠিক সাধনা করতে পারে।

হযরত শিবলি (রহ.)-এর মহান সাধনার কাহিনি

খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিকের শাসনামলে অনেক রাষ্ট্রে ইসলামি শাসনব্যবস্থা ছিল। তিনি প্রত্যেক এলাকায় গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে যোগাযোগব্যবস্থার তেমন উন্নতি ছিল না। তাই প্রতি ছয় মাইল অন্তর-অন্তর সাংবাদিক নিযুক্ত ছিল। এদের কেউ ভালো সংবাদ দিতেন। কারও পক্ষে থেকে খারাপ সংবাদ এলে তিনি অত্যন্ত পেরেশান হয়ে যেতেন যে, এত ব্যাপক শাসনব্যবস্থায় এখন আমি কী করতে পারি। তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খুব বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, হুজুর! আপনি একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকল গভর্নরকে একত্রিত করে তাদের সুদক্ষ গভর্নরদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করুন। এতে অন্যান্যরা আনুমান করবে, আমাদের ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি রয়েছে। ফলে সবাই সচেতন হয়ে নিজেকে সুদক্ষ বানানোর চেষ্টা করে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বানাবে। এ পরামর্শটি বাদশাহর খুব পছন্দ হলো। তিনি এ অনুষ্ঠানের জন্য তারিখ নির্ধারণ করলেন। কোনো মেহমানখানা না থাকার কারণে বিশাল একটি মাঠের মধ্যে আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। লোকজন এসে সমবেত হতে শুরু করেছে। প্রায় হাজার মাইল দূরত্বের যারা, তারা এখানে আসতেই এক মাস সময় লাগবে। আবার যেতে এক মাস লাগবে। এখানে কিছুদিন অবস্থানও করতে হবে। তাই তারা স্বপরিবারে খাদেমসহ প্রায় তিন মাসের পথের খরচ সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। রাস্তায় পাহাড়, নদী, সাগর ইত্যাদি পাড়ি দিয়ে পায়ে হেঁটে আসতে শুরু করলেন। বর্তমানে তো হাজার মাইল পথ একদিনে

অতিক্রম করার জন্য গাড়ি, লঞ্চ, ট্রেন, বিমান ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে। আবার বিশেষ অতিথি এলে দেহরক্ষীও রাস্তায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। আর সেখানে আসার জন্য তারা এভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন যে, সামনের দিকে বনজঙ্গল ইত্যাদিতে কিছু লোককে উষ্ট্রারোহীদের আগেই পদব্রজে পাঠিয়ে দিত, যাতে রাস্তার মানুষ ও প্রাণীশত্রু থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। এর পেছনে এমন বাহন থাকত, যেগুলোতে মালামাল ও প্রাণীর খাবার থাকত। এর পেছনে তাদের মহিলা ও বাচ্চারা থাকত। তারপর পদব্রজে গমনকারীরা থাকত। এভাবে শত-শত উটের কাফেলা হয়ে যেত। সুতরাং এত সংখ্যক মেহনানের জন্য অতিথিশালা তৈরি করা অসম্ভব। তাই উন্মুক্ত মাঠেই ব্যবস্থা করে বাদশাহ বললেন– যারাই আসবে, তারা এই মাঠে তাঁবু নির্মাণ করে থাকবে।

বিভিন্ন এলাকার গভর্নরগণ নিজ-নিজ এলাকার পোশাক পরিধান করে আসতে শুরু করলেন। নির্ধারিত অনুষ্ঠানের দিন বিভিন্ন পোশাকের মানুষ, বিভিন্ন রঙের তাঁবু ইত্যাদির ফলে অত্র এলাকা যেমন সুসজ্জিত বাগানের মতো প্রতীয়মান হচ্ছে।

তারপর বাদশাহ গভর্নরদের ডেকে সুদক্ষদের পুরস্কার দিলেন এবং দায়িত্বে উদাসিনের কিছু সতর্ক করে দিলেন, যাতে তারা দায়িত্বের প্রতি সচেতন হয়। ওই দিন মাহফিল সমাপ্তিকালে বাদশাহ কতক গভর্নরকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি করে বিশেষ পোশাক দিলেন। যারা এগুলো পাচ্ছেন, তারা বাদশাহর দরবারে আসতে অনুমতির প্রয়োজন নেই। এগুলোকে এমন মনে করুন, যেন সেগুলো ছিল বর্তমান যুগের লন্ডন, আমেরিকার গ্রিনকার্ড। এ পোশাক থাকলে বাদশাহর সীমান্তপ্রহরীরা তাদের আসতে বাধা দেবে না। তারা যখন ইচ্ছা তখন এসে বাদশাহর সঙ্গে বিশেষ বৈঠক করতে পারবেন। তৎকালে এ পোশাক তাদের জন্য বিশেষ নেয়ামত ছিল।

এই পোশাক দিয়ে বাদশাহ বললেন, আজ আপানাদের এ পোশাক দেওয়ার আনন্দে আগামীকাল আপনাদের দাওয়াত। পরের দিন তারা উপস্থিত হয়ে দাওয়াত খাওয়ার পর মাহফিল শুরু হলো। বাদশাহ সিংহাসনে বসলেন। বর্তমান পরিস্থিতির ওপর মতবিনিময় শুরু হলো। মাহফিল চলাকালে কোনো একজনের হাঁচির ভাব হয়েছিল। তখন তো আর বিজ্ঞানের যুগ ছিল না। আর আমেরিকান হাঁচিও আসত না। একথা এজন্যই বললাম যে, বর্তমান আমেরিকার লোকেরা হাঁচির ব্যাপরে খুবই দক্ষ। একটু খেয়াল করলে দেখবে, অনুষ্ঠানের মধ্যে তাদের হাঁচি এল; কিন্তু এমনভাবে হাঁচিটা

সামলে নেয় যে, কাছে থেকেও বোঝা যায় না। এ ব্যাপারটা আমার আজ পর্যন্তও বুঝে আসেনি। আমি অনেকবার বুঝবার চেষ্টা করেছি; তবু বুঝতে পারিনি। তাই আমি স্বীকার করি, এ ব্যাপারে তারা দক্ষ।

যাহোক গভর্নর সাহেব হাঁচি দমন করার জন্য অনেকবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারছেন না। নিজে-নিজে হাঁচির সঙ্গে ফাইট শুরু করেছেন। শেষ পর্যন্ত দু-তিনটা হাঁচি দিয়ে দিলেন। হাঁচি তো আল্লাহর কুদরতি বিষয়। কিন্তু মানুষ হাঁচিদাতার প্রতি অপমানের দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে। তাই তিনি মাথাটা নত করে ফেললেন। এবার লোকেরা তার দিকে তাকানোর পর বাদশাহর দিকে মনযোগ হলো। আর স্বতঃসিদ্ধ কথা হলো, হাঁচি এলে নাক থেকে কিছু পানি বেরিয়ে আসে। তারও এমনই হলো। বর্তমান যুগের মতো তো তখন আলাদা রুমাল বা টিস্যু থাকত না; তাই চিন্তিত হলেন কী করা যায়। মনে-মনে ভাবলেন, মানুষ যখন আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে তাই এ জামার ওপরের অংশ দিয়ে মুছে নেব। যখন এই বিশেষ জামা দ্বারা নাক পরিষ্কার করতে লাগলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর দিকে বাদশাহর দৃষ্টি পড়ে গেল। বাদশাহ রেগে গর্জে উঠে বললেন, আমার দেওয়া পোশাক দিয়ে তুমি এমন কাজ করতে পারলে? বাদশাহ তার সেবকদের ডেকে বললেন, তার গা থেকে জামাটি খুলে নিয়ে এসো আর দরবার থেকে তাকে বের করে দাও। চৌকিদাররা পোশাক খুলে তাকে বের করে দিল। তারপর বাদশাহ নিজেও শান্ত হলেন। অন্যান্যরাও নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বিচক্ষণ উজির বলল, হুজুর! আজ বৈঠক সমাপ্তির ঘোষণা দিয়ে দিন। বাদশাহ অনুষ্ঠান সমাপ্তির ঘোষণা দিলেন। সবাই চলে গেল। শুধু বাদশাহ আর তাঁর উজির রইলেন।

ক্রোধের আগুনে বাদশাহ নীরব ছিলেন। উজির ভাবতে লাগলেন, আমাকে এমন একটা কথা বলতে হবে, যার দরুন বাদশাহর রাগ মিটে যায়। এবার বিচক্ষণ উজির কিছু বলতে চাইলেন। এমন সময় দারোওয়ান এসে বলল, হুজুর নাহাওন্দ-এর গভর্নর পুনরায় আসতে চাচ্ছেন। বাদশাহ বললেন, নিয়ে এসো। নাহাওন্দের গভর্নর এলে বাদশাহ বললেন, কী জন্য এসেছ? গভর্নর বললেন, হুজুর! শুধু একটি কথা বলতে চাই যে, হাঁচি মানুষের ইচ্ছাধীন, নাকি ইচ্ছার বহির্ভূত বিষয়? তিনি বললেন, তুমি আমাকে এভাবে বেয়াদবিমূলক প্রশ্ন করছ? গভর্নর বললেন, হুজুর! আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, ওই লোককে এমন ভরমজলিসে অপমান করার এত প্রয়োজন হয়েছিল কেন? মাহফিল শেষে নিরালায় ডেকে নিয়ে যদি আপনার দানকৃত পোশাক নিয়ে যেতেন, তাহলে মনে হয় ভালো হতো। একথা শুনে বাদশাহ রেগে

আগুন হয়ে গেলেন। বললেন, খবরদার! তোমার এরকম প্রশ্নে জবাবদিহিতার গন্ধ আসছে। আরেকটি কথা বললে তোমারও পরিণাম এমনই হবে। সে বলল, বাদশাহ আপনি পরিণাম দেখানোর প্রয়োজন হবে না। বিষয়টা আমার বোঝা হয়ে গেছে। তিনি বললেন, কী বুঝে গেলে? গভর্নর বলতে লাগল, হুজুর! আপনার দেওয়া পোশাকের মতো আল্লাহপাকও আমাকে মানবতার পোশাক পরিয়ে পাঠিয়েছেন। আজ যদি আমি আল্লাহর দেওয়া পোশাকের অবমূল্যায়ন করি, তাহলে কাল কেয়ামতের ময়দানে আমাকে এভাবে ভরমজলিসে অপমান করে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন। তাই আমাকে প্রথমে সেই পোশাকের মূল্যায়ন করতে হবে। আপনার পোশাকের আমার কোনোই প্রয়োজন নেই। এ কথা বলে নাহাওন্দ-এর গভর্নর বাদশাহর দেওয়া পোশাক খুলে বাদশাহর দিকে ছুড়ে মারলেন এবং আমি চলে যাচ্ছি; আপনার গভর্নরি আপনি রেখে দিন বলে বের হয়ে গেলেন। এভাবেই তার হাত থেকে গর্ভনরের দায়িত্ব চলে গেল। বের হয়ে সাথীদের বললেন, আমার পরিবারবর্গকে বাড়িতে পৌঁছাতে হবে। এদিকে পরিবারদের বললেন, আমার জীবনের উদ্দেশ্য মূল্যায়নের জন্য আমি চলে যাচ্ছি, যা আগে ভুলে গিয়েছিলাম।

তারপর সেই গভর্নর তৎকালীন বুযুর্গ হযরত সিরাজ (রহ.)-এর কাছে গিয়ে বললেন, হুজুর! আমি মনুষ্যত্ব শিক্ষা করতে এসেছি। তিনি বললেন, ঠিক আছে থাকো। আমার এখানে থাকলে ইনশাআল্লাহ তোমার কাঙ্ক্ষিত মুক্তা পেয়ে যাবে। গভর্নর সেখানে থাকতে লাগলেন। এখনও আত্মশুদ্ধি হাসিল হয়নি; তাই কথায়-কাজে মেজাজ চাঙ্গা থাকত। এতে পীর সাহেব বুঝলেন, তাকে সংশোধন করা সহজ ব্যাপার নয়। কয়েকদিন পর বললেন, ভাই! তোমার উদ্দেশ্যের পোশাক এখানে পাবে না। তুমি বাগদাদে জুনাইদ বাগদাদির কাছে চলে যাও। সে বলল, আচ্ছা ভালো। তারপর সে জুনাইদ বাগদাদির কাছে পৌঁছে তাঁকে বলল, হুজুর! আপনার কাছে একটি নেয়ামত আছে; সেটি সংগ্রহ করতে আমি এসেছি। আপনি চাইলে আমি তার মূল্য দেব। জুনাইদ বাগদাদি বললেন, প্রথম কথা হলো, আমি চাইলে তুমি তার মূল্য দিতে পারবে না। অর্থাৎ– আমল করতে পারবে না। আর বিনামূল্যে দিলে তুমি তার যথাযথ সম্মান দেবে না। সে বলল, হুজুর! তাহলে বিকল্প রাস্তা কী হতে পারে? তিনি বললেন, এখানে থাকো। দেখো, আল্লাহপাক কী পন্থা বের করেন।

সে সেখানে থাকতে লাগল। কিছুদিন পর জুনাইদ বাগদাদি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী কাজ করতে? সে বলল, নাহাওন্দের গভর্নর ছিলাম। জুনাইদ বোগদাদি বুঝতে পারলেন, তার মধ্যে ক্ষমতার অহমিকা রয়েছে। কারণ, এধরনের গভর্নররা এক প্রকার খোদায়িত্বের প্রভাব দেখায়। তাই তিনি তাকে নিম্নমানের একটি ব্যবসার আদেশ দিলেন। বললেন, যাও বাজারে গিয়ে গন্ধকের দোকান দাও, যার মধ্যে দুর্গন্ধ থাকে। ক্রেতারাও এ বস্তু আনন্দের সাথে ক্রয় করে না। একান্ত প্রয়োজনে কিনতে আসে। এবার তার মাথার মুকুট পায়ে পড়ল। কোথায় গভর্নর আর কোথায় গন্ধকের ব্যবসায়ী। এর ক্রেতারা থাকে অশিক্ষিত আর তাদের ব্যবহারও ভালো থাকে না। বিষয়টা এমন হলো, যেমন কোনো রাজদরবার থেকে তাকে কাফনের কাপড়ের দোকান দিতে বলা হয়েছে। তখনকার সময় লোকেরা গন্ধক খুব ব্যবহার করত। এমনকি কাপড় ধৌত করতে গন্ধক ব্যবহার করত। তিনি এ আদেশ দেওয়ার পর তার খুব অবাক লাগল। তারপরও নিজের মুরশিদের আদেশ হওয়ার কারণে সে দোকান দিতে রাজি হলো।

দোকান দিয়ে সময় গুনতে লাগল, এক বছর কবে শেষ হবে। শেষ হওয়ার পর এসে বলল, হুজুর! আপনি এক বছরের জন্য গন্ধকের দোকান দিতে বলেছিলেন; তা পূর্ণ হয়েছে। জুনাইদ বাগদাদি বললেন, তুমি দিন গুনছিলে? না; হবে না। যাও; আরও এক বছর এই ব্যবসা করো। এবার ব্যবসা করতে গিয়ে সে দিন গণনা বাদ দিল।

দ্বিতীয় বছর পূর্ণ হলে জুনাইদ বোগদাদি বললেন, ভাই! এবার তো এক বছর পার হয়ে গেল। মানে তুমি গণনা ছেড়ে দিয়েছ। তখন সে বলল, হুজুর এবার আমার জন্য কী হুকুম? জুনাইদ বাগদাদি বললেন, যাও থালা নিয়ে বাগদাদ শহরে ভিক্ষা করো। এতে যা কিছু পাবে খানকার ফকিরদের খাওয়াবে, তুমি খাবে না। তুমি রোযা রাখবে। আল্লাহু আকবার! একজন গভর্নর ভিক্ষা করতে পারে কীভাবে? তাকে দেখতে একজন শিক্ষিত লোকের মতো দেখায়। তদুপরি সে সুস্থ লোকও বটে। তাই গভীর চিন্তায় পড়ে গেল। শায়খ বললেন, তুমি যে নেয়ামত পেতে ইচ্ছা করেছ, তা পেতে হলে একাজ তোমাকে করতেই হবে। নতুবা এখান থেকে চলে যাও। সে একটি বাটি নিয়ে বাজারে গিয়ে ভিক্ষার জন্য হাঁক দিলে লোকেরা বলতে শুরু করল, একজন সুস্থ মানুষ ভিক্ষা চাইতে লজ্জা করে না? কামচোর কোথাকার? যা এখান থেকে। একজনের ধমক খেয়ে অন্যজনের কাছে গেলে সে-ও এভাবে ধমক দেয়। এদিকে শায়খের ইচ্ছাও এটাই ছিল, যাতে সে সাধারণ মানুষে.

ধমক খেয়ে তার আসল অবস্থার কথা স্মরণ হয়। এভাবে প্রতিদিন বের হয়। মানুষের ধমক খায়; কোনো ভিক্ষা পায় না। কিছুদিনের মধ্যেই মানুষের কাছে ধমকের পাত্র বলে পরিচিতি পেয়ে গেল। তাই লোকেরা দূর থেকেই তাকে ধমকাতে থাকে। এবার তাদের সামনে যাওয়াই তার জন্য কঠিন হয়ে গেল। এক বছর এভাবে ভিক্ষা চাওয়ার ফলে তার মন এমন পরিষ্কার হলো যে, আল্লাহর মাখলুকের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।

ভাই! বুযুর্গগণ কাউকে একাকিত্ব এখতিয়ার করতে বললে অথবা কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করলে তাদের আসল উদ্দেশ্য হয় মাখলুক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। আর এটাই কুরআনের ফয়সালা। আল্লাহপাক বলেন–

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

'সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমার প্রভুর যিকির করো।'[১০৫]

একদিন হযরত শায়খ গভর্নরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কী? বলল, আবুবকর শিবলি। শায়খ বললেন, ভালো; এখন থেকে তুমি আমাদের মজলিসে বসতে পারবে। পূর্ণ তিন বছর সাধনার পর মজলিসে বসার অনুমতি পেলেন। এদিকে শিবলির অন্তর পূর্ব থেকেই পরিষ্কার হয়েছিল বলে এখন তাঁর প্রতিটি কথা থেকে নূর বিস্তার করতে থাকে। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর অবস্থায় পরিবর্তন এসে যায়। মহব্বতে এলাহী হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

পরিশেষে একদিন জুনাইদ বাগদাদি বললেন, শিবলি! তুমি নাহাওন্দের গর্ভনর ছিলে। এতে তুমি অনেকের ওপর অত্যাচার করেছ। অনেকের হক নষ্ট করেছ। তাই এসমস্ত লোকের একটি তালিকা তৈরি করো। তিনি সেই কাজ শুরু করলেন। সাথে শায়খের বিশেষ তাওজ্জু ছিল। সুতরাং তিন দিনের মধ্যেই কয়েক পৃষ্ঠার একটি তালিকা তৈরি করলেন।

শায়েখ বললেন, বাতেনি সম্পর্ক ততক্ষণ পর্যন্ত ভাগ্যে জুটবে না, যতক্ষণ-না এদের কাছে থেকে মাফ নেবে। যাও; এদের কাছে ক্ষমা চেয়ে এসো। পীরের নির্দেশে তিনি নাহাওন্দ গিয়ে এক-এক করে সবার কাছে ক্ষমা চাইলেন। কেউ-কেউ সাথে-সাথে ক্ষমা করে দিলেন। কেউ-কেউ বলল, তুমি আমাকে অনেক লাঞ্ছিত করেছিলে; তাই এখন ক্ষমা পেতে হলে তোমাকে এত সময় পর্যন্ত রোদের তাপে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কেউ-কেউ বলল,

---

১০৫. সূরা মুয্যাম্মিল : আয়াত ৮

আমার ঘরে চাকর হিসেবে কাজ করতে হবে। তিনি সবার শর্ত পুরা করে ক্ষমা চেয়ে দুই বছর পর বাগদাদে জুনাইদ বাগদাদির কাছে এলেন।

খানকায় এসে পাঁচ বছর থাকার পর চেষ্টা ও সাধনার চাকায় ঘর্ষণ খেয়ে আত্মা নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। আমিত্ব দূর হয়ে গিয়েছিল। বাতেনে শুধু তুমি আর তুমির ধ্বনি ছিল। সুতরাং একদিন আল্লাহর রহমতের সাগরের ঢেউ প্রবল হয়ে উঠে হযরত জুনাইদ বাগদাদি (রহ.) তাকে আধ্যাত্মিক বিদ্যায় মালামাল করে দিলেন। তারপর কী হলো? চোখের দৃষ্টিশক্তি পাল্টে গেল। আল্লাহপাকের মারেফতে বক্ষ নূরানি হয়ে খাজানায় পরিণত হলো। তিনি আরিফ বিল্লাহ বা আল্লাহচেনা হয়ে গেলেন। বাস্তবিক যে বান্দা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কষ্ট-সাধনা করে, আল্লাহপাক তাকে এমন পথ প্রদর্শন করেন যে, সে তার মাকসাদের জন্য মুক্ত রাস্তা পেয়ে যায়।

আল্লাহপাক বলেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'যারা আমার মাঝে সাধনা করে, তাদের আমি আমার রাস্তাগুলো দেখিয়ে দেই।'[১০৬]

আল্লাহপাকের কুরআনের ফয়সালাও এটাই।

لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى

'মানুষের জন্য তা-ই থাকে, যার জন্য সে চেষ্টা করে।'[১০৭]

এ মহান সাধনার ফলে হযরত শিবলি (রহ.)-এর প্রতি আল্লাহপাকের পুরস্কার বর্ষণ হতে থাকে। তিনি আল্লাহপাকের এমন মহব্বত হাসিল করেছিলেন যে, তার সামনে যে কেউ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে তার মুখে মিষ্টি তুলে দিতেন। এ বিষয়ে কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমার সামনে আমার মাহবুবের নাম উচ্চারণ করবে আর আমি তার মুখে মিষ্টি দেব না তবে কী করব। বন্ধুগণ! যারা নিজের নফসকে সাধনার গর্তে ফেলে খাঁটি সোনায় পরিণত করে, তাদের অন্তরে আল্লাহপাকের মহব্বতের সাগরের ঢেউ খেলতে থাকে।

---

১০৬. সূরা আনকাবুত : আয়াত ৬৯

১০৭. সূরা নজম : আয়াত ৩৯

সাধনা কাকে বলে?

স্মরণ রাখবেন, দুনিয়া হচ্ছে সাধনার স্থান আর আখেরাত হচ্ছে দর্শনের স্থান। সাধনা কাকে বলে? আল্লাহপাকের নির্দেশ পালন করার জন্য আত্মার বিরোধিতা করা। নিজের ইচ্ছা ও চাহিদা বিলিয়ে দিতে বান্দাকে কষ্ট করতে হয়। তাকে সাধনা বা মুজাহাদা বলে। এই মূলতত্ত্বের মুখোশ উন্মোচন করে আল্লাহর হাবীব বলেন–

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ اِطَاعَةِ اللهِ

'মুজাহিদ বলে, যে আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে।'

নফসকে লালনপালনকারী

নফসকে লাগাম লাগানো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে তো বেশিরভাগ মানুষ নফসকে লাগাম দেওয়ার পরিবর্তে তাকে পুষতে থাকে। যেমনভাবে মানুষ ঘোড়া পোষে। একথাটি স্মরণ রাখবেন। লোকে আমার প্রশংসা করুক, নিজের প্রশংসায় খুশি হওয়া, তাদের সামনে তোমার স্বপ্ন বয়ান করা, নিজের স্তর বর্ণনা করা, ইচ্ছানুপাতে খানা খাওয়া, হৃদয়ে সঞ্চারিত চাহিদাকে পুরা করা ইত্যাদির দ্বারা নফস সতেজ হয়। যখন এ নফস অবাধ্য ও শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন বান্দা বলে, শরীয়তের ওপর আমল করতে আমার মন চায় না। কারণ, তার অন্তর শরীয়তের ওপর চলতে প্রস্তুত নয়। কোনো এক বুযুর্গ বলতেন– হে আমার বন্ধু! তুমি নফসকে লালন-পালনে ব্যস্ত। আর নফস তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে উদগ্রীব। তুমি তাকে পালবে আর সে তোমাকে কাঁধে করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

সুন্নতের অনুসরণে নফস পরাজিত হয়

এই নফসকে কীভাবে পরাভূত করা যায়? এর একটি পন্থা হলো প্রত্যেকটি কর্ম সুন্নাত মোতাবেক করা। ইমামে রাব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেন– নিজের পক্ষ থেকে ধার্যকৃত নফল ইবাদাত দ্বারা নফসকে কাবু করা যায়। তদুপরি প্রত্যেকটি কাজ সুন্নাত অনুযায়ী আদায় এর ওপর ফলপ্রসূ হয়।

১৯৭৩ সালে এক লোক আমি অধমের সাক্ষাতের জন্য এলে জানতে পারলাম, সে ষোলো বছর বয়স থেকে লাগাতার রোযা রাখছে। একথা শুনে

আমার এক বন্ধু খুব অবাক হলেন। আমি বললাম, এটা তো তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। তিনি বললেন, সহজ কোথায়? ঠান্ডা, গরম, সুস্থ্যতা, অসুস্থ্যতা, সফরে, নিজ বাড়িতে, সর্বাবস্থায় রোযা রাখা কঠিন নয় কীভাবে? আমি বললাম, ঠিক আছে ওই লোককে জিজ্ঞাসা করে নাও। আমার বন্ধু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! আপনার এই নীরবচ্ছিন্ন রোযা রাখার মধ্যে স্মরণীয় কোনো ঘটনা আছে কি? সে বলল, না। আমার বন্ধু আমাকে বললেন, ব্যাপার কী? আমি বললাম, এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। কেউ দিনে তিনবার খায় আর কেউ দুবার খায়। মনে করুন, সেও দুবারের অভ্যাস করে নিয়েছে। সেহরি ও ইফতার দুবেলা আহার করা তার অভ্যাস হয়ে গেছে। আমি বললাম, তাকে জিজ্ঞাসা করো সে কি দাউদ (আ.)-এর মতো রোযা রাখে। অর্থাৎ একদিন রোযা রাখা আর একদিন ফাঁকা দেওয়া। তিনি একথা জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, না; এটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই দিনের বেলা আহার করতে আমার মোটেও চাহিদা হয় না। তাছাড়া এমন করলে আমার নফসের ওপর বোঝা হয়ে যেত। কারণ, পরের দিন সে আহার চাইত। ফলে নফসকে আয়ত্ত করা আমার জন্য কঠিন হয়ে যেত। আমি বললাম, দেখ, সে নিজের নফসের ওপর কেমন সাধনা করেছে। এমন কঠিন বিষয় তার জন্য সহজ হয়ে গেছে। অথচ হাদীছে যে এক দিন ফাঁকা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সেটা তার জন্য দুষ্কর হয়েছে।

তাই বন্ধুগণ! আমাদের জন্য উচিত খুঁজে-খুঁজে বের করে সুন্নাতের ওপর আমল করা। পানাহারে, শয়নে, জাগরণে, পরিধানে সুন্নত পালন করা। আমি হাদীছের ভান্ডার কিতাবসমূহ থেকে কুড়িয়ে-কুড়িয়ে এ সমস্ত সুন্নতসমূহকে 'বা আদব বা নসীব' নামক কিতাবে একত্রিত করেছি। সুতরাং যেব্যক্তি নিজের জীবনকে সুন্নত মোতাবেক গড়তে চায়, সে যেন ওই কিতাবটি পড়তে আরম্ভ করে এবং প্রত্যেকটি কাজ সুন্নতমতো করতে থাকলে তার জীবন একেবারে সুন্নতের প্রতিকৃতি হয়ে যাবে।

আল্লাহপাক যার প্রতি খুশি হয়ে যান, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুন্নতের ওপর আমল করা তার ভাগ্যে জোটে। প্রত্যেকটি কাজ তার সুন্নাত মোতাবেক হয়। এতে কোনো প্রতিবন্ধকতা আসে না। একব্যক্তি হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.)-এর সান্নিধ্যে নয় বছর থাকার পর বলছে, হুজুর! আমাকে অন্য কোনো মুরশিদের কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, তোমার জন্য ভালো হবে তো? সে বলল, হুজুর! আমি নয় বছরের মধ্যে আপনার কোনো কারামত দেখতে পাইনি। তিনি বললেন, ঠিক আছে; তবে এ নয় বছরের

মধ্যে তুমি আমার কাছে সুন্নাতের পরিপন্থী কোনো কাজ দেখছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে এর চেয়ে বড় কারামত আর কী হতে পারে? ভাই! এতে বোঝা যায়, সুন্নাতের ওপর জীবন গড়া সবচেয়ে বড় কারামত।

সুন্নত মহব্বতের যোগ্য

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেন, যদি পৃথিবীর সমস্ত কারামত আমার থেকে হরণ করা হয় আর সুন্নাতের অনুরসণ আমাকে দেওয়া হয়, তাহলে এ আমার মহা সৌভাগ্য মনে করি। আর যদি সুন্নাতের অনুসরণ বিলুপ্ত করা হয়, তাহলে এটা আমার সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য মনে করি। তাই আমাদের বুযুর্গদের আল্লাহপাক সুন্নতি জিন্দেগি দিয়েছিলেন। তাদের ওঠা-বসা, আচার-আচরণ, কথাবার্তা, চলাফেরা সবকিছু সুন্নাত অনুযায়ী হতো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বিশ্ববাসীর জন্য রহমতের ফোয়ারা ছিলেন, তেমনিভাবে আমাদের বুযুর্গগণ ছিলেন রহমতের ঝরনার ছোট নালা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর অন্যের কষ্টে ব্যথিত হতো। তেমনি তাঁদেরও ব্যথিত হতো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও আল্লাহপাকের স্মরণ থেকে উদাসীন হতেন না। তেমনি তাঁরাও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হতেন না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের জন্য দিন-রাত এক করে দিতেন। তেমনি তারাও নিজের জ্ঞান ও বিবেক সর্বদা দীনের জন্য ব্যয় করতেন।

তাকবীরে উলার গুরুত্ব

একদা হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.) দেওবন্দ মাদারাসার বার্ষিক জলসায় এসেছিলেন। বয়ানের পর দু'আ শেষে নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়েছে। তিনি মঞ্চ থেকে নেমে মসজিদে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মোসাফাহা করার জন্য লোকেরা রাস্তায় ভিড় করে রাখল। যেমনটা বর্তমানেও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত ভিড় কেটে কোনোমতে মসজিদে গেলেন। এতক্ষণে ইমাম সাহেব এক রাকাত পড়ে ফেলেছেন। তিনি নামায শেষ করে আক্ষেপের সাথে বললেন, ত্রিশ বছরে আজ আমার তাকবীরে উলা ছুটে গেল। অথচ ইচ্চাকৃতভাবে ছোটেনি। মাহফিলের নিকটেই মসজিদ ছিল। তিনিও উজু অবস্থায় ছিলেন। দ্রুত যাওয়ার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু আল্লাহর বান্দারা যেতে ব্যাঘাত করেছে। তারপরও এত আক্ষেপ! দেখুন, ত্রিশ বছর তাকবীরে উলার সাথে নামায পড়া সহজ সাধনা নয়।

হযরত কারী রহীমবখশ পানিপথি (রহ.)-এর সাধনা

আল্লাহ তা'আলা হযরত কারী রহীমবখশ (রহ.)-এর ইল্‌মি বরকত এমন বিস্তার করেছিনে যে, পৃথিবীর যেখানে যাবেন, সেখানেই তাঁর ছাত্রদের মাদরাসা পাবেন। তিনি কুরআনের খেদমতের বাগান লাগিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি একবার ওমরাহ করতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায প্রথম কাতারে ঠিক ইমামের পেছনে তাকবীরে উলার সাথে আদায় করেছি। সুবহানাল্লাহ!

এটি আমাদের জন্য দরূহ ব্যাপার। এর অনুমানও আমরা করতে পারি না। সেখানে আমরা একদিনও এমনভাবে কাটাতে পারি না। সেখানে মানুষের খুব ভিড় হয়। চেষ্টা করলেও সক্ষম হওয়া যায় না। অথচ প্রত্যেক নামায প্রথম কাতারে ঠিক ইমামের পেছনে তাকবীরে উলার সাথে পড়া কেমন কঠিন ছিল। এর মর্ম হলো, তিনি মসজিদেই থাকতেন। আমার ধারণা, তিনি ফজরের আগে মসজিদে প্রবেশ করতেন আর সর্বশেষ ঈশার নামায পড়ে বের হতেন। আল্লাহু আকবার! আমাদের বুযুর্গগণ এমন সাধনার ফলে আল্লাহপাকের পুরস্কার লাভ করেছেন।

খাজা সিরাজুদ্দীন (রহ.)-এর সাধনা

হযরত খাজা সিরাজুদ্দীন (রহ.) একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। যুবক বয়সে একবার হজ করতে গিয়ে কোনো কিছু না খেয়ে সেখানে তেরো দিন থাকেন। এর মধ্যে প্রশ্রাব-পায়খানাও করেননি। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হুজুর! ব্যাপার কী? তিনি বললেন, আমি একটা কালো কুকুর এ পবিত্র ভূমি অপবিত্র করি কীভাবে। তেরো দিন পর মদীনায় গেলেন। এটা ছিল তাঁর করামাত। এ কারামত তাঁরা-ই পায়, যারা সাধনা করে। চিন্তা করুন, আমরা দৈনিক কবার বাথরুমে যাই?

আত্মার বিরুদ্ধে সাধনা

বুযুর্গগণ বলেছেন, আত্মার বিরুদ্ধে সাধনা চারভাবে করতে হয়।

(১) قلت طعام- কম খাওয়া

(২) قلت منام- কম ঘুমানো

(৩) قلت كلام- কম বলা

(৪) قلت اختلاط مع الانام- মানুষের সঙ্গে মেলামেশা কম করা।

দুটি সাধনায় অবকাশ

বর্তমানে আমরা অতিশয় দুর্বল হওয়ার কারণে দুটি সাধনায় অবকাশ দেওয়া হয়েছে–

(১) কম খাওয়া

(২) কম ঘুমানো।

আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, প্রয়োজন হলে ক্ষুধা অনুপাতে খেয়ে নাও। এতে কোনো সমস্যা হবে না। হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দি (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হুজুর! কী পরিমাণ খাব? তিনি বলেছিলেন, ভালো খাও, ভালো কাজ করো। এটাই মূল বিষয়। যে ষাড়কে মালিক বেশি খাওয়ায় আর সে কাজও বেশি করে, তার প্রতি মালিক খুশি হয়ে যায়। তাকে খাওয়াতে মালিক বিরক্তি বোধ করে না। আমাদের গাভি যদি দুধ বেশি দেয়, তাহলে তার মুখে ঘাস তুলে দিতে ইচ্ছা করে। তেমনিভাবে যে বান্দা আল্লাহর আনুগত্য করে, তাকে খাওয়াতে আল্লাহর বিরক্তি আসে না। স্বতঃসিদ্ধ কথা হলো, যার খাবে তাঁর গুণগান করবে। আল্লাহর দেওয়া আহার্য ভক্ষণ করো আর তার প্রসংশা করো।

আগেকার যুগে বুযুর্গগণ অবিরাম শুধু পানির ওপর ভরসা করে রোযা রাখতেন। বর্তমানে এমন সাধনার প্রয়োজন কম। বর্তমানে আমরা প্রথম থেকেই দুর্বল। এমন সাধনা করলে হাড্ডিসার হয়ে যাব। রোগব্যাধি আক্রমণ চালাবে। ফলে ইবাদাত করার যোগ্যই থাকবে না। বর্তমানে যার দেহে শক্তি আছে, সে-ই ইবাদাত করতে পারে। বর্তমানে আমি দুদিন অনাহারে থাকলে কী আমার আওয়াজ মাহফিল পর্যন্ত পৌঁছবে? না; বরং আওয়াজ বেরই হবে না।

আল্লাহওয়ালাগণ বলেন, প্রয়োজনসাপেক্ষে আহার করো। দিনে পাঁচবার খাও একথাও বলেন না। আবার এও বলেন না যে, দৈনিক মাত্র এক লুকমা খাও। হ্যাঁ; যদি এটা অনুভব কর যে, আত্মার অবাধ্যতার প্রভাব রয়েছে আর মস্তিষ্ক সর্বদা নফসানি, শয়তানি ও কুপ্রভৃত্তির ধারনায় ভরে আছে, স্বভাবের ওপর যৌবনের চাহিদার প্রাধান্য রয়েছে, জীবন এমন যে বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, তাহলে তোমার আত্মাকে ক্ষুধার কষ্ট দাও। হাদীছে এসেছে, এমন অবস্থায় রোযা রাখো। এ-ও আবার সাধারণ রোযা নয়। মজবুত হয়ে একদিন রোজা রাখো, আরেকদিন আহার করো। আহারের দিন এমন আহার করবে যে, নামে শুধু আহার, প্রকৃতপক্ষে রোযার মতোই কষ্টকর। আত্মাকে

এভাবে অনাহারে রাখলে তা সোজা হয়ে যাবে। কেননা, এ সমস্ত পাগলামি হলো পেট ভার থাকার পাগলামি।

একদিন হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (রহ.) উপবাস থাকার ফযিলত বর্ণনা করছিলেন। তখন কেউ তাঁকে প্রশ্ন করল, হুজুর! এটাও কি ফযিলতের বিষয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এটাও ফযিলতের বিষয়। কারণ, ফেরাউন যদি অনাহারে থাকত, তাহলে কস্মিনকালেও খোদায়ির দাবি করত না। সে তো বাদশাহ ছিল, অনাহারের কোনো খবর ছিল না। ইংরেজদের দেশে একটি কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে। কোনো এক দেশের জনগণ দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে হরতাল করে মিছিল বের করেছে। রাজা-রানি উভয়ে মিছিল দেখল। রানি রাজাকে জিজ্ঞাসা করল, ওরা স্লোগান দিচ্ছে কেন? রাজা বলল, তারা খাবার-রুটি পাচ্ছে না তাই। রানি বলছে, তাহলে তাদের ডাবল রুটি খেতে বলো।

ভাই! রানি রাজমহলে থাকার কারণে কোনো দিন ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারেনি।

মহিলাদের থেকে কেউ খোদায়ি দাবি করল না কেন?

এটি একটি সূক্ষ্ম বিষয় যে, যেব্যক্তি নিজেকে ছোট মনে করবে, সে কোনোদিন খোদায়ি দাবি করতে পারে না। স্বতঃসিদ্ধ কথা হলো, যে নিজেকে বড় মনে করবে সে খোদায়ি দাবি করতে পারবে।

মানবেতিহাসে কোনো মহিলা কোনোদিন খোদায়ি দাবি করেনি। কারণ, মহিলারা সব সময় নিজেকে পুরষের অধীন মনে করে। পুরুষদের নিজের ওপর প্রাধান্য দেয়। তাদের মস্তিষ্কে এটা সর্বদা থাকে যে, কোনো না কোনো পুরুষ আমার বড় আছে। যেমন– আমার পিতা অথবা আমার স্বামী। তাই মহিলারা কোনো দিন খোদায়ি দাবি করেনি।

বেশি খাওয়া অপরাধ

হাদীছ শরীফে কম খাওয়ার ফযিলত এবং বেশি খাওয়ার অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোনো বিষয়ে গবেষণা করা অর্ধেক ইবাদাত আর অল্প আহার করা পূর্ণ ইবাদাত। অন্য হাদীছে হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহপাকের কাছে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে দীনের ব্যাপারে অধিক গবেষণা করে আর অধিক সময় ক্ষুধার্ত থাকে। আর আল্লাহপাকের সবচেয়ে বড় দুশমন হলো, যে অধিক খায় আর অধিক ঘুমায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-

ও বলেছেন যে, যেব্যক্তি উদর ভরে ভক্ষণ করল, আকাশের দিকে উড্ডয়নের রাস্তা তার ভাগ্যে জুটবে না। এ-ও বলেছেন যে, অধিক আহার করে অন্তরকে মেরে ফেলো না। কেননা, অন্তর চাষাবাদের জমির মতো; তাতে পানির প্রয়োজন হয়। কিন্তু অধিক পানি হলে সেটা নষ্ট হয়ে যায়।

এ সমস্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বেশি খাওয়া আল্লাহর কাছে প্রিয় নয়। অল্প আহার আল্লাহর কাছে প্রিয়। বন্ধুগণ! এর পরেও কতক লোক এত অধিক আহার করে যে, আল্লাহর আশ্রয় চাই!

বেশি খাওয়ার কতগুলো ঘটনা

১. ১৯৭৪ সালে যুলফিকার আলী ভুট্টুর শাসনামলে হযরত মুফতী মাহমুদ সাহেব (রহ.) 'জেল ভরো' নামে একটি আন্দোলন চালিয়েছিলেন, যার ফলে কাদিয়ানিদের রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। লোকজন নিজেই নিজেকে গ্রেফতারির জন্য প্রস্তুত করে দিত। বেরলবি, দেওবন্দি, আহলে হাদীছ ও শিয়া সবাই মসজিদে সমবেত হতো। ওলামায়ে কেরাম খতমে নবুওয়াতের ওপর বক্তব্য দিতেন। মাহফিল শেষ হলে ১৫-২০ জন যুবক নিজেকে গ্রেফতারি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত। তারা ফুলের মালা গলায় দিয়ে ওই যুবকদের সামনে রেখে মিছিল বের করত। তারাস সজোরে স্লোগান দিত। এদিকে পুলিশ তাদের আগে আগে থাকত। মাহফিল শেষ হলে পুলিশ ওই মালা পরিহিত লোকদের গাড়িতে উঠিয়ে জেলখানায় নিয়ে যেত। অন্যরা বাড়িতে চলে যেত। এটা প্রতিদিনের অন্যতম কর্মশালা ছিল। তারা অপরাধী ছিল না; বরং সম্ভ্রান্ত লোক ছিল। এদের মধ্যে আলেম, হাফেজ, কারীদের সঙ্গে শিক্ষিত যুবকরাও খতমে নবুওয়তের স্লোগান তুলে স্বেচ্ছায় গ্রেফতারি দেওয়ার জন্য নতশিরে প্রস্তুত ছিল। পুলিশও বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে জানত। তাই তাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ না করে গাড়িতে উঠিয়ে কারাগারে নিয়ে ভেতরে ছেড়ে দিত। পার্থক্য এতটুকু ছিল। বাইরে থাকার পরিবর্তে কারাগারে ফটকের ভেতরে থাকত। কারাগারের ভেতরে মসজিদ ছিল। সেখানে তারা নামায পড়ত, ঘোরাফেরা করত।

এ সময় আমাদের মুরশিদে আলম (রহ.)-এর বড় ছেলে আবদুর রহমান কাসেমী সাহেব ভাবলেন, আমি গ্রেফতারির আগ্রহ পেশ করব। তিনি অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র ছিলেন। আল্লাহপাক এমন নেক সন্তান সবাইকে দান করুন। একদিন তিনিও গ্রেফতারির আগ্রহ পেশ করলেন। পুলিশ তাঁকে কারাগারে পৌঁছিয়ে দিল। গ্রেফতারে আগ্রহীদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য থাকতেন,

তাদের পুলিশ এখানে না রেখে অন্যত্র পাঠিয়ে দিত। সুতরাং পুলিশ হযরত আবদুর রহমান কাসেমী (রাযি.)কে চাকওয়াল কারাগারের পরিবর্তে জাহলাম কারাগারে পাঠিয়ে দিল। তখন সেটা সদর কারাগার ছিল। আল্লাহপাকের কুদরত। রাওয়ালপিন্ডি থেকে আরেক বুযুর্গ হযরত গোলামুল্লাহ খান বন্দি হয়ে জাহলাম কারাগারে এলেন। তিনি শায়খুল কুরআন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। জেলসুপার ভাবল, মাওলানা সাহেব একজন বিজ্ঞ আলেম আর এদিকে পীর সাহেবের ছেলে আবদুর রহমান; তারা উভয়জনই সম্মানী ব্যক্তি। তাই এদের দুজনের জন্য নির্দিষ্ট কামরার ব্যবস্থা করে দিল।

দৈনিক শত-শত মানুষ তাদের সাক্ষাতের জন্য যায়। মজার ব্যাপার হলো, যে কেউ তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য যেত সবাই তাদের জন্য মিষ্টি, বিস্কুট, ফল ইত্যাদি নিয়ে যেত। মোদ্দাকথা, এদের কাছে প্রচুর খাবার জমা হতো। তারা দুজনে ভাবলেন, আমাদের দেখার জন্য প্রতিদিন লোকজন আসে। আমরা যদি এদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করি, তাহলে আমাদের মিষ্টিদ্রব্যও কমবে আর মেহমানদারিও হয়ে যাবে। সুতরাং তারা এর ব্যবস্থা করলেন। এভাবে প্রতিদিন মেহমানদারি চলছে।

আবদুর রহমান কাসেমী সাহেব বলেন, একদা আমরা গল্প করছি। পরামর্শ করছি যে, আগামীকাল অমুক-অমুককে দাওয়াত দেব। ঘটনাক্রমে চাকওয়াল এলাকার মাওলানা বখশ নামে একলোক ওই জেলখানায় ছিল। সে-ও খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের দায়ে বন্দি হয়েছিল। হযরত গোলামুল্লাহ খান তাকেও আমন্ত্রণ জানালেন। তার কথা শুনেই আমি হতাশ হয়ে হুজুরকে বললাম, সত্যিই যদি আপনি মাওলানাকে দাওয়াত দিয়ে থাকেন, তাহলে অন্যদের খাবারে সংকট পড়বে। তিনি বললেন, ফজরের নামাজের পর তাকে ডেকে সমস্ত খাবার সামনে উপস্থিত করে দেব। তার সাধ্যানুযায়ী খাওয়ার পর কিছু থাকবে। পরে সেই পরিমাণে অন্য মেহমান ডাকব। আমি বললাম, ঠিক আছে; এটা খুব উত্তম প্রস্তাব।

হযরত কাসেমী সাহেব বলেন, আমাদের কাছে দশ কেজি মিঠাই ছিল। তাই হিসাব করলাম, জনপ্রতি যদি ২৫০ গ্রাম খায় তবু ৪০ জনকে খাওয়ানো যাবে। সর্বোচ্চ কেউ আধা কেজি খেতে পারবে। তিনি বলেন, আমাদের কাছে সেনাবাহিনীর বড়-বড় মগ ছিল, যাতে তিন কাপ চা ধরত। সেই মগ দ্বারা ৪০ মগ পানি দিয়ে চা তৈরি করলাম। সাথে প্রয়োজনমতো দুধ ও চিনি দিলাম। তাহাজ্জুদের সময় উঠে প্রায় ৪০ জনের চা-নাস্তা প্রস্তুত করে

ফজরের নামাযে গেলাম। নামাযের পর কুরআনের তা'লীম হলো। তারপর মাওলানা বশখকে নিয়ে এলাম। তিনি বলেন, তাকে দস্তরখানে বসিয়ে আমি গুড়ের বাটি খুলে-খুলে দিচ্ছি আর সাথে সেনাবাহিনীর মগ দিয়ে চা দিচ্ছি। তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন আর খাচ্ছেন। আল্লাহু আকবার! বান্দা ১০ কেজি গুড় ও ৪০ মগ চা একাই খেয়ে ফেললেন!

যখন সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, তখনও এদিক-সেদিক তাকাচ্ছেন, আরও কিছু আছে কি-না। যখন আর কিছু দেখতে পেল না। সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। তখন বলল, আচ্ছা মাওলানা সাহেব! অনুমতি দিলে এখন যেতে পারি। পীর সাহেব বললেন, ভাই! বসেন আমাদের সঙ্গে কিছু গল্প করেন। সে বলল, হুজুর অন্য সময় কথা হবে। তখন তার বারবার বিদায় চাওয়াতে পীর সাহেব ভাবলেন, মনে হয় তার পেটে সমস্যা এসে গেছে। তিনি বললেন, ভাই! এত তাড়াহুড়া করছেন কেন? তিনি বললেন, হুজুর আসল ব্যাপার হলো, চৌধুরী জহুর এলাহীর বাড়িতে আমার নাস্তার প্রোগাম রয়েছে। তার এরকম খাওয়া দেখে আমার পীর সাহেব একবার তাকে ধমক দিয়ে বললেন, মিয়া তুমি তো রুটি খাও না; বরং রুটি তোমাকে খাচ্ছে।

বন্ধুগণ! আমি একথা বলার উদ্দেশ্য হলো, কিছু-কিছু লোক এত অধিক পরিমাণে খায়, যার কোনো প্রয়োজন নেই। আরও কম খেলেও চলে।

২. হযরত খাজা সিরাজুদ্দীন (রহ.)-এর কাছে এক মাওলানা সাহেব এসেছিলেন। তিনি একবারে একটি বকরি ও কয়েক বান্ডিল রুটি খেতেন। তিনি হুজুরের দরবারে এসেই বলছিলেন, হযরত! আমার খাবারের অভ্যাস এটা। অর্থাৎ আমি ক্ষুধার জ্বালা সইতে পারি না। কিন্তু সে এত পরিমাণ খাওয়ার পরও অত্যন্ত খোদাপ্রেমিক ছিল। এ পরিমাণ খেয়ে নফল নামাযে দাঁড়িয়ে সারা রাত নামায পড়ত। খাওয়াটা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

একদা আহারের সময় সকল মেহমানের জন্য এক পাতিলের চেয়ে কম খাবার পাকানো হয়েছে। তা দেখে সে হতাশ হয়ে গেছে যে, আমার খাবারের কী হবে? শায়খ সিরাজুদ্দীন সাহেব খাদেমকে ডেকে বললেন, ওই মাওলানার পাত্রেও দুটি রুটি, এক টুকরো গোশত ও সামান্য ঝোল দেবে। তা-ই করা হলো। সে খাবার দেখে পেরেশান হয়ে গেল, এবার কী করব? আল্লাহু আকবার! সে খাওয়া শুরু করল। খাচ্ছে আর খাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হয়ে খাওয়ার পরও তার পাত্রে খাবার অবশিষ্ট রয়ে গেল।

বরকতের বহিঃপ্রকাশ

এ-ধরনের একটি ঘটনা হাদীছে এসেছে।

১. খন্দক যুদ্ধের পরিখা খননের সময় সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শরীক ছিলেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম কয়েক দিন পর্যন্ত অনাহারে কাটান। ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধেছেন। এক সাহাবী একদিন বলছেন, হুজুর! ক্ষুধার জ্বালায় কাজ করতে পারছি না। পেটে পাথর বেঁধে কয়েকদিন যাবৎ কাজ করছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পেট খুলে দেখলেন, তাতে দুটি পাথর বাঁধা রয়েছে। এমন দুরবস্থার সময় হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর স্ত্রী ভাবলেন, কয়েকদিন যাবৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না খেয়ে আছেন। আমাদের ঘরে তো একটা বকরি আছে। এটা জবাই করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাইয়ে দিই। তিনি তার স্বামীকে বললেন, আমি খানা প্রস্তুত করছি। আপনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলুন, দু-তিনজন সাহাবীকে নিয়ে যেন আমাদের বাড়িতে চলে আসেন। আমাদের এখানে তিন-চারজনের খাবারের ব্যবস্থা হবে।

হযরত জাবের (রাযি.) এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়া দিলেন এবং সবকিছু খুলে বললেন। দাওয়াত পেয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবায়ে কেরামকে জানিয়ে দিলেন, আজ জাবেরের বাড়িতে মুজাহিদগণের দাওয়াত। ঘোষণা শুনে সমস্ত সাহাবা (রাযি.) তাঁর বাড়িতে গেলেন। এ ঘোষণা শুনে জাবের (রাযি.) দৌড়ে বাড়িতে গেলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন, জাবের, আমরা আসার পূর্বে পাত্রের ঢাকনা খুলো না। তিনি বাড়িতে গিয়ে ব্যাপারটা তাঁর স্ত্রীকে বললেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম চলে এলেন। এখন কী করা যায়? স্ত্রী বললেন, আমাদের কাছে মাত্র চার-পাঁচজনের খাবারের ব্যবস্থা আছে। প্রায় নয়শজন সাহাবীর ব্যবস্থা কীভাবে করব? আগে বলুন, এই নয়শজনকে আপনি দাওয়াত দিয়েছেন, নাকি নবীজি দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি শুধু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছি আর তিনি সবাইকে দাওয়াত দিয়েছেন। এবার তাঁর স্ত্রী বললেন, তাহলে আমাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই। যিনি দাওয়াত দিয়েছেন, তিনিই খাওয়াবেন।

খাবার প্রস্তুত। সাহাবায়ে কেরাম হযরত জাবের (রাযি.)-এর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেকজন করে চাদরের নিচ থেকে রুটি বের করে এবং পাতিলের ঢাকনা আবৃত রেখে তরকারি দিতে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত নয়শজন সাহাবী পেট ভরে খেয়ে এলেন। হযরত জাবের (রাযি.) ঢাকনা খুলে দেখলেন, খাবার যেমন ছিল তেমনই রয়েছে। সুবহানাল্লাহ!

২. হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) বলেন, আমি একদিন ক্ষুধার তাড়নায় ক্লান্ত হয়ে ঈশার নামাযের পর মদীনার মসজিদে বসে রইলাম, দেখি কেউ আমাকে নিয়ে কিছু খাইয়ে দেয় কি-না। কারণ, তাদের মেহমানদারি করানোর প্রচলন ছিল। কিছুক্ষণ পর হযরত আবুবকর (রাযি.) এসে সালাম দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু দাওয়াত দিলেন না। অথচ দাওয়াত দেওয়া হলো হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর অন্যতম অভ্যাস। ভাবলাম, হয়তো তাঁর ঘরে আজ কিছু নেই। একটু পরে হযরত ওমর (রাযি.) এসে তিনিও সালাম দিয়ে চলে গেলেন। ভাবলাম, তাঁর ঘরেও মনে হয় আজ কিছু নেই।

আরও কিছুক্ষণ পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আমাকে চিনে মুচকি হেসে বললেন, আবুহুরায়রা ! এসো তোমাকে কিছু খাইয়ে দেব। আবুহুরায়রা বলেন, আমি কয়েক দিনের উপবাস ছিলাম। খাবারের সংবাদ পেয়ে আনন্দে বাগবাগ হয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাচ্ছি। তিনি ঘরে সংবাদ পাঠালেন, ঘরে কিছু খাবার থাকলে নিয়ে আসো। ঘর থেকে জবাব এল, খাবার কিছু নেই; তবে পান করার মতো কিছু দুধ আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও ; সেটা নিয়ে আসো। আবুহুরায়রা (রাযি.) বলেন, একথা শুনে আমি ভাবলাম, হায়! এখানেও দেখি আজ একই অবস্থা! যাক একটু দুধ তো খেতে পারব।

আল্লাহু আকবার! দুধের পেয়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে এলে তিনি বললেন, আবুহুরায়রা ! যাও আসহাবে সুফফার লোকজনকে ডাকো। তারা সত্তরজন ছিলেন। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম, তাদের নিয়ে এলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, সবাইকে দুধ পান করাও। অর্থাৎ– সর্বশেষ আমাকে খেতে হবে। তারপর থাকবে কি-না কে জানে। যাক, আমি তাদের সবাইকে নিয়ে এলাম।

তারা আসার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবুহুরায়রা! এদের দুধ পান করাও। তিনি বলেন, আমি পেয়ালা হাতে নিয়ে

একজনকে পান করার জন্য দিই আর তাকাই, দেখি কিছু বাকি থাকে কি-না। সে পান করার পর পেয়ালার দিকে তাকিয়ে দেখি, না ; উল্লেখযোগ্য কোনো কমতি আসেনি। এভাবে ক্রমান্বয়ে আমি সকলকে পান করানোর পরও দেখি, অনেক দুধ অবশিষ্ট রয়েছে। এবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবুহুরায়রা ! এখন তুমি দুধ পান করো। আমি পরিপৃষ্ত হয়ে পান করলাম। রেখে দেওয়ার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবুহুরায়রা ! আরও পান করো। আমি আরও পান করে পেট ভরে নিলাম। এবার পেয়ালা সরানোর পর তিনি মুচকি হেসে বললেন, আবুহুরায়রা! আরও পান করো। তারপর এমন পান করলাম যে, এখন দুধ আমার ভেতরে থেকে বাইরে আসার উপক্রম হয়েছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি আর পারছি না। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পেয়ালা নিয়ে পান করতে শুরু করলেন। তাতে পেয়ালার দুধ শেষ হয়ে গেল।

বরকত প্রকাশের আরেকটি ঘটনা বলে আজকের আলোচনা শেষ করব।

৩. একবার হযরত খাজা ফজল আলী কোরাইশি (রহ.)-এর জমি থেকে গম উঠানো হলো। সেই গম পাকানো হলো আর খানকার লোকেরা খেল। আমাদের এখানেও এই ধারা চালু রয়েছে। আমাদের জমিতে গম উৎপন্ন হয় আর সারা বছর এখানের ছাত্র-ওস্তাদ সবাই সেই গম খেয়ে থাকেন। তিনি গম নিয়ে মসজিদের বারান্দায় রাখলেন। তখনকার সময় মাটি দ্বারা ভাঁড় বানিয়ে গম নিয়ে সংরক্ষণ করা হতো। মুরিদগণ মসজিদের বারান্দা থেকে গম নিয়ে ভাঁড়ে ভরছেন। তারা শুধু নিচ্ছেনই ; কিন্তু বারান্দার গম শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এমনকি বোঝা উঠাতে-উঠাতে তাদের ঘাড়ব্যথা শুরু হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ !

খাজা আবদুল মালিক সিদ্দিকী সাহেব অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি আসল হাকীকত বুঝে গেলেন। তিনি শায়খের কাছে গিয়ে বললেন, হুজুর ! এখানে যে বরকত প্রকাশ পাচ্ছে, ভেতরে তা থাকছে না। অর্থাৎ– ক্লান্তিতে আমাদের ভেতরটা অস্থির হয়ে আছে। খাজা ফজল আলী কোরাইশি (রহ.) বললেন, ভাই কী হয়েছে? তিনি বললেন, গম বহন করতে-করতে ঘাড় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে; শুধু ভেঙে যাওয়া বাকি রয়েছে। সুতরাং একটু তাওয়াজ্জুহ দিয়ে দয়া করুন। তিনি বললেন, চলো আমি আসছি। তিনি এসে অল্প কিছু গম উঠালেন। এতক্ষণে সমস্ত গম ভেতরে নেওয়া হয়ে গেল। আল্লাহু আকবার! এগুলো কী বস্তু ছিল? এগুলো ছিল বরকত। একটি

কথা মনে রাখবেন। পৃথিবীতে যেখানেই দীনের কাজ চলবে, সেখানেই বরকত প্রকাশ হতে থাকবে। আর দুনিয়াদারের কাজ বে-বরকতে চলে। আল্লাহওয়ালাদের কাজ বরকতপূর্ণ হয়। আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে এ বরকত দীনের জন্যই হয়ে থাকে।

আল্লাহপাক যেন আমাদের সকল কাজ এখলাসের সাথে করার তাওফীক দান করেন। এ রাস্তার সকল কষ্ট ও যাতনা সহ্য করার সাহস দান করেন। আমীন।

তালেবে ইল্‌মদের মর্যাদা

'ওই সকল যুবক-বৃদ্ধ সবাইকে তালেবে ইল্‌ম বলে, যাদের অন্তরে এই নূরের সম্পর্ক অর্জনের প্রেরণা থাকে। আপনি স্পঞ্জ দেখে থাকবেন। যখন তাকে পানিতে রাখা হয়, তখন সেটা সমস্ত পানি চুষে নেয় এবং তার প্রতিটি ছিদ্রে পানি পৌঁছে যায়। তাই ইল্‌মচোষক মানুষকে তালেবে ইল্‌ম বলে। শিক্ষকদের সম্মুখে তারা এমনভাবে বসে যে, শিক্ষকের মুখ থেকে যে বাণীই নির্গত হয়, সেটি তাদের স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করে। অধিক উষ্ণতায় যেমন মানুষ অতি আগ্রহের সাথে পানি পান করে, তালেবে ইল্‌ম এর চেয়ে বেশি আগ্রহের সাথে ওস্তাদগণের বাণী গ্রহণ করে।'

তালেবে ইল্‌মদের মর্যাদা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ.

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعِلْمُ نُوْرٌ

اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

ইল্‌ম একটি নূর

ইল্‌ম একটি নূর। এটি হেদায়াতের প্রতি রাস্তা দেখায়। আম্বিয়ায়ে কেরামগণ এই ইল্‌ম নিয়ে এসে মানুষের মধ্যে বণ্টন করেছেন। তাদের সান্নিধ্যে থাকা লোকেরা এর বরকত গ্রহণ করেছে। তারপর তা পরবর্তীদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। নবীগণের ত্যাজ্য সম্পত্তির এ ক্রমধারা আজ পর্যন্ত চলে আসছে। ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তা এখনও বিস্তার হচ্ছে। শিক্ষকগণ শিক্ষা দেন। ছাত্ররা শিক্ষা গ্রহণ করে। তাদের সারাটা বছর এভাবেই চলে।

বছরের শুরুতে বোখারি শরীফের দরস নামে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর সূচনা হয়। এতে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই সমবেত হয়ে দু'আর মাধ্যমে শিক্ষাবর্ষের উদ্বোধন করেন।

ইল্‌ম অন্বেষণকারীর সম্মান

সর্বজনস্বীকৃত কথাটি হচ্ছে, আল্লাহপাক যাদের ইল্‌ম শিক্ষার তাওফীক দান করেন, তারা আল্লাহপাকের চয়নকৃত বান্দা।

আল্লাহপাক বলেন–

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

'আমার কিতাবের উত্তরাধিকারী আমি তাদেরই নিযুক্ত করি, যারা আমার চয়নকৃত বান্দা।'[১০৮]

বর্তমানে যারা বোখারি শরীফ বা অন্যান্য শ্রেণিতে পড়ছে, তারা সবাই একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের অধীনে জীবন যাপন করছে। আল্লাহর দরবারে তাদের অনেক সম্মান রয়েছে। তারা এমন সম্পদ অর্জন করছে, যা আল্লাহপাক নবীগণের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। সত্যবাদীদের সঙ্গে এর সম্পর্ক। যারা এই ইল্‌ম হাসিল করবে, তারা সত্যবাদী হয়ে যাবে।

হযরত সুফিয়ান ছাওরি (রহ.) বলেন, ইল্‌ম শিক্ষার নিয়ত যদি সঠিক হয়, একমাত্র আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে পৃথিবীতে এর চেয়ে উত্তম কোনো জিনিস হতে পারে না। হাদীছ শরীফে এসেছে, আল্লাহ যখন কোনো সাধারণ মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন। পক্ষান্তরে কোনো তালেবে ইল্‌মের প্রতি খুশি হলে তার জন্য একটি শহর আবাদ করেন। সুবহানাল্লাহ! তালেবে ইল্‌মদের ফেরেশতাও মহব্বত করে। তাদের সম্মানার্থে ফেরেশতারা নিজের ডানা তাদের পায়ের তলে বিছিয়ে দেন।

প্রকৃত তালেবে ইল্‌ম কে?

ওই সকল যুবক-বৃদ্ধ সবাইকে তালেবে ইল্‌ম বলে, যাদের অন্তরে এই নূরের সম্পর্ক অর্জনের প্রেরণা থাকে। আপনি স্পঞ্জ দেখে থাকবেন। যখন তাকে পানিতে রাখা হয়, তখন সেটা সমস্ত পানি চুষে নেয় এবং তার প্রতিটি ছিদ্রে পানি পৌঁছে যায়। তাই ইল্‌মচোষক মানুষকে তালেবে ইল্‌ম বলে। শিক্ষকদের সম্মুখে তারা এমনভাবে বসে যে, শিক্ষকের মুখ থেকে যে বাণীই নির্গত হয়, সেটি তাদের স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করে। অধিক উষ্ণতায় যেমন মানুষ অতি আগ্রহের সাথে পানি পান করে, তালেবে ইল্‌ম এর চেয়ে বেশি আগ্রহের সাথে ওস্তাদগণের বাণী গ্রহণ করে। এটা ধরাবাঁধার কাজ নয়। এটা খুশির বিষয়। তাই আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করতে হবে।

---

১০৮. সূরা ফাতির : আয়াত ৩২

ইল্‌মের বাতির চতুর্পার্শ্বে পতঙ্গের মহা সমাগম

এ নেয়ামত হাসিলের জন্য মানুষ দিন ও রাত এক করে দেয়। এজন্যই তালেবে ইল্‌মদের কাছে দিন-রাতের কোনো বৈষম্য থাকে না। হযরত মাদানি (রহ.) যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ করতে হতো। তাই গভীর রাত্রে মাদরাসায় আসতেন। ছাত্ররা দারোয়ানকে বলে রাখত, হুজুরের সাধারণ নিয়ম হলো যখনই মাদরাসায় আসবেন, তখন উজু করে মসজিদে গিয়ে নামায পড়বেন। সুতরাং হুজুর এলে আমাদের জাগিয়ে দেবেন। তা-ই করা হতো। হুজুর নামায পড়ছেন। এদিকে ছাত্ররা উজু করে কিতাব নিয়ে হুজুরের পেছনে বসে থাকত। তাঁর আসার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। যখনই আসতেন, তখনই ছাত্ররা মোম বাতির পতঙ্গের মতো চতুর্দিক ঘিরে ক্লাসরুম ভরে যেত।

ইল্‌মপিপাসার এক অনুপম উদারহণ

একবার আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)কে তৎকালীন শাসনকর্তা বন্দি করলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর এক যুবক বিচারকের দরবারে এসে অঝোরধারায় কাঁদতে শুরু করল। তাকে দেখলেই মনে হয় তার চেহারায় ইল্‌মের নূর প্রস্ফুটিত হচ্ছে। তার চেহারা এ আয়াতের যোগ্য পাত্র ছিল। আল্লাহপাক বলেন–

سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ

'তাদের নিদর্শন হলো তাদের চেহারায় সেজদার চিহ্ন থাকে।'[১০৯]

এ মজলিসে যারা উপস্থিত ছিল, সবাই অনুভব করল, এ যুবক যে আবদারই করবে, তা গ্রহণ করা হবে। এমনকি বিচারকেরও এমন অবস্থা হলো। বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন, হে যুবক! তুমি কাঁদছ কেন? কোনো কষ্ট থাকলে বলো; আমি দূর করে দেব। কিছু চাওয়ার থাকলে বলো; তা আমি পূর্ণ করব। তখন সেই যুবক বলল, হুজুর! আমার আবদার হলো, আপনি আমাকে কারাগারে বন্দি করুন। কী আশ্চর্যের কথা! বিচারক একথা শুনে হতাশ হয়ে গেলেন। ভাই! কী ব্যাপার? তোমাকে কারাগারে পাঠাব কেন? সে জবাব দিল, আপনি আমার ওস্তাদকে জেলখানায় বন্দি করেছেন, যার কারণে অনেক দিন যাবৎ আমার সবক ফাঁকা যাচ্ছে। যদি আমাকে

---

১০৯. সূরা ফাতাহ : আয়াত ২৯

জেলখানায় দিয়ে দেন, তবে কারাগারের কষ্ট সহ্য করতে হবে সত্য; তবু আমার ওস্তাদের কাছে থেকে ইল্‌ম তো শিক্ষা করতে পারব। সুবহানাল্লাহ!

ইল্‌মের সন্ধানী এমনও ছিল!

শাহ আবদুল কাদের রায়পুরি (রহ.) বলেন, আমি দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হতে গেলে শিক্ষাসচিব সাহেব বললেন, ভর্তির সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন আর ভর্তি করা যাবে না। তখন আমি শিক্ষাসচিব সাহেবকে মিনতির সাথে বললাম, হুজুর! এখন আমি কী করতে পারি? তিনি বললেন, বাবা! মূল বিষয় হচ্ছে, আমাদের এখানে বোর্ডিং নেই, বাবুর্চি নেই। গ্রামের লোকেরা কিছু ছাত্রের খাবারের ব্যবস্থা করে। সে পরিমাণ ছাত্র আমাদের ভর্তি হয়ে গেছে। পরে কেউ এলে আমরা অপরাগতা প্রকাশ করি। বর্তমানে এমন কোন ঘর নেই যে, আমরা আরেকজন ছাত্রের খাবারের ব্যবস্থা করতে পারি। আমি বললাম, হুজুর যদি আমার খাবারের দায়িত্ব আমার ওপর থাকে, তাহলে আমাকে ভর্তি করবেন? তিনি বললেন, ঠিক আছে এ শর্তে ভর্তি করতে পারি। আমি এ শর্তেই ভর্তি হলাম। তিনি বলেন, আমি সারাদিন ক্লাস করি, রাতে তাকরার করি। লেখাপড়া শেষ করে ছাত্ররা ঘুমানোর পর আমি ওস্তাদের কাছে থেকে অনুমতি নিয়ে বাজারে গিয়ে আম, কলা ইত্যাদির ছালবাকল কুড়িয়ে এনে ধুয়ে পরিষ্কার করে খাচ্ছি। এটাই ছিল আমার চব্বিশ ঘন্টার খাবার। এগুলো খেয়ে আমি এক বছর কাটিয়েছি। তবু ক্লাস ফাঁকা দেইনি। সুবহানাল্লাহ!

তারাই ছিল ছাত্র। তাদের জীবনী দেখে উপলব্ধি হয় যে, কোনো মানুষ যেমন কোনো বস্তুর জন্য অস্থির হয়, তেমনি তারা নিজের ওস্তাদগণের জন্য অধীর থাকতেন। তাই শিক্ষকের দরস তাদের কাছে দুনিয়ার সকল বস্তু হতে প্রিয় থাকত। তারা সবক ফাঁকি দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু এ হলো সেই শিক্ষা, যা মানুষের হৃদয়কে নূরানি বানায়। তাই আমাদের ওলামায়ে কেরাম ইল্‌ম শিক্ষা করতে এমন সাধনা করেছেন, যার দৃষ্টান্ত দিতে পৃথিবী ব্যর্থ।

ইল্‌মের তৃষ্ণার উত্তম দলীল

এক মুহাদ্দিছ সাহেব বলেন, আমি জানতে পারলাম, অন্য একজন মুহাদ্দিছ সাহেব একটি হাদীছ জানেন। সেই হাদীছটি আমিও জানি; তবে আমার জানা থেকে তাঁর জানার সনদ দৃঢ় তার সনদের ধারাবাহিকতা

কয়েকজন পরই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সুতরাং হাদীছের এই মজবুত সনদ সংগ্রহ করার জন্য আমি নয়শ মাইল পথ সফর করে তাঁর কাছে থেকে এই হাদীছের সনদ সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। সুবহানাল্লাহ! মুহাদ্দিছে কেরামের ইল্‌মি তৃষ্ণা কীরূপ ছিল। মাত্র একটি হাদীছকে মজবুত করার লক্ষ্যে প্রায় হাজার মাইল পথ সফর করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (রাযি.)-এর আবেদন

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এক জায়গায় দরস দিচ্ছেন। তারপর অন্য এলাকা থেকে কিছুলোক এসে বলল, হুজুর আপনি দয়া করে আমাদের এলাকায় একটি দরস দিত হবে। তিনি বললেন, ভাই! আমি এখানে দরস দিই। এখান থেকে আপনাদের এলাকায় গিয়ে দরস দিয়ে আসা আমার জন্য কঠিন হয়ে যাবে। তারা বলল, হুজুর! আমরা একটি বাহনের ব্যবস্থা করব। সুতরাং আপনি এখান থেকে আমাদের গ্রামে দ্রুত যাওয়া-আসা করতে পারবেন। ইমাম মুহাম্মদ (রাযি.) এতে রাজি হয়ে গেলেন। এমন সময় ইমাম শাফেয়ী (রাযি.) আবেদন করলেন, হুজুর! আমি এই কিতাবটি আপনার কাছে শিক্ষা করার জন্য এসেছি। তিনি বললেন, ভাই! স্বতন্ত্রভাবে তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার সময় আমার হাতে নেই। ইমাম শাফেয়ী (রাযি.) বললেন, হুজুর! আপনি যখন এখানে দরস দিয়ে ওই গ্রামে যাবেন, তখন আমি আপনার বাহনের ওপর থেকে আমাকে এ কিতাবের দরস দেবেন। এতে আপনার সময়েরও ক্ষতি হবে না। এদিকে আমার শিক্ষা হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ! মানবেতিহাসে ইল্‌মি তৃষ্ণার এর চেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবে না।

ইল্‌মি আত্মমর্যাদার আশ্চর্য ঘটনা

জ্ঞান সন্ধানের রাস্তায় আমাদের ওলামায়ে কেরামগণ সীমাহীন কষ্ট-সাধনা করেছেন। তাঁরা সুখের সঙ্গে তা অর্জন করেননি। উদাহরণস্বরূপ–

হযরত সুফিয়ান ছাওরি (রহ.) তাঁর দুজন সাথীসহ একজন মুহাদ্দিছ সাহেবের কাছে ইল্‌ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে গেলেন। তিনি বলেন, আমাদের কাছে অল্প পরিমাণ ছাতু ছিল। এগুলো আমরা অল্প-অল্প করে আহার করি আর ইল্‌ম শিক্ষা করি। আমাদের কিতাবের দরস শেষ হওয়ার তিন দিন পূর্বে খাবার শেষ হয়ে যায়। আমরা চিন্তায় পড়ে গেলাম। তারপর পরামর্শ হলো, দুজন কিতাব শিক্ষা করবে আর একজন লোকালয়ে গিয়ে মজুরি করে খাবার

সংগ্রহ করবে। এভাবে ক্লাসও চলবে, খাবারেরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এদিকে কিতাবের সবকও তিন দিনে শেষ হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, পরদিন দুজন ক্লাসে গেলাম আর একজন মজুরি করতে বাইরে গেল। সে খাবারের ব্যবস্থার জন্য লোকালয়ে না গিয়ে সোজা মসজিদে গিয়ে নফল ইবাদাত ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করল। সে ভাবল, মাখলুকের কাছে চাওয়া থেকে সরাসরি আল্লাহ পাকের কাছেই চাইব। সারাদিন মসজিদে অবস্থান করে সন্ধ্যায় ফিরে এল। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, কী ভাই! কোনো ব্যবস্থা হয়েছে? সে উত্তর দিল, ভাই আমি এমন এক মালিকের কাজ করেছি, যিনি খুব কড়াকড়িভাবে হিসাব করেন। তাই পরে দেবেন। তার কথায় আমরা শান্ত হয়ে বসে রইলাম।

দ্বিতীয় দিন অন্যজনের পালা। সেও বের হয়ে একই রাস্তা অবলম্বন করল। মসজিদে গিয়ে সারাদিন ইবাদাত করে সন্ধ্যায় ফিরে এলে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই! কোনো ব্যবস্থা হয়েছে? সে উত্তর দিল, আমি এমন এক মালিকের কাজ করেছি, যিনি কারও প্রাপ্য অনাদায়ী রাখেন না। পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমার মজুরি তুমি পরিপূর্ণই পাবে।

তৃতীয় দিন আমিও এ আমলই করলাম। আল্লাহর অপার মহিমা! ওই দিন রাতে তৎকালীন শাসক স্বপ্নে দেখলেন, কঠিন একটি বিপদ তাকে গ্রাস করতে চাচ্ছে আর বলছে, সুফিয়ান ছাওরি আর তার দুই সাথীর খবর নাও।

এই স্বপ্ন দেখেই তার ঘুম ভেঙে গেল। শাসক চতুর্দিকে পুলিশ পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে টাকার থলি দিয়ে বলে দিলেন, যাও সুফিয়ান নামের লোকটির সন্ধান বের করে তাকে এটা দেবে আর বলবে এটা শুধু উপস্থিত উপঢৌকন। ভবিষ্যতে তাদের জন্য আমার ধনভান্ডার উন্মুক্ত রয়েছে।

এদিকে আমাদের কিতাব শিক্ষা করাও শেষ হয়ে গেছে। পুলিশ চতুর্দিকে সন্ধান করতে-করতে মসজিদে এসে আমাদের সন্ধান পেয়ে গেল। তারা বলল, বর্তমান বাদশাহর পক্ষ থেকে আপনাদের হাদিয়া। তিনি গত রাত এমন স্বপ্ন দেখেছেন। তাই আপনাদের জন্য এগুলো পাঠিয়েছেন।

হযরত সুফিয়ান ছাওরি বলেন, আমরা পরস্পরে পরামর্শ করলাম, এখন কী করা যায়। আমাদের সম্মুখে দুটি দরজা রয়েছে। একটি আসল মালিকের, অপরটি বাদশাহর। আমরা যে ইল্‌ম শিক্ষা করেছি, তাতে বলা হয়েছে মালিকের কাছ থেকে গ্রহণ করো। সুতরাং আমাদের ইল্‌মের আত্মসম্মান

এটা সহ্য করতে পারে না যে, আমরা বাদশাহর দরবারে গিয়ে কিছু গ্রহণ করব। আল্লাহু আকবার! তিন দিনের উপবাস থাকা সত্ত্বেও বাদশাহর কাছে থেকে কিছু গ্রহণ করতে ইল্‌মের আত্মমর্যাদা সহ্য করেনি। এ অবস্থায়ই তাঁরা সফর করে বাড়িতে ফিরে এলেন। তাঁরা ছিলেন তালেবে ইল্‌ম। তাদের দৃষ্টি সর্বদা আল্লাহপাকের দিকে থাকত। এ রাস্তায় তারা কষ্ট-সাধনা করেছেন। তবু কারও কাছে মাথানত করেননি। ফলে তাদের প্রতি আল্লাহপাকের সাহায্য এসেছে।

ইল্‌মপিপাসুদের পরিতৃপ্তি

দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার প্রাথমিক পর্যায়ে শাহ রফিউদ্দীন সাহেব কিছুদিন মাদরাসার দায়িত্বে ছিলেন। একদিন তিনি মাদরাসার হাউজে (কূপে) উজু করছেন। এমন সময় এক ছাত্র টিফিনবাটি নিয়ে হযরতের সামনে উপস্থিত হলো। তার বাটিতে সামান্য পাতলা ডাল ছিল। সে বলছে, দেখুন হুজুর! আপনার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় মাদরাসা থেকে এমন ডাল-তরকারি দেওয়া হয়, যার দ্বারা উজু করা জায়েয হবে। একথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটার হাত থেকে বাটিটা ফসকে ডালটুকু পড়ে গেল।

এরপর ছেলেটা পালিয়ে চলে গেল। কিন্তু ওস্তাদগণ বিষয়টি জেনে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তারা বললেন, এই ছেলেটা নাযেম সাহেবকে একথা বলার দুঃসাহস কোত্থেকে পেল? নাযেম সাহেবের আমল সম্পর্কে তারা অবগত ছিলেন। তিনি এলে তারা বললেন, হুজুর! এই ছেলের আচরণে আমরা লজ্জিত। দয়া করে আপনি মনে কষ্ট নেবেন না। তিনি বললেন, না-না; সে তো আমাদের ছাত্র নয়। শিক্ষকগণ বললেন, ও তো আমাদেরই ছাত্র। তিনি বললেন, না; সে আমাদের ছাত্র নয়। এবার ভাবলেন, দেখা যাক বোর্ডিংয়ের খাতায় তার নাম আছে কি-না। খোঁজ করে দেখা গেল, খাতায় তার নাম আছে। আবার শিক্ষকগণ এসে বললেন, হুজুর বোর্ডিংয়ের খাতায় তার নাম আছে। তিনি বললেন, না সে আমাদের ছাত্র নয়। এবার ক্লাসের খাতা চেক করে দেখা গেল, তাতেও তার নাম রয়েছে। হুজুর আবার বললেন, না; সে আমাদের ছাত্র নয়। শেষ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া গেল, তার নাম হাজিরা খাতায় আছে ঠিকই; তবে সে কোনোদিন ক্লাস করেনি। শুধু খাওয়ার সময় আসে। খেয়ে বাইরে চলে যায়। এদিকে ক্লাসে অন্য এক ছাত্রের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। তাই হাজিরার সময় ওই ছাত্রটি তার হাজিরা দিয়ে দিত।

ওস্তাদগণ মূল বিষয় জেনে হতাশ হয়ে গেলেন, হুজুর মাঝে-মাঝে এসে ছেলেটাকে চিনে ফেললেন; অথচ আমরা সবসময় থেকে এ বিষয়টি আঁচ করতে পারলাম না। এতে তারা আরও লজ্জিত হয়ে হুজুরের কাছে ক্ষমা চাইলেন আর বললেন, হুজুর! ছাত্রদের সঙ্গে তো আপনার এত সম্পর্ক নেই। তাহলে কীভাবে জানলেন, সে ছাত্র নয়। তিনি বললেন, আমি যখন এ মাদারাসার দায়িত্ব নিলাম, তখন একদিন হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাবে দেখলাম। তিনি এই কূপের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সমস্ত ছাত্র সারিবদ্ধভাবে আসছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কূপের পানি দ্বারা সকল ছাত্রের পাত্র ভরে দিলেন। সেখানে আমি ওই ছেলেটাকে দেখিনি। তাই বললাম, সে আমাদের ছাত্র নয়। সুবহানাল্লাহ!

তারপর এমন একটা সময় এল যে, মাদরাসার সকল ছাত্র-ওস্তাদ এমনকি বাবুর্চি ও দারোয়ান পর্যন্ত আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে গিয়েছিল। এটা কীভাবে হলো? তারা সর্বদা ইল্‌মের আশেক ছিলেন। দিনরাত ইল্‌মের জযবায় মগ্ন থাকতেন।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর দরবারে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)

আল্লাহপাক আমাদের পূর্বপুরুষদের অন্তরে ইল্‌ম অর্জনের এমন আগ্রহ দিয়ে ছিলেন যে, তাদের ওস্তাদগণ যা কিছুই বলতেন সেগুলো তাদের স্মৃতিপটে বদ্ধমূল হয়ে যেত।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আমি মদীনার মসজিদে ইমাম মালেক (রাযি.)-এর সান্নিধ্য গেলাম। যাওয়ার পর দেখতে পেলাম। উঁচা-লম্বা এক লোক বসে বলছেন–

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমি বুঝে গেলাম, ইনিই ইমাম মালেক হবেন।

তিনি ছাত্রদের শ্রুতলিপি করাচ্ছেন। হাদীছ শুনে-শুনে ছাত্ররা লিখছে। তিনি বলেন, আমি মুসাফির মানুষ। আমার হাতে লেখার মতো কিছু ছিল না। তাকিয়ে দেখি, একটি শুকনা ডাল আমার পাশে পড়ে আছে। সেটা নিয়ে হাতের তালুতে লিখতে শুরু করলাম, যাতে আমিও তাদের সাদৃশ্য হয়ে যাই। কারণ, হাদীছে এসেছে–

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

'যেব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।'

নামাযের সময় হলে সবাই নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি বসে রইলাম। এমন সময় ইমাম মালেক (রাযি.)-এর দৃষ্টি আমার দিকে পড়লে তিনি বললেন, ভাই! আপনি কী করছেন। আমি বললাম, হাতের মধ্যে হাদীছ লিখছি। তিনি বললেন, কী লিখেছ দেখাও। বললাম, হুজুর! এটা কলম নয়– এটা একটা শুকনা ডাল। সুতরাং দেখানো সম্ভব নয়। তিনি বললেন, ভাই! এটা তো হাদীছের আদবের পরিপন্থী। আমি বললাম, হুজুর! বাহ্যিকভাবে আমি শুকনা ডাল দ্বারা হাতের তালুতে লিখছি আর অন্তর্নিহীতভাবে আমি হাদীছসমূহ আমার স্মৃতিপটে লিপিবদ্ধ করছি। তিনি বললেন, এর মানে কী? আমি বললাম, হুজুর! আপনি যা কিছু বলছেন, সব আমার স্মরণ আছে। তিনি বললেন, আমি একশরও বেশি হাদীছ ছাত্রদের লিখিয়েছি। তন্মধ্যে অর্ধেক হাদীছ যদি তুমি বলতে পার, তবে তা অনেক বড় ব্যাপার হবে। ইমাম শাফেয়ী (রাযি.) বলেন, তিনি অর্ধেকের কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমি ১নং হাদীছ থেকে শুরু করে শেষ হাদীছ পর্যন্ত সনদসহ মুখস্থ শুনিয়ে দিলাম। সুবহানাল্লাহ!

ইমাম বোখারির সাধনা

যারা চেষ্টা-সাধনার সাথে ইল্‌ম অর্জন করে, তাদের ওপর আল্লাহপাকের রহমত বর্ষিতে থাকে। আল্লাহর দরবারে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নসিব হয়। তারা ইল্‌ম অর্জনের এমন সাধনা করতেন যে, নিজের একান্ত প্রয়োজনীয় কাজও ছেড়ে দিতেন। অথচ বর্তমানে এমনও ছাত্র আছে, যারা তাদের মনের চাহিদা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। ইমাম বোখারি (রহ.) বিশ বছর পর্যন্ত শুধু বাদাম আর ছোলা খেয়ে চব্বিশ ঘন্টা কাটিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি হাদীছ সংগ্রহ করার জন্য কুফায় এত সফর করেছি, যার সংখ্যা আমি বলতে পারব না। আজ দেখুন, আল্লাহপাক এই বোখারি শরীফকে কত সম্মান দিয়েছেন! তার সবক শুরুর ও শেষের দিন মাহফিল করা হয়। এর কারণ হচ্ছে, তাঁরা ইল্‌ম শিক্ষার জন্য অস্থির থাকতেন। তাই আল্লাহপাক তাঁদের ইল্‌মে এত সম্মান দান করেছেন।

ওলামায়ে কেরামের ধৈর্য ও অটলতাকে সালাম

তারা এমন লোক ছিলেন, যারা কুরআন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছেকে সংরক্ষণ করেছেন। এ সংরক্ষণ দুভাবে হয়।

১. মুখস্থ রাখার দ্বারা

২. নিজের জীবনে ইল্‌মের পেছনে ব্যস্ত থাকার দ্বারা।

অর্থাৎ– জীবনের সাথী বানানোর দ্বারা।

সমস্ত ওলামায়ে কেরাম শরীয়তের বিধানকে আমলে পরিণত করে তাকে নিজের জীবনসাথী বানিয়ে নিয়েছিলেন। আল্লাহপাক বলেন–

وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ

'দরবশে ও ওলামায়ে কেরাম এজন্য যে, তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক বানানো হয়েছে।'[১১০]

রবওয়ালা মানে আল্লাহওয়ালা। احبار হচ্ছে حبر-এর বহুবচন। অর্থ জ্ঞানী। অর্থাৎ– ওলামায়ে কেরাম, সালেহীন। তাঁদের দায়িত্ব কী? তাঁরা আল্লাহপাকের কিতাবের হেফাযতকারী। আপনি দেখে থাকবেন, পুল বা সেতু হেফাজতের জন্য পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ করে বসে থাকে। তেমনিভাবে ওলামায়ে কেরাম কুরআনের প্রতিটি আয়াতে ফাঁড়ি তৈরি করে বসে থাকেন। তারা কোনো মিথ্যাবাদীকে যথেচ্চাভাবে কুরআনের মর্ম বোঝানোর জন্য সুযোগ দেন না। যদি কেউ চেষ্টা করেও, তবে ওলামায়ে কেরাম এর সঠিক বিশ্লেষণ বুঝিয়ে দেন। এটা তাদের ফরজ দায়িত্ব। এ যোগ্যতা কখন হাসিল হবে? যখন কুরআনকে নিজের জীবনে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَا يَحْيٰى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ

'হে ইয়াহইয়া! কিতাবকে শক্তভাবে ধরো।'[১১১]

এর উদ্দেশ্য কী? এর উদ্দেশ্য কি হাত দ্বারা শক্ত করে ধর? না; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, এই কিতাবের শিক্ষা নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করো। একে تَمَسُّكٌ بِالْكِتَابِ (কিতাবকে আঁকড়ে ধরা) বলে।

---

১১০. সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৪

১১১. সূরা মারয়াম : আয়াত ১২

কুরআন ও সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা শুধু শব্দ পড়ে গেলে হাসিল হবে না। এজন্য যেব্যক্তি কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করে না, তার সম্পর্কে কুরআন বলে–

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

'তাদের দৃষ্টান্ত গাধার মতো, যে নিজের পিঠে কিতাব বহন করে।'[১১২]

কিতাবে কী আছে সে জানে না। সুতরাং উপকারী ইল্‌ম হলো যার ওপর মানুষ আমল করে। এজন্য মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহ.) বলেন, ইল্‌ম এমন একটি নূর, যা শিক্ষা করার পর মানুষ তার ওপর আমল না করে শান্ত থাকতে পারে না। আমাদের বুযুর্গদের জীবনী দেখুন। তাঁরা যা শিক্ষা করেছিলেন, তার ওপর আমল করেছেন। তাদের জীবনীতে তাকওয়া, পরহেযগারি, উত্তম চরিত্র, বিনয় ও নম্রতা পরিলক্ষিত হয়।

প্রিয় তালেবে ইল্‌ম ভাইয়েরা! এটা সত্যের কাফেলা, যে কাফেলার সেনাপতি ছিলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম। তাঁরা ছিলেন আল্লাহপাকের মনোনীত বান্দা। তাঁদের পরে ছিলেন যথাক্রমে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন; তাবয়ে তাবেঈন ও আমাদের পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরাম। তাঁরা সবাই আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জন করে উর্ধ্বজগতের দিকে চলে গেছেন। এমন অসংখ্য লোক পৃথিবীতে এসে এখলাসের জীবন গড়ে পরকালে পাড়ি দিয়েছেন। বর্তমানেও এ সমস্ত মাদরাসায় অসংখ্য ছাত্র-ওস্তাদ দীনের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে যাচ্ছেন। আমাদের ওলামায়ে কেরাম কেউ বিশ বছর, কেউ চল্লিশ বছর শুকনা রুটি খেয়ে চাটাইয়ের ওপর বসে ধৈর্যের সাথে ইল্‌মের খেদমত করে গেছেন। তাঁরা কখনও রাষ্ট্রীয় সাহায্যের ওপর তাওয়াক্কুল করতেন না। তাঁরা আল্লাহপাকের এহসানের ওপর ভরসা করে কুরআনের সংরক্ষণ নিজের ফরজ দায়িত্ব মনে করতেন এবং তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। তাদেরকে আল্লাহপাক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা দিয়েছিলেন। আমি তাঁদের এ অটলাতাকে সালাম জানাই। তাঁরা রাষ্ট্রীয় অনুদানের দরজার ওপর মহান আল্লাহর দুয়ারকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এর ওপরই ভরসা করে রয়েছেন। তারা কার ছিলেন?

---

১১২. সূরা জুমুআ : আয়াত ৫

আল্লাহপাক বলেন–

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ

'তারা ওই সমস্ত লোক, যারা কিতাবকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছে।'[১১৩]

তাঁরা নিজের প্রাণ উৎসর্গ দিতে প্রস্তুত ছিলেন; তবু কুরআন ও সুন্নাহের খেলাফ কাজ করতে রাজী ছিলেন না। যদি তাঁদের জীবনকাহিনি জানতে চাও, তাহলে 'তারীখে ওলামায়ে দেওবন্দ' নামক গ্রন্থটি পড়ে নিয়ো। তার পাতায়-পাতায় সাক্ষ্য বিদ্যমান যে, তাঁরা দীনের সংরক্ষণে কী পরিমাণ কুরবানি দিয়েছেন।

ইল্‌ম শিক্ষায় এক রাজপুত্রের সাধনা

শায়খুল হাদীছ আল্লামা যাকারিয়া (রহ.) ঘটনাটি বর্ণনা করেছিলেন। আমি অধম আমার নিজের ভাষায় ঘটনাটি বর্ণনা করছি।

বাদশাহ হারুন রশীদের এক ছেলে ছিল। সে যৌবনের শুরুলগ্ন থেকেই ধার্মিক ছিল। রাজমহলে থেকেও সে সাদা জামা পরিধান করত। দস্তরখানা বিছিয়ে শুকনো রুটি খেত। পার্থিব আভিজাত্যের প্রতি তার অনীহা ছিল। বোঝা যেত, সে একজন খাঁটি দরবেশ। তাই লোকেরা তাকে পাগল বলত।

একদা কিছু লোক বাদশাহকে তাঁর ছেলের ব্যাপারে খুব গোস্বামূলক কথা বলল যে, আপনি তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করছেন না। সামান্য শাসালেই তো সে ঠিক হয়ে যায়। তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন, তোমার কারণে আজ আমাকে বন্ধু-বান্ধবের কাছে লজ্জিত হতে হচ্ছে। ছেলে উত্তর দিল, আব্বাজান! আমার কারণে যদি আপনি লজ্জিত হন, তাহলে আমাকে অনুমতি দিন। আমি ইল্‌ম শিক্ষার জন্য কোথাও চলে যাব, যা আমি অনেক আগেই বলেছিলাম। বাদশাহ ক্রোধের স্বরে বললেন, ঠিক আছে, যাও; আমি অনুমতি দিলাম।

রাজপুত্র ইল্‌ম শিক্ষার জন্য বের হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করল। ক্রোধ নিবারণ হওয়ার পর বাদশাহ চিন্তায় পড়ে গেলেন, ছেলে তো এখন চোখের আড়াল হয়ে যাবে। তাই রানিকে বললেন, ছেলেটাকে আটকাও। রানি ছেলেকে বারণ করতে চাইলে ছেলে বলল, আম্মাজান! আমি ইল্‌ম শিক্ষার জন্য নিয়ত পাকা করে ফেলেছি; আমাকে যেতেই হবে। রানি ছেলের দৃঢ় সংকল্প দেখে বললেন, আচ্ছা বাবা! যাও। তারপর একটি কুরআন শরীফ ও

---

১১৩. সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৭০

একটি আংটি দিয়ে বললেন, বাবা! এদুটি জিনিস সঙ্গে রাখবে। কুরআনখানি তেলাওয়াত করবে আর প্রয়োজন হলে আংটিটা ব্যবহার করবে। মায়ের কাছ থেকে এদুটি বস্তু নিয়ে ছেলে ইল্‌ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল।

যুবক এত সুন্দর ছিল যে, তাকে দেখলে লোকজন অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। বন্ধুগণ! তার সামনে দুনিয়ার সমস্ত নেয়ামত উপস্থিত ছিল। দেখুন, সে চাইলে সুখের জীবন কাটাতে পারত। চাইলে প্রাসাদে সুখের জীবন গড়তে পারত। কিন্তু না; তার হৃদয়ে আল্লাহপাকের ভালোবাসা ছিল। পরকালের ভয় ছিল। ইল্‌ম শিক্ষার প্রেরণা ছিল।

সে বলল, আমি পার্থিব জীবনের স্বাদ ভোগ করতে চাই না। চিরস্থায়ী জীবনের আনন্দ ভোগ করতে চাই। তাই সে রাজমহল ত্যাগ করে অজানার উদ্দেশে বের হয়ে গেল। বাদশাহর ছেলে তার প্রাসাদের জীবনকে লাথি মারল। বর্তমানে এই ছাত্রদের মধ্যে কেউ ধনীর দুলাল হলে সে কথা মেনে নিতে পারবে না। সে বলবে, আমিও তো এত বড় রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এসেছি। আরে ভাই! এই রাস্তায় শাহাজাদাদেরও চাটাইয়ের ওপর বসতে দেখা যায়।

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی

منت شناش ازو کہ بخدمت گزاشت

'বন্ধু! তুমি বাদশাহর সেবা করছ বলে গঞ্জনা করো না। বাদশাহর সেবক তো লাখ-লাখ রয়েছে। বরং বাদশাহ তোমার ওপর দয়া করেছেন যে, তোমাকে তাঁর সেবক হিসেবে গ্রহণ করেছেন।'

সে অট্টলিকা ছেড়ে বহুদূর এমন একটা লোকালয়ে গেল, যেখানে ওলামায়ে কেরাম বসবাস করেন। সে নিয়ত করেছিল, আমি মসজিদে এতেকাফের জীবন কাটাব। শুধু দরসের সময় ওস্তাদের কাছে যাব। তাদের বোঝা হয়ে পানাহারের ব্যবস্থাপনা তাঁদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেব না। সে জীবনযাপনের জন্য এই রুটিন করে নিয়েছিল যে, সপ্তাহে একদিন মজুরি করে ছটা রুটির ব্যবস্থা করব আর দৈনিক একটা রুটি পানি দ্বারা আহার করে চব্বিশ ঘন্টা কাটাব।। ছদিন পর আবার মজুরি করতে যাব। সুতরাং সে ছদিন ওস্তাদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করছে। সপ্তম দিন ছুটি থাকে। তাই সে ওই দিন কাজে বের হয়ে ছদিনের খাবারের ব্যবস্থা করে।

একলোক বলছেন, আমি ঘর নির্মাণ করছিলাম। শ্রমিকের জন্য তাদের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দেখলাম, অতিশয় সুদর্শন এক যুবক পার্শ্বে বসে কুরআন তেলাওয়াত করছে। তার চেহারা দেখে আমার হৃদয়ে কুরআনের এই আয়াতটি উদ্ভাসিত হলো, যা ইউসুফ (আ.)-এর কে দেখে মিশরের মহিলারা বলেছিল। আল্লাহপাক বলেন–

مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ

'সে তো মানব নয়; সে কোনো সম্মানিত ফেরেশতা।'[১১৪]

তাকে শ্রমিকের মতো দেখাচ্ছে না। সে কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান মনে হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে যুবক! তুমিও কি কাজ করার উদ্দেশ্য এসেছ? সে জবাব দিল, চাচাজান, আমাদের জন্মই তো শ্রমিক হিসেবে। আল্লাহ বলেন–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ

'আমি মানুষদের সৃষ্টি করেছি কষ্ট-সাধনার জন্য।'[১১৫]

আমি বললাম, শ্রমিকের কাজ করবে? সে বলল, জি করব। তবে আমার দুটি শর্ত আছে।

কী তোমার শত?

চাচাজান! আমি সারাদিন কাজ করে এত টাকা নেব। এর চেয়ে কম বা বেশি নেব না। তা ওই পরিমাণ ছিল, যার দ্বারা ছটা রুটি খরিদ করা যায়।

ঠিক আছে। তোমার দ্বিতীয় শর্ত কী?

যখন নামাযের সময় হবে, তখন আমি নামাযে চলে যাব। ধীরেসুস্থে নামায পড়ে আসব। এতে আপনি কিছু বলতে পারবেন না। এটা আমার মালিকের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়। এ সময় অন্য কাজে লিপ্ত থাকা আমি সহ্য করতে পারব না। যদি আপনি এই শর্ত মেনে নেন, তাহলে আমি মজুরি করার জন্য প্রস্তুত আছি।

লোকটি বলল, আমি তাকে নিয়ে এলাম। সারাদিন তার ইচ্ছেমতো কাজ করেছে। সন্ধ্যায় দেখি সে কয়েকজন শ্রমিকের সমতুল্য কাজ একাই করেছে। কাজ বেশি দেখে আমি তাকে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিতে চাইলে সে

---

১১৪. সূরা ইউসুফ : ৩১

১১৫. সূরা বালাদ : আয়াত ৪

বলল, চাচা! আমি আগেই বলেছি, মজুরি কম-বেশি নেব না। ফলে সে ধার্যকৃত মজুরি নিয়ে চলে গেল। আমি ভাবলাম, আগামীকালও তাকেই আনতে হবে। পরের দিন সেখানে গিয়ে আর তাকে পেলাম না। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কুরআন তেলাওয়াতকারী শ্রমিকটি কোথায়? অন্যান্য শ্রমিকরা বলল, জনাব! সে প্রকৃত শ্রমিক নয়। সে একজন তালেবে ইল্‌ম। লেখা পড়া করে। সপ্তাহে একদিন ছুটি থাকার দরুন সে কাজ করে ছদিনের খাবারের ব্যবস্থা করে। সে মসজিদে এতেকাফ করে। কারও কাছে হাত পাতে না। ছুটির দিনে শ্রমিকের কাজ করে আহার জোগায়। আমি বললাম, ঠিক আছে আমি এক সপ্তাহ অপেক্ষা করব। সপ্তাহের শেষ দিন ওই স্থানে গিয়ে দেখি, যুবকটি বসে-বসে কুরআন তেলাওয়াত করছে। আমি তাকে বাড়িতে নিয়ে এলাম। তারপর ভাবলাম, তার মধ্যে কী গুণ রয়েছে, যার দরুন সে কয়েকজন শ্রমিকের কাজ একাই সেরে ফেলে তা আজ আমার দেখতে হবে।

সে বলল, ভাই আমি আড়ালে থেকে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম। একটি ইট স্থাপন করতে অনেক সময় লাগে। কারণ, প্রথমে ইট আনো, তারপর মসলা দাও, তারপর সোজা করো। কিন্তু তাকে দেখলাম, সে মসলা ফেলে ইট রেখে যাচ্ছে। এতে ইটগুলো স্বয়ংক্রীয়ভাবে সোজা-সোজা বসে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম, লোকটি অবশ্যই আল্লাহওয়ালা; তাই আমার ঘরটি তার মাধ্যমেই নির্মাণ করব।

পরের সপ্তাহে আমি সেখানে গিয়ে দেখি সে আসেনি। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, ভাই! ওই লোকটি অসুস্থ হয়ে গেছে। মসজিদেই আছে। আমি মসজিদে গিয়ে দেখি, সে চাটাইয়ের ওপর একটি ইট মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে আছে। প্রচণ্ড জ্বরের কারণে তার শরীর গরম হয়ে লাল হয়ে গেছে। আমি তার শিয়রের পাশে বসে আস্তে-আস্তে ইটখানা সরিয়ে আমার কোলে তার মাথা রেখে আদরের সাথে বললাম, হে যুবক! তুমি আমার কাছে সংবাদ পাঠালে না কেন? তাহলে আমি তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতাম। যে বলল, চাচা! যে ডাক্তার আমাকে আরওগ্য দান করবেন, তিনিই তো রোগ দিয়েছেন। তার এ জবাব শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। তারপর বললাম, আমি তোমার জন্য ভালো একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা করি। সে বলল, না, আমি এমন এক পথিক, যার আবাসস্থল নিকটেই। তবে পাথেয় নেই। আমি বললাম, তুমি কী বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না? সে বলল, অবস্থাদৃষ্টে

বোঝা যাচ্ছে, আমার সময় খুবই কম। আমি আপনার কাছে একটি আবদার করছি। দয়া করে পূর্ণ করবেন। আমার কাছে একটি আমানত রয়েছে; তা আমি আপনার হাতে সঁপে দিলাম। আমি চলে যাওয়ার পর আপনি জায়গামতো পৌঁছিয়ে দেবেন। এই আংটি ও কুরআন শরীফখানা বর্তমান বাদশাহর কাছে পৌঁছিয়ে দেবেন। তারপর সে মুনাজাত করতে শুরু করল–

'হে আমার মালিক! তুমি জান, আমি রাজপ্রসাদের সুখ-সাচ্ছন্দের জীবনকে লাথি মেরে তোমার সন্ধানে এখানে এসেছি। তোমার জন্যে কষ্ট-সাধনা করেছি। এখন তোমার দরবারে আমার উপস্থিতির সময় হয়েছে। আমি ভয় করছি, তুমি আমাকে তাড়িয়ে না দাও। তোমার দরবার ছাড়া আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। হে আমার মালিক! আমাকে তুমি দয়া করো। আমি এমন এক মুসাফির, পথ যার দীর্ঘ; কিন্তু কোনো পাথেয় নেই।

শুনে আমার চোখে অশ্রু নেমে এল। এই দু'আর মুহূর্তে সে কালেমা পাঠ করতে-করতে নিজের জান সৃষ্টিকর্তার কাছে সমর্পণ করে দিল। তখন বুঝতে পারলাম, আমি যার কথা শুনছিলাম, সে বাদশাহর ছেলে। ইল্‌ম শিক্ষার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেছে।

তারপর আমি শাহাজাদার কাফন-দাফন শেষ করে বাদশাহ হারুনুর রশীদের দরবারে হাজির হলাম। তখন তিনি সওয়ারিতে আরোহণ করে ঘোরাফেরা করছিলেন। আমি বললাম, হুজুর! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে। অনুগ্রহপূর্বক আমার একটি কথা শুনুন। বাদশাহ তার বাহন দাঁড় করালেন। আমি কুরআন শরীফ ও আংটি বাদশাহর হাতে দিলাম। এগুলো দেখেই বাদশাহর চেহারায় চিন্তার রেখা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন, আচ্ছা রাজদরবারে এসো। প্রাসাদে যেতেই তিনি আমাকে বললেন, হে পথিক! আমার মনে হয় তুমি আমার জন্য কোনো দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছ। বলো, আমার ছেলের কী হয়েছে? আমি বাদশাহকে তার ছেলের বিস্তারিত কাহিনি শোনালাম যে, তিনি সপ্তাহে ছদিন ইল্‌ম শিক্ষা করতেন। একদিন শ্রমিকের কাজ করে ছদিনের আহার জোগাতেন। ইট দ্বারা বালিশ বানিয়ে মসজিদের চাটাইয়ে থাকতেন। শেষ পর্যন্ত কালেমা পাঠ করতে-করতে আল্লাহর দরবাবে পৌঁছে গেছেন।

তার কথা শুনেই বাদশাহর দুচোখ অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে গেল। বাদশাহ বললেন, হে আমার সন্তান! তুমি এত অল্প বয়সে সেইকথা বুঝে গেলে, যা তোমার বয়স্ক পিতার উপলব্ধি করা উচিত ছিল।

বন্ধুগণ! তারা এমন লোক ছিলেন, যাদেরকে কেয়ামতের দিন কুরআনের রক্ষক বলে আহ্বান করে উঠানো হবে। তাদের জীবনই সাক্ষ্য দেয়, তারা সত্যিকারের তালেবে ইল্‌ম ছিলেন। সুতরাং প্রকৃত তালেবে ইল্‌ম হলেন, যারা একথা মনে করেন যে, আমার জীবন قال الله تعالى এবং قال رسول الله صلى الله عليه وسلم এর জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছি। তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। কারণ, এগুলো হচ্ছে অপ্রকৃত বস্তু। তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইল্‌ম শিক্ষা করা। এজন্যই তারা চব্বিশ ঘন্টা ইল্‌ম শিক্ষা করতে সচেষ্ট থাকতেন।

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আজকে যারা বোখারি শরীফের প্রথম সবক গ্রহণ করেছ বা করছ, তোমাদের উদ্দেশে বলছি। এই শিক্ষাবর্ষকে সাধারণত শেষ বর্ষ বলা হয়। সুতরাং এই প্রবল আবেগের সাথে ইল্‌ম শিক্ষা করো এবং তার ওপর আমল করতে থাকো। তারপর দেখবে, আল্লাহপাকের রহমত ও বরকত কীভাবে বর্ষিত হয়। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের সবাইকে তাঁর খাস রহমত দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন এবং ইল্‌মের নূর দ্বারা নূরান্বিত করেন। আমীন।

তালেবে ইল্‌মের সেবায় আল্লাহর ওলী

আল্লাহর তা'আলার দরবারে তালেবে ইল্‌মের মর্যাদা অনেক বেশি। হযরত খাজা বাকি বিল্লাহ (রহ.) যিনি হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর পীর ছিলেন। তাঁর একটি কথা আমার এখনও মনে পড়ে। তিনি আমাদের এ তরিকার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এজন্য তাঁর কথাটি আপনাদের খেদমতে পেশ করছি।

একদা তাঁর এক শিষ্য তাঁর সামনেই বলল, আমাদের পীর সাহেব এমন, যাকে আল্লাহপাক অনেক সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে তাঁর মুরীদ হিসেবে দান করেছেন এবং তাকে এমন-এমন মর্যাদা দান করেছেন। একথা শুনে তিনি নীরব রইলেন। এমন নিস্তব্ধতা, যেন তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পরীক্ষায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। কেননা, একটি প্রবাদ রয়েছে–

حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ

'সাধারণ লোকের নেক আমল নৈকট্যবান বান্দাদের কাছে গোনাহের সমমর্যাদা রাখে।'

হ্যাঁ ভাই: বড়দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে আল্লাহপাকের নেয়ামতও বেশি হাসিল করা যায়। মুরীদের কথায় তিনি নিস্তব্ধ রইলেন কেন? অন্যের মুখে নিজের প্রসংশা শ্রবণ করা আত্মম্ভরিতার অন্তর্ভুক্ত। তবু তাকে বাধা দিলেন না কেন? পরীক্ষাস্বরূপ তার এই অবস্থার বিরতি দেখা দিয়েছিল। সকল বিশেষ অবস্থা শেষ হয়ে গেছে। যার কারণে তিনি কয়েকদিন যাবৎ আল্লাহপাকের দরবারে কাঁদতে থাকলেন। তিনি বললেন- হে আমার মালিক! কোন অপরাধের কারণে আমার সেই বিশেষ অবস্থা দূরীভূত হয়েছে মেহেরবানি করে আমার কাছে প্রকাশ করে দিন। পরিশেষে তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হলো, তুমি অমুক মাদরাসায় গিয়ে সেখানের কুরআন পাঠকারী ছোট-ছোট শিশুদের মাধ্যমে দু'আ চাইবে। তোমার পূর্বের অবস্থা ফিরে পাবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি ওই মাদরাসায় গেলেন। খাজা বাকি বিল্লাহর আগমনে ছাত্র-ওস্তাদ সবাই দাঁড়িয়ে সম্মান জানালেন। তাদের এ অবস্থা দেখে তাঁর দুচোখ বয়ে অশ্রু বেরিয়ে আসে। তিনি বললেন, আপনাদের সামনে এক আল্লাহর ওলীর আগমন হয়েছে ভেবে আপনারা আমাকে সম্মান জানালেন। অথচ গত রাতে আমাকে স্বপ্নে আপনাদের মাধ্যমে দু'আ চাইতে বলা হয়েছে। সুতরাং ভাই! আপনাদের মর্যাদা অনেক বেশি। আপনারা আমার জন্য দু'আ করুন।

তারপর মাদরাসার ছোট-ছোট ছাত্ররা সমবেত হয়ে হযরত বাকি বিল্লাহ (রহ.)-এর জন্য দু'আ করেছে। ফলে আল্লাহপাক তাঁর পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে দেন। আল্লাহু আকবার!

আল্লাহপাক আজকের এ মাহফিলে আমাদের উপস্থিতি কবুল করুন এবং আমাদেরকে তাঁর মকবুল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন।

সুতরাং বন্ধুগণ! আমরা পাগলপারা হয়ে ইল্‌ম শিক্ষা করতে হবে এবং আমাদের মালিককে সন্তুষ্টি করতে হবে। আমাদের চেষ্টা আল্লাহপাক কবুল করুন। আমীন।

আযানের ফযিলত

'আল্লাহপাক মুয়ায্যিনকে হুকুম দিয়েছেন, হে আমার বান্দা! তোমরা আল্লাহু আকবার চারবার বলো। মানুষকে আমার ঘরের প্রতি আহ্বান জানাও এবং বলো, তোমরা এসো ওই প্রভুর দিকে।

اللهُ اكبر – যার মাহাত্ম্য আগুন ও তার সৃষ্ট বস্তু হতে অধিক।

اللهُ اكبر – যার মাহাত্ম্য বাতাস ও তার সৃষ্ট বস্তু হতে অধিক।

اللهُ اكبر – যার মাহাত্ম্য পানি ও তার সৃষ্ট বস্তু হতে অধিক।

اللهُ اكبر – যার মাহাত্ম্য মাটি ও তার সৃষ্ট বস্তু হতে অধিক।

এজন্যই মুয়ায্যিন যখন اللهُ اكبر বলে, তখন বুঝতে হবে, আমাদের কোন মালিকের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে।'

আযানের ফযিলত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ.

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٣﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

ইসলামের স্তম্ভসমূহের একটি হচ্ছে আযান। এজন্য আযানের সুরতে দৈনিক পাঁচবার ইসলামের আহ্বান করা হয়। আজ আযান সম্পর্কে কিছু আলোচনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আযানের সংজ্ঞা

আযানের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ঘোষণা। পারিভাষিক অর্থ, এমন কিছু বিশেষ বাক্যকে আযান বলে, যেগুলোর দ্বারা মানুষদের নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়।

আযানের সূচনা

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা কম থাকায় নির্ধারিত সময়ে নামাযের জামাতে উপস্থিত হতে কোনো সমস্যা হতো না। কালক্রমে সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে জামাতে উপস্থিত হওয়ার গুরুত্ব দেখা দিল। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি নিয়ে ভাবতে থাকেন। সেই ভাবনায় সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পরামর্শ করলেন, নামাযের জন্য লোকদের কীভাবে সমবেত করা যায়। কেউ বললেন, নামাযের সময় হলে পতাকা উড়িয়ে দেব। এতে লোকজন দেখে একে অপরকে ডেকে সবাই একত্রিত হয়ে যাবে। কিন্তু এ পদ্ধতি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনঃপূত হলো না। কেউ বললেন, একটি সিঙ্গার ব্যবস্থা করা হোক যেভাবে ইহুদিরা লোক জামায়েত

করতে সিঙ্গা ব্যবহার করে থাকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাও পছন্দ করলেন না। কেউ-কেউ শঙ্খ বাজানোর কথা বললেন, যেটা খ্রিস্টানরা ব্যবহার করে। এটাও চয়েজ হলো না। কারণ, এগুলো ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কর্মধারা। এই চিন্তা-গবেষণার মধ্যেই পরামর্শসভা শেষ হয়ে গেল।

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ নামে এক সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভাবনা নিয়ে গভীর গবেষণা করতে-করতে নিদ্রায় গেলে স্বপ্নে দেখলেন, কে যেন তাকে আযানের বাক্যগুলো শিক্ষা দিচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, ওই সাহাবী পরের দিন সকালে এসে স্বপ্নের ঘটনা বিস্তারিতভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন যে, আমি তন্দ্রাবস্থায় ছিলাম। এমন সময় কে যেন এসে আমাকে এ বাক্যগুলো শিক্ষা দিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ওমর (রাযি.)ও এ স্বপ্ন দেখেছিলেন। তবে তিনি প্রকাশ করেননি। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের বর্ণনার বিশ দিন পর তিনি বলেছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমর (রাযি.)কে বললেন, তুমি এত দিন বলনি কেন? তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আমার আগে বর্ণনা করার কারণে পুনরায় আমি একই স্বপ্ন বলতে লজ্জাবোধ করছিলাম। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাযি.)কে বললেন, বেলাল উঠো আর আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ যেভাবে বলে সেভাবে তুমি বলতে থাকো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে হযরত বেলাল দাঁড়িয়ে আযান দিলেন। এভাবে আযানের সূচনা হয়ে গেল।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে চারজন মুয়াযযিন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে চার ব্যক্তি মুয়াযযিন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

(১) হযরত বেলাল (রাযি.), যার সম্পর্কে অসংখ্য আশ্চর্য-আশ্চর্য ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে।

(২) হযরত আবু মাহযূরাহ (রাযি.)। ছোটবেলায় একবার তিনি অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে আনন্দ-উল্লাসের সময় হযরত বেলাল (রাযি.)-এর আযান পুনরাবৃত্তি করছিলেন। এমন সময় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর আযানের আবৃত্তি শুনে তাকে কাছে ডাকলেন। অন্যান্য ছেলেরা চলে গেল। কিন্তু আবুমাহযূরাহ স্বস্থানে

দাঁড়িয়ে রইলেন। নবীজি তার নিকটে গিয়ে তাঁর মাথার চুল ধরে বললেন, এখন যা বলতেছিলে তা আবার বলো। সে কিছক্ষুণ নিস্তব্ধ থেকে সরে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথায় ধরে রাখার কারণে যেতে পারেনি। ফলে সে আযানের বাক্যগুলো হুবহু উচ্চারণ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শোনাল। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথা ছেড়ে দিয়ে বললেন, চলে যাও! এবার হযরত আবু মাহযূরাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর নবী! এখন আমি আর কোথায় যাব? আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে যাব। আল্লাহু আকবার!

এ ঘটনা থেকে ওলামায়ে কেরাম একটি মাসআলা সংগ্রহ করেছেন যে, কোনো কাফের যদি স্বেচ্ছায় আযান দেয়, তাহলে সে মুসলমান হয়ে গেছে বলে আদেশ দেওয়া হবে। এভাবেই ওলামায়ে কেরাম কুরআন হাদীছ থেকে মাসআলা সংগ্রহ করেন। একেই ফেকাহ্শাস্ত্র বলে।

একটি কথা স্মরণ রাখবেন, ওলামায়ে কেরাম মাসায়েলের জবাব তৈরি করেন না; বরং তাঁরা জবাব বর্ণনা করেন। কারণ, তৈরি বলা হয় যা পূর্বে ছিল না। অথচ কুরআন হাদীছের মধ্যে মাসায়েলের জবাব পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। ওলামায়ে কেরাম সেগুলো বের করে বর্ণনা করেন। এতে সাধারণ মানুষের হতাশা দূরীভূত হয়। সমুদ্রে ঝিনুকের ভেতরে মুক্তার মতো কুরআন হাদীছে মাসায়েল রয়েছে। ওলামায়ে কেরাম সেথায় ডুব দিয়ে মুক্তা সংগ্রহ করেন।

এজন্যই ইবনে দাউদ (রহ.) বলেন, নামাযের মধ্যে ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর জন্য দু'আ করা একান্ত কর্তব্য। কারণ, তিনি সারাটা জীবন সাধনা করে ফেকাহ্শাস্ত্রের ব্যাকরণ তৈরি করেছেন এবং ছয় লক্ষ মাসায়েল একত্রিত করে মুসলিম জাতির জন্য আমল করার পথ সুগম করে দিয়েছেন।

হযরত আবু মাহযূরা (রাযি.)-এর অন্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসার এমন গভীরতা ছিল যে, তার যে চুলগুলোতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধরেছিলেন, আজীবন তিনি সেই চুলগুলো কাটেননি। তিনি বলতেন, এ চুলগুলোকে আমার প্রিয়তম স্পর্শ করেছেন; সুতরাং আমি এগুলো কর্তন করতে পারি না।

(৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তৃতীয় মুয়ায্যিন ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে কুর্জ (রাযি.)।

(৪) চতুর্থ মুয়ায্যিন ছিলেন হযরত ওমর ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযি.)।

আল্লাহপাকের মাহাত্ম্যের প্রচার

আযানের মাধ্যমে আল্লাহপাকের মাহাত্ম্যের প্রচার করা হয়। আপনি একটু ভেবে দেখুন, আযানের মধ্যে 'আল্লাহু আকবার' চারবার বলা হয়। এর কারণ কী? এর পেছনে একটি রহস্য রয়েছে। ওলামায়ে কেরাম বলেন, মানুষ চারটি মৌলিক পদার্থ দ্বারা তৈরি। আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস। বর্তমানে এগুলোকে মৌলিক উপাদান না বলে বিশেষ অংশ বলা প্রয়োজন। এগুলো প্রত্যেকটির নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে। আমরা সংক্ষেপে সেগুলোর আলোচনা শুনব।

১. আগুনের শক্তি : মানুষ তৈরির প্রথম অংশ আগুন। তার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। জঙ্গল ও বিরান জনপদে আগুন লাগলে এর সামনে মানুষ অসহায় হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ দেখুন–

আমেরিকার বনে, জঙ্গলে আগুন লাগলে মাস দুয়েক পর্যন্ত জ্বলতে থাকে। কেউ তা নেবাতে পারে না।

আমার এক বন্ধু আকাশ পথে ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সময় হঠাৎ আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পান। তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে স্টাফকে জিজ্ঞাসা করলেন, সাগরের মধ্যখানে আগুন আসে কোত্থেকে। সে বলল, আমি পরিচালক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে আপনাকে বলছি। পরিচালককে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, এখানে সমুদ্রের নিচে একটি তেল ও পেট্রোলের নালা রয়েছে। সেখান থেকে সর্বদা গ্যাস বের হচ্ছে। এবার এখানে বজ্রপাত হওয়ার ফলে আগুন লেগে যায়। বিশেষজ্ঞরা অক্লান্ত চেষ্টার পরও তা নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম হয়নি। একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ এ আগুন নেভাতে পারবে না।

আমি একবার কাজিকিস্তান সফরে গিয়েছিলাম। সহসা সেখানে একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড দেখলাম। তা দেখতে অবিকল আগুনের একটি স্তম্ভের মতো, যা কয়েক ফার্লং উঁচু হবে। এমন স্তম্ভ আমার জীবনে কোনোদিন দেখিনি। আমার সাথীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ আগুনের মূলতত্ত্ব কী। সে বলল, এখানে একটি তেলের খাল খনন করা হয়েছিল। একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে টেকনিক্যালি দক্ষতার অভাবে তাতে আগুন লেগে যায়। তারপর নিচ থেকে এরকম স্পিডে তেল বের হয়, যা আকাশচুম্বী দেখাচ্ছে। আর সাথে-সাথে আগুনও এত ওপরে উঠছে। রাশিয়ার অগ্নিবিশারদগণ দু-বছর পর্যন্ত চেষ্টা করেও তা নেভাতে পারেনি। তারপর তারা সারা বিশ্ব ঘোষণা দিলেন, যদি

কোনো দেশ এ আগুন নেভাতে পারে, তাহলে এরপর যে-পরিমাণ তেল এখান থেকে সংগ্রহ করা যাবে, তার অর্ধেক নির্বাপণকারীকে দেওয়া হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোনো দেশ তা নেভাতে সক্ষম হয়নি।

২. পানির শক্তি : মানুষ তৈরির দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে পানি। তার নিজস্ব শক্তি রয়েছে। সেটাও আল্লাহপাকের মাখলুক। পানির অভ্যন্তরে বড়-বড় মাছ বাস করে। নিউইর্য়কের একটি এ্যাকুরিয়ামে (মৎস্যগৃহ) লেখা রয়েছে, সামুদ্রিক একটি অদ্ভূত মাছ আছে, যা জন্মের পর থেকে দৈনিক একশ কেজি করে বাড়তে থাকে। সমুদ্রে এমনও মাছ রয়েছে, যার ওপর অনেক সময় জাহাজ পর্যন্ত আটকা পড়ে যায়। সমুদ্র একটি অদ্ভূত জগৎ। আমি অধম সমুদ্র ভ্রমণ করেছি। পৃথিবীতে যেমন আশ্চর্যের অনেক বিষয় রয়েছে, তেমন সমুদ্রেও অনেক বিস্ময়কর বস্তু রয়েছে।

বন্ধুগণ! বলছিলাম, পানিরও নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন–

চাঁদে যখন পূর্ণিমা আসে, তখন সাগরে প্রবল জোয়ার থাকে। তার মর্ম হলো, ওই সময় সমুদ্রে প্রচণ্ড ঢেউ থাকে। বিশাল উঁচু-উঁচু ঢেউ বইতে থাকে। সমুদ্রের এই প্রচণ্ড উতলার সময় জাহাজ পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট ডিগ্রী পরিমাণ কাত হয়ে যায়। উতরা থেমে গেলে আবার সোজা হয়ে যায়। ওই সময় বিশাল-বিশাল জাহাজগুলো উতলা স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে।

বিজ্ঞান বলে, যদি সমুদ্রের জলপ্রবাহ ষাট ডিগ্রীর নিম্নে হয়, তাহলে জাহাজ আবার সোজা হতে পারে। এর ওপরে হলে জাহাজ উল্টে যায় এবং জাহাজের যাত্রী, আসবাবপত্র সবকিছু সমুদ্রের অথৈ গভীরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং ওই সময় জাহাজের কাফের, মুসলিম সকল যাত্রী একান্ত নিষ্ঠার সাথে হৃদয়ের গভীর থেকে বলতে থাকে, হে আল্লাহ এখন আমাদের বাঁচানোর মালিক একমাত্র তুমিই। সুবহানাল্লাহ!

বিশ্ববাসী বলল, আমরা টাইটানিক জাহাজ নির্মাণ করেছি, যা কখনও ডুববে না। মূলত তারা একে অজেয় ভেবেছিল। আল্লাহপাক সেটাকে মধ্যসাগরে শুধু নিমজ্জিতই করেননি; বরং দ্বিখণ্ডিত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। এতে আল্লাহপাক তাদের দাবি চুরমার করে দিয়েছেন। সমুদ্রের অনুমান ওই ব্যক্তি করতে পারবে, যে সমুদ্র ভ্রমণ করেছে অথবা যে সমুদ্রের উতলার সামান্য ঝলক দেখেছে।

বন্যা এলে সারা শহর বিধ্বস্ত হয়ে যায়। হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে যে প্লাবন হয়েছিল, তাতে পৃথিবীর সমস্ত ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

৩. বাতাসের শক্তি : সৃষ্টজীবের সৃষ্টির ধারাবাহিক তৃতীয় উপাদান হচ্ছে বাতাস। তারও নিজস্ব শক্তি রয়েছে। উদাহরণ দেখুন–

আদ সম্প্রদায়ের ওপর বাতাসের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। ঈমানদারগণ উপলব্ধি করেছিলেন, কী মাধুর্যময় বাতাস বয়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে কাফেরদের জন্য এই বাতাসই জমিনে পড়ে থাকত।। পরের দিন তাদের মরদেহ বিগড়ে যেত।

কুরআন বলে–

كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

'যেন নিক্ষেপিত ফোলা-ফোকলা খেজুরকাণ্ড।'[১১৬]

তাদের দৈহিক গঠন-কাঠামো ও শক্তি সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ বলেন, তাদের উচ্চতা ষাট হাত এবং বুকের প্রশস্ততা ত্রিশ ফুট পর্যন্ত হতো। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ۝

'তারা পাহাড় কেটে বাসস্থান নির্মাণ করত।'[১১৭]

তারা বলত–

مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

'আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে আছে?'[১১৮]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় তারা নিজের শক্তি ও ক্ষমতার ওপর কেমন গর্ব করত। বাস্তবেও তারা নিজেদের ক্ষমতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এমনকি আল্লাহপাকও বলেছেন–

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝

'তাদের মতো শক্তিধর জাতি আর শহরে সৃষ্টির করা হয়নি।'[১১৯]

---

১১৬. সূরা আল-হাক্কা : আয়াত ৭
১১৭. সূরা শু'আরা : আয়াত ১৪৯
১১৮. হা-মীম আস-সাজদাহ
১১৯. সূরা ফাজর : আয়াত ৭

তারা এত ক্ষমতাধর জাতি ছিল। কিন্তু আল্লাহপাক তাদের ওপর বাতাসের শাস্তি প্রেরণ করলেন, যার ফলে তারা এমনভাবে উল্টে পড়ে রইল যেমন তুফান খেজুরকাণ্ড ফেলে রেখেছে।

কুরআনের অন্য জায়গায় আল্লাহপাক বলেন–

وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۖ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ﴿٣٩﴾

'আদ, ছামুদ ও কূপবাসী এবং তাদের মধ্যবর্তী অনেক সম্প্রদায় সবাইকে আমি দৃষ্টান্ত বলে দিয়েছিলাম এবং সকলকে আমি ধ্বংস করে উজাড় করে দিয়েছি।'[১২০]

দেখুন, কী অপূর্ব শাহী কথা।

অন্যস্থানে আল্লাহপাক বলেন–

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

'তুমি কি তাদের কোনো পদধ্বনি শুনতে পাও? অথবা তাদের গুঞ্জন শুনতে পাও?'[১২১]

বর্তমানেও পৃথিবীতে অতি বিজ্ঞানী ক্ষমতা নিয়ে বাতাসের শাস্তি আসে। এগুলোর নাম রেখেছে তারা টর্নেডো। এই টর্নেডো বা ঘূর্ণিঝড় কী? এটা হচ্ছে বাতাস। কয়েকশ মাইল আয়তন নিয়ে পাক খেতে থাকে। খুবই শক্তিশালী হয়, যা ঘরবাড়ির ছাদ পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যায়। একবার আমেরিকার এক স্বায়ত্ত্বশাসিত এলাকায় খুব শক্তিশালী ঘুর্ণিঝড় হয়েছিল, যার ক্ষমতা ত্রিশ ডিগ্রীরও বেশি ছিল। সেটা ঘরবাড়ির ছাদ উড়িয়ে নিয়েছে। যানবাহনকে কয়েকশ মাইল দূরে নিক্ষেপ করেছে। মুহূর্তের মধ্যেই মনোরম শহরকে বিধ্বস্ত ধ্বংস্তূপে পরিণত করে দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড় শেষ হওয়ার পর তার দৃশ্য দেখার জন্য আমি ওই এলাকায় গিয়েছিলাম। তখন দেখতে পেলাম, একটি ঘরের ছাদ উড়িয়ে নিয়ে গেছে। তার একটি ডাইনিং টেবিল, যাতে পনেরো-বিশজন লোক একসঙ্গে বসে খানা খেতে পারবে। সেই টেবিলটা অনেক দূরে একটি গাছের ডালে ঝুলে রয়েছে, যা দেখতে অনেক ভারী দেখায়। তা সরাতে কমপক্ষে দশজন লোকের প্রয়োজন হবে বলে

---

১২০. সূরা ফুরকান : আয়াত ৩৮, ৩৯

১২১. সূরা মারয়াম : আয়াত ৯৮

অনুমান হয়। কিন্তু সেটা গাছের ডালে এমনভাবে ঝুলে আছে, যেন কোনো ছোট শিশু তার একটা সেন্ডেল দূরে নিক্ষেপ করেছে। আল্লাহু আকবার!

টর্নেডো একটি গাড়িকে তিন কিলোমিটার দূরে নিয়ে নিক্ষেপ করেছে। এর সন্ধান এভাবে পাওয়া গেছে যে, টর্নেডো আসার দুই মিনিট আগে ওই গাড়িটি ছেড়ে যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছিল, যার দরুন তার তালিকা কম্পিউটারে রেকর্ড হয়েছিল। তার দুই মিনিট পরই টর্নেডো এসে যায়। ফলে গাড়িটা তিন কিলোমিটার দূরে পাওয়া যায়।

আমি অধম ওই এলাকায় যাওয়ার সময় আমার বন্ধুগণ আমাকে নির্দেশনা দিয়ে বলেছে, জনাব! যদি ওই এলাকায় যাওয়ার পর সহসা ঘূর্ণিঝড় এসে পড়ে, তাহলে আপনি তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে নেমে মাটিতে শুয়ে যাবেন। কেননা, কোনো বস্তু মাটির সাথে মিশে থাকলে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিতে পারে না। কিন্তু উপড়ে থাকলে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এমন প্রশিক্ষণের পেছনে তারা মিলিয়ন-বিলিয়ন ডলার খরচ করে।

৪. মাটির শক্তি : সৃষ্টজীবের সৃষ্টির চতুর্থ উপাদান মাটি। জমিনকে মাটি বলা হয়। মাটির নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে। তা বর্তমানে আমরা উপলব্ধি করতে পারব না। ভূমিকম্পের সময় কিছু অনুমিত হয়। কারণ, ভুমিকম্পের সময় জমিনে ধ্বংসাত্মক পরিস্থিত সৃষ্টি হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ দেখুন–

১৬০০ খ্রিস্টাব্দে চীনের এক প্রদেশে ভূমিকম্প হয়েছিল, যার দরুন এক দিনে ৮ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল।

১৯৯৪ সালে আমি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় সফরকালে তথাকার শহর লসএঞ্জেলস-এর চৌরাস্তাগুলোতে কয়েক মিটার লম্বা Metallic berds (লোহার তৈরি বোর্ড) দেখতে পেলাম। সেগুলোতে Oh God (হে আল্লাহ!) লিপিবদ্ধ রয়েছে। কয়েক স্থানে এরকম দেখার ফলে আমার মেজবানকে জিজ্ঞাসা করলাম, জনাব Oh God (হে আল্লাহ)-এর ভাবার্থ কী?

তিনি বললেন, গত ১৭ই জানুয়ারী রাত ৪টার সময় এখানে একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে সে তার Epicentre (উৎপত্তিস্থল) জমিনের ওপর থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার গভীরে ছিল। তাদের মতে এরকম ভূমিকম্প Default ProloalilitY one in ten Thousand হাজারে প্রায় একটি সংঘটিত হয়ে থাকে। এজন্যই ভূমিকম্পের পূর্বে সতর্কবার্তার মেশিনসমূহ নীরব ছিল। গবেষকরাও তা থেকে আশঙ্কামুক্ত ছিল। কারণ, এটা কখনও সংঘটিত হবে না। কিন্তু যখন এই ভূমিকম্প এসে

গেল, তখন সুপার পাওয়ার টেকনোলজিও অকার্যকর হয়ে গেল। এ ভূমিকম্প এমন ভয়ানক আকারে হয়েছিল যে, তার Amplitude ক্ষমতা ৭ ডিগ্রির চেয়ে অধিক ছিল। স্থায়িত্ব ছিল প্রায় ৪৫ সেকেন্ট। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, তা কখনও শান্ত হবে না। লোকজন বিছানায় শয়িত ছিল। তাদেরকে ফুটবলের মতো নিক্ষেপ করে নিচে ফেলে দিয়েছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ওই ভূমিকম্পে প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর ক্ষয়ক্ষতি কম হয়েছে। আর সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষতি অধিক হয়েছে। অথচ সেগুলোকে এমন উপকরণ বা ফর্মুলায় এত মজবুত করে নির্মাণ করা হয়েছিল যে, সেগুলো ধসে যাওয়া সন্দেহাতীত বিষয় মনে হচ্ছিল। উদাহরণস্বরূপ দেখুন–

প্রধান-প্রধান সড়কের ব্রীজগুলোর নিরাপত্তাব্যবস্থা এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছিল যে, তাদের ধারণামতে এগুলো কোনোদিন ধ্বংস হবে না। হাসপাতালের বিল্ডিংগুলোও আমেরিকান প্রযুক্তিতে Lang Life (আজীবন) গ্যারান্টি দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল, যাতে বাহ্যিকভাবে দুরবস্থা দেখা গেলেও বিল্ডিং ভেঙে না পড়ে। যদি কোনো সময় হাসপাতালের বিল্ডিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়, তাহলে Effeted রোগীদের চিকিৎসা কে করবে। এমনিভাবে থানা ফাঁড়িগুলোও Safety Factor Ten নিরাপত্তাব্যবস্থাপনায় নির্মাণ করা হয়েছিল যে, ধসে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আল্লাহপাকের অনুপম শক্তি এমন হলো যে, ওই বিল্ডিংগুলোই সর্বপ্রথম ধ্বংস হয়ে গেল। আমি অধম স্বচক্ষে সেগুলো দেখে এসেছি।

আপনারা বিশ্বাস করবেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি দেখেছি, দু-মিটার প্রস্থের খুঁটিগুলো পাটকাঠির মতো ভেঙে পড়ে রয়েছে। প্রধান সড়কের ব্রীজগুলো শত ফুট উঁচু থেকে এভাবে পড়ে আছে যেমন ছোট শিশু চকলেট নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় হলো, ওই ভূমিকম্পের Epi center (কেন্দ্রবিন্দু) থেকে প্রায় ২৫ ফুট দূরত্বে অবস্থিত একটি মসজিদ ছিল। সেটা একেবারে অক্ষত রয়েছে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহপাকের শান দেখুন, সেই ১৭ই জানুয়ারি ওই দিন ছিল, যেদিন পরাশক্তিরা ইরাকের বাগদাদে সম্মানিত স্থানসমূহে বোমা বিস্ফোরণ করেছিল। ওই ভূমিকম্পে ক্ষতির হিসাব প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার বলা হয়েছে। আর ঠিক সেই পরিমাণ ডলার কুয়েতের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমেরিকা অর্জন করেছিল। আল্লাহপাক একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সমান্তরাল করে দিয়েছেন।

আমার বন্ধুরা বলেছেন, ভূমিকম্পের পর বড়-বড় শিল্পপতিগণ সহানুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য দিয়েছেন যে, প্রকৃতি আমাদের Oprator (সাহায্য) করেনি।

বিজ্ঞানীরা দেশের সরকারগুলোকে বলেছেন, আপনাদের ধর্মগুরুদের জিজ্ঞাসা করুন, এর থেকে বাঁচার উপায় কী? তারা জবাব দিলেন, কেন? বিজ্ঞানীরা বলল, এই ভূমিকম্প লঘু আকারে হয়েছে। বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়াতে ৮ থেকে ১০টি লাইভ ফাল্টস বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে একটি অনেক বড় ভূমিকম্পের উপকরণ। আমরা সেটার নাম দিয়েছি BIG ONE। এই ভূমিকম্প যেকোনো সময় আসতে পারে। এর Epi centre ভূমিকম্প উৎপত্তিস্থল জমিন হতে মাত্র কয়েক মিটার নিচে রয়েছে। তাই ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা খুবই বেশি। যদি সেই Big one এসে যায়, তাহলে ক্যালিফোর্নিয়া ও হলিউড এলাকা বিছিন্ন করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। কেননা, যে ভূমিকম্প এসেছিল তাতে ক্যালিফোর্নিয়ার চতুর্দিকে জমিনে ফাটল দেখা দিয়েছে। এতে একটি সুড়ঙ্গ দেখা যায়, যার দ্বারা জমিনের অনেক গভীর পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়। আমি বললাম, আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু তারপরও আমি বাস্তবে দেখতে চাই। আল্লাহর বান্দা আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম, জমিনে ফাটল সৃষ্টি হয়ে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে আছে। দৃষ্টি যদ্দুর দৃশ্যমান হয় তদ্দুর পর্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তার গভীরতা কতটুকু হবে তা একমাত্র আল্লাহপাকই জানেন। শুধু এতটুকু মনে করুন যে, সামান্য একটু ঝাঁকুনির দ্বারাতেই পুরা এলাকা পৃথক হয়ে গেছে। আর যদি Big one আসে, তাহলে অত্র ভূখণ্ড সাগরে নিক্ষেপ করে দেবে।

সে বলেছে, বিজ্ঞানীদের একথা শুনে সরকারগুলো অত্যন্ত হতভম্ব হয়ে গেল। তারা ধর্মগুরুদের জিজ্ঞাসা করল, এখন এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের কী ব্যবস্থা করা যায়? তারা অক্লান্ত গবেষণার পর জবাব দিলেন, শহরের চৌরাস্তাগুলোতে বড়-বড় অক্ষরে আল্লাহ তা'আলার নাম লিপিবদ্ধ করে রাখুন, যাতে লোকেরা সেগুলো দেখে আল্লাহপাকের নামে স্মরণ করে। প্রশাসন চৌরাস্তাগুলো Oh God (হে আল্লাহ!) লিপিবদ্ধ করে রেখেছে, যাতে Big one হতে রক্ষা পাওয়া যায়। সুবহানাল্লাহ!

হলিউড এলাকা চলচিত্র ও বেহায়াপনার লোকালয় ছিল, যাকে Sex centre of the world (বিশ্বের বেহায়াপনার কেন্দ্রবিন্দু) বলা হয়।

আল্লাহর কুদরত যে, আমার বন্ধু একদিন ওই এলাকায় আমার প্রোগাম নির্ধারণ করলেন। যখন তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন আমি অত্যন্ত হতবাক হলাম যে, তিনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। আলামত দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বন্ধু আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? তিনি বললেন, জনাব এ এলাকায় আপনার প্রোগাম রেখেছি। আল্লাহপাকের মহিমা! সেখানে দীনের কাজ করলাম। বয়ান দিলাম। আমার ধারণা, আগন্তুকদের প্রায় ৮০% মদ পান করে এসেছিল। কিন্তু আল্লাহর শোকর, বয়ান শেষে প্রায় ৫০ জন লোক বাইয়াত গ্রহণ করেছেন, তাওবা করেছেন। আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহপাকের সম্পর্কের নূর তিনি এমন জায়গায়ও পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

সেই ভূমিকম্পের দরুন এক হিন্দু লোকের একটি বিল্ডিং ধসে পড়েছিল। সে ইন্ডিয়ার নাগরিক ছিল। আমেরিকা গিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে রিয়েল স্টেট-এর কাজ শুরু করেছিল। এতে সে অনেক টাকা ইনকাম করে প্রায় ত্রিশ বিলিয়ন ডলারের মালিক হয়েছিল। তার পাঁচতলা একটি ভবন ছিল। ভূমিকম্পে সেটা একেবারে মাটিতে মিশে গেছে। ওই লোকটি টাকা-পয়সার মোহে পড়ে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করল। এমনকি নিজ ধর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে গেল। টাকার নেশা তাকে সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছিল। এ ভবনে এসে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা ক্ষতিপূরণ দাবি করল। তাদের ক্ষতিপূরণের মোট সংখ্যা ত্রিশ বিলিয়ন ডলার দাঁড়িয়েছে। আমি স্বচক্ষে সেই ভবনটা দেখেছি। পরের দিনই ওই লোকটাকে ফুটপাতে দাঁড়াতে হলো। আমেরিকার উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলোতে বড় আকারে তার ছবি অঙ্কন করে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে যে, এক লোক সারা জীবনে যা অর্জন করেছিল, একটি ভূমিকম্প তার সবকিছু কেড়ে নিল। বন্ধুগণ! এ পৃথিবী কত বাদশাহকে ভিখারি করেছে আর কত ভিখারিকে সিংহাসনে বসিয়েছে।

বন্ধুগণ! আলোচনা করছিলাম, আগুনের নিজস্ব শক্তি রয়েছে। বাতাসের স্বীয় ক্ষমতা রয়েছে। পানির নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে। মাটিরও নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে। যখন সেগুলোর ক্ষমতা প্রকাশ পায়, তখন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, সেগুলোর ক্ষমতার পরিমাণ কত। যেহেতু আল্লাহপাক এ চারটা উপাদান দিয়ে মানব সৃষ্টি করেছেন, তাই আল্লাহপাক মুয়ায্যিনকে হুকুম দিয়েছেন, হে আমার বান্দা! তোমরা আল্লাহু আকবার চারবার বলো। মানুষকে আমার ঘরের প্রতি আহ্বান জানাও এবং বলো, তোমরা এসো ওই প্রভুর দিকে।

اللهُ اكبر – যার মাহাত্ম্য আগুন ও তার সৃষ্ট বস্তু হতে অধিক।

اللهُ اكبر – যার মাহাত্ম্য বাতাস ও তার সৃষ্ট বস্তু হতে অধিক।

اللهُ اكبر – যার মাহাত্ম্য পানি ও তার সৃষ্ট বস্তু হতে অধিক।

اللهُ اكبر – যার মাহাত্ম্য মাটি ও তার সৃষ্ট বস্তু হতে অধিক।

এজন্যই মুয়ায্যিন যখন اللهُ اكبر বলে, তখন বুঝতে হবে, আমাদের কোন মালিকের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে।

আল্লাহপাকের মাহাত্ম্যের ধারণা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর মুয়ায্যিনের اللهُ اكبر শুনলে অনিচ্ছাকৃতভাবে চক্ষু দ্বারা অশ্রু বয়ে যেত। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হযরত এর কারণ কী? তিনি বললেন, اللهُ اكبر শুনলে আমার অন্তরে আল্লাহপাকের মাহাত্ম্য উদ্ভাসিত হয়। ফলে তাঁর ভয়ে আমার চোখে অশ্রু বয়ে যায়।

চিন্তার বিষয়

বলুন বন্ধুগণ! যদি আপনি কাউকে আপনার ঘরে আহ্বান করেন আর সে না আসে, তাহলে আপনার ক্রোধ আসবে কি-না? অবশ্যই আসবে। সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন اللهُ اكبر এর দ্বারা মানুষদের তাঁর ঘরের প্রতি আহ্বান করেন আর বান্দা না যায়, তাহলে আল্লাহপাকের ক্রোধ আসবে কি-না? স্মরণ রাখবেন, মিষ্টার ইবলিস একটি সেজদা করতে অস্বীকার করায় আল্লাহপাক তাকে চিরদিনের জন্য তাঁর দরবার থেকে বিতাড়িত করেছেন। আর বেনামাযী ব্যক্তি দৈনিক ৪০টি সেজদা করতে অস্বীকার করছে। সুতরাং তার পরিণাম কী হতে পারে? এটা তো আল্লাহপাকের অশেষ দয়া যে, তিনি হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর বরকতে পুনরায় আমাদের ওপর রহমত অবতীর্ণ করেন। নতুবা হাদীছে এসেছে, বেনামাযীদের হাশর ফেরাউন, হামান ও কারুনের সঙ্গে করা হবে। এজন্যই আযানের শব্দ শোনামাত্রই ওদিকে মনোনিবেশ করতে হবে যে, আমার মালিকের পক্ষ হতে আমাকে তলব করা হয়েছে।

আযানের জবাবের ফযিলত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আযানের আওয়াজ শুনলে মুয়ায্যিন যা বলে তা বলতে থাকো। حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ও حَيَّ عَلَى

الفلاح বলার সময় لا حول ولا قوة الا بالله বলো; তাহলে শয়তান পলায়ন করবে আর বান্দার নামাযে যেতে কোনো সমস্যা হবে না। এভাবে আযানের জবাব দিলে আল্লাহপাক তাকে জান্নাত দেবেন।

স্বপ্নে আযান দেওয়ার বিভিন্ন ব্যাখ্যা

অসময়ে আযান দেওয়া দেখলে আল্লামা ইবনে সীরীন (রহ.) বলেন, ওই বান্দা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। কারণ সে অসময়ে আযান দিয়েছে।

আল্লামা ইবনে সীরীন (রহ.)কে কেউ এসে বলল, হুজুর! আমি খাবে আযান দিতে দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি অতিশয় সম্মানপ্রাপ্ত হবে। কিছুক্ষণ পর অন্যজন এসে বলল, হুজুর! আমি স্বপ্নে আযান দিতে দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি অপমানিত হবে।

বাস্তবেও তা-ই হলো। তারপর কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল, হুজুর! একই স্বপ্ন দু-রকম ব্যাখ্যা হলো কেন? তিনি বললেন, কুরআনে দুই স্থানে আযানের শব্দ এসেছে। এক. হযরত ইবরাহীম (আ.)কে আদেশ দেওয়া হয়েছে–

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

'হে আমার বন্ধু! হজের জন্য মানুষদের মধ্যে ঘোষণা দাও।'[১২২]

আমি প্রথম ব্যক্তির মধ্যে ধার্মিকতা দেখেছি। তাই এ আয়াত দ্বারা ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছি, তাকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো দেখা যাচ্ছে। আবার কুরআনের একস্থানে রয়েছে–

ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۝

'তারপর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করল, হে কাফেলার জনগণ! তোমরা চোর।'[১২৩]

তাই এ আয়াত দ্বারা আমি ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছি, সে অপমানিত হবে।

যদি কোনো মহিলা আযান দিতে দেখে, তাহলে সে অসুস্থ হবে। কারণ, মহিলাদের জন্য আযান দেওয়া শরীয়তের পরিপন্থী কাজ। সুতরাং অননুমোদিত কোনো কাজ করতে দেখা মানে তার আসল অবস্থা থেকে বিচ্যুত হওয়া। তাই সে সুস্থতা থেকে স্থানচ্যুত হয়ে অসুস্থ হবে।

---

১২২. সূরা হজ্জ : আয়াত ২৭

১২৩. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৭০

আল্লামা ইবনে সীরীনের কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হুজুর! স্বপ্নে দেখেছি, আমি মৃত ব্যক্তির মুখে এবং মহিলাদের গুপ্তাঙ্গে সিল-মহর এঁটে দিচ্ছি। এমন আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে আমি অত্যন্ত হতভম্ব হয়েছি। আমাকে এর তাবীর বলে দিন। তিনি বললেন, প্রথম কথা হলো, মনে হচ্ছে, তুমি মুয়ায্যিন? সে বলল, জি হুজুর, আমি মুয়ায্যিনই। তিনি বললেন, তুমি রমযান মাসে সাহরির পূর্বে আযান দাও। তাই এমন স্বপ্ন দেখেছ। কারণ, তোমার আযানের দ্বারা মানুষের খাওয়াদাওয়া এবং নারীসঙ্গম বন্ধ হয়ে যায়।

একজন ফকীহ (বিজ্ঞ আলেম)-এর সমমর্যাদার কর্মকার

আমরা আযানের গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কারণ, এতে আমাদেরকে আল্লাহপাকের দিকে আহ্বান করা হয়। এর একটি আদব হলো, আযানের আওয়াজ শোনামাত্র পার্থিব কাজ ছেড়ে দিয়ে নামাযের প্রস্তুতি নেওয়া। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর প্রতিবেশীদের মধ্যে এক কর্মকার ছিল। তার মৃত্যুর পর কোনো এক মুহাদ্দিছ তাকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করা হয়েছে শোনাও! সে বলল, আমাকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর সমমর্যাদায় রাখা হয়েছে। বর্তমানে আমি তাঁর সঙ্গে চলাফেরা করছি। যিনি স্বপ্নে দেখলেন, তিনি অত্যন্ত হতবাক হলেন যে, ওই কর্মকার সারাদিন লোহার কাজ করত আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) দিন-রাত ধর্মের কাজ করতেন এবং 'কুরআন সৃষ্ট' মাসয়ালায় তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। অথচ উভয়জনকে একই মর্যদায় রাখা হয়েছে! তিনি বিষয়টি অন্য একজন মুহাদ্দিছ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিলেন, ওই কর্মকারের কোনো-না-কোনো কাজ আল্লাহপাকের পছন্দ হয়েছে। তাই তাকে এমন সম্মান দেওয়া হয়েছে। তিনি ভাবলেন, কর্মকারের পরিবারের কাছে থেকে কিছু তত্ত্ব নেওয়া যাক। তিনি তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তোমার স্বামীকে খুব ভালো অবস্থানে দেখেছি। সুতরাং তার বিশেষ কোনো আমল থাকলে বলো। স্ত্রী বলল, তিনি একজন হতদরিদ্র লোক ছিলেন। সারাদিন লোহার কাজ করতেন আর সময়মতো নামায আদায় করতেন। এছাড়া অন্য কোনো বিশেষ আমল আমার জানা নেই। তিনি বললেন, একটু চিন্তা করে দেখুন, তার বিশেষ কোন আমলটি ছিল, যার দরুন সে এত সম্মানিত হয়েছে। একটু ভেবে তার স্ত্রী বলব, আমার স্বামীর জীবনের দুটি কাজ আমার বিষয়ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। একটি হলো নামায ও আযান। তিনি আযানের এত গুরুত্ব দিতেন

যে, কাজ করতে লোহার আঘাত করার জন্য হাতুড়ি ওপর দিকে উত্তোলন করেছেন আর ঠিক সেসময় মুয়ায্যিন আল্লাহু আকবার বলে আযান শুরু করে দিলেন, তাহলে তিনি আর আঘাত করতেন না। হাতুড়ি রেখে বলতেন, এখন আমার মালিক আমাকে ডাকছেন। আমাকে তার দরবারে হাজিরা দিতে হবে।

দ্বিতীয়টি হলো, তিনি সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে রাতে বাড়ি আসতেন। পরে আমরা স্বামী স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে থাকতাম। এদিকে আমাদের প্রতিবেশী হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল রাত জেগে কুরআন তেওয়াত করতেন আর ইবাদাত করতেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে আমার স্বামী আক্ষেপের শীতল নিঃশ্বাস ছাড়তেন আর বলতেন। আহ! আমার অনেক সন্তানাদি। এদের আহার জোগানোর জন্য সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে যাই। রাতের বেলা ইবাদাত করার সুযোগ পাই না। আহার জোগানোর মতো পরিবাবে আর কেউ নেই। যদি থাকত, তহালে আমিও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতো সারা রাত জেগে আল্লাপাকের ইবাদাত করতাম।

মুহাদ্দিছ সাহেব বলবেন, আযানের এত গুরুত্ব এবং নেক কাজের প্রবল আগ্রহের দরুন আল্লাহপাক তাকে আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর সমমর্যাদা দান করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যদি কোনো লোক একান্ত প্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত থাকে, তাহলে অন্ততপক্ষে অন্তরে নেক কাজের আগ্রহ রাখা দরকার। কেননা, হতে পারে, আল্লাহপাক হৃদয়ের আবেগের দরুন তাকে সেই নেয়ামত দান করে দেবেন। প্রচলিত ভুল ১/৩৭

আটা সদকা করার নিয়তে পাহাড় পরিমাণ ছাওয়াব

একবার বনী ইসরাঈল গোষ্ঠীর মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ক্ষুধার তাড়নায় লোকজন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। তখন এক লোক শহরে বের হয়ে সামনে একটি বালুর টিলা দেখে বলল, আল্লাহপাক যদি আমাকে এই স্তূপ পরিমাণ আটার মালিক বানাতেন, তাহলে আমি এই দুর্দিনে মানুষের মধ্যে সমস্ত আটা বণ্টন করে দিতাম। হাদীছে এসেছে, আল্লাহপাক সাথে-সাথে ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন, আমার বান্দার আমলনামায় ওই পরিমাণ আটা সদকা করার ছাওয়াব লিখে দাও। সুবহানাল্লাহ!

আযানের আদব ক্ষমার কারণ হয়ে গেল

যুবায়দা খাতুন নামে আল্লাহর এক বান্দী মৃত্যুবরণ করলে কেউ তাকে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি জান্নাতে চলাফেরা করছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, যুবায়দা ! তুমি তো পুণ্যবর্তী ছিলে তাই আল্লাহপাক তোমাকে জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন তাই না? তিনি বললেন, না, আমি যে সমস্ত কাজ পুণ্যময় ভাবতাম, সেগুলোর প্রতি আল্লাহপাক ভ্রূক্ষেপই করেননি। একটি কাজ যা আমি তুচ্ছ্য মনে করতাম, সেই আমলের বিনিময়ে আল্লাহপাক আমাকে জান্নাত দিয়েছেন। সেই আমলটি হলো, মসজিদ থেকে আযানের শব্দ শোনামাত্রই আমি আযানের আদব রক্ষার্থে শাড়ির আঁচল দ্বারা মস্তক আবৃত করতাম। তাই আযানের আদবের দরুন আল্লাহপাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

হাদীছের আলোকে আযানের ফযিলত

এবার আমি আপনাদের সম্মুখে আযানের ফযিলত বিশিষ্ট কতিপয় হাদীছ পাঠ করব। এতে আপনারা অনুধাবণ করতে পারবেন, আযানের ফযিলত কত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আল্লাহপাক তিন ব্যক্তিকে জান্নাতের চূড়ায় সমাসীন করবেন।

১. ওই কৃতদাস, যে আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে এবং নিজের মালিকের দায়িত্বও পালন করেছে।

২. যেব্যক্তি কোনো জাতির নেতৃত্ব দিয়েছে আর জনগণ তার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছে।

৩. যেব্যক্তি প্রত্যেক দিন ও রাতে পাঁচবার আযান দিয়েছে।[১২৪]

হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন মুয়ায্যিনের গ্রীবা (গর্দান) সবচেয়ে লম্বা থাকবে।[১২৫]

হযরত আবু সাঈদ (রাযি.) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। মুয়ায্যিনের আযানের আওয়াজ যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে,

---

১২৪. তিরমিযী

১২৫. মুসলিম

এর মধ্যকার যত জীব, ইনসান ও অন্যান্য বস্তু শুনবে, সবকিছু কেয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত, হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যেব্যক্তি ছাওয়াবের আশায় সাত বছর পর্যন্ত আযান দেবে, তার জন্য জাহান্নাম হতে নিস্কৃতি লেখা হয়।[১২৬]

হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ বলেন, হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এ বিষয়টি এমন, যা প্রত্যাখ্যান করা হয় না। অর্থাৎ– খুব অল্পই প্রত্যাখাত হয়। (১) আযানের সময় দু'আ (২) জিহাদের ময়দানের দু'আ যখন উভয় পক্ষ সারিবদ্ধ হয়ে মুখোমুখী হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযি.) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা মুয়ায্‌যিনের আযান শুনলে তার মতো তোমরাও বলো। তারপর আমার ওপর দরুদ প্রেরণ করো। যেব্যক্তি আমার জন্য দু'আ করবে, আল্লাহপাক তার ওপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করবেন। তারপর আমার জন্য ওসিলা তলব করো।

ওসিলা জান্নাতের একটি সুউঁচ্চ বিশেষ স্থানের নাম, যেখানে আল্লাহপাকের বান্দাদের মধ্য হতে কোনো একজনকে সমাসীন করা হবে। আমি আশা করি, সেই বান্দা আমি-ই হব। সুতরাং যেব্যক্তি আমার জন্য ওসিলার দু'আ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে।[১২৭]

ওসিলার দু'আ এই–

اللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ বাণী ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমি মালিক। তুমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করো জান্নাতের সুউচ্চ স্থান ও বৈশিষ্ট্য এবং তাকে পৌঁছিয়ে দাও প্রসংশিত স্থানে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি নিজেই দিয়েছ। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না।'

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) হযরত খাওলা (রাযি.) থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী বর্ণনা করেন যে, অসুস্থ ব্যক্তি

---

১২৬. তিরমিযী

১২৭. মুসলিম

যতক্ষণ অসুস্থ থাকবে, ততক্ষণ সে আল্লাহপাকের মেহমান থাকে। তার জন্য প্রতিদিন সত্তরজন শহীদের ছাওয়াব পরিমাণ আমল আকাশে উড্ডয়ন করা হয়। যদি সে অসুস্থ থাকে, তাকে সুস্থতা দান করা হয়। সে গোনাহ থেকে এমন নিষ্পাপ হয়ে যায়, যেমন আজই মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়েছে। আর যদি সেই ব্যাধিতে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে বিনা হিসাবে তাকে জান্নাতে দেওয়া হবে।

বন্ধুগণ! আরও শুনুন-

মুয়ায্যিন আল্লাহপাকের দারোয়ান, যাকে প্রত্যেক আযানের বিনিময়ে হাজারো নবীর ছাওয়াব প্রদান করা হয়।

আলেমগণ আল্লাহপাকের উকিল ও নির্বাচিত ব্যক্তি, যাদেরকে কেয়ামতের দিন প্রত্যেক হাদীছের বিনিময়ে নূর প্রদান করা হবে, প্রত্যেক হাদীছের প্রতিদানে হাজার বছরের ইবাদাত লেখা হবে এবং ইল্‌ম শিক্ষার্থী নারী-পুরুষ আল্লাহপাকের খাদেম, যাদের প্রতিদান একমাত্র জান্নাতই হয়ে থাকে।

হযরত আবু সাঈদ (রাযি.) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি পাঁচ প্রকার লোকের জন্য জান্নাতের জামিন হব। (১) পুণ্যবতী নারী, যে নিজের স্বামীর আনুগত্য করে, (২) পিতামাতর বাধ্যগত সন্তান, (৩) যেব্যক্তি হজের রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেছে, (৪) যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং (৫) ওই ব্যক্তি যে কোনো মসজিদে ছাওয়াবের আশায় আযান দেয়।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-শহরে মুয়ায্যিন বেশি থাকে, সেখানে শীত কম হয়।

ফকীহ আবুল লায়েছ সমরকন্দি (রহ.) বলেন, হযরত যাহহাক (রহ.) বর্ণনা করেছেন, হযরত যায়েদ ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) যখন আযানের শব্দগুলো স্বপ্নে দেখার পর হযরত বেলাল (রাযি.)কে শিক্ষা দিলেন, তখন হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাযি.)কে বলেছিলেন, ছাদের ওপরে উঠে আযান দাও। হযরত বেলাল (রাযি.) আযান দেওয়া শুরু করলে মদীনাবাসী নগরীতে একটি বিকট আওয়াজ উপলব্ধি করেছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান, এটা কিসের আওয়াজ? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

বেলালের আযানের দরুন আল্লাহপাকের আরশ পর্যন্ত আকাশের দরজা খোলা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! হযরত আবুবকর (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বৈশিষ্ট্য কি শুধু বেলালের জন্য? নাকি সমস্ত মুয়ায্যিনের জন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এ বৈশিষ্ট্য সমস্ত মুয়ায্যিনের জন্য। তারপর বললেন, মুয়ায্যিনদের আত্মাকে শহীদগণের আত্মার সঙ্গে একত্রিত করা হয়। কেয়ামতের দিন একজন আহ্বানকারী আহ্বান করবে, মুয়ায্যিনরা কোথায়? তখন মুয়ায্যিনগণ মেশক ও কর্পুরের স্তূপে দাঁড়িয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ!

সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়ে আযান দেওয়ার আবেগ

সাহাবায়ে কেরামের জীবনীর ওপর আলোকপাত করলে প্রতীয়মান হয়, তাঁদের অন্তরে আযান দেওয়ার প্রবল আগ্রহ ছিল। উদাহরণস্বরূপ–

হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, আমি যদি মুয়ায্যিন হতাম, তাহলে ফরজ হজ আদায়ের পর অন্য কোনো হজ আদায় করার আগ্রহ থাকত না।

হযরত আলী (রা) বলেন, একটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে আমার আক্ষেপ নেই। সেটি হচ্ছে, আমি সর্বদা এই আকাঙ্ক্ষায় থাকতাম যে, আমার ছেলে হাসান ও হুসাইনের জন্য হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে মুয়ায্যিনের আবেদন করব।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, আমি যদি মুয়ায্যিন হতাম, তাহলে কোনো জিহাদে অংশগ্রহণ না করলেও তার পরওয়া করতাম না।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) বলেন, আমি মুয়ায্যিন হলে কোনো জিহাদে অংশ না নেওয়ার কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপও করতাম না।

আযানের এক চিত্তাকর্ষক ভ্রমণ

আমি আপনাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলছি; মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন।

ভূপৃষ্ঠে এমন কোনো মুহূর্ত অতিবাহিত হয় না, যখন মুয়ায্যিনের আওয়াজ ধ্বনিত না হয়। শত-শত নয়; বরং হাজারো মুয়ায্যিন এক সঙ্গে আল্লাহপাকের একত্ববাদ ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাতের প্রচার করতে থাকেন।

যদি পৃথিবীর মানচিত্রে লক্ষ্য করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেই ইন্দোনেশিয়া এমন একটি দেশ, যা পৃথিবীর গোলাকারের পূর্ব প্রান্তের মধ্যস্থলে অবস্থিত। লোকালয়ের প্রেক্ষিতে খুবই ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এর জনসংখ্যা প্রায় আঠারো কোটি। সেই দেশে অসংখ্য দ্বীপ রয়েছে। তন্মধ্যে সামাটার, জাওয়া, সিলবিয বড়-বড় দ্বীপ।

ভোর রাতের শেষ সময় সুবহে সাদিক পূর্বাকাশের শুভ্রতা তথাকার পূর্বপ্রান্তের দ্বীপে উদিত হয়। তখন সেখানে রাত সাড়ে পাঁচটা বাজে। ঠিক সেই সময় পূর্ব প্রদেশগুলোতে হাজার-হাজার মুয়াযিন একসঙ্গে আযান দিতে থাকে। আল্লাহর একত্ব ও রেসালাতের ঘোষণা দিতে থাকে। পূর্ব প্রদেশগুলো থেকে শুরু করে ক্রমশ পশ্চিম প্রদেশের দিকে এগুতে থাকে। ফলে দেড় ঘন্টা পর জাকার্তায় আযান দেওয়ার পালা আসে। জাকার্তার পর এই ক্রমধারা সামাটরায় শুরু হয়। তারপর সামাটরার পশ্চিম প্রান্তের গ্রাম ও প্রদেশগুলোতে আযান শুরু হওয়ার পূর্বেই মালায়াতে আযানের ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয়ে যায়। আর সেই ক্রমধারা এক ঘন্টা পর ঢাকায় পৌঁছে যায়। বাংলাদেশের আযান এখনও শেষ হয়নি। কলকাতা হতে সরাসরি নগর পর্যন্ত আযানের গুঞ্জন শুরু হয়। অন্যদিকে এ ক্রমধারা মুম্বাইয়ের দিকে এগিয়ে যায়। ফলে গোটা ইন্ডিয়ার আনাচে-কানাচে তাওহীদ ও রেসালাতের ঘোষণার গুঞ্জন ওঠে। শ্রীনগর ও শিয়ালকোটে আযানের সময় অভিন্ন। শিয়ালকোট থেকে কোয়েটা, করাচি ও গোয়াদর পর্যন্ত চল্লিশ মিনিটের ব্যবধান রয়েছে। তখন পাকিস্তানে আযানের শব্দ ধ্বনি হতে থাকে। পাকিস্তানের পশ্চিম প্রান্তে আযান শেষ হওয়ার পূর্বেই আফগানিস্তান ও মস্কটে আযান শুরু হয়ে যায়। মাসকাত থেকে বাগদাদে এক ঘণ্টার ব্যবধান রয়েছে। ওই সময় সৌদি আরব, ইয়েমেন, আরব আমিরাত, কুয়েত ও ইরাকে আযানের গুঞ্জন শুরু হয়। বাগদাদ থেকে এস্কান্দারিয়া পর্যন্ত এক ঘন্টার তফাৎ রয়েছে। ওই সময় সুদান, সিরিয়া, মিশর ও সোমালিয়াতে আযান ধ্বনিত হতে থাকে। এস্কান্দারিয়া ও ইস্তাম্বুল একই দৈর্ঘ্যতায় রয়েছে। তুরস্কের পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেড় ঘন্টার ব্যবধান। এ সময় সারা তুরস্কে তাওহীদ ও রেসালাতের আওয়াজ ধ্বনি হতে থাকে। এস্কান্দারিয়া থেকে তারাবলিস পর্যন্ত এক ঘন্টার ফারাক। ওই সময় উত্তর আফ্রিকায় লিবিয়া, তিউনিসিয়াতে আযান সম্প্রচার হতে থাকে। সেই ফজরের আযান ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব দ্বীপ হতে সূচনা হয়ে সাড়ে নয় ঘন্টা ভ্রমণ করে এখন আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব প্রান্তে পৌঁছতে-পৌঁছতে এদিকে ইন্দোনেশিয়াতে যোহরের আযানের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে গেছে।

যোহরের আযান ঢাকায় পৌঁছতে-পৌঁছতে পূর্ব ইন্দোনেশিয়াতে আছরের আযানের সূচনা হয়ে যায়।

এ ধারাবাহিকতা দেড় ঘন্টা চলার সাথে-সাথে পূর্বে ইন্দোনেশিয়াতে মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে হয়েছে। মাগরিবের আযান কোনোমতে সিলবিয থেকে সামাটায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই পূর্ব দ্বীপে ঈশার আযানের সময় হয়ে যায়।

মজার ব্যাপার হলো, ওই সময় পশ্চিম আফ্রিকায় ফজরের আযান হয়। এতে প্রতীয়মান হয়, পৃথিবীতে একটা সেকেন্ডও এমন যায় না, যখন আযানের আওয়াজ ধ্বনিত হয় না। সুবহানাল্লাহ! তাওহীদ ও রেসালাতের এ সম্প্রচারের ধারাবাহিকতায় আল্লাহপাকের এ বাণীর সুস্পষ্টতা প্রকাশ পায় যে, আল্লাহপাক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন–

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

'হে আমার হাবীব! আমি তোমার আলোচনাকে সমুন্নত করেছি।'[১২৮]

মুয়ায্যিনগণ কী আযান দিয়েছেন? তারা তো আল্লাহ তা'আলা মাহাত্ম্য ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুউচ্চ মর্যাদার সুগন্ধ দ্বারা সারা পৃথিবীকে সুবাসিত করেছেন।

আল্লাহপাকের মাহাত্ম্য বর্ণনার বিস্ময়কর ধরন

হযরত শারফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনিরী (রহ.) আল্লাহপাকের মাহাত্ম্য সম্পর্কে একটি আশ্চর্যকর প্রবন্ধ লিখেছেন। এটি পড়লে মানবহৃদয়ে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়ে যায়। আপনারাও শুনুন; তাহলে বুঝতে পারবেন, নামাযের মধ্যে আল্লাহু আকবার বলার পর মানুষের অবস্থা কী হওয়া চাই। এ প্রবন্ধটি সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, اللهُ اكبر এর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আরেক অর্থ হচ্ছে, মাহাত্ম্য একমাত্র আল্লাহপাকের জন্য। বন্ধুগণ! লক্ষ করুন। আল্লাহু আকবারের অর্থ আমাদের জানা দরকার। আমরা তো জানি

---

১২৮. সূরা আলাম নাশরাহ : আয়াত ৪

اللهُ اكبر মানে আল্লাহ সবচেয়ে বড়। এতে প্রতীয়মান হয়, আরও অনেকে বড় রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় আল্লাহ। মূলত এর মর্ম হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহই বড়। তিনি একটু বাড়িয়ে বলেন যে, আল্লাহপাক খালিক ও মালিক। আর খালিক ও মালিক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং নির্দ্বিধায় আল্লাহপাকের দয়া ও ক্রোধের অধিকার রয়েছে। তিনি চাইলে ভূমণ্ডল থেকে নভোমন্ডলে চড়াতে পারেন।

আল্লাহ ফুযায়েল ইবনে আয়ায (রহ.)কে ডাকাতদল থেকে চয়ন করে নিয়েছেন। আর বালআম বাউরাকে চারশত বছরের ইবাদাত থাকা সত্ত্বেও ওলীদের তালিকা থেকে বের করে দিয়েছেন।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.)কে মূর্তিপূজা থেকে বের করে একত্ববাদী বানিয়েছেন। আর ফেরেশতাদের রূপকার আযাযীলকে সাত হাজার বছরের ইবাদাত থাকা সত্ত্বেও অভিশপ্ত বানিয়েছেন।

তিনি সালমান ফারসি (রাযি.)কে পূজামণ্ডপ থেকে বের করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচরের সোপানে আরোহণ করিয়েছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে মসজিদে রেখে লাঞ্ছিত করেছেন।

তিনি চাইলে পাপিষ্ঠের ছায়ানীড়ে নবীকে প্রতিপালন করেন। আর চাইলে নবীর ঔরসে হতভাগা সৃষ্টি করেন। তিনি চাইলে কুকুরকে ওলীদের কাতারে দাঁড় করান। আর চাইলে ওলীকে কুকুরের সমতুল্য করে দেন।

সাবধানতার চোখ খোলো

আদম (আ.)-এর আক্ষেপ, ইবরাহীম (আ.)-এর ব্যর্থতা, নূহ (আ.)-এর আর্তনাদ। ইয়াকুব (আ.)-এর বিপদ। ইউসুফ (আ.)-এর অসহায়ত্ব। যাকারিয়া (আ.)-এর মাথায় করাত চালানো। ইয়াহইয়া (আ.)-এর গ্রীবার অসি। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্থির হয়ে বারবার আকাশের দিকে তাকানো এ সবকিছু আল্লাহপাকের মাহাত্ম্যের বহিপ্রকাশ। ইবরাহীম (আ.) আযরের ঔরসে জন্ম নিয়েছেন তা ভেবে কুরআনের এ আয়াতখানা পাঠ করো–

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

'আল্লাহ জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন।'[১২৯]

---

১২৯. সূরা ইউনুস : আয়াত ৩১

আর কেনানকে হযরত নূহ (আ.)-এর ঘরে জন্ম দিয়েছেন একথা স্মরণ করে এ আয়াতখানা পাঠ করো–

وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

'আল্লাহ মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন।'[১৩০]

আল্লাহপাকের দয়া কখনও অকারণে উত্তাল হয়ে ওঠে। তখন وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ বলে কুকুরের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর কখনও ক্রোধের আগুণ গর্জে ওঠে। তখন মুয়াল্লিমুল মালাইকার পোশাক খুলে إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي এর সিলমহর ললাটে স্থাপন করে দেন। যদি অনুগ্রহের দৃষ্টি দেওয়া হয়, তাহলে সমস্ত দোষ গুণে পরিণত হয়ে যায়। যদি আল্লাহর অনুগ্রহের আলোচনা আসে, তাহলে অভিশপ্তকে পুরস্কৃত করতে আর মাটিকে পরশপাথর বানাতে সময় লাগে না।

স্বতঃসিদ্ধ কথা হলো, ভয়ের সঙ্গে আশাও থাকে। আল্লাহর ফয়সালা যদি যথোপযুক্ত প্রাপ্যের ভিত্তিতে হতো, তাহলে আমরা কোনো হিসাবে পরিগণিত হতাম না। অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জানাই, যিনি মাধ্যম উপকরণ দূরীভূত করেছেন। যেখানে পুণ্যবানগণ আশাবাদী থাকেন, সেখানে আমরা নগণ্যরাও প্রত্যাশী থাকতে পারি। যতই ক্লেদাক্ত হোক না কেন সে ফেরাউনের জাদুকরদের চেয়ে অপবিত্র নয়। আসহাবে কাহাফের কুকুরের চেয়ে তুচ্ছ নয়। সিনাই পর্বতের চেয়ে অপদার্থ নয়। উস্তুয়ানায়ে হান্নানার চেয়ে কম মূল্যের নয়।

তিনি আফ্রিকার কৃষ্ণাবর্ণের কৃতদাসকে ধরে এনে সম্মানের মুকুট পরিয়ে দেন। সুবহানাল্লাহ! বন্ধুগণ আজকের আলোচনায় একথা প্রতীয়মান হয় যে, গ্রহণযোগ্যতা পেতে হলে যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। সুতরাং আমরাও যদি নতশিরে হাজির হই, তাহলে এই পরিত্যাক্ত বস্তুও গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে। আল্লাহপাক আমাদের টুটাফাটা ইবাদাতগুলো কবুল করুন। আমীন।

---

130. সূরা ইউনুস : আয়াত ৩১

রোযা ও তারাবির শারীরিক উপকারিতা

'রমযান মাস মুমিনের জন্য বার্ষিক আত্মশুদ্ধির কেন্দ্রের মতো। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে পেশাজীবিগণ নিজেকে শক্ত অবস্থানে রাখার জন্য, বাণিজ্যিক নলেজে উন্নতির জন্য, কোম্পানির কর্মকর্তাদের উন্নতির জন্য প্রতি বছর অনেক কিছু করে থাকে। তেমনিভাবে কুরআন মাজীদ চৌদ্দশত বছর পূর্বে থেকে একটি প্রতিচ্ছবি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নিজের অনুরাগ ও অবস্থার স্থিতিশীলতার জন্য এবং নিজের আধাত্মিক সমুন্নতির জন্য বছরে এমন একটি মাস দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে তোমরা কুরআনের শিক্ষা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করবে। আর সত্যিকারের আবেগের মাধ্যমে আমল করার সংকল্প করবে।'

রোযা ও তারাবির শারীরিক উপকারিতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ.

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ

اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

প্রকৃত রাজাধিরাজের সরাসরি সম্বোধন

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রোযা ফরজ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু আয়াতটির গঠন-কাঠামো নিয়ে একটু আলোকপাত করলে দেখা যায়, আল্লাহপাক বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

'হে ঈমানদারগণ!'

মানে হে মানবসম্প্রদায়! যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মান্য করার স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের প্রতি আল্লাহপাকের এ সম্বোধন।

বন্ধুগণ! তাওরাতের এক জায়গায় আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের সরাসরি সম্বোধন করার ফলে তারা এত উল্লসিত হয়েছিল যে, তারা বলতে লাগল–

نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ

'আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয় পাত্র।'[১৩১]

---

১৩১. সূরা মায়েদা : আয়াত ১৮

তাদেরকে একবার সম্বোধন করার দরুনই তারা Superiority Complex শ্রেষ্ঠত্বের আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হয়েছিল। অথচ উম্মতে মুহাম্মাদীকে কুরআনে আল্লাহপাক ৮৮ বার সম্বোধন করেছেন।

এর দৃষ্টান্ত এমন মনে করুন যেমন, যদি কোনো মেথরকে ডেকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কথা বলেন, তাহলে সেটা ওই সুইপারের জন্য বিরাট সম্মানের বিষয় হয়। সে বলে V.I.P Personality আমাকে কাজ দিয়েছে। আর এখানে তো আরও সূক্ষ্ম বিষয় যে, স্বয়ং আল্লাহপাক বিশ্বপালনকর্তা আর আমরা তাঁর সৃষ্টি। তাই যদি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আমাদের সম্বোধন করে কিছু বলেন, তাহলে এটা কী পরিমাণ গুরুত্বের বিষয় হতে পারে? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, কুরআন তেলাওয়াত করতে যখন يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বাক্য আসে, তখন তেলাওয়াতকারী সচেতন হওয়া চাই যে, এখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে সরাসরি সম্বোধন করেছেন।

রোযা আল্লাহপাকের নৈকট্যের মাধ্যম

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বাক্য দ্বারা আল্লাহপাক মানুষদের তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করে সংবাদ দিচ্ছেন, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে।

এখন এ সম্বোধন শুনে বিভিন্ন ধারণা আসতে পারে। কেউ ভাবতে পারে, আমাদের প্রকৃত মালিক আমাদের প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন। তাই বছরে একমাস পানাহার থেকে বিরত থাকতে বলছেন। এ অহেতুক ধারণা নিরসনের জন্য আল্লাহপাক বলেন, এ রোযা তোমাদের শাস্তিস্বরূপ নয় এবং আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্কের দূরত্ব নয়; বরং

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল।

অর্থাৎ– এটা কোনো নতুন দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পণ করা হয়নি; বরং এটা ইবাদাতের একটি ক্রমধারা। তোমাদের পূর্ববর্তীগণও এ কাজ করেছে। এবার মুমিনগণ অন্তরে প্রশান্তি পায় যে, এ রোযা আমাদের শাস্তি নয়,এবং আল্লাহপাকের অসন্তুষ্টির বহিপ্রকাশও নয়; বরং এটি উপসনার একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়।

তারপর রোযা ফরজ করার উদ্দেশ্যও বর্ণনা করা হয়েছে। রোযার মাধ্যমে ক্ষুর্ধাত থাকলে তোমাদের মালিক কোনো কিছু পাবেন না; বরং এতে তোমাদেরই কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহপাক বলেন

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

'যাতে তোমরা খোদাভীরু হয়ে যাও।'

এতে প্রতীয়মান হয়, এই যে ইবাদাত মুমিনের ওপর ফরজ করা হয়েছে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মুমিনের অন্তরে উত্তম গুণ সঞ্চার করা। সুতরাং পূর্ণ আয়াত পাঠ করলে হৃদয়ে প্রশান্তি আসে এবং আগ্রহ জাগে যে, আমরা এ ইবাদাতটি গুরুত্বের সাথে আদায় করি।

উপদেশমূলক কুরআনি নীতিমালা

এ আয়াত দ্বারা আমরা আরও একটি সূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবন করতে পারি যে, আমরা ঘরে বিবি-বাচ্চাদের আদেশ করি। এতে কী আমরা কুরআনি নীতিমালা অবলম্বন করি? আমরা কি তাদেরকে প্রথমে আদরের সাথে ডাকি? তাদের কোনো আদেশ করলে এর সঙ্গে সে কাজের উপকারিতা ও রহস্য বর্ণনা করি যে, তাদের এ অনুভুতি হয় যে, এ কাজ করার পেছনে উদ্দেশ্য কী? এতে আমরা ভুল করি। Straight awaw তৎক্ষণাৎ দুটি শব্দে একটি বিষয় বলে দেই। অথচ শ্রোতা বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝতেও পারেনি। তখন কয়েকবারে সে এ বিষয়টি অনুধাবন করতে কষ্টে পড়ে যায়। সুতরাং বন্ধুগণ, লক্ষ করুন কুরআন মাজীদ কী অপরূপ নীতিমালা বর্ণনা করেছে।

বাৎসরিক আত্মশুদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু

রমযান মাস মুমিনের জন্য বার্ষিক আত্মশুদ্ধির কেন্দ্রের মতো। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে পেশাজীবিগণ নিজেকে শক্ত অবস্থানে রাখার জন্য, বাণিজ্যিক নলেজে উন্নতির জন্য, কোম্পানির কর্মকর্তাদের উন্নতির জন্য প্রতি বছর অনেক কিছু করে থাকে। তেমনিভাবে কুরআন মাজীদ চৌদ্দশত বছর পূর্বে থেকে একটি প্রতিচ্ছবি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নিজের অনুরাগ ও অবস্থার স্থিতিশীলতার জন্য এবং নিজের আধাত্মিক সমুন্নতির জন্য বছরে এমন একটি মাস দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে তোমরা কুরআনের শিক্ষা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করবে। আর সত্যিকারের আবেগের মাধ্যমে আমল করার সংকল্প করবে। বাস্তবেও রমযান মাসে

তারাবির নামাযে কুরআন শরীফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়া হয়। এর উদ্দেশ্য হলো, আমরা আল্লাহপাকের সঙ্গে যে-প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছি, সারা বছর শিথিলতার দরুন তা পিছিয়ে যাচ্ছে। এবার একসঙ্গে পূর্ণ কুরআন শরীফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নতুন করে শুনে ব্যাটারি চার্জ করে নতুন পণের মাধ্যমে এক বৈপ্লাবিক জীবনের সূচনা করব।

বিদ্যার্জনের দীপ্তিমান কল্পনা

একবার আমার একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের সুযোগ হয়েছিল। আমাদের প্রশিক্ষক একজন জার্মানি ডাক্তার ছিলেন। তিনি বিশ্বের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন। কেউ হয় যোগ্য ম্যানেজার, আর কেউ হয় কার্যকরি ম্যানেজার। উভয়ের মধ্যে বিরাট তফাৎ রয়েছে। Efficient Manager বলা হয়, সে সর্বদা নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে। চাই মাল প্রডাকশন হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে Effective Management তাকে বলে, যিনি প্রডাকশন ও মালামাল সরবরাহের অবস্থা অবলোকন করেন।

ক্লাসে লেকচার দেওয়ার সময় তিনি বলেছেন, মানুষের মস্তিষ্কে একটি বিষয়ের কল্পনা রয়েছে। তা হলো শৈশবে বিদ্যা, যৌবনে কাজ, বার্ধক্যে বিশ্রাম। বর্তমানে সেই প্রাচীন কল্পনার অবসান হয়েছে। ইউরোপিয়ান গবেষকগণ বলেন, শৈশবেও বিদ্যা, যৌবনেও কর্মব্যবস্তার পাশাপাশি বিদ্যা অর্জন করা চাই। এর পদ্ধতি হলো, আমরা যখন কোনো বাণিজ্যিক কর্ম করব, তখন ব্যবসায়িক চেতনা বৃদ্ধির জন্য কনফারেন্স-সেমিনার করে নিজেকে শক্ত অবস্থানে ধরে রাখতে হবে। নতুবা অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আমাদের অগ্রগামী হয়ে যাবে।

তিনি একথা বলার পর আমি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে বললাম, আমি আপনার কথার সঙ্গে কিছু শেয়ার করতে চাই। তিনি বললেন, ঠিক আছে বলো। আমি বললাম, জনাব! এ ভাবনা ইউরোপিয়ান গবেষকদের নয়; বরং এটা অনেক পুরাতন বিষয়। তিনি বললেন, কিভাবে? আমি বললাম, আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন হয়েছিল। তখন জ্ঞানের এত মূল্যায়ন করা হতো না। তিনি যে-সম্প্রদায়ে জন্ম গ্রহণ করেন, তারা অজ্ঞ ছিল। যেযুগে তিনি আগমন করেছিলেন, সেই যুগকে অজ্ঞতার যুগ বলা হয়। এমন বর্বর যুগে যখন

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতিকে বিদ্যা শিক্ষা দেন, তখন তিনি বিদ্যার্জন সম্পর্কে বলেছিলেন–

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

'তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত বিদ্যার্জন করো।'

সুতরাং আপনি এই যে বলেছেন, ইউরোপিয়ান গবেষকরা এ ফলাফল বের করেছেন এ প্রেক্ষিতে আমি বলব, আপনি অনেক বিলম্বে এ ফলাফল অবগত হয়েছেন। অথচ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীপ্যমান ভাবনা এই ধারণা আমাদের অনেক পূর্বেই দিয়েছেন।

আমার কথা শুনে তিনি কিছুক্ষণ ভেবে ব্রিফকেইস থেকে ডায়রি বের করে আমাকে বললেন, এর ওপর তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীটা আরবীতে লিখে নিচে ইংরেজিতে অনুবাদ লিখে দাও। আমি লেখার পর তিনি বললেন, বর্তমানে এখানে আমার যত অতিথি রয়েছেন, সবার সম্মুখে আমি অঙ্গীকার করছি, আজ থেকে আমি যেকোনো ভার্সিটিতে লেকচারের সময় শ্রোতাদের জানিয়ে দেব, মুসলমানদের নবী আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে এর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ঈমানের চার্জিং

এসব হাদীস নয় ১/৮০

সুবহানাল্লাহ! ইসলাম এমন শিক্ষা দিয়েছে, যা কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট। পরিপূর্ণ উন্নতির জন্য বার্ষিক কনফারেন্স, সেমিনার ইত্যাদি করে থাকে। আর আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশত বছর পূর্বে এমন একটি ধারণা দিয়েছেন যে, সারা বছর তোমরা বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত থাকো। কেউ শিল্পকর্মী আর কেউ পেশাজীবী। কেউ ভার্সিটির প্রফেসর হবে। কেউ হাসপাতালের সার্জন হবে। এতে তোমাদের ঈমানি জযবা শিথিল হতে পারে। ঈমানের ব্যাটারী ডাউন হতে পারে। সুতরাং মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে যেমন তার ব্যাটারী ডাউন হয়; ফলে চার্জারের মাধ্যমে চার্জ দিতে হয়, তেমনিভাবে আল্লাহপাক ঈমানদারদের জন্য ঈমানের চাজিংস্বরূপ রমযান মাস দিয়েছেন। রমযান মাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, দিনের বেলায় রোযা ফরজ করা হয়েছে আর রাতের বেলায় তারাবির নামাযে কুরআন শ্রবণ করা সুন্নতরূপে নির্ধারিত করা হয়েছে। এ দুটি কাজে স্বয়ং মানুষেরই উপকার হয়। এর মধ্যে মানুষের আত্মা ও চরিত্রের সংশোধন রয়েছে। এতদ্ব্যতীত মানবদেহে রোযার অনেক

প্রভাব পড়ে। আজ আমি আপনাদের সম্মুখে রোযার সেই প্রভাবগুলো আলোচনা করব। তবে এর পূর্বে একটি ঘটনা শুনুন।

চিকিৎসা সম্পর্কে কুরআন-হাদীছের নির্দেশনামূলক নীতিমালা

বাদশাহ হরুন রশীদের শাসনামলে একজন খ্রিস্টান ধর্মগুরু এসে বাদশাহর সঙ্গে কথা বলার অনুমতি চাইলেন। তিনি একজন অবিজ্ঞ ডাক্তারও ছিলেন। সুতরাং তাকে সুযোগ দেওয়া হলো। তিনি বললেন, আমি একজন ধর্মপণ্ডিত ও অবিজ্ঞ ডাক্তার। আমি আপনার কাছে জানতে চাই, আপনারা বলেন, পবিত্র কুরআনে সর্ব বিষয়ের মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে কি মানবদেহের সুস্থতা সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা রয়েছে? বাদশাহ উপস্থিত আলেমগণকে বললেন, তার প্রশ্নের উত্তর দাও। তখন আলী ইবনে হুসাইন নামে একজন আলেম দাঁড়িয়ে বললেন, জি। আমদের কুরআন দৈহিক সুস্থতা সম্পর্কে অত্যন্ত সুচারু মূলনীতি বর্ণনা করেছে। সেটা কী? তিনি বললেন, আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

'তোমরা আহার কর, পান করো। কিন্তু অপচয় করো না।'[১৩২]

অর্থাৎ– অতিমাত্রায় আহার করো না। বরং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আহার করো। এটি এমন একটি মূলনীতি যে, এর ওপর আমল করলে মানবজীবনে রোগব্যাধি আসার সুযোগই পাবে না।

একথা শুনে আগত লোকটি বলল, আমি একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। আমি আপনাদের কুরআনের এ মূলনীতিকে সমর্থন করি। আচ্ছা বলুন, আপনাদের নবীও কি আত্মশুদ্ধি শিক্ষাদানের পাশাপাশি দৈহিক সুস্থতার ব্যাপারে কোনো মূলনীতি বলে দিয়েছেন যে, মানুষ কীভাবে তার দেহিক সুস্থতার প্রতি যত্নবান হবে? আলেম উত্তর দিলেন, জি, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও দৈহিক সুস্থতার ব্যাপারে অমূল্য মূলনীতি ব্যক্ত করেছেন। তিনি একটি হাদীছ পাঠ করে করলেন, 'সমস্ত রোগের উৎস হলো পাকস্থলি। তোমরা দেহকে তা-ই দাও, যা তার প্রয়োজন। সতর্কতা চিকিৎসা থেকে উত্তম।'

খ্রিস্টান ধর্মগুরু হযরত আলী ইবনে হুসাইনের ভাষ্যে চিকিৎসা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছের মূলনীতি শুনে বলতে লাগলেন– তোমাদের ধর্মগ্রন্থ ও

---

১৩২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৩১

তোমাদের নবী জালিনুসের (গ্রিসের অধিবাসী চিকিৎসাবিজ্ঞানী গ্যালেন) জন্য কোনো বিষয় রেখে যাননি।

বর্তমান বিশেষজ্ঞরা সত্যায়ন করেন যে, আমাদের আহারের অভ্যাসেই আমাদের অসুস্থের সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন অধিক পরিমাণে চিনি আহার করলে ডায়াবেটিস হয়। অধিকহারে রসালো খাবার খেলে হাইপ্রেসার হয়। চটপতি, ভাজাপোড়া ও তৈলাক্ত বেশি খেলে আলসার, ব্লাডপ্রেসার হয়। এজন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাকস্থলি সমস্ত রোগের উৎস। এ থেকে রোগব্যাধির সূচনা হয়। সুতরাং যেব্যক্তি পাকস্থলি কন্ট্রোল করবে; যা কিছু দেহের জন্য উপকারী, তা ভক্ষণ করবে আর যা কিছু ক্ষতিকর, তা থেকে বিরত থাকবে, ইনশাআল্লাহ সে নানাবিধ পীড়া থেকে নিরাপদ থাকেব। সুতরাং হাদীছের প্রথমাংশ স্মরণ রাখবেন যে, 'পাকস্থলি সমস্ত রোগের মূল।'

দ্বিতীয় অংশ হলো, 'তোমরা দেহকে তা-ই দাও যা তার প্রয়োজন।'

কতিপয় সূফীসাধক অসুস্থ হলে চিকিৎসা করা থেকে বিরত থাকেন। তেমনিভাবে কতক মহিলা চিকিৎসা করেন; তবে ওষুধ তিক্ত হলে তার কাছেও জান না। এসব নবীর শিক্ষার পরিপন্থী। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দেহকে ওই জিনিস দাও, যা তার প্রয়োজন।' এতে প্রতীয়মান হয়, দেহের কোনো বস্তুর চাহিদা থাকলে তো আহার করা দরকার। এটা আমাদের বিশেষজ্ঞ নবীর শিক্ষা। হাদীছের শেষের অংশে বলা হয়েছে, 'সতর্কতা অবলম্বন করা চিকিৎসা থেকে উত্তম।'

বর্তমানে আমরা এ বিষয়ে অনেক ঢিলেমি করি। যেখানে দেখবে, কোনো লোক দস্তরখানে বসে পাত্রের দিকে দ্রুত হাত বাড়িয়ে দেয়, তবে বুঝতে হবে, সে ডায়াবেটিক রোগী। লোকেরা পরোটা খেতে-খেতে শিরা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় আর বলে, ক্ষতির মালিক তো আল্লাহ। আরে ভাই! আল্লাহ মালিক ঠিকই; তবে আল্লাহপাক তো বিবেক দিয়েছেন ব্যবহারের জন্য। বিবেক বলে, আমি অসুস্থ। মিষ্টিদ্রব্য থেকে আমাকে দূরে থাকতে হবে। তখন মিষ্টি খাওয়া ত্যাগ করা চাই। মানুষ এমন কথাকে 'তাওক্কুল' বলে। আসলে এটা অপরাধ।

স্মরণ রাখবেন, ডাক্তার যাকে কোনো জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলেছেন যে এটা করলে তোমার ক্ষতি হবে, সে যেন ওই জিনিস খেয়ে তাওয়াক্কুল না ফুটায়। এতে সে তাওয়াক্কুলের ছাওয়াব তো পাবেই না; বরং

তার করার ফলে যদি সে মারা যায়, তাহলে কেয়ামতের দিন আত্মহত্যার শাস্তি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মানুষ তো বাহ্যত মিষ্টিদ্রব্য খায়। প্রকৃতপক্ষে এটা ধীরগতির বিষ। যার ডায়বেটিক কন্ট্রোলে নেই এবং তার পায়ে ক্ষতও আছে বটে; তারপরও সে তা খেয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় সে এই মিষ্টিদ্রব্যকে যেন মিষ্টি মনে না করে; বরং এটা মিষ্টির আকৃতির বিষ।

বর্তমান যুগের বিশেষজ্ঞরা ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, 'সতর্কতা অবলম্বন করা চিকিৎসা থেকে উত্তম।' ইংরেজী একটা প্রবাদও রয়েছে– 'চিকিৎসা হতে পথ্য ভালো।

অধিক আহারসৃষ্ট ব্যাধিসমূহ

মানুষ যা কিছু আহার করে, তার দেহের জন্য তা প্রয়োজন হয়। তবে ইংরেজিতে একটি বাগ্‌ধারা রয়েছে–

Exeess in Everything is bad.

'কোনো জিনিসে অতিমাত্রা সর্বদাই ক্ষতিকর হয়।'

এই বাগ্‌ধারার প্রেক্ষিতে বলতে হয়, যদি আমরা কোনো মেশিনকে ওভারলোড করি, তাহলে একটি ডাউন অতিক্রম করতে তার আয়ু শেষ হয়ে যাবে। তেমনই মানুষের পাকস্থলিও। খাবারের নির্দিষ্ট পরিমাণ তাকে উপকার পৌঁছায় বটে; কিন্তু যদি তাতে অতিমাত্রায় লোড করি, তাহলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিসাধণ করবে। অতি ভক্ষণ মানুষকে সুস্থতা নয়; অসুস্থতা উপহার দেয়।

অতি ভক্ষণে মানবদেহে চর্বি জমে যায়। সে মোটা হয়ে যায়, যার ফলে তার ওজন বেড়ে যায়। এভাবে মোটা হওয়া মুমিনের জন্য বিপদ। সে কোনো কাজের উপযোগী থাকে না। পায়ে হেঁটে কিছুক্ষণ চললেই হাই শ্বাস বের হতে থাকে। সুতরাং সে ইবাদাত করবে কীভাবে?

এমনিভাবে পার্থিব কোনো কর্মও করতে পারে না। যে নিজকে সামাল দিতে পারে না। সে অন্যের সাহায্য করবে কীভাবে? স্মরণ রাখবেন, স্বাস্থ্যকে সুস্থতা বলে না; বরং সুস্থতা বলা হয়, দৈহিক কাঠামো এমন হওয়া চাই যে, অনেক্ষণ কাজ করতে পারে; তবু ক্লান্তি আসে না। সুতরাং অনেক্ষণ কাজ করার পর যদি ক্লান্তি না আসে, তাহলে বুঝবে, আমি সুস্থ আছি।

আপনি চিন্তা করলে দেখবেন, আজকাল অধিকাংশ রোগই অধিক আহারের কারণে হয়ে থাকে। যেমন– ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবেটিস, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ইত্যাদি। অল্প আহারে যে সমস্ত ব্যাধি দেখা দেয়, তা বর্তমানে নেই। এর মর্ম হচ্ছে, বর্তমানে আমরা অফুরন্ত নেয়ামতে ভরপুর। সম্ভবত আগেকার লোকেরা এমন নেয়ামত পায়নি। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এত নেয়ামত পেয়েও আজ যে-পরিমাণ অকৃতজ্ঞতা বিদ্যমান, আগে কস্মিনকালেও তা হতো না।

অল্প আহারের অভ্যাস করো

মানুষের জন্য উচিত হলো সর্বদা প্রয়োজন সাপেক্ষে আহার করা। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের দেহ অনুপাতে তার খাবার হবে। তাই ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, মানুষের যে-পরিমাণ ক্ষুধা হয়, তার চেয়ে সামান্য কম আহার করলে এটা তার জন্য স্বল্প আহারের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। আমরা এটা বলিনি যে, পর্যাপ্ত পরিমাণ আহার্য থাকা সত্ত্বেও তুমি ক্ষুধার্ত থাকো। দেহকে আহার দেবেই না। বরং অবশ্যই খেতে হবে। তবে কী পরিমাণ? যতটুকু চাহিদা আছে তার চেয়ে সামান্য কম। তাহলে সেই খাবার উত্তমরূপে পরিপাক হয়ে দেহের অংশ বৃদ্ধি পাবে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহারের আমল

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বল্পাহারে অভ্যস্ত ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতি জিন্দেগিতে ধারাবাহিক তিন দিন এমন অতিবাহিত হয়নি যে, তিনি পেট পুরে আহার করেছেন। সুবহানাল্লাহ!

একদিন আহার করলে পরের দিন অনাহারে থাকতেন। দুদিন আহার করলে তৃতীয় দিন আহারবিহীন কাটাতে হয়েছে।

একদা হযরত সায়্যেদা ফাতেমা (রাযি.) দোজাহানের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলেন। তখন নাবীজি তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। সায়্যেদা ফাতেমা (রাযি.) বললেন, আব্বাজান! সায়্যেদুনা আলী (রাযি.) আটা আনয়নের পর আমি রুটি পাকাচ্ছি। এতে আমাদের প্রত্যেকের ভাগে একটি রুটি পড়েছে। আমার রুটি আমি মুখে দেওয়ার সময় আপনার স্মরণ হলো, ফাতেমা! তুমি তো রুটি খাচ্ছ। তুমি কি জান, তোমার আব্বা রুটি খেতে পাচ্ছেন কি-না? সুতরাং আমার ভাগের রুটির অধিকাংশ আমি আপনার জন্য হাদিয়া নিয়ে

এসেছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত থেকে রুটির টুকরাটি নিয়ে খাচ্ছেন আর বলছেন, ফাতেমা! ওই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আজ তিন দিন যাবৎ তোমার পিতা এক টুকরো রুটিও খেতে পাননি।

সুস্থতার উত্তম রহস্য

একদা একজন বিজ্ঞ ডাক্তার চিকিৎসা করার উদ্দেশ্যে মদীনায় গেলেন। তার ধারণা ছিল, মদীনায় কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই; সুতরাং সেখানে আমার ইনকাম বেশি হবে। কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। তার কাছে কোনো রোগীই এল না। সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, এখানে কোনো ডাক্তার নেই বলে প্রচুর ইনকামের আশায় এসেছিলাম। কিন্তু অনেকদিন গত হয়ে গেল; কোনো রোগী এল না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখানকার মানুষ অতিক্ষুধার সময় খায় আর কিছু ক্ষুধা বাকি থাকতে হাত ধুয়ে নেয়। একারণে তাদের রোগব্যাধি কম হয়।' এটা সুস্থতার উত্তম রহস্য, যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন।

সুস্থতার বার্তা

যেহেতু মানুষের বুঝবুদ্ধি, শিক্ষানীতি, জীবনোপকরণ এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভিন্ন হয়ে থাকে, তাই আল্লাহপাক তাঁর বান্দাদের ওপর এই অনুগ্রহ করেছেন যে, তারা নিজের জীবনে এই অল্প আহারের অভ্যাস করতেও পারে, আবার না-ও করতে পারে। সুতরাং তাদের ওপর এমন একটি মাস দিয়েছেন যে, বাধ্যতামূলক তারা অল্প আহারের অভ্যাস করবে আর এতে অল্প আহারের পরিপূর্ণ উপকার তারা ভোগ করবে। এতে সর্বস্থরের মানুষের জন্য রমযান মাস সুস্থতার মাধ্যম হবে। এতে প্রতীয়মান হয়, এ মাস সর্বস্তরের মানুষের জন্য সুস্থতার সংবাদ বহন করে।

ইসলামের সততার সুস্পষ্ট প্রমাণ

আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে এক খ্রিস্টান প্রকৌশলীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে সে বলল, আমি রোযা রাখার অভ্যাস করছি। আমি বললাম, এর উদ্দেশ্য কী? সে বলল, তোমরাও তো বছরে একমাস রোযা রাখ? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, এতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অসীম কল্যাণ

রয়েছে। তাই প্রতি বছর এক মাস রোযা রাখা আমার অভ্যাসে পরিণত করেছি।

বন্ধুগণ! সে একজন বিধর্মী লোক হওয়া সত্ত্বেও ইসলামি শিক্ষার রহস্য উপলব্ধি করে সুযোগে তা পালন করে যাচ্ছে।

সিংহের সুস্থতার রহস্য

বর্তমান আমরা সাধারণত যা আহার করি, তা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়। দু-একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে।

সিংহ বা বাঘ সম্পর্কে আমরা জানি, সে বনের রাজা। তার দেহে এত পরিমাণ ক্ষমতার প্রভাব থাকে যে, সে কোনো প্রাণীর সম্মুখে উপস্থিত হলে এমনিতেই সেই প্রাণীর প্রাণ অর্ধেক বের হয়ে যায়। সে চলার সময় তার দেহের অবয়ব এমন দেখায় যে, মনে হয়, বাস্তবেই সে বনের রাজা হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তার খাবার কী পরিমাণ হয়? সপ্তাহে একবার সে গোশত খায়। আমি বিশ্বের বিভিন্ন স্থান দর্শন করার সুযোগ পেয়েছি। যেখানে বাঘ ও সিংহের বংশবৃদ্ধির চর্চা করা হয়। সব জায়গায় দেখলাম একই অবস্থা। সপ্তাহে একবার এদের গোশত দেওয়া হয়। আমি এ সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসাও করেছি। তারা বলেছে, সপ্তাহে একবার খাবার দেওয়াই বাঘ ও সিংহের জন্য যথেষ্ট। আমি বললাম, বাঘ-সিংহের সপ্তাহে একবার আহার করলে চলে আর আমরা মাশাআল্লাহ দৈনিকই কয়েকবার আহার করি।

কুমিরের সুস্থতার তথ্য

বর্তমানে পৃথিবীতে যত প্রাণী রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে দীর্ঘজীবী প্রাণীদের একটি হলো কুমির। কুমির দেড় থেকে দুশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। কুমিরের মেরুদণ্ডে এমন শক্তি থাকে যে, সে যদি বাঘ বা সিংহের বুকে তার চোয়াল দ্বারা ধরতে পারে, তাহলে বাঘ-সিংহের বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তবু তার চোয়ালের স্পর্শ বিচ্ছিন্ন হবে না। সুতরাং যুগপৎ এ বিষয়ে গবেষণা করা হয়েছে যে, কুমিরের এত দীর্ঘ জীবন ও সীমাহীন শক্তির পেছনে রহস্য কী? জানা গেছে, প্রাণীটা খায় কম।

আপনি শুনে অবাক হবেন যে, কুমিরের ওজন ৭০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ– একজন মানুষ যদি ৭০ কেজি ওজন হয়, তাহলে তার মতো দশজনের সমান ওজন হয় একটা কুমির। কিন্তু সে দৈনিক মাত্র ৭০০ গ্রাম খাবার খায়। অর্থাৎ এক কেজি থেকেও কম।

বন্ধুগণ! এটা অনেক চিন্তার বিষয় যে, আমাদের দুপুরের খাবারই মাশাল্লাহ দুই কেজির বেশি হয়। তিন বেলার খাবারের বাইরে চা ইত্যাদির নাম নিয়ে আরও কত কিছু খাওয়া হয়। সবকিছু আমি বলতেও পারব না। সাধারণ নিয়ম হলো, কোনো মেশিনকে অতিরিক্ত ব্যবহার করলে তা দ্বারা প্রডাকশন সঠিক হয় না।

দুর্বলতা আসে কেন?

মস্তিষ্ক সর্বদা আমাদের শরীরের রক্তকে বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চারণ করে। যখন আমরা সীমাতিরিক্ত আহার করি, তখন মস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত নেয়, এখন পাকস্থলিতে অধিক রক্তের প্রয়োজন। যেমন– ফায়ার সার্ভিসের লোকেরা যেখানে বেশি প্রয়োজন সেখানকার আগুন জরুরি ভিত্তিতে নির্বাপণ করে। তেমনিভাবে আমদের রক্তের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাকস্থলির দিকে চলে যায়। এমনকি সেসময় আমাদের মস্তিষ্কও পর্যাপ্ত রক্ত পায় না। তাই তন্দ্রার ভাব দেখা দেয়। বেশি আহার করলে তন্দ্রার ভাব আসার মূল কারণ হচ্ছে, মস্তিষ্ক অন্যান্য অঙ্গ থেকে রক্ত হ্রাস করে পাকস্থলির প্রতি প্রেরণ করে। বোঝা যায়, মস্তিষ্ক বলছে, বিপদ সম্মুখিন হয়েছে; এখন এই খাবারকে হজম করাতে হবে। যেহেতু শরীরের অন্যান্য অংশে স্বল্প পরিমাণ রক্ত বিচরণ করে, তাই মানুষ দুর্বল হয়ে যায় এবং দীর্ঘ সময় শুয়ে থাকে।

খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁদের খাবার

এ নিখিল ধরণীতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ যারা অতিবাহিত হয়েছেন, তাঁদের জীবনীতে লক্ষ করলে সবাইকে একই রকম দেখা যাবে। তাঁরা একান্ত প্রয়োজনমতো আহার করতেন। উদাহরণ দেখা যাক–

১. হযরত ইমাম বোখারি (রাযি.)কে আল্লাহপাক এত পরিমাণ স্মৃতিশক্তি দিয়েছিলেন যে, লাখ-লাখ হাদীছ তাঁর মুখস্থ ছিল। একদা তাঁর খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি শুধু সাতটি বাদাম খেয়ে নিজকর্মে লিপ্ত হয়ে যাই। সারা দিন এর ওপরই চলে। আল্লাহু আকবার!

এ পৃথিবীতে যারাই আয়ুস্কাল দীর্ঘ ও সুস্থ পেয়েছেন, তারা এমন লোক ছিলেন, যাদের দেহে চর্বি জমাট হতো না। তাই তাদের দেহ দীর্ঘকাল সুস্থ থাকত।

২. একদা আমার একটি জাদুঘর দেখার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে আমি বিজ্ঞানী আইনস্টাইন-এর মমিকৃত লাশ দেখলাম। বর্তমান পৃথিবীতে

আইনস্টাইনকে এত সম্মান দেওয়া হয়, যেমন ধর্মীয় কনফারেন্সে নবীদের দেওয়া হয়ে থাকে। তিনি পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। আমি তার জীর্ণশীর্ণ কফিন দেখে অবাক হলাম। আমার ধারণা, তাঁর ওজন ষাট কেজির বেশি ছিল না। তিনি কোনো বস্তুর উপাদান ও এনার্জি ট্রান্সফারে স্বতন্ত্র বিধান নির্ধারণ করে গেছেন। বর্তমানে তার ওপর ভিত্তি করে অধিক গবেষণা চলছে।

আমাদের যুবকদের কম খাওয়ার অভ্যাস করা চাই। পবিত্র রমযান মাস সেই অভ্যাস গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগ।

রোযার কতিপয় হেকমত

রোযার দ্বারা মানবমনে ধৈর্যশক্তির সঞ্চার হয়। আল্লাহর নেয়ামতের মূল্যায়ন অন্তরে বদ্ধমূল হয়। অবহেলায় কত খাবার আমরা নষ্ট করি। উপবাস থাকলে অনুভব হয় এক লোকমা খাবারের মূল্য কত। রোযার অন্যান্য উপকারিতার সঙ্গে এটিও একটি উপকারিতা যে, মানুষ তার খাবারের সূচি কন্ট্রোল করতে পারে।

ওজন হ্রাস করার সহজ প্রেসক্রিপশন

একটি কারণ হলো কম আহার করা। এটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। দ্বিতীয়ত, ধীরে ধীরে আহার করাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত।

এতে একটি চিত্তাকর্ষক সূক্ষ্মতা রয়েছে। আপনি দেখে থাকবেন, আমাদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে, যারা দস্তরখানে বসতেই কয়েক মিনিটের মধ্যে দস্তরখানের সকল খাবার তার উদরে চলে যায়। খাওয়া শেষ করে পেটে হাত রেখে বলে, দোস্ত আজকে খেয়ে ফেলছি। এমন করা সঠিক নয়। এতে একটি সূক্ষ্ম বিষয় শুনুন।

একদা আমি এরকম একটি রচনা পড়েছিলাম। কোনো বিশেষজ্ঞ এসোসিয়েশন বিষয়টি প্রকাশ করত। এটি একটি সত্য ঘটনা। তারা লিখেছে, যেব্যক্তি নিজের ওজন কমাতে চায়, সে যেন ধীরে-ধীরে আহার করে। এটা পাঠ করে আমি আশ্চর্য বোধ করলাম যে, বর্তমান আধুনিকতা বলে ওজন হ্রাস করতে হলে কম খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। আর এ বিশেষজ্ঞরা বলছে, ওজন কমাতে হলে আস্তে-আস্তে খেতে হবে।

ক্ষুধার নিবারণ হওয়ার অনুভূতি

আহারের ব্যাপারে মানুষ দুই প্রকার। এক. কম খাওয়ার পক্ষে। দুই. খেতে-খেতে মরে যাওয়ার পক্ষে। ইতোপূর্বে আমরা জানতে পেরেছি, অল্প আহারে ওজন হ্রাস পায়। এটি আমাদের জন্য নতুন শিক্ষা ছিল। আমি সেই নির্দেশনাপত্রটি পড়েছিলাম, যাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, আহারের সময় আমাদের বিবেকই সিদ্ধান্ত দেয়, আমরা কী পরিমাণ খেয়েছি। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করুন।

মানুষের মাথা সোজা নাকি বাঁকা, তার ফায়সালা চোখ করতে পারে না। এর সিদ্ধান্ত করে বিবেক। আমাদের কানে একটি প্রণালী রয়েছে, যাতে তারল্য থাকে। এ তারল্য নিজের স্তর নিয়ন্ত্রণ করে। এই স্তরের সিগন্যাল যখন মগজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন মস্তিষ্ক অনুভব করে, মাথাটা এখন সোজা আছে, নাকি বাঁকা। এমনিভাবে পেট ভরে যাওয়ার অনুভবও মস্তিষ্কই করে থাকে। এ ব্যাপারে মস্তিষ্ক দুই প্রকারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

১. মানুষের পেটের বহিরাংশের চামড়ার ভেতরে Transpucer ফিট করা থাকে। এটা উত্তোলনকারী বস্তুর মতো ফিট করা থাকে। মানুষ যখন আহার করে এবং পাকস্থলি একটু বিস্তৃত থাকে, তখন সে নিজেই একটু দীর্ঘ হয়ে অনুমান করে যে, কী পরিমাণ খাবার অভ্যন্তরে গেছে। তবে এটা ধীর গতির হয়ে থাকে। এটা তার সাংকেতিক বার্তা মগজ পর্যন্ত পৌঁছতে ৭-১০ মিনিট সময় লাগে। অর্থাৎ এ নির্দিষ্ট সময় পর মস্তিষ্ককে বলে দেয়, এখন পেট ভরে গেছে।

২. মানুষের খাবারে পেট ভরে যাওয়ার দ্বিতীয় সিগন্যাল হচ্ছে মুখ। মুখ একটি দ্রুত কার্যকরি ইউনিট। সে ইউনিট যত দ্রুত কাজ করে, তাও মস্তিষ্কে পৌঁছে থাকে। এ দুটি সংকেত দেখে মস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত নেয়, এখন পেট ভরে গেছে। এবার চিন্তা করুন, আমরা খাওয়ার সময় কী-কী করে থাকি?

আমরা দুই মিনিটের মধ্যেই দুটি রুটি, পানি, চা, পানীয় ইত্যাদি খেয়ে ফেলি। তখনও পেটের সিগন্যাল মস্তিষ্কে পৌঁছেনি। আমরা সীমাতিরিক্ত খেয়ে ফেলি। সুতরাং ওই সিগন্যালের পূর্বে যখন খাবারের সিগন্যালই পৌঁছে যায়, তখন আমরা বলি, আজ বেশি খেয়ে ফেলছি।

উল্লিখিত সিগন্যালগুলোর ব্যাপারে একটা বাস্তব প্রমাণ দেখুন। মনে করুন, আপনি খাবার খাচ্ছেন। অর্ধেক রুটি খাওয়ার পর আপনার একটি আন্তর্জাতিক ফোন এল। এখন আপনি খাবার রেখে ফোনে কথা বলতে শুরু

করলেন। পাঁচ-সাত মিনিট কথা বলার পর দেখবেন, আপনার ক্ষুধা মরে গেছে। ভাই! ক্ষুধা হ্রাস পায়নি; বরং এতক্ষণ পেটের সাংকেতিক চিহ্ন মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আর মস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, এখন এ-পরিমাণ খাবারই যথেষ্ট।

স্লিমিং ক্লাবে (স্বাস্থ্যনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে) যাওয়ার প্রয়োজন নেই

রমযান মাসে দিনে রোযা রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের আহারে হ্রাস করা। ভালো দেহে খাবার কমালে কী হবে? যখন পাকস্থলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার সংগ্রহ হবে না। তখন পাকস্থলি দেহের চর্বিসমূহ সুগারে পরিণত করে ব্যবহার করতে থাকে। এটা এক প্রকার Steroids যা শরীরের মধ্যে Generate সৃষ্টি হয় এবং তা মানবদেহের চর্বিকে সুগার বানিয়ে দেয়। পরে তা শরীরে ব্যবহার হতে থাকে। এজন্য মানুষ ক্ষুধার্ত থাকলে তার চর্বি বিগলিত হয়ে দৈহিক অবয়ব স্মাট অপরূপ হয়। এজন্য যেসমস্ত লোক স্বাস্থ্যনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে যাওয়ার পরও স্বাস্থ্যের অবনতি না হয়, তাদের জন্য উচিত, তারা যেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আমল করে। অর্থাৎ রোযা রাখে। ফলে তার আর ব্যায়ামাগারে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না; বরং তার শরীরের চর্বি এমনিতেই শুকিয়ে যাবে।

তারাবির নামাযে দৈহিক উপকার

প্রথম কথা হলো, রমযান মাসে সারাদিন রোযা রাখবে। দ্বিতীয় কথা হলো, রাতে তারাবির নামায আদায় করবে। এখন প্রশ্ন জাগে, তারাবির নামাযে আত্মিক কল্যাণ রয়েছে বটে; তবে এর দৈহিক উপকার কী?

বন্ধুগণ! তারাবির নামাযে আত্মার অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। তৎসঙ্গে দৈহিক উপকারও রয়েছে অনেক।

১. ইবাদাতের সাথে শারীরিক ব্যায়ামও রয়েছে

নামায এক ধরনের ব্যায়াম। আজ থেকে দশ বছর পূর্বে ডাক্তারগণ সকালে পায়চারি করার পরামর্শ দিতেন। পরে জানা গেল, সাধারণ পায়চারি করলে বার্ধক্যে পায়ে ফোসকা, পানি ইত্যাদি দেখা দেয়। সুতরাং ডাক্তারগণ বলেন, আস্তে-আস্তে একটু দ্রুতগতিতে চলা চাই। বিশেষজ্ঞদের মতে দ্রুত চলা মানবদেহের জন্য অতিশয় উপকারী।

আল্লাহ তা'আলা কুদরত দেখুন। সামান্য দ্রুত চলা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। হাদীছ শরীফে এসেছে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে চলতেন যেমন কোনো উঁচু স্থান থেকে নিচু স্থানে দ্রুত অবতরণ করছেন। এটা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগ পরিশেষে ধাক্কা খেয়ে পার্থিব কল্যাণের ক্ষেত্রে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে সমর্থন করছে।

তারপর বিশেষজ্ঞরা বলেন, দৈনিক একবার দ্রুত বেগে পায়চারি করা পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ নয়। এখন প্রশ্ন জাগে, যদি শুধু Brisk walk ই করতে হয়, তাহলে কাজকর্ম কখন করবে? তারা বলেন, মানুষ এ পরিমাণ ব্যায়াম করবে, যার দরুন তার হার্টের হৃদয়ের খণ্ডাংশ সতেজ হয় এবং মানবদেহে যে তরল পদার্থ রক্তের মতো সঞ্চালিত হয়, তার গতি বৃদ্ধি পায়। ফলে তার শিরা-উপশিরাগুলো পরিষ্কার হবে। তারা বলেন, দৈনিক কয়েকবার ব্যায়াম করা চাই। যদিও স্বল্প সময় হয়। বন্ধুগণ! ভেবে দেখুন, যদি ওই সমস্ত লোক দৈনিক পাঁচবার নামায আদায় করত, তাহলে তার অন্য কোনো ব্যায়ামের প্রয়োজন হতো না।

আমার এক বন্ধু জাপান গিয়েছিলেন। সেথায় একস্থানে কোম্পানির মালিক সমিতির বৈঠক ছিল। তিনি বলেন, আমিও সেই বৈঠকে অংশগ্রহণ করলাম। প্রায় ৮-১০ ঘন্টার বৈঠক ছিল। তখন আমি দেখলাম, তারা ঘন্টাকয়েক পরপরই নিজের চেয়ারের সঙ্গে হেলেদুলে ব্যায়াম করছেন। কেউ আগে-পিছে হেলাদুলা করছে। কেউ দাঁড়িয়ে হাতের মাধ্যমে হালকা ব্যায়াম করছে; আবার বসছে। এ বৈঠকের সময় তারা তিনবার এরকম ব্যায়াম করছে। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা এমন করছেন কেন? সে বলল, আমাদের ডাক্তারগণ বলেছেন, দৈনিক একবার নয়; বরং হালকা-হালকা কয়েকবার ব্যায়াম করলে শরীরের অনেক উপকার হয়।

একথা শুনে আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দাগণ! কিছুক্ষণ পরপর তোমরা যে-ব্যায়াম করছ, এর পরিবর্তে তোমরা যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর, তাহলে তোমাদের সেই ব্যায়াম অটোমেটিক পালন হয়ে যাবে।

বন্ধুগণ! এবার ভেবে দেখুন, একজন মুমিন বান্দা আল্লাহর নির্দেশ মনে করে আমল করে আর বিনামূল্যে তার দৈহিক উপকার অর্জিত হয়ে যায়। এমনকি কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি যে পাহাড়ে বাস করে, সে নামাযের মাধ্যমে

দৈহিক উপকার সম্পর্কে কিছুই জানে না। এমতাবস্থায়ও সে নামায পড়লে তার দৈহিক উপকার অর্জিত হয়। আফসোস! আমাদের যুবকরা নামাযের গুরুত্ব দেয় না। আর যারা নামাযের গুরুত্ব দেয়, তারা ছাওয়াবও পায়। সাথে-সাথে শারীরিক ব্যায়ামও হয়ে যায়।

২. স্থায়ী সৌন্দর্যের রহস্য

আমি একবার ওয়াশিংটনের Simthsonian Space Musium এক বিশাল জাদুঘরে গিয়েছিলাম। সেখানে এক ডাক্তারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাদের মুসলিম পোশাক দেখে আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে লাগলেন। বললেন, মুসলমানদের মধ্যে যারা অধিক ইবাদাতকারী হয়, তাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকে। আমি বললাম, জি। একেবারে পুণ্যবানদের জ্যোতি। তিনি বললেন, এই উজ্জ্বলতার বিশেষ কারণ রয়েছে। আমি বললাম, সেটা কী? তিনি বললেন, মানুষের হৃদয়ের ওপরে ও নিচে দুটি রক্তের কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে। এগুলো থেকে হৃৎপিণ্ডে রক্ত পৌঁছে থাকে। তন্মধ্যে ওপরের অংশ থেকে নিচের অংশের মাধ্যমে অতি সহজে পৌঁছে। ওপরের অংশের মাধ্যমে রক্ত পৌঁছা কঠিন হয়। এজন্যই মস্তিষ্কে যে-পরিমাণ Flooded Blood রক্ত প্রবাহের প্রয়োজন, তা পৌঁছে না। কিন্তু মুসলমানরা যখন নামাযে সেজদা করে তখন মাথা নিচের দিকে আর হৃদয় ওপর দিকে থাকে এর দ্বারা হৃদয়ের নিচের অংশ থেকে রক্ত অনায়াসে বহমান হয়ে মস্তিষ্ক, চেহারা, চামড়া ইত্যাদিতে বিস্তৃতি লাভ করে। তাই দীর্ঘ সেজদা করলে চেহারা রক্তিম হয়ে যায়। সুতরাং ওই রক্তের প্রবাহ প্রতিদিন চেহারায় বিরাজ করার দরুন সেজদাকারীদের চেহারা সর্বদা সজীবতায় ঝলমল করে।

বন্ধুগণ! তারপর আমি ভেবে দেখলাম, বিষয়টি সম্পূর্ণ সত্য। তাই বলি, মহিলারা যদি নামাযের এই রহস্য জানত, তাহলে ক্রীম ব্যবহার ত্যাগ করে নফল নামায পড়ত আর দীর্ঘ সেজদা করত। বাস্তবিকই আপনারা দেখে থাকবেন, যারা ইবাদাতগোজার হয়, তাদের চেহারায় নূর চমকাতে থাকে। নামাযের আত্মিক প্রভাব তো তার স্বস্থানে রয়েছেই। পাশাপাশি রক্তের সঠিক প্রবাহের মাধ্যমে চেহরাকে সুন্দর ও লাবণ্যময় করে।

৩. ডায়বেটিক নিয়ন্ত্রণ করার উপায়

বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, মানুষ সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময় তার সুগার লেভেল ডাউন থাকে। তাই রোগনির্ণয়

কেন্দ্রে কোলেস্টরল চেক করাতে হলে ডাক্তার বলে সকালে নিদ্রা থেকে ওঠে খাওয়ার আগে আসবেন। যেহেতু সকালে সুগার লেভেল হ্রাস থাকে, তাই আল্লাহপাক সকালে মাত্র চার রাকাত নামায নির্ধারণ করেছেন। এ সময় অধিক ব্যায়ামের প্রয়োজন নেই। নামাযের প্রথম কেরাত দীর্ঘ হলেও নামায মাত্র চার রাকাত। তারপর দুপুরে যখন আমরা মাশাআল্লাহ পেটপুরে আহার করি, তখন সুগার লেভেল ওপরে উঠে যায়। তাই বারো রাকাত নামায নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ, এ সময় দীর্ঘ ব্যায়াম করলে তোমার সুগার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

তারপর যোহরে দীর্ঘ নামাযের মাধ্যমে যখন তোমার সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণ চলে আসে, তখন আছরের সময় চার রাকাত ইচ্ছাধীন করে দিয়েছেন। না পড়লে কোনো দোষ নেই। আর অবশিষ্ট চার রাকাত ফরজ করেছেন।

তারপর সম্ভাবনা রয়েছে, আছরের নামাযের পর কেউ অধিক ক্ষুধার দরুন নাস্তা করেছে বা আইসক্রীম খেয়েছে, যার দরুন তার সুগার পুনরায় উত্তেজিত হয়েছে। তাই মাগরিবের নামায সাত রাকাত করেছেন।

সাধারণত মাগরিবের পর রাতে খাবার খাওয়া হয়। সুতরাং মাগরিবের পর যখন আমরা ভারী খাবার খেয়ে থাকি, তখন সুগার লেভেল আবার হাই হয়ে যায়। এখন আর সাত রাকাত কার্যকর হবে না। তাই সতেরো রাকাত নির্ধারণ করেছেন। এখন প্রশ্ন হয়, দুপুরের খাবারে পর বারো রাকাতে কাজ হয়। তবে রাতের খাবারের পর সতেরো রাকাত কেন? এর উত্তর হলো যোহরের নামাযের পর তোমরা আবার কর্মে লিপ্ত হবে। এতে সুগার আরও ডাউন হবে। তাই সেখানে বারো রাকাতের ব্যায়ামই যথেষ্ট। কিন্তু ঈশার নামাযের পর এখন শোওয়ার পালা। তাই ব্যায়াম দীর্ঘ হওয়া উচিত। সুতরাং সতেরো রাকাত করা হয়েছে।

বন্ধুগণ! আল্লাহপাকের প্রজ্ঞা দেখুন। রমযান মাসে মানুষ সারাদিন উপবাস থেকে ইফতারের সময় অধিক ক্ষুধার কারণে অধিক আহার করে। দুধ, ডিম, কলা, জুস ইত্যাদি খেয়ে থাকে। এতে তার সুগার একেবারে হাই হয়ে যায়। তাই আল্লাহপাক বলেন, এখন তোমাদের সুগার নিয়ন্ত্রণে আছে; সতেরো রাকাতের ব্যায়ামে হবে না। সুতরাং আরও বিশ রাকাত তারাবির নামাযও আদায় করতে হবে; তাহলে তোমাদের দেহ সঠিক উপকার লাভ করবে।

মহান আল্লাহ কত দয়াময়! তিনি তার উপসনাও এভাবে নির্ধারণ করেছেন যে, তাতে মানুষ আত্মিক উপকারিতার পাশাপাশি দৈহিক উপকারিতাও পেয়ে থাকে। কোনো মানুষ ভ্রমণে বের হলে যখন তাতে Exercise কষ্ট হতে থাকে, তখন আল্লাহপাক অনুগ্রহ করে বলেন, তোমাদের এ দুষ্কর সময়ে আমার ফরজ দায়িত্ব আমি তোমাদের ওপর অর্ধেক করে দিলাম। আর নফল ইবাদাতগুলো আমি রহিত করে দিলাম।

পবিত্র রমযান মাসের জন্য পূর্ব থেকে প্ল্যান করা জরুরি

পবিত্র রমযান মাস আসন্ন। এতে আমাদের জন্য আত্মিক ও দৈহিক কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। সুতরাং রমযানের জন্য আমরা পূর্বে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া উচিৎ। মহৎ ব্যক্তিগণ পূর্বে থেকে প্রত্যেক জিনিসের প্ল্যান করেন। তাই বলা হয়- Well plan half done 'সুন্দর প্ল্যান অর্ধেক কার্য সম্পাদিত হওয়ার নামান্তর।'

বর্তমানে তো বিয়ের প্ল্যানিং এক বছর পূর্বে থেকেই করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্ল্যানিংও অনেক পূর্ব থেকে করা হয়। সুতরাং রমযান মাসের জন্যও আমরা পূর্ব থেকে প্ল্যানিং করা দরকার, আমরা রমযান মাস কীভাবে অতিবাহিত করব। ভাই! রমযানের প্ল্যানিং করতে কোনো প্রকার প্রশিক্ষণ দিতে হয় না যে, এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে আর দিন চলে যাবে। রমযানের Planing প্রস্তুতি হচ্ছে পূর্ব থেকে তোমরা ব্যস্ততাসমূহ কমাতে থাক, যাতে রমযানে মাসে তুমি নিজেকে Light হালকা বা দায়িত্বমুক্ত রাখতে পার।

পরিবারে কোনো বিয়ে-শাদী আয়োজন হলে এক মাস আগে থেকে মানুষ নিজেকে বিয়ের সময়ে দায়িত্বমুক্ত রাখার চেষ্টা করে, যাতে সে বিয়ের আনন্দ পূর্ণরূপে ভোগ করতে পারে। বিয়ের আনন্দ ভোগের জন্য যেভাবে মানুষ নিজেকে দায়িত্বমুক্ত রাখতে চেষ্টা করে, তেমনি আমরাও আল্লাহপাকের ক্ষমায় পরিপূর্ণ অংশ নেওয়ার জন্য, নিজের গোনাহ মাফ করানোর জন্য, নিজের মালিককে সন্তুষ্ট করার জন্য পবিত্র রমযান মাসে দায়িত্বমুক্তির Lihgt Planing করব। আর রমযান মাসে শুধু রমযানেরই কাজ করব। পৃথিবীতে এ-ধরনের কত কাজ হয়, যা মানুষ নিজেই করে। সুতরাং আমাদের উচিৎ আমাদের ভ্রমণ, মিটিং অন্যান্য কাজের প্ল্যান করে নিজেকে Light weihgt দায়িত্বমুক্ত রাখার চেষ্টা করব। আমরা যখন Mentally গবেষণার দিক থেকে মুক্ত থাকব, তখন নিষ্ঠার সাথে নামায-তারাবিহ ইত্যাদি আদায় করতে

পারব। তারপর এ প্রশ্নই আসবে না যে, আমাকে অমুক মিটিংয়ে যেতে হবে বা অমুক কাজ করতে হবে। তাই রমযানের জন্য পূর্ব থেকে প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমত, এ প্রস্তুতি যে, আমরা নিজেকে হালকা রাখব।

দ্বিতীয়ত, আমরা নিজেকে রমযান মাসে নিষ্ঠার সাথে গুরুত্বসহকারে রোযার প্রতি এগজস্ট করার জন্য Mentally ভাবনা তৈরি করতে হবে। মানুষের অন্তরে একটি ভয় বিরাজ করে যে, রোযা রাখলে আমি দুর্বল হয়ে যাই কি-না। আমি কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় আমাদের এক সাথী ছিল। তার দেহ অত্যন্ত ভারী ছিল। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তার ওজন ১৫০ কেজি হয়েছিল। অথচ সে রোযা রাখত না। একদা আমি জিজ্ঞাসা করলাম, দোস্ত! তুমি রোযা রাখছ না কেন? সে বলল, আমার আম্মু বলেছেন রোযা রাখলে আমি দুর্বল হয়ে যাব।

তাই বন্ধুগণ! নিজের বিবেককে এভাবে প্রস্তুত করো যে, এক মাস রোযা রাখলে, কম খেলে আমার দেহের কোনো সমস্যা হবে না। আমাদের দেহের প্রয়োজন স্বল্প অথচ আমরা বেশি খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে যাই। ডাক্তারগণ বলেন, যদি কোনো মানুষ মাত্র তিনটি খেজুর খায়, তাহলে এতে তার এ পরিমাণ উপকরণ অর্জিত হয় যে, তিন দিনের মধ্যে তার ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যু আসতে পারে না। মাত্র তিনটি খেজুরের মধ্যে এ পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ রয়েছে।

আমরা যে-পরিমাণ আহারে অভ্যস্ত, রমযান মাসে এর চেয়ে কিছু কমনোর চেষ্টা করব। এত বেশিও খাব না যে, ফজরের নামাযেই টক ঢেঁকুর আসতে শুরু করে। আবার এমনও যেন না হয় যে, একেবারে না খেয়েই থাকে।

বন্ধুগণ! যারা রাতের খাবার এ-পরিমাণ খেয়ে থাকে যে, সেহরির সময় জাগ্রত হওয়া তাদের জন্য দুষ্কর হয়, তারা বলে, চলো যা খাবার রাতেই খেয়ে নিই। সুতরাং তারা রাতের খাবার খেয়েই রোযার নিয়ত করে নেয়। এটা ভুল নিয়ম। পবিত্র রমযানকে নিজের জীবনের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ো না; বরং রমযান মাসের নিয়মে জীবন গড়ার চেষ্টা করো। সাহরি খাওয়া স্বতন্ত্র ইবাদাত। তাহাজ্জুদের সময় নফল নামায বেশি পরিমাণে আদায় করো। এটাও আলাদা ইবাদাত।

শবে কদর পাওয়ার সহজ পদ্ধতি

সর্বশেষ একটি সূক্ষ্ম বিষয় আলোচনা করছি। আল্লাহপাক অসীম দয়াবান। তিনি রমযান মাসে 'শবে কদর' নামে একটি রাত রেখেছেন যে, এ-রাতের ইবাদাতের ছাওয়াব এক হাজার মাসের চেয়ে বেশি। সেই রাতের সন্ধানে এতেকাফে বসা হয়। তাই যদি কেউ শবে কদরের ছাওয়াব পেতে চায়, তাহলে তা পাওয়া অতি সহজ। সব মানুষের অন্তরে এ রাত পাওয়ার প্রবল আগ্রহ থাকে। আমরাও এর ছাওয়াব পেতে পারি। তবে কীভাবে?

এর জন্য একটি সূক্ষ্ম বিষয় শুনুন। এটি অত্যন্ত কার্যকরি রহস্য। জানি না কতজন খোদাপ্রেমিক সান্নিধ্য অর্জনের পর এ রহস্য লাভ করেছি।

কুরআন শরীফে আল্লাহপাক বলেন–

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝

'শবে কদর এমন একটি রাত, যার ইবাদাত এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।'[১৩৩]

আরও বলেন–

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝ سَلٰمٌ ۛ

'সেই রাতে ফেরেশতারা ও জিবরাঈল আল্লাহপাকের আদেশে প্রত্যেক কর্মে অবতরণ করেন। সেই রাতে আল্লাহর রহমত, বরকত ও প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। সেই প্রশান্তি ও বরকত কখন নেমে আসে?[১৩৪]

কোন রাতে কটা বাজে তা আসতে পারে সে সম্পর্কে কেউ অবগত নয়। তবে আল্লাহপাক একটি ঘোষণা দিয়েছেন–

حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

'সেই বরকত ওই রাতে সুবহে সাদেক উদিত হওয়া পর্যন্ত বর্ষিত হতে থাকে।'[১৩৫]

এর দ্বারা একটি সূক্ষ্মতা পাওয়া যে, যে-সময়ই শবে কদর হবে আর তার বরকত যখন থেকে শুরু হবে, তখন থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত সেই বরকত বর্ষণ হতে থাকবে। সুতরাং আমাদের মতো দুর্বল মানুষ সারারাত জেগে

---

১৩৩. সূরা কাদর : আয়াত ৩
১৩৪. সূরা কাদর : আয়াত ৪
১৩৫. সূরা কাদর : আয়াত ৫

ইবাদাত করা অসম্ভব। তাই যখন রোযা রাখার জন্য সাহরির সময় জাগ্রত হব, তখন যদি তাহাজ্জুদের কয়েক রাকাত নফল নামায আদায় করি, তাহলে অবশ্যই আমরা শবে কদরের ইবাদাতের ছাওয়াবের অধিকারী হব। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে রমযান মাসে বেশি-বেশি ইবাদাত করার তাওফীক দান করুন এবং এ মাসকে আমাদের জন্য কল্যাণকর বানিয়ে আমদের সকল হতাশা দূর করুন। আমীন।

[খুতুবাতে যুলফিকার একাদশ খণ্ড সমাপ্ত]

খুতুবাতে যুলফিকার

খণ্ড-১২

আল্লাহ্ তা'আলার যথাযথ মূল্যায়ন

'আল্লাহর তা'আলা এমন মূল্যায়নকারী যে, তাঁর বান্দারা নগণ্য কোনো আমল করলেও তিনি তা গ্রহণ করেন। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের সাধারণ নিয়ম হলো, তাদের কাছে সামান্য উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হলে তাকে তারা অবমূল্যায়ন করেন। কারণ, সম্রাস্তের কাছে মূল্যবান উপঢৌকন নিয়েই যেতে হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহপাক এমন দয়াবান মালিক যে, তিনি বলেন–

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

'যে বান্দা অনুকণা পরিমাণ নেক আমল করবে, আল্লাহপাক কেয়ামতের দিন সেই আমলেরও প্রতিদান দেবেন।'[১৩৬]

কুরআন শরীফে একটি নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে–

اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى

'তোমাদের নারী ও পুরুষ কারও কৃত আমল আমি নষ্ট করব না।"

---

১৩৬. সূরা যিলযাল : আয়াত ৭

আল্লাহ্ তা'আলার যথাযথ মূল্যায়ন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ.

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

আল্লাহর অসংখ্য গুণ আছে। সারা পৃথিবীর গাছপালাকে যদি কলম বানানো হয় এবং সমুদ্রের পানি কালি বানিয়ে আল্লাহর গুণকীর্তন লিপিবদ্ধ করা হয়, তবে এক সময় কলমসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে, সমুদ্রের সমস্ত পানি শেষ হয়ে যাবে, তবু আল্লাহপাকের স্তুতি লেখা শেষ হবে না।

মূল্যায়ন করা কাকে বলে?

আল্লাহপাকের গুণসমূহের মধ্যে একটি গুণ হলো যথাযথ মূল্যায়নকারী। যথাযথ মূল্যায়ন কাকে বলে? অন্যের ওপর প্রাধান্য দিয়ে ভালোবাসার কারণে এ পরিমাণ দয়াবান হওয়া যে, তার কোনো আমল প্রত্যাখ্যান না করা এবং তার চাওয়া-পাওয়া থেকে বেড়ে তার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করাকে যথাযথ মূল্যায়ন বলে।

একটি বিপদ বনাম দুটি উদারতা

আল্লাহপাক তাঁর কোনো বান্দাকে বিপদের সম্মুখিন করলে এরপর তাকে তার পূর্বের অবস্থার চেয়ে দ্বিগুণ প্রসারতা দান করেন। আল্লাহপাক বলেন–

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

'নিশ্চয় প্রত্যেক সঙ্কীর্ণতার পর সাচ্ছন্দ আসে। অবশ্য প্রত্যেক সংকটের পর প্রশস্ততা আসে।'[১৩৭]

---

১৩৭. সূরা আলাম নাশরাহ : আয়াত ৫, ৬

যেহেতু একই বাক্য দুবার বলা হয়েছে, তাই মুফাসিসরীনে কেরাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যেকোনো প্রকার বিপদ বা সংকট এলে বান্দা যদি এর ওপর সত্যিকারার্থে ধৈর্যধারণ করে, তাহলে সেই সংকটের পর আল্লাহপাক তাকে দ্বিগুণ প্রসারতা দান করেন।

এ বিষয়টিকে কোনো কবি বলেন–

إذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح • فعسر بين يسرين اذا فكرته فافرح

'যখন তোমার ওপর কঠিন কোনো বিপদ আসে, তখন সূরা আলাম নাশরাহে চিন্তা করো। দেখো একটি সংকীর্ণতা রয়েছে দুটি প্রশস্ততার মধ্যে। সুতরাং যখন তুমি গবেষণা করবে, তখন তোমার বিপদ কেটে যাবে আর তুমি খুশি হয়ে যাবে।

আল্লাহপাকের কাছে আমলের মূল্যায়ন

আল্লাহর তা'আলা এমন মূল্যায়নকারী যে, তাঁর বান্দারা নগণ্য কোনো আমল করলেও তিনি তা গ্রহণ করেন। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের সাধারণ নিয়ম হলো, তাদের কাছে সামান্য উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হলে তাকে তারা অবমূল্যায়ন করেন। কারণ, সম্রাস্তের কাছে মূল্যবান উপঢৌকন নিয়েই যেতে হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহপাক এমন দয়াবান মালিক যে, তিনি বলেন–

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

'যে বান্দা অনুকণা পরিমাণ নেক আমল করবে, আল্লাহপাক কেয়ামতের দিন সেই আমলেরও প্রতিদান দেবেন।'[১৩৮]

কুরআন শরীফে একটি নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে–

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ

'তোমাদের নারী ও পুরুষ কারও কৃত আমল আমি নষ্ট করব না।'[১৩৯]

এখন নিম্নের উদাহরণটি মনোযোগ দিয়ে শোন। অফিসের হিসাবরক্ষককে যদি কোনো জরুরি কাগজ প্রধান কর্মকর্তার সম্মুখে উপস্থিত করতে হয়, তখন সে এ কাগজটি নিজের হাতে কয়েকবার টাইপ করবে। প্রথমবার টাইপ করার পর শব্দের বানান ঠিক করবে; তারপর প্যারাগ্রাফি ঠিক

---

১৩৮. সূরা যিলযাল : আয়াত ৭

১৩৯. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯৫

করবে। তারপর সম্পূর্ণ ঠিক করে হাকিমের টেবিলে উপস্থিত করার পর হাকিম তাতে দস্তখত করবেন। পক্ষান্তরে যদি সে প্রথমবার টাইপ করার পরই হাকিমের টেবিলে দিয়ে দেয় আর বলে, জনাব এটা আমি নিজ হাতে টাইপ করেছি; এবার আপনি বানান ও প্যারাগ্রাফি ঠিক করে সাইন দিয়ে দিন, তাহলে কোনো হাকিম তাতে দস্তখত করবেন না।

বন্ধুগণ! যদি আল্লাহপাকের এ অবস্থা হতো যে, বান্দা আমল করার পর আল্লাহ এই বলে ফিরিয়ে দেন যে, বান্দা! যাও; তোমার আমল সংশোধন করে নিয়ে আসো। তাহলে আমাদের কী অবস্থা হতো? যদি কোনো ব্যক্তি নামায পড়তে দুনিয়ার বিভিন্ন ধান্দার মোহে পড়ে নামাযের রাকাতগুলোই ভুলে যায় যে, আমি কত নম্বর রাকাতে আছি, তাহলে বাদশাহী শিষ্টাচার হলো, তুমি শুরু থেকে পুনরায় নামায আদায় করো। কারণ, তুমি আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে এত উদাসীন হলে কেন? সুতরাং তোমার এ নামায গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাই নতুন করে আদায় করো। কিন্তু মহামহিম খোদা এমন আদেশ দেননি। যদি এমন নির্দেশ দিতেন, তবে আমাদের সারাদিনই নামায পড়তে হতো। কারণ, আমার জানা নেই, এমন ভুল ব্যতীত কজন নামায আদায় করতে পারে।

নামাযের রাকাতের সংখ্যা ভুলে গেলে শরীয়তের হুকুম হলো, তুমি চিন্তা করে যেকোনো একটা দিক ঠিক করে সেখান থেকে পরবর্তী নামায শেষ করো এবং শেষে সেজদায়ে সাহু আদায় করো; তোমার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। অথচ সে নামাযের রাকাতই ভুলে গিয়েছিল। যেব্যক্তি নামায পড়তে রাকাতের সংখ্যা ভুলে গেল, তার জন্য সহজ নির্দেশ ছিল নামায পুনরায় আদায় করা। কিন্তু এ সুরতে বান্দার কৃত আমল বিফলে যেত। তাই মহা মূল্যায়নকারী আল্লাহপাক বান্দার সেই মেহনতকে বিফলে যেতে দেননি। সুতরাং একটি নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, নামাযের ভুল যদি ওয়াজিব পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে শেষে সেজদায়ে সাহু আদায় করো; আমি তোমাদের নামায কবুল করে নেব।

নামাযের রাকাতে ভুল হওয়ার পর যদি কেউ নামায ভেঙে শুরু থেকে পুরনায় পড়তে চায়, তাহলে এটা শরীয়তের বিধানের ব্যতিক্রম। কেননা, নামায ভঙ্গ করা অপরাধ। এতে বান্দার কৃত আমল বিফলে যায়। সংশোধনের চেষ্টা করো, যাতে আগের আমল বিফলে না যায়। এ নির্দেশ কেন? কারণ, আল্লাহপাক মহা মূল্যায়নকারী।

কোনো বান্দার এমন অবস্থা হলো যে, কোনো শত্রু তাকে রাতের অমানিশায় কোনো নির্জন এলাকায় ফেলে এল, যেখানে কেবলার দিক নির্ণয় করার কোনো উপায় নেই। এমতাবস্থায় সে নামায পড়তে হলে শরীয়ত বলে, তুমি চিন্তা করে তোমার অন্তরের প্রবল ধারণানুযায়ী কেবলা ঠিক করে নামায আদায় করে নাও। তারপর দু-রাকাত আদায় করার পর যদি আকাশের মেঘাচ্ছন্ন অবস্থা দূরীভূত হয়ে চাঁদের বিকাশ ঘটে আর চাঁদ দেখে তোমার ধারণা হয়, কেবলা আমার একেবারে বিপরীত দিকে, তাহলে শরীয়ত একথা বলে না, তোমাকে পুনরায় শুরু থেকে নামায আদায় করতে হবে। বরং শরীয়ত বলে, কেবলা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তুমি নামাযে থেকে কেবলার দিকে ফিরে বাকি দু-রাকাত আদায় করো। তোমার পূর্ণ নামায আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহপাক তোমার নামায কবুল করে নেবেন। এটা যথাযথ মূল্যায়ন বই আর কী হতে পারে?

সত্য খোদার সত্য ওয়াদা

আল্লাহপাকের একটি অনুপম নীতি হলো, বান্দা তার পরিশ্রমের প্রতিদান অবশ্যই পায়। দুনিয়ার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অধীন লোকেরা তাদের কাজ করে। ধনীরা তাদের কাছ থেকে কাজ নেয়। তবে তাদের প্রাপ্য সঠিকভাবে আদায় করে না। অথচ আল্লাহপাক শ্রমিকের মজুরি সঙ্গে-সঙ্গে আদায় করা চান। শরীয়তের মাসয়ালা হলো, শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার পরিশ্রমিক দিয়ে দাও।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, শ্রমিকের পারিশ্রমিককে যেহেতু আল্লাহপাক এত গুরুত্ব দেন যে, তাদের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বে তাদের মজুরি দিয়ে দাও, তাহলে যে বান্দা আল্লাহপাকের জন্য পরিশ্রম করে, তাঁর দীনের কাজ করে আর পারিশ্রমিকদাতা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং আল্লাহপাক কী পরিমাণ দ্রুত তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে থাকেন? দুনিয়ার মালিকদের তো অনেক সময় টাকা-পয়সার সমস্যা হতে পারে। আল্লাহপাক তো এমনও নন। আল্লাহ হচ্ছেন–

وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

'আসমান ও জমিনের ধনভান্ডার আল্লাহরই কাছে।'[১৪০]

---

১৪০. সূরা মুনাফিকূন : আয়াত ৭

বন্ধুগণ! কেয়ামতের দিন কোনো বান্দা এমন পাওয়া যাবে না। যে বলতে পারবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমল করেছি; অথচ তার প্রতিদান আমি পাইনি। দুনিয়ার কোনো-কোনো সম্ভ্রান্ত মালিকরা তাঁদের শ্রমিকের মজুরি ১০০ টাকার পরিবর্তে ১১০ টাকা দিয়ে থাকেন, যাতে পরবর্তী কালে শ্রমিক কোনো কিছু না বলতে পারে। কারণ, শ্রমিকের মজুরি কম দিলে শ্রমিক তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে থাকবে। এতে তাদের মানহানি হবে।

পরিতাপের বিষয় হলো, দুনিয়ার মালিকরা যদি তাদের পেছনে কুৎসা রটাবার ভয়ে শ্রমিকের মজুরি প্রাপ্যাধিক দিতে পারে, তাহলে আল্লাহপাক কীভাবে মানুষকে এ সুযোগ দিতে পারেন যে, কেয়ামতের দিন সে দাঁড়িয়ে বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাজ করেছিলাম। কিন্তু তার পারিশ্রমিক আমি পাইনি। তা কস্মিনকালেও হতে পারে না। সত্য হলো, আল্লাহপাক বান্দার পরিশ্রমের বিনিময় তার চাওয়া-পাওয়ার থেকেও বেশি দিয়ে থাকেন। এটাই হালো সত্য খোদার সত্য ওয়াদা। আল্লাহপাক বলেন, আমি তোমাদের নারী-পুরুষ কারও আমল নষ্ট করব না। বিফল যেতে দেব না। এটা মহা উৎসাহ প্রদানের বিষয় যে, আল্লাহপাক এত মূল্যায়নকারী।

যদি কোনো ছাত্র হস্তলিপি শিক্ষা করে আর একটি অক্ষর ভুল লেখার পর ওস্তাদ বলেন, আবার লেখো, এটা কেটে আবার লেখো, তাহলে এটা হবে ওস্তাদের নম্র আচরণ। এভাবে যদি দু-তিনটা অক্ষর ভুল হয় আর শিক্ষক সুন্দর লিপিকার হন, তাহলে বলবেন, ভাই পুনরায় লেখো। কিন্তু যদি ওই শিক্ষক তার ছাত্রের ভুল নিজেই বারবার ঠিক করে লিখে দেন এবং বলেন, তুমি যা লিখেছ সবকিছু আমি গ্রহণ করলাম। তাহলে এ শিক্ষক হবেন ছাত্রের ওপর অতি দয়াবান। কেননা, তিনি তার ছাত্রর কাজ বিফল যেতে দেননি। তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলাও আমাদের জন্য অতিশয় দয়ালু তিনি আমাদের টুটাফাটা আমলকে বিফল যেতে দেননি।

আল্লাহ তা'আলার যথাযথ মূল্যায়নের উদাহরণসমূহ

আল্লাহপাক যথাযথ মূল্যায়নকারী। এর কিছু উদাহরণ শুনুন–

সায়্যেদুনা হযরত আইয়ুব (আ.)-এর ওপর আল্লাহপাকের দয়া ও অনুগ্রহ। হযরত আইয়ুব (আ.) সার্বক্ষণিক আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। তা দেখে মিস্টার ইবলিছ আল্লাহ তা'আলাকে বলল, হে আল্লাহ! তার কাছে সর্বপ্রকার নেয়ামত বিদ্যমান থাকার কারণে সে সার্বক্ষণিক আপনার ইবাদাতে

মগ্ন থাকে। তার কাছে ঘরবাড়ি, স্ত্রী-সন্তান, বাগবাগিচা সবই আছে। এতসব নেয়ামত থাকতে সে আপনার ইবাদাত করবে না, তাহলে কী করবে? আল্লাহপাক বললেন, ঠিক আছে আমি পরীক্ষা করছি। আগুন লেগে ঘরবাড়ি পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। স্ত্রী-পুত্র সবাই মরে গেল। বাগানের তলদেশের নির্ঝরিনি বন্ধ করে দিলেন। সেগুলো দেখতে-দেখতে বিরান হয়ে গেল। স্বয়ং আইয়ুব (আ.)-এর গায়ে কঠিন ব্যাধি আক্রমণ করল, যার বিস্তারিত আলোচনা কুরআনে রয়েছে। তদুপরি হযরত আইয়ুব (আ.)-এর জবানে আল্লাহপাকের যিকির জারি রইল। সুবহানাল্লাহ!

একদিন কেউ দেখল, তার জিহ্বা নড়াচড়া করছে। সামান্য অগ্রসর হয়ে সে কান পেতে শুনল, তিনি বলছেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে অবস্থায় রাখেন, তাতে আমার আপত্তি নেই। তবে এই আশা রাখি যে, আমার জিহ্বাটা সুস্থ থাকবে; তাহলে শেষ মুহূর্তে আপনার নাম জপ করে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে পারব। সুবহানাল্লাহ!

যখন তার পরীক্ষা নেওয়া শেষ হলো, তখন আল্লাহপাক তার ব্যাপারে দুটি কাজ করলেন।

এক. আল্লাহ তা'আলা হযরত আইয়ুব (আ.)-এর প্রশংসা করলেন। তা-ও একেবারে যথাযথ প্রশংসা। আল্লাহপাক বলেন–

إِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۚ إِنَّهٗٓ أَوَّابٌ ۝

'আমি তাকে ধৈর্যধারণকারী পেয়েছি। সে আমার কতই-না উত্তম বান্দা। সে আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।'[১৪১]

এই শব্দগুলোকে আল্লাহপাক কুরআন মাজীদের অংশ বানিয়েছেন। জান্নাতে কুরআন তেলাওয়াতের সময় সেখানেও হযরত আইয়ুব (আ.)-এর স্তুতি গাওয়া হবে, যেন একটি ধ্বংসাত্মক পরীক্ষায় চিরস্থায়ী পুরস্কার দান করেছেন।

দুই. আল্লাহপাক তাকে সুস্থতা দান করলেন, তার বাড়িঘর, স্ত্রী-সন্তান, বাগবাগিচা সবকিছু শুধু ফিরিয়েই দেননি; বরং তাঁর অপার কৃপার সবগুলোর ডাবল দিলেন। যেমন– আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ أَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

১৪১. সূরা সাদ : আয়াত ৪৪

'এবং আমি তাকে তার পরিবারবর্গ দিয়েছি এবং অতিরিক্ত তাদের সমপরিমাণ দিয়েছি আমার রহমত। আর বিবেকবানদের জন্য স্মরণীয় করে দিয়েছি।'[১৪২]

আমার পক্ষ থেকে এটা রহমত ছিল এবং বিবেকবানদের জন্য একে বানিয়েছি নিদর্শনস্বরূপ। আমি যদি কাউকে পরীক্ষা নিই আর সে ধৈর্যের সাথে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করে, তাহলে আমি তাকে তার কল্পনার বাইরে কল্যাণ দিয়ে থাকি। যেমন– পিতা তার সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শাসিয়ে থাকে। উদ্দেশ্য হয় প্রশিক্ষণ দেওয়া। কিন্তু মূলত সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ অসীম থাকে। তাই কিছুক্ষণ পর আবার আদর করে ডেকে নিয়ে আইসক্রীম দেয়। আল্লাহর ব্যবহার এর চেয়ে বহুগুণ বেশি দয়াদ্র হয়।

আমার ছোট বেলায় ঘরের বড় ব্যক্তিবর্গগণ কোনো কিছু আনার জন্য আমাকে মহল্লার একটি বৃদ্ধ লোকের দোকানে পাঠাতেন। আমি সেই দোকানে গেলে বৃদ্ধ লোকটি টাকার বিনিময়ে আমার ঘরের প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করতেন। অতিরিক্ত আমাকে ১-২টি বিস্কুট দিয়ে বলতেন, মিয়া এটা খাও।

আম্মুকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আম্মাজান ওই লোকটি আমাকে বিস্কুট দেয় কেন? আম্মু বললেন, বাবা! ওই লোকটি তোমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেজন্য তিনি তোমাকে নিজের সন্তানের মতো মনে করেন। তাই আমাদের ঘরের প্রয়োজনীয় বস্তু দেওয়ার পর তোমার প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করত তোমাকে বিস্কুট দেন। বন্ধুগণ! ঠিক তেমনি মনে করুন, আল্লাহপাক কোনো বান্দাকে পরীক্ষা করলে অথবা কোনো বান্দা আল্লাহপাকের জন্য ত্যাগ স্বীকার করলে আল্লাহপাক ওই বান্দার সাথে তার চাহিদার অতিরিক্ত দয়া ও অনুগ্রহমূলক ব্যবহার করেন।

হযরত আছিয়া ও তাঁর গৃহপরিচারিকার প্রতি অনুগ্রহ

ফেরাউনের ঘরে এক গৃহপারিচারিকা ছিল, সে তার স্ত্রী ও কন্যাদের সাজসজ্জা করাবে। মনে করুন, সেই মহিলা একজন হেয়ার ড্রেসার ছিল। একদিন ফেরাউনের মেয়ের চুল আঁচড়ানোর সময় তার হাত থেকে চিরুনি পড়ে গেলে সে আল্লাহর নাম মুখে উচ্চারণ করে চিরুনি উঠাল। ফেরাউনের মেয়ে একথা শুনে বলল, কী! তুমি মূসার খোদার নাম নিচ্ছ? তুমি কী মূসার

---

১৪২. সূরা সাদ : আয়াত ৪৩

খোদাকে মান? বিষয়টা যখন জানাজানি হয়ে গেল, তখন মহিলা আর মিথ্যা বলতে পারল না। সে বলে দিল, হ্যাঁ, আমি মূসার খোদাকে মানি। ফেরাউনের মেয়ে বলল, ঠিক আছে; আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি। সে গিয়ে তার পিতাকে বলল, বাবা! আপনার গৃহকর্মী, যার কোনো মূল্য নেই সে মূসার খোদাকে মান্য করে। এখন তোমার খোদায়ি কোথায় গেল? একথা শুনে ফেরাউন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বলল, ঠিক আছে; আমি এক্ষুনি তাকে উচিত শিক্ষা দিচ্ছি।

ফেরাউন মন্ত্রিসভা ডেকে মহিলাকে উপস্থিত করে বলল, তোমার দাবি থেকে এই মুহূর্তে ফিরে আস; অন্যথায় তোমার মৃত্যু অনিবার্য। মহিলা জবাব দিল, ঠিক আছে, তুমি যা করার করো ফেলো। ফেরাউনে জানতে পারল, মহিলার স্তন্যপায়ী একটি মেয়ে আছে। সে মেয়েটিকেও উপস্থিত করল। তারপর মহিলাকে মাটিতে শুইয়ে তার এক হাতে পেরেক মেরে মাটিতে বিদ্ধ করল। তারপর অন্য হাতেও মেরে বলল, এখনও তোমার দাবি থেকে ফিরে আসো। মহিলা বলল, তা হবে না। তারপর উভয় পায়ে পেরেক মেরে আবার আল্লাহকে অস্বীকার করতে বললে মহিলা তার দাবির ওপর অটল থাকল। ফেরাউন বলল, ঠিক আছে। তার মেয়েটিকে আনো।

তাকে এনে ওই অবস্থায় তার বুকের ওপর রেখে দিলে শিশুটি দুধপান করতে লাগল। এবার ফেরাউন বলল, দেখো, এখন যদি তুমি আমাকে খোদা স্বীকার না কর, তাহলে তোমার মেয়েটাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু আল্লাহর বাঁদা খোদার প্রেমে বিভোর। সে এই অবস্থায়ও আল্লাহকে ছাড়তে পারছে না। পরিশেষে নিষ্পাপ শিশুকে মায়ের স্তন পান করা অবস্থায় শহীদ করে দিল। তার রক্ত মায়ের বুক ভেসে গড়িয়ে যাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ!

বন্ধুগণ, ভেবে দেখুন, ওই সময় সন্তানের জন্য মায়ের কী অবস্থা হতে পারে? কিন্তু প্রভুর প্রেমে আত্মহারা মহিলা তখনও বলছে, আমার দাবি থেকে আমি কস্মিনকালেও ফিরব না। আল্লাহর জন্য সে তার কলিজার টুকরা, নয়নের মনি শিশুকে কোরবান করে দিল। ফেরাউন যখন দেখল, এভাবেও তাকে ফেরানো যাচ্ছে না, তখন বিচ্ছু আনয়ন করতে আদেশ দিল। তৎকালীন সময় শত্রুদের শাস্তি দেওয়ার জন্য সাপ, বিচ্ছু ও বাঘ ইত্যাদি পোষা হতো। তার গা থেকে বস্ত্র খুলে বিচ্ছু ছেড়ে দিলে বিচ্ছু তাকে দংশন করতে লাগল। বন্ধুগণ! সামান্য মৌমাছির দংশন সহ্য করা কঠিন হয়। সাধারণত তুচ্ছ একটি বিচ্ছুর আঘাত বরদাশত করা যায় না। অথচ শাস্তির

জন্য পোষা বড়-বড় বিচ্ছু তাকে দংশন করছে আর মহিলা বিষের জ্বালায় ছটফট করছে। তবু সে আল্লাহকে ভুলে ফেরাউনকে খোদা মানতে রাজি হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত বিষাক্ত বিচ্ছুর দংশনে মহিলা ওখানেই ইহধাম ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমাল। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এরপর ফেরাউন অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে অন্দর মহলে গিয়ে তার স্ত্রীকে বলল, দেখেছ রানি! মহিলা আমাকে না মেনে মূসার খোদাকে মান্য করায় আমি তাকে কেমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছি? বিবি আছিয়াও ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। ফেরাউনের এহেন ন্যাক্কারজনক ঘটনা সহ্য করতে না পেরে বললেন, আমার ভাবতে অবাক লাগছে, তুমি একটি নিষ্পাপ দুধের শিশুকে তার মায়ের বুকের ওপর জবাই করেছ! তারপর তার মাকেও নির্মমভাবে হত্যা করেছ! তোমার মতো নির্দয়, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী আর কে হতে পারে? এমন জঘন্য নির্মম কর্ম করতে তোমার কিঞ্চিৎ দয়া হলো না?

স্ত্রীর মুখে এই তিরস্কার ও অভিশাপ শুনে ফেরাউন বলল, তবে কি তুমিও মূসার খোদার প্রতি ঈমান এনেছ?

ভাই! ঈমান খুব আশ্চর্য নেয়ামত। তিনিও ঈমানের কথা গোপন রাখতে পারলেন না। বলে ফেললেন, হ্যাঁ; আমি ঈমান গ্রহণ করেছি। ফেরাউন দিশেহারা হয়ে বলল, কী! আমর স্ত্রী হয়ে তুমি মূসার খোদার ওপর ঈমান এনেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি ঈমান এনেছি। সে বলল, জান আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দিতে পারি? আছিয়া বললেন, হ্যাঁ, যা ইচ্ছা করতে পার; তাতে আমি ভয় করি না।

ফেরাউন আবার রেগে আগুন হয়ে পুনরায় রাজদরবারে এসে মন্ত্রীসভা ডাকল। ব্যঘ্র গর্জন দিয়ে বলল, দেখো, কিছুক্ষণ পূর্বে আমি এক মহিলার কী পরিণতি করেছি। এখন আরেকটি মহিলা, যার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লাখো রমণী থেকে চয়ন করে আমি তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে মহলের রানি বানিয়েছি। তার সেবার জন্য সার্বক্ষণিক শত-শত যুবতি প্রস্তুত থাকে। ইশারার সাথে তার সকল কাজ সমাধা হচ্ছে। আর সে কিনা আজ বলছে, আমি মূসার খোদার ওপর ঈমান এনেছি। তাকে হাজির করো। পুলিশ অবাক। এখন পর্যন্ত রানিকে কত সম্মান জানাচ্ছি। আর বাদশাহ বলছেন তাকে গ্রেফতার করার জন্য। যাক শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হলো।

ফেরাউন বলল, আছিয়া! যদি তুমি আমার কথা না শোন, তাহলে সবার সামনে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করব। তিনি বললেন, না; আমি যেকথা স্বীকার করে নিয়েছি, তা আমি ত্যাগ করতে পারব না। ফেরাউন বলল, দেখো আছিয়া! এখন পর্যন্ত তুমি আমার স্ত্রী এ মহলের রানি তোমার একটা সম্মান আছে। আমি তোমাকে শেষ সুযোগ দিচ্ছি। অন্যথায় আমি তোমাকে এমন অপমানিত করব যে, কেউ কাউকে এমন অপমান করতে পারে না। তিনি বললেন, এখন আর ফিরে আসা সম্ভব নয়। আমার সিদ্ধান্তে আমি অটল। এবার ফেরাউনের ক্রোধের আগুন আরও বেড়ে গেল। দারোওয়ানদের আদেশ দিল, তার গা থেকে কাপড় খুলে দাও।

বন্ধুগণ! ভেবে দেখুন, কোনো পুরুষকে যদি ভরমজলিসে তার গায়ের কাপড় খুলে দিতে বলা হয়। তাহলে তার কেমন লজ্জা আসে। সে বলে, মাটি কেন ফাটে না। আমি কেন লুকাই না। সুতরাং জনসমক্ষে কাপড় খুলে উলঙ্গ করা পুরুষেরই যদি এমন লজ্জাবোধ হয়, তবে একজন মহিলার, তদুপরি একজন লজ্জাবতী সম্ভ্রান্ত মহিলার কী অবস্থা হতে পারে? এতদসত্ত্বেও আছিয়া বললেন, তোমার যা ইচ্ছা করতে পার; তবু সত্যের পথ থেকে এক চুলও সরতে পারব না। ফলে তার গা থেকে কাপড় খুলে বস্ত্রহীন অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখল।

তারপর তাকে পুনরায় বলা হলো, এখনও সময় আছে, ফেরাউনকে খোদা মেনে নাও। তিনি বললেন, না; আমার আসল মালিককে আমি ভুলতে পারি না। একথা শুনে ফেরাউন নির্দেশ দিল, একেও ওই মহিলার মতো মাটিতে শুইয়ে দাও। যখন তাকে লোকেরা শোয়াতে লাগল, তখন ফেরাউন বলল, শাহী মহলের দিকে চেহারা রেখে শোওয়াও, যাতে সে তা দেখতে পায় আর উপলব্ধি করতে পারে, এ মহলে আর আমি কখনও প্রবেশ করতে পারব না। ফেরাউনের নির্দেশিত শাহীমহলের দিকে মুখ করে তাকে শোওয়ানো হলো। এবার ফেরাউন বলল, আছিয়া! এখনও সময় আছে; আমাকে খোদা মেনে নাও। তিনি বললেন, না; আমি মানতে পারি না। সে কসাইদের নির্দেশ দিল, জীবিত অবস্থায় তার গা থেকে চামড়া তুলে দাও।

তৎকালে ব্লেডের মাধ্যমে দেহের চামড়া উঠানো হতো। সেভাবেই আছিয়ার দেহ থেকে চামড়া তুলে দেওয়া হলো। সুবহানাল্লাহ! বন্ধুগণ, আল্লাহর শান লক্ষ করুন। গায়ের সম্পূর্ণ চামড়া উঠানো পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। অথচ চামড়া উঠালে তাতে বাতাস লাগলেও ব্যথা পাওয়া যায়।

সুতরাং ভেবে দেখুন, তিনি কী পরিমাণ যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। তিনি পানিবিহীন মাছের মতো ছটফট করতে লাগলেন। এবার ফেরাউন বলল, আছিয়া! এখন কী হলো? এখন তো তুমি না পাবে শাহী মহলের আড়ম্বর, না পাবে আমার মতো বাদশাহকে তোমার বর। এখনও কী আমাকে খোদা মানতে পার না? তিনি বললেন, কস্মিনকালেও মানতে পারি না।

ফেরাউন অত্যন্ত জেদি ছিল। তাই মরিচ আনতে নির্দেশ দিল। ইতিহাস সাক্ষী। পেষা মরিচ এনে তার গায়ে ঢেলে দেওয়া হলো। মরিচ ঢালার সময় তিনি আরও অধিক ছটফট করতে লাগলেন। পরিশেষে এই অস্থির অবস্থায় তিনি আল্লাহপাকের দরবারে প্রার্থনা করলেন–

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

'হে আমার মালিক! আমার জন্য তোমার জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করে দাও।'[১৪৩]

আছিয়া প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! ফেরাউন শাহী মহল থেকে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে বলছে, আমি আর সে ঘরে প্রবেশ করতে পারব না। সুতরাং হে আমার মালিক! আমি এ রাজমহল চাই না। আমার জন্য জান্নাতে তোমার পাশে একটি ঘর বানিয়ে রাখো। একথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে বিবি আছিয়া শহীদ হয়ে গেলেন।

বন্ধুগণ! এবার আল্লাহপাকের যথাযথ মূল্যায়ন দেখুন। মেরাজের রাতে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আ.)-এর সঙ্গে একটা বস্তি অতিক্রম করার সময় সেখানে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর সুগন্ধি অনুভব করলেন। জিবরাঈল (আ.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কিসের সুবাস। জিবরাঈল (আ.) বললেন- ওই গ্রামে এক মহিলার কবর রয়েছে, যে ফেরাউনের স্ত্রী ও কন্যাদের মাথা আঁচড়াত। আল্লাহর ওপর ঈমান আনার কারণে ফেরাউন তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। ফলে আল্লাহপাক ওই মহিলার কবরকে জান্নাতের উদ্যান বানিয়েছেন এবং এর বরকতে সারা গ্রামে জান্নাতের সুগন্ধি ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সুগন্ধি আগ্রহের সাথে ভোগ করেছেন।

---

১৪৩. সূরা তাহরীম : আয়াত ১১

বিবি আছিয়ার সাথে আল্লাহর মূল্যায়ন কীভাবে হয়েছে?

বিবি আছিয়া প্রার্থনা করেছিলেন-

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

'হে আল্লাহ তোমার পাশে জান্নাতে আমর জন্য একটা গৃহ নির্মাণ করো।'[১৪৪]

আল্লাহপাক তার মূল্যায়ন এভাবে করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর অন্তিম সময় বললেন। খাদীজা! তুমি এ জগৎ ছেড়ে যাওয়ার পর জান্নাতে গেলে সেখানে আমার স্ত্রীদের আমার সালাম জানাবে। একথা শুনে খাদীজা অবাক হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ পৃথিবীতে আমিই তো আপনার একমাত্র স্ত্রী। তাহলে তারা আবার কারা, যাদের কাছে আপনার সালাম পৌঁছাতে এমন ফরমায়েশ দিচ্ছেন। হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খাদীজা! ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া এবং ঈসা (আ.)-এর মাতা মারয়াম। তারা জান্নাতে চলে গেছেন। আল্লাহপাক জান্নাতে তাদের সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়েছেন। তাই ওদের কাছে আমার সালাম পৌঁছাতে বলছি।

আল্লাহপাকের মূল্যায়ন দেখুন। হযরত আছিয়া আল্লাহপাকের কাছে তাঁর পাশে জান্নাতে ঘর চেয়েছিলেন। আল্লাহ তাকে ঘর দিলেন। সাথে ঘরের শোভা জীবনসঙ্গীও দিলেন। তা-ও আবার এমন লোক যে, নিজের একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুবহানাল্লাহ!

ফেরাউন আছিয়াকে নিজের ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল। আল্লাহপাক তাঁকে শুধু ঘরই দেননি; বরং কমবখত ফেরাউনের পরিবর্তে নিজের সবচেয়ে প্রিয়জন উভয় জাহানের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এসমস্ত বিষয়ে প্রতীয়মান হয় যে, যেকোনো বান্দা আল্লাহপাকের জন্য ত্যাগ স্বীকার করলে তিনি তার যথাযথ মূল্যায়ন করেন। তিনি মূল্যায়নকারী বান্দার চাওয়া-পাওয়ার বাইরে অনুগ্রহ করেন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত

আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম থেকে দশ হাজার নবী-রাসূল পাঠালেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)কে যে-সম্মানে ভূষিত করা

---

১৪৪. সূরা তাহরীম : আয়াত ১১

হয়েছে, তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। ফলে হযরত ইবরাহীম (আ.) খ্রিস্টান, ইহুদি সবার কাছে সম্মানের পাত্র। বোঝা যায়, তিনি আল্লাহর কাজ করেছেন আর আল্লাহপাকও তাঁর কর্মের প্রতিদান দিয়েছেন।

কেননা, যিনি অতি দয়াবান হন তিনি বান্দার পরিশ্রমের প্রতিদান দেন। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতিদান দিতে আল্লাহপাক বলেন–

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

'আমি তোমাকে মানবজাতির ইমাম বানাব।'[১৪৫]

এ তো ছিল গৃহ নির্মাণের প্রতিদান। পক্ষান্তরে আল্লাহপাক তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুর চেয়ে অতিরিক্ত একটি নেয়ামত দিয়েছেন। সেটি কী? সেটি হলো হযরত ইবরাহীম (আ.) যেস্থানে দাঁড়িয়ে কাবাঘর নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে আল্লাহপাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদচিহ্ন প্রস্ফুটিত রেখেছেন এবং এস্থানকে আজীবন আগত ব্যক্তিদের জন্য নামাযের স্থান বানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহপাক বলেন–

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

'তোমরা ইবরাহীম (আ.)-এর দাঁড়ানোর স্থানকে নামাযের স্থান বানাও।'[১৪৬]

অর্থাৎ সেখানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করো।

এতে বোঝা যায়, আল্লাহপাক বলছেন, হে ইবরাহীম! তুমি এস্থানে দাঁড়িয়ে আমার ঘর নির্মাণ করেছিলে। সুতরাং আমি তোমার পদচিহ্ন ও এর আশেপাশের স্থানকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নামাযের স্থান বানিয়ে দিলাম। একে বলে যথাযথ মূল্যায়ন।

হযরত হাজেরা (আ.)-এর তাওয়াক্কুল ও তাঁর মূল্যায়ন

হযরত ইবরাহীম (আ.) বিবি হাজেরা ও ইসমাঈল (আ.)কে আল্লাহর নির্দেশে সিরিয়া নিয়ে এসে কা'বা শরীফের কাছে এমন স্থানে বসতি স্থাপন করলেন, যার সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন–

بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ

---

১৪৫. সূরা বাকারা : আয়াত ১২৪

১৪৬. সূরা বাকারা : আয়াত ১২৫

'এমন উত্যাকায়, যা একেবারে অনূর্বর; আপনার সম্মানীত গৃহের পাশে।'[১৪৭]

হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন তাদের রেখে সেখান থেকে চলে যাচ্ছেন, তখন বিবি হাজেরা বললেন, 'ওগো আমার প্রাণের স্বামী! আপনি আমাদের এই জনমানবহীন উপত্যাকায় রেখে কোথায় যাচ্ছেন? ইবরাহীম (আ.) কোনো জবাব দেননি। হাজেরা দ্বিতীয়বার বললেনও তিনি কোনো জবাব দেননি। তৃতীয়বার হাজেরা বললেন, আপনি কি আল্লাহপাকের নির্দেশে আমাদের রেখে যাচ্ছেন। এবার হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, হ্যাঁ, আমি আল্লাহপাকের নির্দেশেই তোমাদের এখানে রেখে যাচ্ছি। আল্লাহপাকের নির্দেশ শুনে হযরত হাজেরা (আ.) বললেন, ঠিক আছে; তাহলে যে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, তিনি অবশ্যই আমাদের সকল ব্যবস্থা করবেন। আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।

বন্ধুগণ! দেখুন, আল্লাহর এক দাসি মানুষ হয়ে এমন স্থানে থাকার জন্য আল্লাহপাকের ওপর তাওয়াক্কুল করলেন, যেস্থান জনমানবহীন, গাছপালা, তরুলতা, পানি, খাবার, ফল কোনো কিছুর নামগন্ধও নেই। এবার আল্লাহপাকের মূল্যায়ন দেখুন। শুধু হাজেরা ও ইসমাঈলের পান করার জন্য পানি দেননি; বরং তাদের খাতিরে যমযম নামে এমন কূপের ব্যবস্থা করলেন যে, বর্তমানে সারা দুনিয়ার মানুষ এর পানি পান করছে। যেখানকার বাসিন্দাদের জন্য পানি ছিল না, আজ প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লাখ মানুষ হজের মৌসুমে সেখানকার পানি পান করে। আবার আসার সময় প্রত্যেকে নিজের বাড়ির জন্য নিয়ে আসে। আল্লাহু আকবার! এটি কেমন ঝরনা, যার পানি দ্বারা অসংখ্য মানুষ প্রয়োজন মেটাচ্ছে!

একদা আমার যমযম কূপ দেখার আগ্রহ হলো। কারণ, কিতাবাদিতে লেখা আছে; যমযম কূপ দর্শন করাও পুণ্যের কাজ। তবে তার অভ্যন্তরে কাউকে যেতে দেওয়া হয় না। আল্লাহর মহিমা যে, আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওই কূপের প্রহরীর দায়িত্বে ছিলেন। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, মাথা ঝুঁকিয়ে ভেতরে দেখুন। তিনি সেখানে হাই পাওয়ারের লাইট ফিট করে দিলেন। আমরা মাথা ঝুঁকিয়ে ভেতরে দেখলাম। মনে হচ্ছে, সেটা তেমন গভীর হবে না। তবে তার অভ্যন্তরে পানির স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কী? তিনি বললেন, হুজুর! আমরা সাধারণত

---

১৪৭. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৭

এসব কথা প্রকাশ করি না। আপনি আমার কাছের লোক বিধায় বলতে হচ্ছে। আমি অধমের কয়েকবার এ কূপের অভ্যন্তরে নামার সুযোগ হয়েছে। কূপের নিচ থেকে সাতটি জায়গা দিয়ে অবিরাম পানি বের হচ্ছে।

হে আমার মালিক! এট কেমন মূল্যায়ন! হযরত হাজেরার তাওয়াক্কুলের বিনিময়ে আজ সারা পৃথিবীর অসংখ্য জীব এর পানি পান করছে।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর দু'আর মূল্যায়ন

একদা হযরত ওমর (রাযি.) মক্কা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে রাস্তায় রাত হয়ে গেলে তাঁবু টাঙিয়ে রাত যাপন করছেন। গভীর রাতে সহসা তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। আকাশের দিকে তাকালে জোৎস্না রাতের পূর্ণিমার চাঁদে তার দৃষ্টি পড়ল। চাঁদের দ্যোতনাময় চেহারা দেখেই তাঁর মদীনার চাঁদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা স্মরণ হয়ে গেল। তিনি উঠে গেলেন। গভীর রাত, একাকিত্বের সময়। সুশীতল মৃদ হাওয়া বইছে। আকাশ থেকে নূর বর্ষিত হচ্ছে। দু'আ কবুলের উপযুক্ত সময় ভেবে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা শুরু করলেন। তাতে তিনি হৃদয়ে লুকায়িত ভেদ প্রকাশ করলেন। বলতে লাগলেন–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ قَبْرِيْ فِيْ بَلَدِ حَبِيْبِكَ

'হে আল্লাহ আমাকে তোমার রাস্তায় শাদাহাত দান করো এবং তোমার হাবীব (আ.)-এর নগরিতে আমার সমাধি বানাও।'

বন্ধুগণ! হযরত ওমর (রাযি.) শুধু শাহাদাতের কামনা করেছিলেন। সুতরাং যেকোনো স্থানে, পাহাড়ে, যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত সংঘটিত হলেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু না, আল্লাহপাকের মূল্যায়ন দেখুন, শুধু তাঁর বাসনাই পূর্ণ করেননি; বরং কীভাবে পূর্ণ করেছেন দেখুন। হযরত ওমর (রাযি.) উজু অবস্থায় ছিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জায়নামাযে দাঁড়ানো ছিলেন। কুরআন পাক তেলাওয়াত করছিলেন। এমন নৈকট্যময় অবস্থায় তাঁকে শহীদ করা হয়েছিল। সুবহানাল্লাহ! শাহাদাতের আঘাত ওই অবস্থায় লেগেছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জায়নামাযে শাহাদাতের সৌভাগ্য পান তিনি। তিনি তো শুধু শাহাদাতের তামান্না করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহপাক তাঁর আকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে তাঁকে কল্যাণ দান করেছেন।

হযরত ওমর (রাযি.) দ্বিতীয় দু'আ করেছিলেন- 'হে আমার মালিক! আমার কবর তোমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুর্ণ্যভূমিতে স্থাপন করো। মদীনার প্রসিদ্ধ কবরস্তান জান্নাতুল বাকিতে সামাধি হলেই প্রার্থনা পূর্ণ হয়ে যেত। তবে না, আল্লাহ যথাযথ মূল্যায়নকারী। আল্লাহপাক তাঁকে জান্নাতের বাগান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামরায়, তাঁর পায়ের কাছে দাফন হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ! এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর দু'আর মূল্যায়ন।

হযরত যায়েদ (রাযি.)-এর ওপর অনুগ্রহ ও পুরস্কার

হযরত যায়েদ (রাযি.) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। ছোট বেলায় কেউ তাঁকে গোলাম বানিয়ে বিক্রয় করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন। এখানে থাকছেন। এদিকে তাঁর পিতা তাঁর জন্য যারপরনাই হতাশ। তাঁর উদ্দেশে দিশেহারা হয়ে কাঁদছে আর কবিতা পাঠ করছে এবং ঘুরে ফিরছে।

পরিশেষে কেউ তাকে সন্ধান দিল, তোমার ছেলে মদীনার অমুক জায়গায় থাকে। সুতরাং তার পিতা ও চাচা এসে তার সন্ধান পান। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পিতা আদুরে বাণী শোনাচ্ছেন, বাবা! তোমার জন্য আমি অস্থির। তোমার মা অধীর এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন উম্মাদ। সবার হৃদয়ে আজ অসহনীয় বিষাদ। আমি তোমার সন্ধানে অনেক স্থানে গিয়েছি। অনেক কষ্ট-সাধনা করেছি। ভাগ্যের জোরে আজ তোমাকে ফিরে পেয়েছি। চলো বাবা! বাড়িতে চলো।

কিন্তু পিতার কথায় তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন, আমার মাহবুবের অনুমতি ব্যতীত আমি এখান থেকে যেতে পারব না। ব্যর্থ হয়ে এবার তাঁর পিতা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে আরজ করলেন– 'হে কুরাইশি সরদার! তুমি হাশেমি গোত্রের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তোমার আতিথেয়তা অতুলনীয়। মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার তোমার নিত্য দিনের সাথী। আমার সন্তান আপনার দরবারে রয়েছে। আপনার সান্নিধ্য ছেড়ে সে যেতে চাচ্ছে না। এদিকে আমরা তার বিরহে অধীর। অনুগ্রহপূর্বক তাকে আমাদের সঙ্গে দিন। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রশান্তির জীবন কাটাই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– 'জনাব! আমি যায়েদকে এ স্বাধীনতা দিচ্ছি। সে চাইলে আপনাদের সঙ্গে যেতে পারে আর তার ইচ্ছা না থাকলে আমি তাকে যেতে বাধ্য করব না।

বিষয়টি হযরত যায়েদ (রাযি.)-এর ওপর ন্যস্ত হলে তিনি একবার তার পিতার প্রতি তাকাচ্ছেন, আরেকবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাকাচ্ছেন। শেষে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে গিয়ে বসে গেলেন। দেখুন, সামান্য একটি শিশু হয়ে তিনি বলছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে চাচ্ছি না। হযরত যায়েদ যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে বসে গেলেন, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, 'আজ থেকে যায়েদ আমার সন্তান।' সুবহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবার! যায়েদ ইবনে হারেছা (রাযি.) পিতার কোল ছেড়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে বসলেন। এবার আল্লাহপাকের মূল্যায়ন দেখুন। সাহাবায়ে কেরাম সারা জীবন তাঁকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বলে ডাকছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ফুফাত বোন জয়নব বিনতে জাহাশের সঙ্গে তাঁকে বিবাহ দেন। শুধু তা-ই নয়; বরং সকল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একমাত্র যায়েদের নাম পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহপাক বলেন–

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا

'তারপর যখন যায়েদ ওই মহিলা সম্পর্কে তার ইচ্ছার পরিসমাপ্তি টানল, তখন আমি ওই মহিলাকে তোমার সাথে বিবাহ দিয়েছি।'[১৪৮]

তদুপরি সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে অনেক সম্মান করতেন।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদের মর্যাদা

হযরত যায়েদের ছেলে ছিলেন হযরত উসামা (রাযি.)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কেমন ভালোবাসতেন? তার ছেলেকে তিনি যুদ্ধের সেনাপতি নিয়োগ করে পাঠালেন। অথচ অনেক বড়-বড় সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি স্বল্পবয়সি তরুণ যুদ্ধের সেনাপতি হয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহর মহিমা! স্বয়ং রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে ঝান্ডা তুলে দিলেন। তাঁকে সৈন্যদলের নেতা বানালেন।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর শাসনামলে কিছুসংখ্যক সাহাবাকে বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে সামান্য ভাতা দেওয়া হতো। একবার সেই

---

১৪৮. সূরা আহযাব : ৩৭

ভাতার গ্রাহক নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিলে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের নাম প্রস্তাব করা হলো। এদের নামে সামান্য রাষ্ট্রীয় ভাতা মনজুর হলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ খাদেম ছিলেন। বিদ্যার দিক থেকে হাদীছ বিশারদগণের নেতা বলা হতো। ইল্‌মপিপাসুগণ তাঁর কাছে হাদীছ বর্ণনার জন্য সমবেত হতেন।

হযরত ওমর (রাযি.) তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের জন্য মাসিক ভাতা কম নির্ধারণ করলেন এবং হযরত উসামা ইবনে যায়েদের জন্য বেশি নির্ধারণ করলেন। ফলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হতবাক হয়ে পিতার কাছে আবদার করলেন, আব্বাজান! উসামার জন্য বেশি আর আমার জন্য কম কেন?

হযরত ওমর (রাযি.) অতিশয় আশ্চর্য কথার মাধ্যমে ছেলের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। 'বাবা! আমি এটা এজন্যই করেছি যে, তোমার অনুপাতে তার মূল্যায়ন এবং তোমার পিতার অনুপাতে তার পিতা যায়েদের মূল্যায়ন আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনেক বেশি ছিল।'

এটা তো হযরত ওমর (রাযি.)-এর ভাষ্য ছিল। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেহেতু তাঁর পিতাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সন্তান বানিয়ে ছিলেন, তাই এতে আত্মীয়তার একটি সম্পর্ক রয়েছে। এজন্যই হযরত ওমর (রাযি.) সেই সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি রেখে তার ভাতা বেশি নির্ধারণ করেছেন। বন্ধুগণ! এটা হলো আল্লাহপাকের মূল্যায়ন।

হযরত সালমান ফারসি (রাযি.)-এর প্রতি অনুপম উৎসাহ প্রদান

হযরত সামলান ফারসি (রাযি.) একজন বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন। তিনি ইরানের বাসিন্দা ছিলেন। ইসলামপূর্বে তিনি অগ্নিপূজক ছিলেন। তাঁর পিতা সর্বদা শিখা জ্বালিয়ে রাখতেন। কখনও সেই আগুণ নিভতে দিতেন না। হযরত সালমান ফারসি (রাযি.)ও সেই কাজের জোগানদাতা ছিলেন। মুহূর্তের জন্যও যাতে না নেভে, তাই লাকড়ির সন্ধান করতে হতো। তার পিতা তাকে বলল, বেটা! একাজই জীবনের মূল উদ্দেশ্য। যাক যথেষ্ট সময় সেই কাজটি করেছেন। বাইরে যাওয়ার সুযোগও পাননি। বাইরের সংবাদবার্তা সম্পর্কেও কোনো প্রকার জ্ঞাত হননি।

একদা তার পিতা অসুস্থ হলে টাকা সংগ্রহের জন্য তাকে কোথাও পাঠালেন। তবে বলে দিলেন, খবরদার! সোজা যাবে; সোজা চলে আসবে; এদিক-সেদিক তাকাবে না, অহেতুক সময় নষ্ট করবে না। এর পূর্বে কখনও তিনি বাইরে যাওয়ার সুযোগ পাননি। পথে এক পাদরির (খ্রিস্টান ধর্মগুরুর) সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিনি তার কাছে পথের সন্ধান চাইলেন। তাদের পরস্পরে কথা হলো। পাদরি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী কর? তিনি কর্মব্যস্ততার কথা বললেন। এভাবে কথা বলার প্রেক্ষিতে পাদরির সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে গেল। পাদরি তাকে বললেন, এ এলাকার নিকটেই একটি গির্জা (খ্রিস্টান ধর্মশালা) রয়েছে। আমি সেখানেই থাকি। সুযোগ হলে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করে যেয়ো। সুতরাং তিনি যখনই এদিকে আসতেন, পাদরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যেতেন।

পাদরি তার সম্মুখে খ্রিস্টান ধর্মশিক্ষা উপস্থাপন করলেন। তৎকালে খ্রিস্টান ধর্ম সত্য ধর্ম বলে স্বীকৃত ছিল। হযরত সালমান ফারসি ভাবলেন, এটিই সত্য ধর্ম। আমি এ ধর্ম গ্রহণ করব। তিনি পাদরিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ; গ্রহণ করতে পার। তবে আমাদের শিক্ষাগুরু ওই শহরে বাস করেন। তুমি ধর্ম শিখতে হলে তাঁর কাছে যেতে হবে। তিনি বললেন, আমি সেখানে কীভাবে যাব? পাদরি বললেন, সেখানে বিভিন্ন কাফেলা যায়। আগামী কাফেলা যাওয়ার সময় আমি তোমাকে তাদের সঙ্গে পাঠাব। তিনি বললেন, ঠিক আছে; আগামী কাফেলা যাওয়ার সময় আমাকে জানাবেন। আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে আসব। কারণ, এখানে থাকলে আব্বু আমাকে আগুন জ্বালানোর কাজে নিয়োজিত রাখবেন। এতে আমার জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে না। সুতরাং এর চেয়ে ভালো হবে, আমি সেখানে গিয়ে বিদ্যা শিক্ষা করব।

পরবর্তী কাফেলা যাওয়ার সময় পাদরি তাকে অবগত করলেন। তিনি কাফেলার সঙ্গে সেখানে চলে গেলেন। যার কাছে গেলেন, তিনি অত্যন্ত বয়স্ক আলেম ছিলেন। তার কাছে তিনি প্রায় এক বছর শিক্ষা গ্রহণ করার পর ওই আলেম মৃত্যু বরণ করলেন। হযরত সালমান ফারসি অত্যন্ত হতাশ হলেন যে, আমি তার কাছে শিক্ষা করতে এলাম। কিন্তু তিনি চলে গেলেন। হায়! এখন কী করি!

এরপর সন্ধান করে আরেকজন বিজ্ঞ আলেমের কাছে গেলেন। তিনিও বৃদ্ধ ছিলেন। দু'চার বছর পর তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন। এতে সালমান

ফারসি পুনরায় পেরেশান হলেন। এ হতাশা অবস্থায় ওই আলেমকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন আমি কী করতে পারি? তিনি বললেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই; আমার মৃত্যুর পর তুমি অমুক আলেমের কাছে চলে যাবে এবং সেখানে শিক্ষা গ্রহণ করবে। এ আলেমের মৃত্যুর পর তিনি তার নির্দেশিত আলেমের কাছে চলে গেলেন। আল্লাহর লীলা যে, এই তৃতীয় আলেমও বৃদ্ধ এবং অসুস্থ হয়ে গেলেন। এবার সালমান ফারসি কাঁদতে শুরু করলেন, জানি না আমার কপালে কী আছে। যেখানে যাচ্ছি, সেখানকার ওস্তাদই আমার অন্তরে বিচ্ছেদের রেখা টানছেন।

তৃতীয় ওস্তাদ বললেন চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে একটি মূলনীতি শিক্ষা দিচ্ছি। এরপর তোমাকে কোনো ওস্তাদের কাছে যেতে হবে না। তিনি বললেন, সেট কী? ওস্তাদ বললেন, এখন ওই যুগ এসে গেছে, যখন আখেরী যমানার নবীর আগমন হবে। আমি তোমাকে নিদর্শন বলে দিচ্ছি। তুমি কোনোক্রমে ওই এলাকায় যাওয়ার চেষ্টা করবে, যেখানে তাঁর আগমন ঘটবে। সেখানে গিয়ে তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

একথা শুনে সালমান ফারসি অত্যন্ত খুশি হলেন। তৃতীয় ওস্তাদ তাঁকে শেষ নবীর কিছু নিদর্শন বলে দিলেন এবং একটি কাফেলার সঙ্গে মদীনার পথে পাঠিয়ে দিলেন। ওই সময় মদীনাকে ইয়াছরিব বলা হতো। কাফেলার লোকেরা মধ্যপথে গাদ্দারি করল। তারা ভাবল, এ এক ছোট কিশোর; তার কোনো ওয়ারিশ নেই। সুতরাং ইয়াছরিব (মদীনায়) গিয়ে একে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করে দিল। এক ইহুদি তাকে ক্রয় করল। তিনি সেখানকার কোনো কিছু চিনতেন না, জানতেন না। পরিশেষে তার ওস্তাদের নির্দেশিত লক্ষণ দেখে অনুধাবন করলেন, এটাই সেই এলাকা, যেখানে শেষ যুগের নবীর আগমন ঘটবে। তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে ওই এলাকাতেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।

হযরত সালমান ফারসি (রাযি.)-এর ইহুদি মালিকের খেজুর বাগান ছিল। তিনি সারাদিন সেই বাগানে কাজ করতেন। একদিন তিনি খেজুর গাছে চড়ে খেজুর পাড়ছিলেন। এমন সময় মালিকের এক বন্ধু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এসে আলোচনান্তে বলল, মক্কা থেকে এক লোক এসে এখানে নবুওয়াতের দাবি করছে। হযরত সালমান ফারসি নবুওয়াত শব্দটি শুনেই ওদিকে মনোনিবেশ করলেন, যার জন্য তিনি এতদিন অপেক্ষমাণ ছিলেন। সেকথা শুনে প্রবল আবেগে লাফ দিয়ে গাছ থেকে নিচে নেমে

গেলেন। নিচে নেমে জিজ্ঞাসা করলেন, জনাব! যে নবী আসছেন, তিনি কে? কী তার পরিচয়? ইহুদি তার কথা শুনে ঘাড় চেপে একটা থাপ্পর মারল। বলল, তুই কী শুনবি? যা তুই তোর কাজ কর। এদিকে তিনি গাছ থেকে লাফ দিয়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছিলেন। তদুপরি মালিকের থাপ্পর খেতে হলো। ফলে নিশ্চুপ হয়ে কাজ করতে লাগলেন আর ভাবতে লাগলেন, এখন কী করি। পরিশেষে স্থির করলেন, সপ্তাহে একদিন ছুটি থাকে। সেদিন আমি গ্রামে গিয়ে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করব, মক্কা থেকে কে এসেছেন এবং নবুওতের দাবি করছেন? ছুটির দিনে বের হয়ে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে-করতে একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ পেয়ে ব্যথিত হৃদয়কে শান্ত করলেন এবং চক্ষু ঠান্ডা করলেন।

ওস্তাদ তাকে শেষ নবীর দুটি নিদর্শন বলেছিলেন। এক. তিনি সদকা গ্রহণ করবেন না। দুই. তিনি হাদিয়া গ্রহণ করবেন। সুতরাং তিনি কিছু টাকা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত করে বললেন, এগুলো সদকার টাকা; মেহেরবানি করে গ্রহণ করুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি সদকা গ্রহণ করি না। এতে তার প্রথম লক্ষণ বাস্তবায়িত হয়ে গেল।

কয়েকদিন পর পুনরায় কিছু টাকা এনে বললেন, হুজুর এগুলো আপনার জন্য হাদিয়া। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই টাকা গ্রহণ করলেন। এবার তার দ্বিতীয় নিদর্শন পুরা হয়ে গেল। আল্লাহর অপার কৃপায় তার পরিশ্রান্ত হৃদয় প্রশান্তি লাভ করল এবং তিনি কালেমা পাঠ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর হাল-হাকীকত বললে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ধৈর্য ধরো। এখানে আসা যাওয়া করো। তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখে ছুটির দিনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসা অব্যাহত রাখলেন।

একদিন তার প্রতি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের সাগরে ঢেউ উঠল। তিনি বললেন, সালমান, তোমাকে আর এখান থেকে যেতে দেওয়া হবে না। তোমার মালিককে বলো, সে যা চায় তা দেওয়া হবে। সে যেন তোমাকে মুক্ত করে দেয়। তিনি তার মালিককে বললেন, জনাব! আপনি আমাকে মুক্ত করে দিন। এর বিনিময়ে আপনি যত টাকা চাইবেন বা যে শর্ত দেবেন তা আমি পূর্ণ করব।

ইহুদি অত্যন্ত জেদি লোক ছিল। বলল, তোমাকে আমি দুটি শর্তে মুক্তি দিতে পারি। এক. তিনশ খেজুর গাছ লাগাবে। যখন সবগুলো গাছে এক সঙ্গে খেজুর আসবে, সেদিন প্রথম শর্ত পূর্ণ হবে। তাঁর উদ্দেশ্য হলো তিনশ খেজুর গাছে এক সঙ্গে খেজুর আসা সম্ভব নয়। যদিও আসে তবে অনেক সময় লাগবে। দুই. তুমি আমাকে তিন উকিয়া (আরবি পরিমাণ) সোনা দিতে হবে। এতে তার উদ্দেশ্য হলো, তিন উকিয়া সোনা সংগ্রহ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না আর সে মুক্তিও পাবে না। যদিও দিতে পারে, তবে তা দ্বারা পঞ্চাশটা গোলাম ক্রয় করা যাবে।

হযরত সালামান ফারসি তার উভয় শর্ত মেনে নিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বিস্তারিত বললেন। আল্লাহর কুদরত যে, তিনি এখনও নবীজির দরবারে বসা আছেন। এতক্ষণে এক ব্যক্তি এক টুকরো সোনা এনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া দিল। সুবহানাল্লাহ! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমার কাজ সহজ করে দিয়েছেন। যাও; এটা নিয়ে তোমার মালিককে দাও। তিনি সেটা নিয়ে মালিককে দিলেন। সোনার টুকরাটি দেখতে ছোট দেখাচ্ছিল। কিন্তু ওজন দেওয়ার পর তা ঠিক তিন উকিয়া হলো। মালিক হতভম্ব হয়ে গেল। এত ছোট এক টুকরো সোনা তিন উকিয়া হয় কীভাবে। না, মনে হয় দাঁড়িপাল্লায় সমস্যা আছে। সে নিক্তি ঠিক করে পুনরায় ওজন দিল। ঠিক তিন উকিয়াই হলো। তবু সে বিশ্বাস করতে পারছে না। তাই কয়েকবার ওজন দিল। শেষ পর্যন্ত বলল, যাও ঠিক আছে। এবার খেজুরের বাগান লাগাও।

হযরত সালমান ফারসি পুনরায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও বাগানে গাছ লাগানোর উপযুক্ত করে আমার অপেক্ষা করবে। তোমার সঙ্গে আমি খেজুর গাছ লাগাব। আল্লাহু আকবার। বাগান প্রস্তুত করা হলো। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে নিজ হাতে খেজুর গাছ লাগালেন। একটি গাছ ব্যতীত সকল গাছে খেজুর এসে গেল। পরে জানা গেল, গাছটিতে খেজুর আসেনি। তা হযরত ওমর (রাযি.) রোপন করেছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়ে সেই গাছটি উপড়ে ফেলে সেখানে অন্য আরেকটি গাছ রোপন করলেন। আল্লাহর কুদরতে অন্যান্য গাছের খেজুর শেষ হওয়ার আগেই ওই গাছেও খেজুর এসে গেল। সুবহানাল্লাহ!

উভয় শর্ত পূর্ণ হওয়ার পর মালিক বাধ্য হয়ে তাকে আযাদ করে দিল। আযাদ হয়ে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হুজুর আমি এসে গেছি। এবার আমার জন্য কী হুকুম? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও! আসহাবে সুফ্ফার সঙ্গে থাকো।

মক্কা, সিরিয়া ও অন্যান্য স্থান হতে যে হতদরিদ্র মুসলামনগণ হিজরত করে এসেছিলেন, তাদের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছায়ানীড় তৈরি করেছিলেন। সেখানে যারা থাকতেন, তাদেরকে 'আসহাবে সুফ্ফা' বলা হয়। হযরত সালমান ফারসি তাদের আস্তানায় গেলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সবার সুপার ভাইজার বানালেন। এবার দেখুন! আল্লাহপাক তার কেমন মূল্যায়ন করেছেন। নিজের ঘরবাড়ি কেন ছাড়লেন? আল্লাহ তা'আলার জন্য। আত্মীয়স্বজন কেন ত্যাগ করলেন? আল্লাহর জন্য। যিনি নিজের ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন সব কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করলেন, আল্লাহপাক তাঁর কেমন মূল্যায়ন করলেন? একটি সময় এমন এল যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

سَلْمَانُ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ

'সালমান আমাদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিজের পরিবারের লোক হিসেবে গণ্য করলেন। আল্লাহু আকবার! আত্মীয়-স্বজন ছাড়লেন তো আল্লাহপাক নবীর পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ!

হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর ওপর দয়া ও অনুগ্রহ

হযরত আবদুল্লাহ যুলবাজাদাইন নামে এক সাহাবী ছিলেন। উঠতি বয়স। যৌবন শবেমাত্র প্রস্ফুটিত হচ্ছে। দেখতে অত্যন্ত সুদর্শন ও মনোমুগ্ধকর অবয়ব। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখতে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। পিতা মারা যাওয়ার পর চাচার সান্নিধ্যে থাকতেন। ভাবলেন, ইসলাম গ্রহণের কথা ফ্যামিলিতে প্রকাশ করব না। কিন্তু ঈমান গোপন রাখার মতো বস্তু নয়। কথায় বলে, এশক ও মেশক (ভালোবাসা ও সুগন্ধ) গোপন রাখা যায় না। ঈমান বিষয়টিও

আল্লাহপাকের সঙ্গে ভালোবাসা। সুতরাং তিনি গোপন রাখতে পারেননি। চাচা বললেন, কী; তুমি মুসলমান হয়ে গেছ? বললেন, জি। চাচা বললেন, আমার ঘরে থাকতে হলে ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় কুফরি গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আমার ঘর ছাড়তে হবে। তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি আপনার ঘর ত্যাগ করাটাই গ্রহণ করলাম। আমি চলে যাচ্ছি। চাচা বললেন, দাঁড়াও তোমার পরনের কাপড় তো আমি দিয়েছি। আমার কাপড় দিয়ে যাও। তারপর চাচা তাকে অনেক মারপিট করলেন। তাঁর গায়ের জামা খুলে বস্ত্রহীন অবস্থায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিলেন। ছেলের এ অবস্থা দেখে হতভাগী মা অত্যন্ত বিষণ্ন হলেন। তবে কোনো কিছু বলতে পারছেন না। ফলে তিনি কোনো এক বাহানায় একটি চাদর দিলেন। আমার ছেলে অন্ততপক্ষে লজ্জা ঢাকবে। তিনি চাদরটি নিয়ে দুই টুকরা করে এক টুকরা দ্বারা লুঙ্গির কাজ সমাধা করলেন। অপর টুকরাটা গায়ে প্যাঁচিয়ে নিলেন। ওই যুবক অত্যন্ত মূল্যবান কাপড় পরিধান করতেন। তার সৌন্দর্য দিয়ে মানুষ দৃষ্টান্ত দিত। আজ দুই টুকরা চাদর পরিধান করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। একারণেই তাকে ذُو الْبِجَادَيْنِ বা দুই চাদরওয়ালা বলা হতো। চাদর পরে ঘর থেকে বেরিয়ে ভাবছেন, এবার কোথায় যাই? মনে-মনে স্থির করলেন, আমার সম্মুখে শুধু একজনই ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, আমি যার ভালোবাসার সুধা পান করেছি। সুতরাং যার বাড়ির মড়া, তাঁর ঘাটে দেব ধরা। বনবাসী হলাম যার কারণ, ধরতে হবে তাঁরই চরণ। সুতরাং মদীনায় চলে গেলেন।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাশরীফ এনেছেন। আবদুল্লাহ ওই অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে চিনে ফেললেন। কোনো কবি বলেন–

دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے
وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے.

'উভয় জগৎ যার ভালোবাসায় পরাজিত। সে আসছে বেদনার রাত অতিবাহিত করে।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থি হয়ে বেদনার স্বরে বললেন, হুজুর! ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আমার সঙ্গে এমন আচরণ

করা হয়েছে। প্রহার করে শরীর থেকে বস্ত্র খুলে নেওয়া হয়েছে। ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে; এখন আপতত আসহাবে সুফফার লোকদের সঙ্গে থাকো। দেখা যাক পরে কি করা যায়। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে আসহাবে সুফফার লোকদের সঙ্গে থাকতে লাগলেন।

তার অন্তরে আল্লাহপাকের ভালোবাসা প্রবল ছিল। এমনকি মাঝে-মাঝে আল্লাহর প্রেমে আসক্ত হয়ে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সজোরে الله الله যিকির শুরু করে দিতেন। হযরত ওমর (রাযি.) একবার তার উচ্চৈঃস্বরে যিকির শুনে বললেন, আবদুল্লাহ! এত জোরে যিকির করা ঠিক নয়। হযরত ওমরের কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওমর! আবদুল্লাহকে কিছু বলো না। সে যা করছে, এখলাছের সাথেই করছে।

একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক জিহাদে গেলে হযরত আবদুল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। ঘটনাক্রমে আবদুল্লাহ অসুস্থ হয়ে যান। অবস্থা জানতে পেরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবুবকর (রাযি.) ও ওমর (রাযি.)-এর সঙ্গে তাঁর শুশ্রুষা করার জন্য গেলেন। তখন আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর জীবনের শেষ মুহূর্ত ছিল। হাদীছে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহর মাথাটা তাঁর কোলে রাখলেন। সুবহানাল্লাহ! তিনি এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যার শির নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় কোলে। তাঁর দৃষ্টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার প্রতি অপলক তাকিয়ে আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আদুরে বাণী শোনাচ্ছেন। সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এই সান্ত্বনার মুহূর্তে তাঁর প্রাণ বায়ু চলে গেল। তাঁর দৃষ্টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের দিকে। মাথাটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোলে। বোঝা যায়, যেন তিনি বলছেন–

تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا

میری معراد کہ میں تیرے قدم تک پہنچا

'আপনার মেরাজ ছিল লৌহ-কলমে।

আর আমার মেরাজ হচ্ছে আপনার কদমে।'

এই বিষয়বস্তুটিকে অন্য কোনো কবি তার ভাষায় বলেন–

نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے

یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

'তোমার পায়ের নিচে যেন আমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়,

মনের আফসোস ও আকাঙ্ক্ষা আমার একমাত্র এটাই।'

ইন্তেকালের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে গোসল দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম সে কাজে ব্যস্ত হলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গায়ের চাদর বিছিয়ে বললেন, আবদুল্লাহকে আমার চাদর দ্বারা দাফন করো। সুবহানাল্লাহ!

বন্ধুগণ! আল্লাহপাকের মূল্যায়ন দেখুন। যে-দেহকে আল্লাহর জন্য বিবস্ত্র করা হয়েছিল, সেই দেহ আজ নবীর গায়ের চাদর দ্বারা আবৃত হলো। আল্লাহু আকবার!

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযা পড়ালেন। কবর খনন করা হলো। লাশ কবরে নামানোর জন্য মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় কবরে নামা শরীয়তের নির্দেশ। এটি মুস্তাহাব। আবদুল্লাহর কোনো নিকটাত্মীয় সেখানে উপস্থিত নেই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তার সবচেয়ে নিকটাত্মীয়। সুতরাং হাজার-হাজার সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত থাকতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কবরে নামলেন, তার লাশ আমি-ই কবরে নামাব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কবরে নামার পর হযরত ওমর (রাযি.)সহ অন্যান্যরা তাঁর লাশ উঠালেন। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ওমর! নিজের ভাইকে আমার হাতে সোপর্দ করো। আর সাবধান! তাঁর সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখবে। কোনো প্রকার ত্রুটি যেন না হয়।'

সাহাবায়ে কেরাম তাঁর লাশ নবীজির হাতে অর্পণ করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজহাতে তাঁকে কবরে রেখে আমানতটি আল্লাহপাকের হাওয়ালা করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ!

ভাই! সবাই তো দাফন হয়। তবে তাঁর দাফনও বিস্ময়কর ব্যাপার। আল্লাহু আকবার। কারও কবরে তাঁর পিতা নামে আর কারও কবরে তার ছেলে নামে। কারও কবরে বন্ধু নামে। কিন্তু আবদুল্লাহকে কবরে নামানোর জন্য আল্লাহপাক তাঁর হাবীবকে কবরে নামালেন। হযরত আবদুল্লাহ

(রাযি.)কে কবরে নামানোর সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতে এমন কিছু বাক্য পাঠ করেছিলেন, যেগুলো শুনে হযরত ওমর (রাযি.)-এর শরীর শিউরে উঠেছিল।

হযরত ওমর (রাযি.) এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় বলেন, এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পঠিত বাক্য শুনে তো শরীর শিউরে উঠেছিল; তবে অন্তরে এ আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, হায়! আজ যদি ওমরের লাশ কবরে রাখা হতো যেভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহর লাশ কবরে রাখছেন।

কেউ জিজ্ঞাসা করল, হযরত! এটা এমন কী বিষয়, যার দরুন আপনার এমন আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হলো? হযরত ওমর (রাযি.) উত্তর দিলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আবদুল্লাহর লাশ কবরে রাখেন, তখন দু'আর মধ্যে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ আমি আবদুল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তুমিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।'

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা যেমন যথাযথ মূল্যায়নকারী, তেমনি আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মূল্যায়নকারী।

করজে হাসানা (উত্তম ঋণ) দেওয়ার বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রকাশ

বন্ধুগণ! গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনুন। কেউ যদি নিজের ছেলেকে এক লাখ টাকা হাদিয়া দেয়; তারপর পিতার একটা টাকার প্রয়োজন হয়, তাহলে পিতার মনে এ আশা থাকে যে, এই মাত্র আমি তাকে এক লাখ টাকা দিয়েছি; সুতরাং এখন সে আমাকে একটা টাকা দেওয়া সাধারণ ব্যাপার। এটা ছেলের জন্য পিতার ওপর বিশাল কোনো অনুগ্রহ নয়। পিতা সেই টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার কল্পনাও করে না। কিন্তু বন্ধুগণ! আমার আল্লাহ নিজ কোষাগার থেকে বান্দাকে ধনসম্পদ দেন। আল্লাহপ্রদত্ত এ সম্পদ থেকে কেউ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে আল্লাহপাক বলেন, এ টাকা তুমি আমাকে করজে হাসানা দিয়েছ। তার প্রতিদান তুমি অবশ্য পাবে। আল্লাহ বলেন–

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

'কে আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দেবে?'[১৪৯]

---

১৪৯. সূরা হাদীদ : আয়াত ১১

আল্লাহু আকবার! সম্পদ দিয়েছেন আল্লাহপাক। তাহলে সেই সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা কোনো মহৎ ব্যাপার নয়। কিন্তু আল্লাহপাক বলেন, এটা তুমি আমাকে করজে হাসানা দিলে। সুবহানাল্লাহ! একেই যথাযথ মূল্যায়ন বলে। অথচ তার ধনভান্ডারের কোনো শেষ নেই। আল্লাহ বলেন–

وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

'আসমান জমিনের ধনভান্ডার আল্লাহরই।'[১৫০]

রোযাদারের মূল্যায়ন ও সম্মান

বান্দা ইবাদাত করলে আল্লাহপাক সে ইবাদাতে খুশি হয়ে তার মূল্যায়ন করেন। হাদীছ শরীফে এসেছে। বান্দা রোযা রাখলে সারাদিন কোনো কিছু পানাহার না করার কারণে তার মুখে যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়, তা আল্লাহপাকের কাছে মেশকে আম্বরের চেয়ে অধিক প্রিয়। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহপাক কেমন মূল্যায়নকারী। বান্দা আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার কারণে তার মুখে যে দুর্গন্ধ আসে, তা কারও কাছে প্রিয় নয়। এমতাবস্থায় কারও সঙ্গে কথা বললে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবে যেহেতু বান্দার প্রতি আল্লাহর গভীর ভালোবাসা এবং দয়ার সম্পর্ক, তাই বান্দার মুখের গন্ধও আল্লাহপাকের কাছে প্রিয়। তিনি তার মূল্যায়ন করেন।

যার আমল উদ্দেশ্যবিহীন নয়

বন্ধুগণ! যেব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোরবানি করে, তার কোরবানি আল্লাহপাক গ্রহণ করেন। চাই তার কোরবানি ছোট হোক বা বড়। তবে যার আমল উদ্দেশ্যবিহীন হবে, তার প্রতিদান ভিন্ন। সেখানে আল্লাহপাক মানুষের অন্তরের অবস্থা দেখেন। কে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করেছে তা দেখেন। ছোট বড় দেখেন না। মানুষের পাহাড়পরিমাণ আমল যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে আল্লাহপাক সেই আমল লাথি মেরে ফেলে দেন, যাও তোমার আমল নিয়ে তুমি থাকো। তুমি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছ, মুধুর কণ্ঠে দীর্ঘ ওয়াজ করেছ, যাতে মানুষ তোমাকে বড় আলেম বলে। অনেক জনহিতকর কাজ করেছ, যাতে মানুষ তোমাকে সমাজসেবক বলে। আর তোমাকে তা বলা হয়েছে। এখন আমার কাছে তোমার কোনো প্রতিদান নেই। বন্ধুগণ! বে-আমল আলেমকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা

---

১৫০. সূরা মুনাফিকুন : আয়াত ৭

হবে। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি তুচ্ছ্য একটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করবে, আল্লাহপাক তার যথাযথ মূল্যায়ন করবেন।

যুবায়দা খাতুনের ওপর অনুগ্রহের দৃষ্টি

বাদশাহ হারুন রশীদের স্ত্রী যুবায়দা খাতুন একজন ধার্মিক নারী ছিলেন। কুরআন পাকের সঙ্গে তাঁর গভীর মহব্বত ছিল, যার দরুন তিনি রাজমহলে তিনজন হাফেজা মহিলাকে মাসিক ভাতা নির্ধারণ করে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাদের কাজ ছিল শুধু কুরআন তেলাওয়াত করা। তাদেরকে তিনি তিন শিফটে বিভক্ত করেছিলেন। প্রত্যেক শিফটে একজন করে হাফেজা মহিলা মহলের প্রত্যেক কামরায় বসে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। ফলে চব্বিশ ঘন্টা রাজমহল থেকে কুরআন তেলাওয়াতের গুঞ্জন প্রকাশ হতো।

যুবায়দা খাতুন জানতে পারলেন, হজব্রত পালনের সময় মানুষ রাস্তায় পানি পায় না। অনেক সময় তৃষ্ণায় মানুষ প্রাণ হারায়। তিনি হজব্রত পালনের সময় সঙ্গে পানি নিয়ে যেতেন। বন্ধুগণ ! প্রত্যেক স্ত্রীই তার স্বামীর কাছে থেকে কোনো কিছু আদায় করে থাকে। তিনি কী আদায় করলেন? তিনি তার স্বামীকে বললেন, ওগো আমার জান! আমার হৃদয়ে একটি আকাঙ্ক্ষা আছে। অনুগ্রহপূর্বক আপনি আরাফার ময়দান পর্যন্ত একটি ছোট নদী খনন করিয়ে দিন, যাতে হজের মৌসুমে হাজীগণ এখান থেকে পানি সংগ্রহ করতে পারেন। বাদশাহ হারুন রশীদ তাঁর স্ত্রীর আবেদন পূরণ করলেন। একটি দীর্ঘ নহর খনন করে দিলেন, যা থেকে অসংখ্য প্রাণী, পাখি ও মানুষ পানি পান করছে, উপকার গ্রহণ করছে।

ভেবে দেখুন বন্ধুগণ! এক গ্লাস পানি পান করালে কত ছাওয়াব হয়। আর তিনি পানির একটি খাল তৈরি করে গেলেন জনকল্যাণে। হাদীছ শরীফে এসেছে, কেয়ামতের দিন এক জাহান্নামী ব্যক্তি একজন জান্নাতীকে দেখে চিনে বলবে, ভাই! আমি তোমাকে পৃথিবীতে পিপাসার সময় এক গ্লাস পানি পান করিয়েছিলাম। সে বলবে, হ্যাঁ ! তখন জাহান্নামী ব্যক্তি বলবে, ভাই ওই দিনের খাতিরে তুমি আজ আল্লাহর দরবারে আমার জন্য সুপারিশ করো। এক গ্লাস পানির বিনিময় ওই ব্যক্তি জাহান্নামী ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে। আল্লাহপাক তার সুপারিশ কবুল করে সেই বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ফয়সালা দেবেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর দরবারে এক গ্লাস পানির মূল্য কত!

বন্ধুগণ! মানুষ তো দূরের কথা যেকোনো প্রাণীকে পানি পান করানো অনেক ছাওয়াবের কাজ। হাদীছ শরীফে এসেছে, একমহিলা সারা জীবন

কবীরা গোনাহ করেছে। একদা কোথাও যাওয়ার সময় পথে পিপাসাকাতর একটা কুকুর দেখতে পেল। গ্রীষ্মকাল, প্রচণ্ড উত্তাপে কুকুরটা দীর্ঘ জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। কুকুরের এই অবস্থা দেখে মহিলার হৃদয়ে শিহরণ জাগল। সে তার ওড়নায় কোনো কিছু বেঁধে (নিকটতম কূপ থেকে) পানি উঠিয়ে কুকুরকে পান করাল। পানি পান করে কুকুর শান্ত হলো। মহিলার এ সামান্য কর্ম আল্লাহর দরবারে পছন্দ হয়ে গেল। আল্লাহর রহমতের সাগর উথলে উঠল। এক তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে আল্লাহ তা'আলা তার জীবনের সমস্ত কবীরা গোনাহ ক্ষমা করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ! বন্ধুগণ! এবার ভেবে দেখুন, তৃষ্ণার্তকে পানি পান করানো কত মহৎ কাজ!

যুবায়দা খাতুন অসংখ্য মানুষকে পানি পান করানোর ব্যবস্থা করলেন। তার ইন্তেকালের পর কেউ তাকে স্বাপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, যুবায়দা! তোমার কী হয়েছে? তিনি কললেন, আল্লাহর রহমত। স্বপ্নদ্রষ্টা বললেন, এটা তো হবেই। কারণ, তুমি একটি নির্ঝরিনি তৈরি করে অনেক বড় জনহিতকর কাজ করেছ। তোমার পুরস্কার এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। যুবায়দা বললেন, না ; আমার পুরস্কার নহরের বিনিময়ে নয়। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, তবে কিসের ?। তিনি বললেন, আমার খাল খননের আমল যখন আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়, তখন আল্লাহপাক বললেন, যুবায়দা! তোমার কাছে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের টাকা ছিল। তাই জনকল্যাণে খাল খনন করিয়েছ। সেই টাকা না থাকলে তুমি একাজ করতে পারতে না। এটা কোনো মহৎ কাজ হলো না। বলো, আমার জন্য তুমি কী করেছ? তিনি বলেন, একথা শুনে আমি অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে গেলাম। আমার কাছে তো এমন উল্লেখযোগ্য কোনো নেক আমল নেই।

আমার এ শঙ্কিত অবস্থায় আল্লাহপাকের অনুগ্রহের দৃষ্টি আমার ওপর আলোকপাত করল। আল্লাহপাক বললেন, হ্যাঁ যুবায়দা ! তুমি আমার জন্য একটি কাজ করেছ। সেই আমলটি হচ্ছে একদিন তুমি খাবার খাচ্ছিলে। ক্ষুধার প্রচণ্ড তাড়না ছিল। খাওয়ার জন্য লুকমা উঠাচ্ছিলে। এমন সময় মসজিদে আযান শুরু হলো। মাথায় কাপড় ঠিকমতো দেওয়া ছিল না। তাই তুমি মনে-মনে ভাবছিলে, আল্লাহর নাম ধ্বনিত হচ্ছে আর আমার মস্তক অনাবৃত রয়েছে। এমতাবস্থায় তুমি হাতের লুকমা নিচে রেখে শিরাবৃত করেছিলে। আমার নামের সম্মানে নিজের ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও আহারে বিলম্ব করার কারণে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহপাক দেখেন, আমার সন্তুষ্টির জন্য কী করা হয়েছে। দেখুন, যুবায়দার এ আমল বাহ্যিক দৃষ্টিতে সামান্য দেখায়। কিন্তু আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য হওয়ার দরুন আল্লাহ্ তা'আলা তার কত মূল্যায়ন করেছেন?

একজন মূর্তিপূজকের ডাক ও তার মূল্যায়ন

এক মূর্তিপূজক হতাশ হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে সারা রাত নিজের দেবতার সম্মুখে প্রার্থনা করছে। সে মূর্তির সামনে يا صنم يا صنم হে দেবতা, হে দেবতা বলে ডাকছে। পরিশেষে তার তন্দ্রা এসে গেল। এই অবস্থায় তার মুখে صنم এর পরিবর্তে صمد (আল্লাহপাকের গুণবাচক নাম) উচ্চারিত হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গেই আল্লাহর রহমত বাঁধভাঙা তরঙ্গের রূপ ধারণ করল। আল্লাহপাক বললেন, لبيك يا عبدى (আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হে আমার বান্দা!)) বলো, তোমার প্রয়োজন কী? তুমি কী চাও? ওই বান্দার ডাকে সাড়া দেওয়াতে ফেরেশতারা হতবাক হয়ে বললেন, হে আল্লাহ! সে তো একজন মূর্তিপূজক। সারা রাত সে তার দেবতার নামে তাছবীহ পাঠ করছে। এখন ঘুমের তাড়নায় উদাসীন অবস্থায় তার মুখে صمد নাম উচ্চারিত হচ্ছে। আর আপনি তার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন? ফেরেশতাদের কথার জবাবে আল্লাহপাক বললেন, সে একজন মূর্তিপূজক। সারা রাত তার দেবতার নামের তাসবীহ পাঠ করছে সত্য। কিন্তু সেই দেবতা তার ডাকে সাড়া দেয়নি। বর্তমানে তন্দ্রার অজ্ঞানতায় সে আমার নাম يا صمد (হে অমুখাপেক্ষী) বলে ডাক দিয়েছে। এখন যদি আমিও সাড়া না দেই, তাহলে তার দেবতা ও আমি মহা মহিয়ানের মধ্যে পার্থক্য রইল কোথায়? আল্লাহু আকবার! যে মহান স্রষ্টা এমন মূল্যায়নকারী, আমরা তার মূল্যায়ন করতে চাই কি চাই না। আমাদের জন্য তার মূল্যায়ন একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

ভিত্তিহীন কিসসা

মাসিক আল কাউসার, বর্ষ:১৯
সংখ্যা: ০৭,২০২৩

পুরস্কারের আদেশ

একজন জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছের ঘটনা। তিনি মারা যাওয়ার পর কেউ তাঁকে খাবে দেখে বললেন, হুজুর! আপনি তো খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ ছিলেন। সে ইল্‌মের বিনিময়েই তো আপনার ক্ষমা ঘোষণা করা হবে। তিনি বললেন, ভাই! ইল্‌মের কারণে আমাকে ক্ষমা করা হয়নি। আমার ছোট্ট একটি আমল ছিল, যার দরুন মহান আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেছেন। সে বলল, হুজুর!

সেই আমলটি কী? তিনি বললেন, আমি একদিন হাদীছ লিখছিলাম। দোয়াত থেকে কালি উঠানোর সময় একটা পিপাসাকাতর মাছি আমার কলমে বসে কালি পান করতে থাকে। মাছির কালি পান করা দেখে আমি লেখা বন্ধ করে অপেক্ষা করলাম। মাছিটা নিরাপদ অবস্থায় কলমের কালি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে চলে গেল। তারপর আমি পুনরায় লিখতে শুরু করি। আমার এই সামান্য আমলটুকু আল্লাহর দরবারে পছন্দ হয়ে যায়। এর খাতিরে আল্লাহপাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

সুবহানাল্লাহ! দেখুন, কত সাধারণ কাজ। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়ার কারণে আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়ে গেছে। আল্লাহপাক আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ

ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.) একটি বিস্ময়কর ঘটনা লিখেছেন। তিনি বলেন, একবার আমি কুরআন-হাদীছের আলোকে ওয়াজ ও নসীহত লিখছিলাম (মাকতুবাত শরীফ)। হঠাৎ আমার কলমের কালি বন্ধ হয়ে গেল। আমি বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ দ্বারা কলমের নিব ঠিক করে আবার লিখতে শুরু করি। কিছুক্ষণ পর নামাযের জন্য উজুর প্রয়োজন হলে আমি প্রকৃতির প্রয়োজন মেটাতে টয়লেটে যাই। ইস্তেঞ্জা করার জন্য আমি বসতে যাচ্ছি এমন সময় বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। আঙ্গুলে কলমের কালি দেখে আমি থমকে যাই। আমার হৃদয়ে এ অস্থিরতা বিরাজ করছে যে, এ কালি দ্বারা আমি কুরআন-হাদীছ লিখছি। এখন যদি আমি প্রকৃতির প্রয়োজন সেরে নিই, তাহলে পানি ব্যবহার করার সময় এ পবিত্র কালি অপবিত্র পানির সঙ্গে মিশে যাবে।

আমি ইস্তেঞ্জার হাজত দমন করে বের হয়ে গেলাম। তারপর সেই কালি পরিষ্কার করে পুনরায় পায়খানায় গিয়ে আমার প্রয়োজন পুরা করি। বাথরুম থেকে বের হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমার এলহাম হলো (ওলীদের প্রতি ঐশী বার্তা) 'আহমদ সরহিন্দি! পবিত্র কালির প্রতি আজকের এ শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণের কারণে আমি তোমার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিলাম।'

বন্ধুগণ! দেখুন, আমলটি দেখতে অত্যন্ত ক্ষীণকায়। কিন্তু আল্লাহপাকের দরবারে সেটি অতিকায়। কেননা, সেখানে (আল্লাহর দরবারে) প্রত্যেকটি

আমল এই দৃষ্টিতে দেখা হয় যে, তা আমার জন্য করা হয়েছে কি-না? একমাত্র আল্লাহর জন্য আমল করাকে এখলাছ বা নিষ্ঠা বলে। বন্ধুগণ! মানবমনে এখলাছ নিজে-নিজে তৈরি হয় না; বরং প্রত্যেক কর্মে এখলাছের নিয়ত শিক্ষার মাধ্যম আসে।

অপরাধ রেকর্ডের পরিসমাপ্তি

বন্ধুগণ! একটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। পৃথিবীতে যদি কারও পক্ষ থেকে অপরাধ সংঘটিত হয় অথবা বাস্তবে অপরাধ করেনি; অথচ তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে, তাহলে আদালত সে বিষয়টি তদন্ত করে। তারপর যদি মামলা মিথ্যা সাব্যস্ত হয়, তাহলে বিজ্ঞ আদালত মামলা থেকে তাকে অব্যাহতি দেন। কিন্তু মামলার রেকর্ড আদালতে থাকে। এবার যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে আবেদন করে, মামলার রেকর্ডটি নিষ্পত্তি দিয়ে দিন, তাহলে আদালত বলবে, এট সম্ভব নয়। আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তাই আদালত তা খারিজ করে আপনাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। তবে এর রেকর্ড ফেলে দেওয়া যাবে না। কারণ, আদালতে এটাও একটা মামলা ছিল। বন্ধুগণ! দুনিয়ার আদালতের ব্যাপার এমনই হয়ে থাকে।

এখন একটু খেয়াল করুন। আল্লাহর আদালতের ফয়সালা দেখুন। কোনো বান্দা প্রকৃত অপরাধী ছিল। প্রমাণিত হয়েছে, সে অপরাধ করেছে। তারপর যদি সে আল্লাহর দরবারে অনুগ্রহের আপিল করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তাওবার বাক্যসমূহ পাঠ করে, তাহলে আল্লাহপাক তার তাওবা গ্রহণ করে শুধু তার অপরাধ ক্ষমা করেন না; বরং তার আমলনামা থেকে এই অপরাধের রেকর্ড মুছেও দেন। এমনকি তার আমলনামার লিপিকার ফেরেশতাদের স্মৃতিপট থেকেও এই অপরাধের কথা নিঃশেষ করে দেওয়া হয়, যাতে তারা কেয়ামতের দিন এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে না পারে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহপাক ক্ষমা চাওয়ার কেমন মূল্যায়ন করেন!

চিন্তার মুহূর্ত

প্রিয় ছাত্রগণ! যা কিছু করবে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য করবে। আল্লাহ তা'আলা যথাযথ মূল্যায়নকারী। আমরা অবমূল্যায়নকারী। আমরা এমন অবমূল্যায়নকারী যে, না পারি আল্লাহপাকের যথাযথ মূল্য দিতে, না পারি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপযুক্ত সম্মান দিতে।

তাই আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

'তারা আল্লাহর যথাযথ মূল্যায়ন করেনি।'[১৫১]

এমনকি আমরা আম্বিয়ায়ে কেরামেরও যথোপযুক্ত সম্মান দিতে পারিনি। আল্লাহপাক বলেন–

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

'পরিতাপ! বান্দাদের ওপর তাদের কাছে এমন কোনো নবী অতিবাহিত হয়নি, যাদের সঙ্গে তারা উপহাস করেনি।'[১৫২]

আদিযুগে নবীদের সঙ্গে বিদ্রূপ করা হতো। নবী (আ.)-এর সুন্নতের ওপর বিদ্রূপ করা হয়। উভয় কর্মের লক্ষ-উদ্দেশ্য এক হওয়ার দরুন অপরাধও সমান। বর্তমানে দেখুন, চেহারায় সুন্নত প্রতিষ্ঠা করা কত দুষ্কর হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেয়ামতের সন্নিকটে এমন যুগ আসবে, যখন সুন্নতের ওপর আমল করা এত কঠিন হবে, যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখা দুঃসাধ্য হয়। বর্তমান অবস্থা এমন হয়েছে যে, ঘরে সামান্য একটা কাঁচের গ্লাস ভাঙলে মা সন্তানের গায়ে চপেটাঘাত করেন। কিন্তু ওই সন্তান যদি নবীর সুন্নতকে জবাই করে, তবু মা-বাবা তাকে সামান্য সাবধানও করেন না। এতেই প্রতীয়মান হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নতের মূল্য মা-বাবাবর কাছে দুই টাকা মূল্যের গ্লাসের সমতুল্যও নয়।

বিয়ে-শাদীর সময় সবাইকে রাজি করানো হয়। ভাই-বোন, কাজিন, প্রতিবেশী সকলকে রাজি করানো হয়। তদুপরি ঘরের ভৃত্য ও গৃহপরিচারিকা যদি রাগ করে চলে যায়, তাহলে এদের পর্যন্ত লোকমারফত রাজি করানো হয় এবং বলা হয়, বিবাহের আয়োজন চলছে। আপনি মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রাজি হয়ে যান। এখন অন্য কোনো কথা শুনতে চাই না। আরে ভাই! বিবাহের সময় যেখানে গৃহকর্মীদের রাজি করানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রচেষ্টা চালানো হয়, সেখানে কি একবার একথা চিন্তা করা হয় যে, আমার মালিক রাজী আছেন কি-না? এটা চিন্তা করা হয় যে, আমাদের এ কাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাজী আছেন কি-না।

---

১৫১. সূরা যুমার : আয়াত ৬৭

১৫২. সূরা ইয়াছিন : আয়াত ৩০

বর্তমানে আমাদের ঘর, গলি, বাজার সবকিছুকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের কসাইখানা বানানো হয়েছে। আমাদের পরিবেশ কত সুন্নত জবাই করছে। এতে কি কোনো চোখ কোনোদিন অশ্রু ঝরাচ্ছে? কোনো চোখ কি রাত জেগে কাঁদছে? সন্তান রুজি করছে; তাতেই খুশিতে বাগবাগ। চাই হালাল রুজি করুক, চাই হারাম রুজি করুক সে দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

একলোক তার সন্তানের প্রশংসা করছে। এতে সে সামান্য পরিমাণ কার্পণ্য করে না। আমার ছেলে খুবই ভালো, ভদ্র। সে এমন দক্ষ যে, প্রতি মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা রুজি করে। এত কিছু বলার পর বলছে, সে উচ্চশিক্ষা হাসিল করেছে। ফলে সামান্য একটু ব্যাঘাত হয়েছে। সেটা কী। সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কথার অর্থ কী? সে বলল, ভাই! সে তো প্রকৌশলীর নতুন চিত্রে প্রকৃত মালিককে কিছুটা ভুলে গেছে।

বন্ধুগণ! ভেবে দেখুন, তার ছেলে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাসিক বেতন পায়। এতে সে কত খুশি! সন্তানের কত প্রশংসা করছে। অথচ তার সন্তান যে নাস্তিক হয়েছে, এতে তার সামান্য অনুভূতিও নেই। বলে, সামান্য অপরাধ; সে আল্লাহকে ভুলে গেছে। আসতাগফিরুল্লাহ!

বর্তমানে ওই যুগ চলছে। আজ যদি কাউকে বল, ইসলামি প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছি, তাহলে মানুষ অবাক হয়ে যায়। আল্লাহ জানেন, তারা কী করছে। বর্তমানে শবজিবিক্রেতার সম্মান রয়েছে। ভাঙা গাড়ির চালকের সম্মান রয়েছে। অফিসের পিয়নের সম্মান আছে। ঝাড়ুদার ও মেথরের সম্মান আছে। কিন্তু যদি জানতে পারে, লোকটি মাদারাসায় পড়ছে, তাহলে তার প্রতি সম্মানের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে না। বোঝা যায়, তারা লাঞ্ছনা আর বঞ্চনায় নিপতিত হচ্ছে। স্মরণ রাখবেন, বর্তমান যুগে ইসলামের ওপর জোরালো ভূমিকা রাখা আল্লাহপাকের বিশেষ পুরস্কার। আল্লাহর রহমত যে, তিনি আপনাদেরকে ধর্মের জন্য চয়ন করেছেন।

বাজারে সদাই কিনতে গেলে সেই বস্তুতে ত্রুটি থাকলে তা গ্রহণ করি না। সেই বস্তু ক্রয় করা কেউ পছন্দ করে না। পক্ষান্তরে আল্লাহপাকের রহমত দেখুন! তিনি বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন। তারপর তার মধ্যে যে ত্রুটি রয়েছে, তা-ও বর্ণনা করে দিয়েছেন।

خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا

'মানুষকে দুর্বলভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।'[১৫৩]

অন্যত্র বলেন–

وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا

'মানুষ ত্বরাপ্রবণ।'[১৫৪]

আরেক জায়গায় বলেন–

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا

'মানুষ সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে।'[১৫৫]

কোথাও বলেছেন–

اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا

'নিশ্চয় সে অকৃতজ্ঞ, মূর্খ।'[১৫৬]

বন্ধুগণ! মানুষের এত বিশাল বিশাল ত্রুটি রয়েছে। পণ্যে ত্রুটি থাকলে তা কেউ খরিদ করে না। পক্ষান্তরে মহা মহিম আল্লাহর অনুকম্পা দেখুন! মানুষের মধ্যে এত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তিনি একতরফা সদাই বানিয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন–

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ

'নিশ্চয় আল্লাহপাক জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনের জান ও মাল ক্রয় করেছেন।'[১৫৭]

এ বিষয়টি কোনো কবি তার ভাষায় বলেন–

تو بہ علم ازل مرا دیدی * دیدی آنگہ بعیب بخریدی
توبہ علم آں و من بعیب ہمہ آں * رد مکن آنچہ خود پسندیدی

---

১৫৩. সূরা নিসা : আয়াত ২৮
১৫৪. সূরা ইসরা : আয়াত ১১
১৫৫. সূরা মা'আরিজ : আয়াত ১৯
১৫৬. সূরা আহযাব : আয়াত ৭২
১৫৭. সূরা তাওবা : আয়াত ১১১

'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জ্ঞান দ্বারা দেখেছেন, আমার সকল দোষ-ত্রুটিসহ আমাকে অবলোকন করছেন। তারপরও আমাকে আপনি ক্রয় করেছেন। আপনি মহাজ্ঞানী। আমি অপরাধী হে আল্লাহ! এখন তা প্রত্যাখান করে দিয়ো না, যা তুমি নিজেই পছন্দ করেছিলে।

বন্ধুগণ! আপনাদের মহামহীয়ান পালনকর্তা দীনের জন্য নির্বাচিত করেছেন। আপনারাও দু'আর সময় এ কবিতাগুলো পাঠ করবেন।

বর্তমানে মানুষের ওপর যে অসংখ্য নেয়ামত রয়েছে, আদি যুগের লোকেরা তা চোখেও দেখত না। আমরা অমৌসুমি ফল খাচ্ছি। প্রাচীনকালে এ নেয়ামত আল্লাহপাকের বিশেষ বান্দাগণ পেতেন। এর আলোচনা পবিত্র কুরআনে এসেছে। হযরত মারয়াম (আ.) বে-মৌসুমি ফল পেতেন। এখন সাধারণ জনগণ পর্যন্ত অমৌসুমি ফলের জুস খাচ্ছে। এটাও ফল খাওয়ারই নামান্তর। হে আমার মালিক! আমাদের ওপর আপনার কত নেয়ামত রয়েছে। বর্তমানে কেউ অনাহারে মরছে না; বরং অধিক আহারে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি। ব্লাডপ্রেসার, ডায়বেটিস, হাই কোলেস্টরল ইত্যাদির মতো ধ্বংসাত্মক ব্যাধি অধিক আহারের কারণে সৃষ্টি হয়।

তাই বলতে হয় ভাই! বর্তমানে আল্লাহপাকের যে সমস্ত নেয়ামত রয়েছে, তা আগেকার যুগে ছিল না। কিন্তু বর্তমানে মানুষ যে রকম অকৃতজ্ঞ তা আগেকার লোকদের ছিল না। প্রত্যেক মানুষের মুখে আল্লাহপাকের অকৃজ্ঞতা; তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। তবে দু-চারজন ব্যতিক্রম। সামান্য উন্নতি-অবনতির ক্ষেত্রে আল্লাহপাকের প্রতি অভিযোগ পেশ করতে থাকে। কেউ মসজিদে নামাযে না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, শরীরটা কিছু খারাপ লাগছিল। সুস্থ হলে আসব। অপরজনকে প্রশ্ন করলে সে বলে, কিছু ব্যবসায়িক ঝামেলায় ছিলাম। সমাধান হলে আসব। এতে প্রতীয়মান হয়, কিঞ্চিৎ অসুস্থতা ও ব্যবসায় সামান্য ব্যাঘাত হলে আমরা সর্বপ্রথম যে দুয়ার ভুলে যাই, তা হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহপাকের দুয়ার। এই হলো আমাদের অবস্থা। বকরিকে তার মালিক ডাক দিলে সে আহার ছেড়ে মালিকের কাছে উপস্থিত হয়। অথচ আমাদের সুস্পষ্টভাবে বলা হয়, এটা হারাম, এটা নাজায়েয, এটা অবৈধ। কিন্তু আমরা সবকিছু জেনেশুনে হারামের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারছি না। একারণেই আমরা অবমূল্যায়কারী।

নিকটতম আত্মীয়দের সম্মান করো

বর্তমানে আমাদের স্বভাব এমন হয়েছে যে, অন্যের সম্মান করা আমাদের জন্য কঠিন হয়েছে। যে সমস্ত আত্মীয়ের সঙ্গে মহান আল্লাহ সম্পর্ক জুড়তে আদেশ দিচ্ছেন, আমরা সর্বপ্রথম সেই আত্মীয়তার রজ্জুতে বিচ্ছেদের কাঁচি চালনা করি। আমাদের এই চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন–

وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ

'এবং তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের সাথে, যাদের প্রতি সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ আল্লাহপাক দিচ্ছেন।'[১৫৮]

আমরা মাতাপিতা, ভাই-বোন কারও সম্মান করতে জানি না। বড় ভাই ছোট ভাইকে পিতার মতো লালনপালন করে। কিন্তু যখন ছোট ভাই যৌবনে পদার্পণ করে, তখন তুচ্ছ্য বিষয়ের জের ধরে বড় ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। যে রক্তঝরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছোট ভাইকে পিতৃতুল্য স্নেহ-মমতা দিয়ে প্রতিপালন করেছে, বছরের পর বছর পরিশ্রম করে তার সুখের ভাবনায় এম.এ পর্যন্ত লেখা পড়া করাচ্ছে। হাজারটা বাছাই করে অপরূপ রমণীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বাড়িঘরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, আজ স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কথায় ওই ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে ছোট ভাই পছন্দ করছে না। কিছু-কিছু ঘরের প্রতি সামান্য আলোকপাত করে দেখুন।

বোন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছে না। ভাই বোনের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হচ্ছে না। সন্তান তার বাবার সঙ্গে কথা বলছে না। পিতা তার সন্তান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখছে। প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর ছায়াও দেখতে পারছে না। শাশুড়ি বউয়ের সঙ্গে কথা বলে না। বউ তার শাশুড়ির দিকে তাকাচ্ছে না। ভাবি ননদের সঙ্গে কথা বলে না। ননদ তার ভাবির সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি কোথাও-কোথাও স্বামী-স্ত্রীতে পর্যন্ত কথা হচ্ছে না। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ। স্বামীকে প্রশ্ন করলে স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ। অথচ ওই স্বামী মারা গেলে স্ত্রী বসে-বসে নিরালায় অশ্রু ঝরায়। এখন কাঁদছ কেন? জিজ্ঞাসা করলে বলবে, হে বোন! সে তো আমার বাচ্চাদের পিতা ছিল। শেষ কথা হলো, সে আমাকে তার ছায়ানীড়ে ঠাঁই দিয়েছিল। আমাকে কেউ কিছু বলতে সাহস পেত না। আমি সসম্মানে জীবন

---

১৫৮. সূরা বাকারা : আয়াত ২৭

কাটাচ্ছিলাম। এখন তার স্বামীর কল্যাণসমূহ স্মরণ হচ্ছে। তদ্রূপ স্ত্রী মারা গেলে স্বামীও হতাশ হয়ে যায়। প্রশ্ন করলেন, এখন কাঁদছ কেন? তুমি তো বলতে, আমি তার ছায়াও দেখতে চাই না। সে বলবে ভাই! যা বলছেন সবই সত্য। তবে সারকথা হলো, সে তো আমার সন্তানদের লালনপালন করত। ঘরের অভ্যন্তরীন চিন্তা আমার করতে হতো না। বাড়ির কোনো খবরবার্তা আমার থাকত না। তবু আমি ঘরের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত থাকতাম। বাড়িতে এলে প্রশান্তি লাভ করতাম। এখন তো আমার জন্য মসিবতের পাহাড় নেমে আসছে। এখন স্ত্রীর মর্যাদা অনুধাবন হচ্ছে।

ভাই! এই যে সম্মান ও মর্যাদা আমরা মৃত্যুর পর প্রকাশ করলাম, এটা কি মৃত্যুর পূর্বে পারতাম না? এ সমস্ত অবমাননার মূল কারণ হচ্ছে আমরা নেয়ামত থাকতে তার কদর বুঝি না। আর যখন তা হারিয়ে যায়, তখন তার মর্যাদা অনুভব হয়।

পশ্চিমাদের অভ্যাস হলো, তাদের কেউ মারা গেলে তার সমাধিতে কয়েক টন পুষ্প স্থাপন করে। এ বিষয়ে এক কবি ইংরেজিতে একটি কবিতা লিখেছেন। পুরা কবিতা এখন শোনানোর সুযোগ নেই। প্রথম ছন্দটি শোনাচ্ছি। কবি বলেন–

Why do we wait till a preson die?

এটা কেমন কথা যে, কেউ মারা গেলে আমরা ফুল নিয়ে স্বাগত জানাই। আমরা কেউ মারা যাওয়ার অপেক্ষা করছি কেন?

আরে ভাই! এই ফুল দেওয়ার অর্থ কী? তার জীবদ্দশায় ফুল দিলে সে-ও খুশি হতো; তুমিও ধন্য হতে। আমাদের এখানেও একটি প্রসিদ্ধ রয়েছে যে,

بندے دی قدر آندی اے مرگیاں یا ٹرگیاں

'মানুষের সম্মান তখনই বুঝে আসে, যখন সে মারা যায় বা কোথাও চলে যায়।'

এরকম ধারণা পোষণাকারী লোকেরা কাল্পনিক স্বর্গে বাস করে। আমাদের জন্য উচিত আমরা স্ত্রী-সন্তান, মাতাপিতা, ভাই-বোন ও আল্লাহ তা'আলার সকল নেয়ামতের সম্মান করব। ওস্তাদ, পীর ও নবীগণের সম্মান করব। আল্লাহপাকের যথাযথ মূল্যায়ন করব। অকৃতজ্ঞ যাতে না হই, সে জন্য প্রার্থনা করব। কেননা, মানুষ যখন নেয়ামতের অবমূল্যায়ন করে, তখন আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ বৃদ্ধি পায়।

মাতাপিতার সম্মান করা চাই। কেননা, মাতাপিতা হাড্ডিসার হয়ে কঙ্কাল হয়ে বেঁচে থাকাও সন্তানের জন্য রহমত। তারা যদি অচল হয়ে খাটের ওপর শুয়ে থেকে সন্তানের জন্য দু'আ করেন, তাহলে সন্তান সেই দু'আর প্রতিদান দিতে পারবে না। সন্তানদের জন্য তাদের অন্তর কী রকম অস্থির থাকে, তা একমাত্র তারা-ই জানেন। সন্তান এ বিষয়ে অবগত নয়।

শায়খের সম্মান ও মর্যাদা

সাধারণত দেখা যায়, পীর সাহেবের জীবদ্দশায় তাঁর মর্যাদা অনুভব হয় না। পীরের নির্দেশানুযায়ী আমল করার সুযোগ হয় না। যখন পীর সাহেব ইন্তেকাল করেন, তখন শিষ্যদের মধ্যে পীরের অনুভূতি উপলব্ধি হয়। এবার অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরিয়ে চোখ ফুলিয়ে নেয়। বলতে থাকে, আমার পীরের মতো কোনো পীর আমার নজরে আসে না।

দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসা থেকে হযরত হুসাইন আহমদ মাদানি (রহ.)-এর একছাত্র আমার মুরশিদ (রহ.)-এর খেদমতে শিক্ষার জন্য এসেছিল। তিনি মুসলিম শরীফ দরস দিতেন। সে আমার মুরশিদের কাছে দু-বছর থাকল। সকাল-সন্ধ্যা দরস শুনে আমার মুরশিদের প্রতি তার গভীর বিশ্বাস ও ভালোবাসা জন্মেছিল। এখানে থাকাকালীন সে ভাবত, হুজুরের কাছে মুরীদ হয়ে তাঁর কল্যাণ গ্রহণ করব। কিন্তু সে মুরীদ হয়নি। দু-বছর পর আমার মুরশিদের ইন্তেকাল হয়ে যায়। এবার সে হতাশায় পড়ল, এখন কী করি। কার কাছে মুরীদ হব। তাঁর মতো কোনো লোক তো আমার দৃষ্টিতে পড়ে না।

একথা ভেবে সে প্রায়ই সময় কাঁদত। অবশেষে আমার মুরশিদের খাদেমগণের কাছে এসে কেঁদে-কেঁদে বলত, জনাব! জীবনে যে ভুল করেছি, তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। যদি আমি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে একটা মাস কাটাতে পারতাম, তাহলে সম্ভবত আমার আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন হয়ে যেত। এতেই আমি ধন্য হতাম। তার সেই কান্নার কথা আমার আজ মনে পড়ে। তার কথা স্মরণ হলে আমার অনুভূতি হয় যে, নেয়ামতের কদর সময় থাকতে করা দরকার। এটাই সর্বোত্তম উপদেশ। আমার একথা যদি বুঝে থাক, তাহলে মনে করবে, এখানে আগমনের উদ্দেশ্য তোমার অর্জিত হয়েছে।

ওস্তাদ ও পীরের প্রতি অশুভ ধারণা

বর্তমানে আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে যে, আমার যে ওস্তাদ ও পীরের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করি, তাঁকেও যথাযত সম্মান দেই না। সামান্য ব্যাপারে আমরা তার প্রতি কুধারণা করে বসি। অথচ এ বিষয়ের ওপর আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ থাকে না।

একটি অগ্রাহ্য আমলের পরামর্শ

একদা হারাম শরীফে জনৈক ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলল, হুজুর! আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে। তবে কিঞ্চিৎ অশুভ ধারণাও আছে। আমি বললাম, আল্লাহপাক সেই ধারণা সংশোধন করুন। অনুগ্রহপূর্বক যদি খুলে বলেন, তাহলে আপনাকে আমার খুব হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করব। সে বলল, হুজুর! আমার কুধারণাটা হলো, আপনি যখন বয়ান করেন, তখন মানুষ সঙ্গে-সঙ্গে কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা করার পূর্বেই তাওবা করা ও মুরীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। আর আপনি সেই মাহফিলেই মুরীদ করে নেন। আমার কথা হলো, যদি দু-চার দিনের সময় দিতেন আর তারা কিছু ভেবেচিন্তে প্রস্তুতি নিত, তাহলে ভালো হতো।

বন্ধুগণ! একটু ভেবে দেখুন, সে যেন আমাকে এমন সময়ে বিলম্বের পরামর্শ দিচ্ছে, যখন আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হচ্ছে। যখন গোনাহে মরিচাধরা পাষাণ হৃদয় মোমের মতো বিগলিত হচ্ছে। বান্দা যখন গোনাহ থেকে তাওবা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এমতাবস্থায় প্রতারণা দেওয়ার জন্য শয়তানকে দু-চার দিনের সুযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। পরে এলে মুরীদ করব; অথচ তখন সে আগা-মাথা কিছুই বুঝবে না। আমি বললাম, জনাব আমি ভেবেছিলাম কী জানি আপনি কেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দেবেন। আল্লাহপাক সঠিক অনুভূতি দান করুন।

আমি তাকে বললাম, ভাই! অন্তরের সম্পর্ক আল্লাহপাকের সঙ্গে স্থাপন করা কারও ইচ্ছাধীন নয়। যখন আল্লাহপাকের বিশেষ রহমত নাযিল হয়, তখনই তা সম্ভব হয়। দয়া করে আপনি কারও সঙ্গে কিছু সময় কথা বলে উপস্থিত তাকে তাওবা করার জন্য প্রস্তুত করে দেখুন। সে বলল, আমি সারা জীবন উপদেশ দিলেও কেউ কথা শুনবে না। আমি বললাম, সত্যই বলেছেন। এ বিষয়টি কারও অধীনে নয়। বক্তাও আল্লাহর কাছে থেকে চেয়ে নিষ্ঠার সাথে বলতে হবে এবং শ্রোতাও মনোযোগ দিয়ে শুনে আল্লাহর কাছ

থেকে চেয়ে নিতে হবে। তারপর যখন হৃদয়ের আবেগের সাথে বলা হয় এবং শোনা হয়, তখন একসময় আল্লাহপাকের রহমত উত্তাল হয়ে পাষাণ হৃদয়কে মোমে পরিণত করে তাওবার জন্য প্রস্তুত করে। এটাও আল্লাহ তা'আলার এক মহা মূল্যায়ন।

নেয়ামতে অকৃজ্ঞতার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আল্লাহর নেয়ামতের শোকর নেয়ামত থাকা অবস্থায় করা প্রয়োজন। এমন যেন না হয় যে, নেয়ামতের শুকরিয়া না করার কারণে আল্লাহ রাগান্বিত হয়ে যান।

একমহিলা চুলায় রুটি পাকাচ্ছে। আল্লাহপাক তাকে একটি পুত্র সন্তান দিয়েছিলেন। সন্তান চলাফেরা করার মতো বয়স হয়েছে। মায়ের প্রতি তার গভীর টান ছিল। তাই সে সর্বদা মায়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকত। মা চাচ্ছিল, রুটি পাকানোর সময় সে কোথাও খেলাধুলায় থাকুক অথবা বিশ্রাম নেবে বা শুয়ে থাকবে। কিন্তু ছেলে বারবার মায়ের কাছে চলে আসে। একদা মা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিল। তাই ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে বলল, সাবধান! আজকে যদি আমার কাছে আস, তাহলে মার দেব। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাক।

তারপর মা রান্নার কাজ শুরু করল। কিছুক্ষণ পর ছেলে কাঁদতে-কাঁদতে মায়ের কাছে চলে এল। সে এক মূর্খ মহিলা ছিল। গোস্বার বলে বলে ফেলল– 'তারপরও ওঠে এলে? শুয়ে ছিলে; একেবারেই শুয়ে থাকতে।'

অর্থাৎ– আমি তোকে শুইয়ে দিয়েছিলাম। তুই চিরদিনের জন্য শুয়ে গেলে ভালো হতো।

আল্লাহ তা'আলা তার বদ দু'আ কবুল করে নিলেন। তবে ওই বাচ্চাকে সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু দেননি। ছেলে বড় হয়ে স্কুলে যাচ্ছে। প্রাইমারী শেষ করে উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ে কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করেছে। সকল পরীক্ষয় কৃতিত্বের সাথে পাশ করেছে। অধ্যায়ন শেষ করে উল্লেখযোগ্য একজন ব্যবসায়ী হয়েছে। সে অত্যন্ত সুদর্শন ও অপরূপ যুবক ছিল। রাস্তায় চললে লোকজন তার প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকত। লোকজন ঈর্ষা করে বলত, বাপের বেটা। যুবক হলে এমনই হওয়া চাই।

মা তার জন্য আত্মীয়তা করতে নিজের বংশের সকল শাখা-প্রশাখা খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিয়ের আয়োজন করা হচ্ছে। এখনও বিবাহ হয়নি। মাত্র এক-দুদিন বাকি। এমতাবস্থায় কোনো কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ যুবকের পা

পিছলে গেল। এতে তার ঘাড় ভেঙে সে চিরনিদ্রায় শুয়ে পড়ল। সন্তানের লাশ দেখে মায়ের ব্রেইন এ্যাটাক হয়ে গেছে। এমন সুদর্শন ছেলের বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে মা এখন পাগলির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শহরে, গ্রামে, অলি-গলিতে ঘুরছে। পাটকাঠি ও শুকনো ঘাস আর খরকুটা কুড়াচ্ছে। রাস্তার বখাটে ছেলেরা পাগলি বলে তার পিছু ধাওয়া করছে। অথচ সে প্রকৃত পাগল নয়। আল্লাহপাক তাঁর জালালিয়াত গুণের প্রকাশ ঘটিয়ে সেই মহিলার কাছ থেকে তার পুত্রত্বের নেয়ামত হরণ করে নিয়েছেন।

এতে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহপাক যেন তাকে বলছেন, ঠিক আছে; তুমি আমার প্রদত্ত নেয়ামতের না-শোকরি করে বদদু'আ করেছ, তুই শুয়ে ছিলে; চিরদিনের জন্যই শুয়ে থাকতে। অবশ্যই আমি তখন তাকে শোওয়াইনি; বরং তাকে পাখির মতো ওড়ার সুযোগ দিয়েছি। পরিশেষে যখন সেই ফল পরিপক্ব হবে, তখন আমি সেই সুসংহত ফল কেড়ে নেব। তখন বুঝতে পারবে, তুমি আমার নেয়ামতের অবমূল্যায়ন করেছিলে।

মহিলা তার ছেলের স্মরণে পাঠ করত–

এসেছিল সে মৎস্যস্বরূপ এ ভুবনে।
প্রভু তাকে নিয়ে গেলেন তরঙ্গে ভাসিয়ে যৌবনকালে স্বদেশপানে।
ছোট কম্বলে আবৃত রেখে যায় মোরে।
রাস্তার ওপরে, লাথি খেয়ে কাঁদছি আমি বুকে অশ্রু ঝরে।

বন্ধুগণ! এজন্যই সব সময় একটি কথা বলি যে, নেয়ামত চলে যাওয়ার আগে তার মূল্যায়ন করো। হরণ হওয়ার অপেক্ষা করো না। নেয়ামত একবার চলে গেলে অকৃতজ্ঞের কাছে আর ফিরে আসে না। তাই হাতে থাকতে নেয়ামতের মূল্যায়ন করতে অভ্যস্ত হও। দেখো, আমাদের কাছে অসংখ্য নেয়ামত রয়েছে। আমাদের ঘরবাড়ি , বিবি-বাচ্চা, মা-বাবা, ভাই-বোন, মুসলিম ভাই, সুস্থতা-প্রশান্তি, রিজিক সবকিছু আল্লাহর নেয়ামত। এগুলো আল্লাহপাক আমাদের দান করেছেন। আমাদের এগুলোর মূল্যায়ন করা চাই।

বদ-দু'আ দেওয়া ও গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকো

বন্ধুগণ! বর্তমানে আমরা অকৃতজ্ঞতামূলক অপরাধ থেকে তাওবা করা দরকার। কেননা, বাস্তবতাও এই যে, কথায় বলে, যার নুন খাও তার গুণ

গাও। যদিও আমরা আল্লাহর আহার্য খেয়ে থাকি আর মানুষের কাছে হাত পাতি। কোনো সামান্য কথার জের ধরে ভাইকে অভিসম্পাত করি। আপনি বিভিন্ন ঘরে খোঁজ নিয়ে দেখুন, ভাই তার বোনের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করছে না। শৈশবে তারা সাধারণ কথা নিয়ে ঝগড়া শুরু করে। ভাই বোনের চেয়ে সরল হওয়ার কারণে বোনের কাছে থেকে বস্তু ছিনিয়ে নেয়। মাঝে-মাঝে থাপ্পরও মারে। তারপর বোন প্রতিশোধ নিতে না পেরে অভিশাপ দেয়। এতে কি বোন চিন্তা করে যে, আজ আমি যে ভাইকে অভিশাপ দিচ্ছি, যদি সেই অভিসম্পাত আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়, তাহলে আমার ভাইয়ের পরিণাম কী হবে? ফলে যখন ভাই সেই অভিসম্পাতে গ্রেফতার হয়, তখন বোন পুনরায় আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে, হে আল্লাহ! আমার ভাইকে সুস্থতা দান করো, তার ব্যবসায় বরকত দাও। আমার ভাইয়ের অমুক পেরেশানি দূর করে দাও। এতে কি বোন বুঝতে পারে যে, আমার ভাইয়ের এ বিপদ আমার সেই বদদু'আর ফসল?

দয়াবান প্রভুর মায়াময় সংবাদ

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! অসীম করুণাময় আল্লাহর তা'আলা বান্দাদেরকে তাঁর দরবার থেকে রিক্ত হস্তে ফিরিয়ে দেন না। উচিত ফয়সালা তো এটা ছিল যে, বান্দা যখন আল্লাহপাকের দরজা থেকে বিমুখ হয়, তখন আল্লাহপাকও দুয়ার বন্ধ করে পেছন থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া। যাও গিয়ে ধ্বংস হও। কিন্তু মহামহিম মালিক তা করেন না; বরং মানুষ তাঁর দরবার থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলে তিনি পেছন থেকে আদুরে সুরে বান্দাদের আহ্বান করেন। আল্লাহপাক বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۝

'হে মানবজাতি! মহামহিম প্রভুর দরবার থেকে কোন জিনিস তোমাদের প্রতারণা দিয়ে দূরে সরাচ্ছে?'[১৫৯]

প্রতারণায় গ্রেফতার হচ্ছ কেন? কেন দুনিয়ার জীবনে মত্ত হচ্ছ? মানুষের প্রতি কেন আকৃষ্ট হও? নশ্বর আড়ম্বরের পেছনে দৌড়াচ্ছ কেন? আরে! স্বল্প টাকার পিছু পলায়নকারী! তোমার প্রভু তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি চান, তুমি তাঁর নিকটে আস।

---

১৫৯. সূরা ইনফিতার : আয়াত ৬

আর দুনিয়াবাসী বলে–

میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے
انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آو

'আমার বাড়ির রাস্তায় কোনো ছায়ানীড় নেই। চাই তুমি যেকোনো প্রকার বালুকাময় পাথুরের পথ ভ্রমণ করে আস।'

ভাই! এই হলো দুনিয়াদারের কথা। আল্লাহপাকের আচরণ ভিন্ন। তিনি বলেন, হে আমার বান্দা! তুমি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হলে আমার রহমত তোমার দিকে দুই বিঘত অগ্রসর হয়। তুমি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হলে আমার রহমত তোমার প্রতি দুহাত অগ্রসর হবে। তুমি আমার প্রতি হেঁটে-হেঁটে অগ্রসর হলে আমার রহমত দৌড়ে গিয়ে তোমাকে স্বাগত জানায়। তোমার প্রভু তোমার দিকে চেয়ে আছেন। তুমি কবে তাওবা করবে? তুমি কখন তোমার প্রভুর সঙ্গে সন্ধি করবে। তুমি গোনাহের কাজ কখন পরিত্যাগ করবে? কবে শয়তানের দুয়ারে লাথি মেরে দয়াময়ের দরবারে উপস্থিত হবে।

মা যেমন তার ছেলে রাগ করে চলে যাওয়ার পর সন্তানকে পেছন থেকে মায়াময় স্বরে ডাক দেয়, হে আমার আদরের দুলাল! তুমি আম্মুর সঙ্গে অভিমান করে কোথায় যাচ্ছ, তেমনি আল্লাহপাকও স্নেহ-মমতায় ভরা সোহাগিনীর স্বরে মানুষদের আহ্বান করেন–

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝

'হে মানুষ জাতি! মহামহিমের দরবার থেকে তোমাদের কোন বস্তু ধোঁকা দিচ্ছে?'[১৬০]

দয়াময় প্রভুর অনুগ্রহের পরিসীমা

বান্দা নব্বই বছরে পদার্পণ করলে তার কোমর বাঁকা হয়ে যায়। শরীরটা হাড্ডিসার কংকাল হয়ে যায়। উদরে নাড়িভুঁড়ি শুকিয়ে যায়। মুখের শোভা দাঁত পড়ে যায়। ফলে মানুষ তার কথা শোনা বরদাশত করতে পারে না। সর্বদা উচ্চৈঃস্বরে কাশে। মানুষ তাকে কাছ থেকে তাড়িয়ে দেয়। পরিবারের কেউ তার মূল্যায়ন করে না। কেউ তাকে ডেকে নিয়ে কাছে বসায় না। কেউ

---

১৬০. সূরা ইনফিতার : আয়াত ৬

সোহাগ দেখায় না। ওই সময়ও যদি সে উপলব্ধি করতে পারে, আমি সারাটা জীবন গোনাহ করে আমার মালিককে অসন্তুষ্ট রেখেছি, এখন আমার মালিককে আমি খুশি করতে চাই। লাঠিতে ভর করে কাঁপতে-কাঁপতে প্রভুর দরবারে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চায় আর বলে, হে আমার মালিক! আমি এযাবৎ আপনাকে ভুলেই জীবন কাটিয়েছি। হে আল্লাহ! আমি অনেক দূরের পথ অতিক্রম করে অনেক বিলম্বে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমি কোনো নামায আদায় করিনি। সারাটা জীবন গোনাহে অতিবাহিত করেছি। হে আল্লাহ! দুনিয়ার জন্য আমার যৌবন বিসর্জন দিয়েছি, সম্পদ বিসর্জন দিয়েছি, আমার সৌন্দর্য বিলীন হয়েছে। তবু পৃথিবীতে আমার কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী নেই। হে আমার মালিক! পরিশেষে আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। তখন আল্লাহপাক তাকে একথা জিজ্ঞাসা করেন না, হে আমার বান্দা! এখন কিসের আশায় এসেছ? তোমার কাছে কী আছে? বরং পরম করুণাময় খোদা তার আগমনের মূল্যায়ন করে বলেন, শেষ পর্যন্ত আমার বান্দা আমার কাছে উপস্থিত হয়েছে। আমি তোমার আগমন গ্রহণ করলাম। আর প্রতিদানে শুধু তোমাকে ক্ষমাই করলাম না; বরং আমি মহান করুণাময় তোমার জীবনের সমস্ত অপরাধ নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ!

দয়াময় প্রভুর আরও করুণা দেখুন! যদি কোনো বান্দা কবীরা গোনায় লিপ্ত হয়ে সত্য মনে তাওবা করে, তাহলে তাওবার পর কেউ তাকে গোনাহগার বলে তিরস্কার বা শাস্তি দিতে পারবে না। হাদীছ শরীফে এসেছে, 'যে বান্দা কবীরা গোনাহ করার পর সত্যিকারের তওবা করেছে; তারপর যদি কেউ তাকে গোনাহের শাস্তি দেয়, ভর্ৎসনা করে, তাহলে ওই লোক ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ-না সে এ গোনাহে লিপ্ত হবে।' মহামহিম খোদা গোনাহ তো ক্ষমা করেছেনই; সাথে-সাথে ভর্ৎসনাকারীদের মুখও বন্ধ করে দিয়েছেন। এতে বোঝা যায়, আল্লাহ বলছেন, তোমরা আমার বান্দাকে ধিক্কার দিচ্ছ কেন? সে তো আমার সঙ্গে আপস করে নিয়েছে। কেন তাকে ভর্ৎসনা দিচ্ছ? সাবধান! এমন কাজ কেউ করবে না। যদি কর, তাহলে জেনে রেখো, আমি তোমাকে সেই অপবাদে রঙিন করে গোনাহের লাঞ্ছনা দেখাব।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, কোনো মজলিসে একজন লোকের তাওবা কবুল হলে তার বরকতে আল্লাহপাক ওই মাহফিলের সমস্ত লোকের তাওবা কবুল করে নেন।।'

এক হাদীছের ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায়, কোনো এক সময় হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ সময় ওয়াজ করেছিলেন। ফলে এক সাহাবীর মধ্যে কান্নার ভাব প্রকাশ পায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আজকে এ সাহাবীর কান্না আল্লাহপাকের এমন পছন্দ হয়েছে যে, তার বরকতে এ মাহফিলে যা কিছু চাওয়া হয়েছে, আল্লাহপাক সবকিছু কবুল করে নিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!

কোনো এক কবি কী অপূর্ব বলেছেন–

بیگنا ہوں میں چلازاہد جواس کوڈھونڈنے

مغفرت بولی ادھر آمیں گناہ گاروں میں ہوں

وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر

چیخ اٹھا ہر بیگناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں

'খোদাভীরুগণ নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও চিৎকার করতে থাকবেন। যা তারা সন্ধান করছেন, তা হলো মাগফিরাতের কোলাহাল। এদিকে আসো; আমিও গোনাহগার। এই বিস্ময়কর অবস্থা মহান প্রভু হাশরের দিন দেখবেন। প্রত্যেক নিষ্পাপ ব্যক্তি চিৎকার করে বলবে, আমিও একজন অপরাধী।'

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত ওমর (রাযি.)-এর যমানায় এক বৃদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে সে তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য হয়। প্রথম যুগে সে একজন গায়ক ছিল। এ কর্মেই সে তার জীবন ব্যয় করেছে। তার কণ্ঠস্বর মধুর ছিল। সে গান গাইলে লোকজন তার জন্য পাগলপারা হয়ে যেত। সংগীত পরিবেশনের সময় তার ঘরে হাজারো মানুষের সমাগম হতো। এতে তার প্রচুর ইনকাম হতো। সে নিঃসন্তান ও স্ত্রীহারা ছিল। বার্ধক্যে উপনীত হলে লোকটির দাঁত পড়ে যায়। ফলে মধুর সুরে সংগীত পরিবেশন করতে পারে না। আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষ নিঃস্ব হয়ে রাস্তায় নামে। কিছুদিন পর্যন্ত পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের কাছে গিয়ে কিছু আহার্য সংগ্রহ করেছে। এক সময় এমন হলো যে, তারাও তাকে তিরস্কার করে তড়িয়ে দিচ্ছে। বন্ধু-বন্ধুবের দুয়ার থেকে ধিক্কার খেয়ে অনেক দিন অনাহারে কাটাতে হয়েছে। যৌবনকালের কথা স্মরণ করে আর নির্জনের চোখের পানি ফেলে। হায়! আমি এত সুদর্শন ছিলাম। কোকিলকণ্ঠের অধিকারী ছিলাম। আমার গান শুনে হাজারো মানুষ ব্যাকুল

হয়ে যেত। আমার ঝলক দেখার জন্য অস্থির হয়ে যেত। কিন্তু আজ আমি ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে ঘুরে ফিরছি। আমাকে এক বেলার খাবার দিতে কেউ রাজি হচ্ছে না। এমন বার্ধক্যে দুর্বল ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় তার অন্তর কাতরাচ্ছে। একদা সে ভাবতে লাগলে, হায়! আমি যদি ওই সমস্ত রাতগুলো আল্লাহর জন্য জাগরণ করতাম, তাহলে অবশ্য তিনি আমাকে তাঁর দরবার থেকে তাড়িয়ে দিতেন না। কিন্তু আমি তো আমার জীবন শেষ করে দিচ্ছি। না আছে রূপ, না আছে গুণ, মালও নেই, মূল্যও নেই। এ অবস্থায় এখন আমার মালিককে কীভাবে রাজি করি।

একদা সেই ভাবনায় লোকটা জান্নাতুল বাকি নামক কবরস্তানে গিয়ে বসে নিজের যৌবনের কথা স্মরণ করছে আর কাঁদছে। কেঁদে-কেঁদে তাওবা করে বলছে, হে দয়াময় মালিক! আমার জীবন-যৌবন আমি নিঃশেষ করে দিয়েছি। এখন আমার কাছে কিছুই নেই, যা আমি আপনার সম্মুখে পেশ করতে পারি। আমার মুখে দাঁত নেই, পেটে আঁত নেই। অশীতিপর বৃদ্ধ লোক, লাঠিতে ভর করে চলি। জ্যোতি নেই নয়নে, শ্রবণশক্তি নেই কানে। হে আমার মালিক! এবার আমি লজ্জিত। কবরের পাশে বসেছি, যাতে স্বীয় কবরের নিকটবর্তী হয়ে যাই।

এ ঘটনাটি হযরত মাওলানা রুমী (রহ.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ওই লোকটি যখন নিজের কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত হয়ে কাঁদছিল, তখন তার নিদ্রা এসে যায়। কিছুক্ষণ পর সে জাগ্রত হলে দেখে, তার সামনের দিক থেকে একব্যক্তি আসছে। যখন দেখল, তিনি হচ্ছেন মুসলমানদের খলীফা হযরত ওমর (রাযি.), তখন সে ভয়ে মাথাটা কিছু দিয়ে লুকিয়ে ফেলল। কারণ, সে ভাবছিল, খলীফা ওমর আসছেন। তিনি সাধারণত আমার মতো লোকদের বেত্রাঘাতের শাস্তি দিয়ে থাকেন। এমন যেন না হয় যে, আমার কপালেও দোররা লেগে যায়। হযরত ওমর (রাযি.) তাকে দেখেও কিছু সামনে চলে গেলেন। তিনি তাকে অতিক্রম করে চলে যাওয়াতে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শান্ত হয়।

অল্পক্ষণ পরই হযরত ওমর (রাযি.) পুনরায় তার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। হযরত ওমর (রাযি.)-এর প্রত্যাবর্তন দেখে ভয়ে অতিশয় কাতর হয়ে তার গলাটা শুকিয়ে যায়, না জানি এবার আমার ভাগ্যে কী রয়েছে। হযরত ওমর (রাযি.) তার কাছে এসে মাথা থেকে গাট্টি নামিয়ে তার সম্মুখে রেখে বললেন, ভাই! এই নিন; খাবার খান।

সে তো হতবাক! খলীফা আমাকে খাবার দিচ্ছেন! সে জিজ্ঞাসা করল, আমীরুল মুমিনীন আপনি আমার জন্য খাবার নিয়ে এলেন কীভাবে? হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, ভাই! সকালবেলা আমি বিশ্রাম করছিলাম। চোখে ঘুম লেগে যাওয়ার পর স্বপ্নে দেখলাম, আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে আমাকে সংবাদ দেওয়া হচ্ছে, ওমর! আমার এক বন্ধু কবরস্তানে বসে হতাশায় ভুগছে। সে খুব ক্ষুধার্ত। যাও! তাকে খাবার খাইয়ে আসো। ঘুম ভাঙার পর আমার স্ত্রীকে বললাম, যে-খাবার আমাদের জন্য প্রস্তুত করেছ, তা দাও। তিনি খাবার বেঁধে দিলেন। আমি বললাম, এখন আমি আল্লাহর এক বন্ধুর কাছে যাচ্ছি। তাই আপনার খাবার হাতে না নিয়ে মাথায় বহন করে নিয়ে এলাম, যাতে আল্লাহর বন্ধুর যথাযথ সম্মান বজায় রাখা হয়।

একথা শুনে বৃদ্ধ বলল, হায়! সম্প্রতি আমি প্রভুর দরবারে তাওবা করেছি। আমার মালিক কতই-না দয়াময়! তিনি এত অপরাধ থাকা সত্ত্বেও আমার অনুতপ্ত হওয়াকে কবুল করেছেন। আর বর্তমান বাদশাহকে স্বপ্নে দেখাচ্ছেন, যাও, আমার বন্ধুকে খাবার দিয়ে আসো। হে আমার মালিক! তুমি কত দয়ালু।

লোকটি আল্লাহর দরবারে পুনরায় কাঁদতে শুরু করল এবং কাঁদতে-কাঁদতে সেখানেই হযরত ওমর (রাযি.) সম্মুখে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। আল্লাহু আকবার! তিনি কত মূল্যায়নকারী! আল্লাহপাক আমাদেরও তাওবার নেয়ামত দান করুন। আমীন।

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! যখন কোনো বান্দা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির সন্ধানে নিজের সুখ-শান্তি-বিশ্রাম বিসর্জন দেয়, তার সেই ত্যাগ অবশ্যই নবরূপ ধারণ করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা যথাযথ মূল্যায়নকারী। তিনি বান্দার কর্ম বিফল যেতে দেন না। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমাদের নারী-পুরুষ কারও আমল আমি বিফল যেতে দেই না। এখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গোত্রের ছাত্ররা এসেছে। যদিও ছাত্র অনুপাতে এখানে বাসস্থানের ব্যবস্থা সংকীর্ণ। তবে আমি তোমাদের বলছি, মাদরাসার জন্য জায়গা খুঁজছি। ইনশাআল্লাহ শ্রীঘ্রই তোমাদের খেলাধুলার জায়গারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

প্রতিষ্ঠান গাছপালার মতো হয়। ছোট চারাগাছ রোপন করলে তাতে চড়ুই পাখি বসলেও ভেঙে যায়। কিন্তু যখন সেটা বড় হয়, কাণ্ড ও ডালপালা বিস্তার করে, তখন তাতে পাখি কেন মানুষ এবং তার চেয়ে বড় প্রাণীও

ঝুলতে পারে। তবু তার ডালপালা হেলে না। প্রতিষ্ঠানও এমনই হয়। আমাদের এই দারুল উলূম জঙ্গ বর্তমানে শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করেছে। যৌবনকালের দিকে এগুচ্ছে। আমরা মহামহিম প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের এ প্রতিষ্ঠানের সুঠাম দেহের অধিকারী হিসেবে আমাদের দেখার তাওফীক দিন। আমীন।

মাদরাসার বিল্ডিং নির্মাণ করা সহজ কাজ। তবে খোদাভীরু ও মুখলিছ ওস্তাদ পাওয়া কঠিন। বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায়, মাদরাসার ভবন নির্মাণ হয়েছে। তবে তাকে মাদরাসার বলা হয় না। মাদরাসা হলো নিষ্ঠাবান শিক্ষক ও আনুগত্যশীল ছাত্রদের জামাতের নাম। তারা যেখানে বসবে, সেটাই মাদরাসা। আমরা সার্বক্ষণিক চেষ্টা করি, যাতে যোগ্য থেকে যোগ্যতর শিক্ষকের ব্যবস্থা করা যায়। এখানে তাদের বাসস্থানের সর্ব প্রকার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে তারা নিষ্ঠার সাথে শিক্ষা দিয়ে ছাত্রদের ইল্‌মি দক্ষতার উচ্চ শিখরে পৌঁছিয়ে দেন আর ছাত্ররাও পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। প্রতি বছর এক-দুজন শিক্ষক সেই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন। যেমন কোনো কবি বলেন–

میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر

لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا

'আমি একলা চলছিলাম গন্তব্যের দিকে। কিন্তু লোকজন এসে জড়ো হয়ে যায় আর কাজও সাধিত হয়ে যায়।'

আল্লাহপাক অনেক কাজ করিয়ে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে আরও বড় কাজ সমাধা হবে ইনশাআল্লাহ!

আমরা একটি জামাত। এক হলো ভিড়, এক হলো জামাত। ভিড়ের মধ্যেও অনেক লোক থাকে আবার জামাতেও অনেক লোক থাকে। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, ভিড়ের লোকজনের বিভিন্ন প্রকার মতামত থাকে। আর একটি জামাতের লোকজন ঐক্যবদ্ধ থাকে। আর সেই ঐক্যমতটি হলো আল্লাহপাক যেন আমাদের প্রতি রাজী থাকেন। তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আমরা এ সমস্ত কিতাবের শিক্ষা দেই। ওস্তাদের খেদমতে আমরা সময় ব্যয় করি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষে। আল্লাহকে খুশি করার জন্য পীরের দরবারে আমাদের আগমন। এতে প্রতীয়মান হয়, আমাদের কাজের মূল্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহপাকের মহা সন্তুষ্টি অর্জন করা।

আল্লাহপাক বলেন–

أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ

'খবরদার! খালিস দীন একমাত্র আল্লাহপাকের জন্য।'[১৬১]

আমি অধম সর্বদা এই ভাবনায় মগ্ন থাকি যে, কীভাবে আপনাদের সুখ-শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করা যায়। আর আপনাদের কাজ হলো ভালোবাসার আবেগে তাড়িত হয়ে ইল্‌মি পরিবেশ তৈরি করা, নিষ্ঠার সাথে আমলপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা, যিকিরের পরিবেশের ফুল ফোটানো। অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা, যাতে নিখুঁত হিসাবের দিনে আমরা আল্লাহর সামনে কৃতকার্য হই।

আমি অধম যত দূরেই থাকি, ছাত্র ও ওস্তাদদের জন্য দু'আ করি। এ অধমের সম্ভবত এমন কোনো রাতের তাহাজ্জুদ ছাত্র ওস্তাদের জন্য দু'আ থেকে খালি যায়নি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিয়ে থাকেন। এটি এই অধমের গুণ নয়। এ হচ্ছে মহাগুণীর গুণ। তিনি চাইলে অযোগ্যদের প্রতি নিজের রহমত বর্ষণ করতে পারেন। আমি একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, আপনাদের মধ্যে অনেকে আমার আত্মীয়। আমি তাদের ভালো করেই চিনি ও জানি। আমি তাহাজ্জুদের সময় আপনাদের জন্য এ পরিমাণ দু'আ করি, যা আপনাদের পিতারাও করেন না। আমি নিরবচ্ছিন্নভাবে দু'আ করছি। দু'আর সময় যদিও আপনাদের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয় না, তথাপি সকলের চেহারা আমার দৃষ্টিতে থাকে। ওস্তাদগণের নাম ও চেহারা তো আমার দৃশ্যে ভেসে ওঠে। ছাত্রদের মধ্যেও অনেকে আমার দু'আর অংশ পায়। আমার কাছে দেওয়ার মতো আছে শুধু দু'আ আর আল্লাহর দরবারে আছে অফুরন্ত বিশাল খাজানা।

নেয়ামতের বর্ণনা দেওয়ার পদ্ধতি অনুসরণে বলছি– অহমিকাস্বরূপ নয়। এ-বছর আমি অধমকে হজের সময় মুলতাযামে জড়িয়ে ধরে দু'আ করার তাওফীক দেওয়া হয়েছে। হাজরে আসওয়াদ ও কা'বা শরীফের দরজার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম মুলতাযাম। হাদীছ শরীফে এসেছে, এ স্থানে যে দু'আ করা হয়, তা কবুল হয়। অন্য হাদীছে এসেছে, যেব্যক্তি এই স্থান জড়িয়ে ধরেছে, সে যেন আল্লাহপাকের সঙ্গে আলিঙ্গন করেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্থানের সঙ্গে এভাবে জড়িয়ে থাকতেন,

---

১৬১. সূরা যুমার : আয়াত ৩

যেমন কোনো স্তন্যপায়ী শিশু তার মায়ের বুকের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। শায়খুল হাদীছ আল্লামা যাকারিয়া (রহ.) বলেন, আমাদের মধ্যে যারা-ই এই স্থান জড়িয়ে ধরে দু'আ করেছেন, প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন, তার দু'আ কবুল হয়েছে। তিনি বলেন, এ হাদীছের বর্ণনাকারীদের (সনদ) ক্রমধারা যে রকম ধারাবাহিকভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, তেমনি তার বাস্তব প্রমাণও বর্ণিত হয়ে এসেছে। তিনি বলেন, আজ আমি এ কিতাবে এই হাদীছখানা লিপিবদ্ধ করছি। সাথে-সাথে আমিও স্বীকার করছি, এ হাদীছের বাস্তব প্রমাণ আমি পেয়েছি। ওই স্থানের দু'আ আমার কবুল হয়েছে। এবার ভেবে দেখুন, এটি দু'আ কবুল হওয়ার কেমন জায়গা।

আলহামদুলিল্লাহ। ওই স্থানে দু'আ করা আমি অধমের সৌভাগ্য হয়েছে। সেখানে বিশ মিনিট পর্যন্ত আমি দু'আ করেছি, হে আল্লাহ! যেসমস্ত বান্দা আমি অধমের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক রাখে এবং যেসমস্ত ছাত্র-ছাত্রী আমি অধমের প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে, তাদের সকলকে আপনার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণের মধ্যে শামিল করুন। কেয়ামত পর্যন্ত যেসমস্ত বান্দা এ প্রতিষ্ঠানে দীনের ইল্‌ম হাসিল করবে, তাদের সবাইকে আপনার প্রিয় বান্দাগণের মধ্যে গণ্য করুন এবং আমাদের এ প্রতিষ্ঠানকে عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ (এটি একটি ঝরনা, যা থেকে নৈকট্যবান বান্দারা পান করবে।) এ আয়াতের যোগ্য পাত্র বানিয়ে দিন। আমাদের পূর্বসূরীগণ দূরে থেকে আমাদের জন্য দু'আ করতেন। আজ আমরা দূরে থেকে আমাদের বন্ধুবান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের জন্য দু'আ করি।

কোনো কবি বলেন–

دور بیٹھا کوئی تو دعائی دیتا ہے

میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے

'কেউ দূরে থাকলে সে দু'আ দেয়। আমি নিমজ্জিত হই সমুদ্র আমাকে ছুড়ে মেরে।'

আল্লাহপাক আমার সেই দু'আ কবুল করুন। গোনাহ থেকে দূরে থেকে তাঁর সন্তুষ্টিময় জীবন গড়ার সৌভাগ্য দান করুন। আমরা অবমূল্যায়নকারী আল্লাহপাক আমাদের মূল্যবোধ দান করুন। আমরা বাস্তবিকই আল্লাহপাকের যথোপযুক্ত সম্মান করিনি। আমরা এ বিষয়ে হতবাক যে, তিনি আমাদের

মতো মূল্যবোধহীনদের নেয়ামত দিয়ে থাকেন। তিনি এমন উৎসাহ প্রদানকারী সত্তা, যিনি আমাদের দোষত্রুটি গোপন রাখেন। ত্রুটিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও মানুষের মুখে আমাদের স্তুতি প্রকাশ করেন। হে আল্লাহ! আপনি সমস্ত ওস্তাদ ও ছাত্রদের পরিশ্রম কবুল করুন। আমাদের সবাইকে এক জামাত হিসেবে কবুল করে আপনার মকবুল বান্দাগণের মধ্যে শামিল করুন। আমীন।

এখলাছের বরকত

'আমলের গ্রহণযোগ্যতায় মানুষের নিয়তের বিশাল প্রভাব রয়েছে। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

'আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।'

নিয়ত পরিবর্তনের দরুন মানুষের আমলের পরিবর্তন ঘটে। তাই আমাদের নিয়তের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে চিন্তা করা দরকার। নিয়ত সঠিক করা আবশ্যক। কেননা, সঠিক নিয়তের কারণে ছোট-ছোট আমলে বিরাট প্রতিদান পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে নিয়তের সংশোধন না থাকার কারণে পাহাড়পরিমাণ আমলে ছাওয়াব হয় শূন্য।'

এখলাছের বরকত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ.

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

'তারা খাঁটি মনে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদাত করবে। এছাড়া অন্য কোনো আদেশ তাদের দেওয়া হয়নি।'[১৬২]

দীনের স্তর তিনটি

দীনের তিনটি স্তর রয়েছে। এগুলো জয় করে মানুষ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যবান হয়। যথা–

(১) প্রথম স্তর জ্ঞান অর্জন করা। ইল্‌ম একটি নূর (বাতি) যার দ্বারা মানুষ জীবনযাপনের নির্দেশিকা অর্জন করে। যদি ইল্‌মই না থাকে তাহলে আমল করবে কীভাবে? সুতরাং ইল্‌ম হলো ভিত্তি। এইমর্মে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

'ইল্‌ম হাসিল করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর একান্ত কতব্য।'

এর একটি উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যেক মানুষ ধর্মের ওপর জীবন যাপন করার জন্য যে-পরিমাণ ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন, সেই পরিমাণ ইল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ। পক্ষান্তরে দীনের সর্ব বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা শিক্ষা করা ফরজে কিফায়া। কিছু লোক সেই পরিমাণ শিক্ষা গ্রহণ করলেই সমাজব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়। সর্বকালে এরকম শিক্ষা গ্রহণকারী একটি জামাত থাকা দরকার। আর

---

১৬২. সূরা বায়্যিনা : আয়াত ৫

আপনার-আমার মতো লোকের একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়াদির জ্ঞান শিক্ষা করা অবশ্যক। স্মরণ রাখবেন, ফরজ বিধানের জ্ঞান শিক্ষা করা ফরজ। ওয়াজিব বিধানের জ্ঞান হাসিল করা ওয়াজিব। সুন্নত বিধানের জ্ঞান অর্জন করা সুন্নত।

(২) দীনের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করা। কেননা, ইল্‌ম শুধু শিক্ষা করাই যথেষ্ট নয়। শুধু জ্ঞানের বিনিময়ে যদি ক্ষমা পাওয়া যেত, তাহলে মিস্টার ইবলিস সবার আগে ক্ষমা পেয়ে যেত। কারণ, তার কাছে অঢেল ইল্‌ম ছিল। কিন্তু আমল ছিল না। স্মরণ রাখবেন, বান্দা তার ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ ইল্‌ম দান করেন। হাদীছ শরীফে এসেছে–

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللهُ تَعَالٰى عِلْمَ مَالَمْ يَعْلَمْ

'যেব্যক্তি তার ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ওই ইল্‌ম শিক্ষা দেন, যা সে জানে না।'

সাধারণত শয়তান ছাত্রদের অন্তরে এই কুমন্ত্রণা দেয় যে, এখন ইল্‌ম শিক্ষা করো; পরবর্তীতে একসঙ্গে এগুলোর ওপর আমল করবে। যে ছাত্র এমন ধারণা করবে, নিশ্চয় সে শয়তানের প্রতারণার শিকার। আমল করার একটাই পথ। এদিকে শিক্ষা করো; ওদিকে আমল করো। এ হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের আমল। হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাযি.) বলেন– আমি দুই বছরে সূরা বাকারা পড়েছি। তবে যেদিন আমার সূরায়ে বাকারা পড়া শেষ হয়েছে, সেদিন আমার আমলও সূরা বাকারার মতো হয়েছে। সুবহানাল্লাহ!

(৩) দীনের তৃতীয় স্তর এখলাছ। অর্থাৎ– যে আমলই করবে, তা একমাত্র আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য করবে। এ বিষয়টি খুবই কঠিন। শুনতেও সবাই পছন্দ করে না। তাই ইচ্ছা করছি আজকের মাহফিলে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। যেব্যক্তি এ স্তরে পা বাড়াবে আর তা হাসিল করার জন্য চেষ্টা করবে, সে অনুভব করতে পারবে, এ রাস্তায় পথ চলা কত কঠিন। আমল করা সহজ। কিন্তু আল্লাহপাকের পছন্দসই আমল করা খুবই কঠিন। এজন্যই আল্লাহপাকের প্রিয় বান্দারা আমলও করেন আবার ভয়ও করেন। তারা সারা জীবন তাহাজ্জুদ আদায় করেন; তবু বলেন–

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার যথোপযুক্ত ইবাদাত করতে পারেনি এবং আপনাকে পূর্ণরূপে চিনতে পারিনি।'

তারা সারা রাত তাহাজ্জুদ পড়েন আর সকালে উঠে অনুতপ্ত হন এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চান, যেন তারা সারারাত কোনো কবীরা গুনাহের লিপ্ত ছিলেন।

তাদের শানে আল্লাহপাকে বলেন–

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

'তারা রাতে অল্প বিশ্রাম করে আর ভোর রাতে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে।'[১৬৩]

তারা সারা রাত মহান স্রষ্টার সামনে ললাট অবনত করে রাখেন। তদুপরি প্রভাতে পরিতাপের দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলেন– যেভাবে মহা মহীয়ানের উপাসনা করা উচিৎ ছিল সেভাবে করতে পারিনি। এমনকি কোনো কিতাবে বর্ণিত আছে, কতক খোদাভীরু প্রত্যুষে হাত দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল আবৃত করে রাখতেন। কী জানি আমি মহান স্রষ্টার আরাধনা সঠিকভাবে করতে পারিনি বিধায় আমার চেহারা বিকৃত হয়ে যায়! সুবহানাল্লাহ! আমাদের বুযুর্গগণ তাঁদের কৃত আমল প্রত্যাখান হয়ে যাওয়ার ভয়ে যে-পরিমাণ আতঙ্কিত হতেন, আমরা আজ গুনাহের কাজ করে সেই পরিমাণ আতঙ্কিত হতে পারিনি।

আমলের গ্রহণযোগ্যতার জন্য নিয়তের প্রভাব

আমলের গ্রহণযোগ্যতায় মানুষের নিয়তের বিশাল প্রভাব রয়েছে। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

'আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।'

নিয়ত পরিবর্তনের দরুন মানুষের আমলের পরিবর্তন ঘটে। তাই আমাদের নিয়তের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে চিন্তা করা দরকার। নিয়ত সঠিক করা আবশ্যক। কেননা, সঠিক নিয়তের কারণে ছোট-ছোট আমলে বিরাট প্রতিদান পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে নিয়তের সংশোধন না থাকার কারণে পাহাড়পরিমাণ আমলে ছাওয়াব হয় শূন্য। সুতরাং নিয়ত সঠিক করা একান্ত কর্তব্য। এর কিছু উদাহরণ শুনুন।

---

১৬৩. সূরা যারিয়াত : আয়াত ১৭, ১৮

(১) শায়খুল হাদীছ হযরত যাকারিয়া (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন যে, এক আল্লাহর ওলী যমুনার তীরে বাস করতেন। একদা এক পথিক তাঁর সামনে এসে বলল, হুজুর! নদীর ওপারে আমার খুবই জরুরি কাজ আছে। আমি নদী পার হতে চাই। কিন্তু প্রচণ্ড তুফানের কারণে নদী উত্তাল হয়ে আছে। খেয়া পারাপার বন্ধ, কোনো নৌকা সেই পারে যেতে চাচ্ছে না। যাওয়া সম্ভবও নয়। আমি এখন কী করতে পারি। আমাকে একটু দু'আ করুন। বুযুর্গ বললেন, ঠিক আছে; যাও নদীর ধারে গিয়ে বল, হে নদী! আমি তোমাকে ওই লোকের পক্ষ থেকে জানিয়ে দিচ্ছি, যিনি জীবনে কোনো দিন স্ত্রী মিলন করেননি, জীবনে কোনো দিন আহার করেননি; তাঁর অনুরোধে তুমি শান্ত হয়ে যাও। আমাকে ওপারে যাওয়ার সুযোগ করে দাও। লোকটি বুযুর্গের কথামতো নদীর কূলে গিয়ে বাক্যগুলো বলার সঙ্গে-সঙ্গে নদীর উতলা স্তব্ধ হয়ে গেল। লোকটি শান্তশিষ্টভাবে নদী পার হয়ে গেল।

এদিকে ওই বুযুর্গের স্ত্রী তাঁর কথাগুলো শুনতে পেল। সাতটা সন্তানও আছে তার। এতে সে রেগে আগুন হয়ে গেল, কী আশ্চর্য কথা? লোকসমাজে আমাকে কলঙ্কিত করা হয়েছে। স্বামী ঘরে এলে স্ত্রী বলল– এই যে আপনি খাচ্ছেন আর মোটা হচ্ছেন। এ ব্যাপারটা আমি আপনার আর আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলাম। সে সম্পর্কে মিথ্যা বললে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমাকে জবাব দিন, আমার সঙ্গে মেলামেশা করা আপনি অস্বীকার করলেন কেন? আপনার এই সাতটা সন্তান কোত্থেকে এল? আপনি আজ আমাকে লোকসমাজে কলঙ্কিত করছেন! আমি এর জবাব চাই।

আল্লাহর ওলী নিজের কথাগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা তার স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, শোনো! আমি যখনই আহার করি, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছের প্রতি লক্ষ রেখে সেই নিয়তে আহার করি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার ওপর তোমার প্রাণেরও দাবি আছে। সুতরাং আমার প্রাণের হক বা প্রাপ্য আদায়ের নিয়তে আমি আহার করি। মনের স্বাদে আত্মতৃপ্তির জন্য আমি আহার করি না। সুতরাং এটা আমার খাওয়া নয়। এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছের আমল করে প্রাণের হক আদায় করা। তেমনিভাবে আমি যে সাত সন্তানের পিতা, তাও সত্য। কিন্তু তোমার সঙ্গে মিলনের সময় আমার অন্তরে সর্বদা এ নিয়ত থাকে যে, শরীয়ত আমাকে স্ত্রীর হক আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে। আমি এখন সেই হক আদায় করছি। আমার আত্মার মনোরঞ্জন বা যৌনচাহিদা পূরণের নিয়তে আমি তা করি না। যদিও অনেকবার আমি সে

কাজ করেছি, তবু আমার নিয়ত থাকে তোমার হক আদায় করা। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও আমার কথা মিথ্যা নয়।

দেখুন, নিয়তের পরিবর্তনের কারণে কোথাকার কর্ম কোথায় গিয়ে উন্নীত হয়। সুবহান্নাল্লাহ!

(২) আমি বড়-বড় ওলামায়ে কেরামকে দেখেছি, এক ঘন্টা-দুই ঘন্টা কাছে থাকলেও তাদের নীরব দেখা যায়। প্রয়োজন না হলে তারা কোনো কথা বলেন না। ইমাম আযম হযরত আবুহানীফা (রাযি.)-এর জীবনীতে আছে, তিনি প্রকৃতিগতভাবেই কম কথা বলতেন। কিন্তু কেউ যদি দীনের বিষয়ে কটাক্ষ করত, তাহলে দলীলের ভান্ডার পেশ করে দিতেন। ফলে কেউ তাকে স্তব্ধ করতে পারত না।

(৩) হযরত সৈয়দ যাওয়ার (রহ.)-এরও একটি অভ্যাস ছিল। তিনি অত্যান্ত বিজ্ঞ আলেম ও ফেকাহবিদ ছিলেন। তাঁর সংকলিত কিতাব 'উমদাতুল ফেকাহ' আজ বড়-বড় মুফতীগণের টেবিলে সাজানো থাকে। তাঁর অন্যতম অভ্যাস ছিল, কেউ তাঁর কাছে গেলে যতক্ষণ পর্যন্ত আগন্তুক প্রশ্ন না করবে, ততক্ষণ তিনি কথা বলবেন না। এতে এক-দুই ঘন্টা চলে গেলেও কথা বলবেন না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এত ইল্‌ম থাকা সত্ত্বেও এ দীর্ঘ সময় নীরব থাকেন কীভাবে? তবে যখনই কোনো প্রশ্ন করা হতো, তখন এমন বিশ্লেষণসহ উত্তর দিতেন যে, মনে হতো, সবে এ বিষয়ে কিতাব দেখে এসেছেন।

একদা ছাত্রদের একটি জামাত তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে সম্মিলিত কণ্ঠে আযানের মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করল। আগেকার যুগে স্পীকার ছিল না, মাকই ছিল না। বড়-বড় মসজিদে শত-শত লোকের জমায়েত হতো। ফলে প্রয়োজনমতো মুয়ায্‌যিনগণ সম্মিলিত কণ্ঠে আযান দিতেন। একে اذان جوق বা 'সম্মিলিত আযান' বলা হয়। বর্তমানে সাধারণত এ মাসয়ালার প্রয়োজন দেখা যায় না। তিনি সেই মাসয়ালার বিশ্লেষণ দিতে শুরু করলেন। আমরা দেখলাম, তিনি এ মাসয়ালার সমস্ত শাখা-প্রশাখার বিস্তারিত বিশ্লেষণ দিতে প্রায় দেড় ঘন্টা সময় আলোচনা করলেন।

আমি তাঁর সান্নিধ্যে এই চরিত্র পেয়েছি যে, আল্লাহরওয়ালাদের কথা বাক্যালাপ হয় না। তাঁদের কথা বিবিধ সমস্যার সমাধান হয়। তাঁরা ব্যক্তিগত কোনো কথা বলেন না। যদ্দুর সম্ভব তাঁরা নীরব থাকেন। কেননা, তাঁরা জানেন, নিজের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত কথা বললে পরকালে জিজ্ঞাসিত হব,

তুমি এমন কথা কেন বলেছিলে? আর যখন তাদের কোনো প্রশ্ন করা হয়, তখন তারা সেই প্রশ্নের জবাব দিতে আদিষ্ট হন। শরীয়ত বলে, তুমি তার প্রশ্নের উত্ত দাও। সুতরাং এখন উত্তর দিলে পরকালে জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং প্রতিদান পাবেন। সেই নিয়তেই তাঁরা কথা বলতেন।

আর আমাদের অবস্থা হলো, দুই অক্ষর পড়েই বাঁধভাঙা বাচালতায় লিপ্ত হয়ে যাই। এতে আমরা কুণ্ঠিত হই না। আমাদের এ অবস্থার কারণ হচ্ছে, আমাদের আমলনামা সম্পর্কে আমরা চিন্তিত নই যে, কীভাবে এর জবাব দেব। এ কারণেই দুজন কথা বলে। আর উড়ে এসে জুড়ে বসে তৃতীয়জন ফতুয়া দিতে থাকে। আরে ভাই! তুমি আবার মুফতী হলে কখন। যেখানে তোমার সঙ্গে কোনো কথাই হচ্ছে না, সেখানে তুমি ঠেং পাতানোর প্রয়োজন কী? এটা নিজের আমলনামা সম্পর্কে ফিকির না থাকার পরিচয়। যদি সেই চিন্তা থাকত, তাহলে অকারণে অন্যের কথায় দখল দেওয়া মুশকিল হতো।

(৪) হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) বলতেন, আমার কাছে কোনো লোক বাইয়াতের জন্য এলে আমি তাকে এমন ভয় দেখাতাম যেমন কাউকে বাঘের দ্বারা ভয় দেখানো হয়। কেউ জিজ্ঞাসা করল, আপনি এমন করতেন কেন? তিনি বললেন, এটা এজন্যই করতাম যে, আমার কাছে বাইয়াত হয়ে সে আমাদের তরিকায় প্রবিষ্ট হবে। আজ থেকে তার সকল আমল সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং প্রথমেই আতঙ্কিত করে দিতাম, যাতে বাইয়াত হওয়ার পরে আর আলতুফালতু কাজ করতে সাহস না পায়। তবে এরপর যারা তার ধমকে ঠিকে থাকত, সবাইকে তিনি সঙ্গে-সঙ্গে বাইয়াত করে দিতেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হুজুর! আপনাদের পূর্বপুরুষগণ কাউকে বাইয়াত করতে হলে অনেক চিন্তা করতেন। ইস্তেখারা করতেন। প্রায় একমাস চিন্তাভাবনার পর মুরীদ করতেন। আর আপনি সঙ্গে-সঙ্গেই মুরীদ করে নিচ্ছেন। এর কারণ কী? তিনি অত্যন্ত বিস্ময়কর একটি জবাব দিলেন। ভাই! যখন কোনো বান্দা আমার কাছে বাইয়াতের আগ্রহ প্রকাশ করে, তখন আমি তাকে আমার ঈমানদার ভাই মনে করে তার আশা পূরণ করি। সাথে-সাথে আমারও এ আশা থাকে যে, যদি আমি পরকালে আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হয়ে যাই, তাহলে এদের মধ্যে এমনও লোক থাকতে পারে, যে আমার জন্য সুপারিশ করবে আর আমি মুক্তি পেয়ে যাব।

এ সমস্ত ঘটনায় প্রতীয়মান হয়, এখলাছের সঙ্গে আমল করা একান্ত কর্তব্য। এখলাছ ছাড়া কাজের কোনো দাম নেই।

রিয়া থেকে বেঁচে থাকা আসল অযিফা

মানুষ যদি খোদাপ্রেমিকদের সান্নিধ্যে সময় না দেয়, তাহলে তার মধ্যে লৌকিকতা ও রিয়া জন্ম নেয়। ইবাদাতে লৌকিকতা কাকে বলে? লৌকিকতা হচ্ছে, বান্দা আমল করে বটে; তবে সে চায় লোকে আমাকে ভালো মানুষ বলুক। সে বিভিন্ন কলাকৌশলে মানুষকে জানিয়ে দেয়, আমি এই আমল করেছি। আর মানুষ যখন বলে, আপনার শিক্ষাদান খুবই গুরুগম্ভীর, আপনার অনেক শিষ্য আছে, আপনার ওয়াজ খুব মাধুর্যময়, লোকজন আপনার বয়ান শোনার জন্য ব্যাকুল, তখন খুশিতে বাগবাগ হয়ে যায়। অনেক সময় কতক লোক বলে থাকে, আমি যখন ৫মবার হজে গিয়েছিলাম, তখন এ ঘটনা ঘটেছিল। এখন যদি কেউ বলে, হজে গিয়ে আপনি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, তা আমাদের শোনাচ্ছেন ভালো কথা; তবে এর সঙ্গে '৫ম' কথাটি সংযুক্ত করার উদ্দেশ্য কী? কারণ, নফস চাচ্ছে, আমি যে পাঁচবার হজ করেছি, তা মানুষদের জানিয়ে দেই, তাহলে মানুষ উপলব্ধি করবে, তিনিও কিন্তু একজন। এটা সৃষ্টজীব থেকে প্রশংসা পাওয়ার আশা করার নামান্তর। এভাবে ধন্যবাদ পেয়ে উৎফুল্ল হওয়া রিয়া বা লৌকিকতা। এ থেকে আত্মরক্ষা খুবই কঠিন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) বলেন, একব্যক্তি প্রায়ই কা'বা শরীফের গেলাফ ধরে দু'আ করত আর খোরাসানের লোকজনদের দেখাত। কেউ জিজ্ঞাসা করল, তুমি যে এই গেলাফ ধরে দু'আ করতে, তা খোরাসানের লোকজনকে দেখাচ্ছ কেন? সে উত্তর দিল, লোকটি কা'বা শরীফের গেলাফ ধরে দু'আ করার সময় মনে-মনে ভাবে, হায় আমি কীভাবে কা'বার গেলাফে ধরে দু'আ করছি আমার গ্রামের লোকজন যদি দেখত! এর মর্মার্থ হচ্ছে, লোকটি এ কাজ আল্লাহর উদ্দেশ্যে করেনি; বরং লোক দেখানোর জন্য করেছে। সুতরাং বন্ধুগণ! রিয়ামুক্ত আমল হচ্ছে আসল অযিফা।

কোনো বুযুর্গ বলেন, বান্দা যখন রিয়াযুক্ত আমল করে, তখন আল্লাহপাক ফেরেশতাদের বলেন, দেখো অমুক বান্দা আমার সঙ্গে উপহাস করছে। আমাদের পূর্বসূরীদের অভ্যাস ছিল, তাঁরা নফল রোযা রাখতেন; কিন্তু বাইরে কোথাও যাওয়ার সময় হাতমুখ ধুয়ে ওষ্ঠদ্বয়ে ঘি লাগাতেন, যাতে রোযার কারণে ঠোঁট-মুখ শুকিয়ে থাকার কারণে লোকজন তাঁকে রোযাদার বলে বুঝতে না পারে।

হযরত ওমর (রাযি.) কোনো লোককে প্রকাশ্যে ঘাড় ঝুঁকিয়ে পরিপাটি বাক্যে কথা বলতে (প্রার্থনা করতে) দেখলে তাকে বেত্রাঘাত করে বলতেন, এই অবস্থা প্রকাশ করার স্থান হচ্ছে নির্জনে– জনসমক্ষে নয়। যেব্যক্তি লৌকিকতা বা রিয়া থেকে নিজেকে নিস্কৃতি দিতে পারে এবং নিজের মধ্যে এখলাছ পয়দা করতে পারে, তার স্বভাব বিনয়ী হয়ে যায়। সে তার আমলের রক্ষক হয়। এটাই মুখলিছ বা নিষ্ঠাবান বান্দাগণের পরিচয়।

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.)-এর এখলাছ

ইয়ারমুকের যুদ্ধে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.) সেনাপতি ছিলেন। যুদ্ধচালাকালে হযরত ওমর (রাযি.) হযরত আবুউবাদা ইবনুল জাররাহ (রাযি.)-এর মারফত তাঁর কাছে চিঠি পাঠালেন। সেই পত্রে তিনি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.)কে নির্দেশ দিলেন– খালিদ আজ তোমাকে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো । পত্রখানা পাওয়ামাত্র তুমি পত্রবাহককে তোমার দায়িত্ব অর্পণ করবে। তারপর তুমি ইচ্ছা করলে সাধারণ সৈনিকদের সাথে জড়িত হয়ে যুদ্ধ করতে পার; ইচ্ছা করলে মদীনায় ফিরে আসতে পার। তোমাকে উভয় স্বাধীনতা দেওয়া হলো।

পত্র পেয়ে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.) নিজের দায়িত্ব হযরত আবুউবাদা ইবনুল জাররাহ (রাযি.)কে বুঝিয়ে দিয়ে সাধারণ সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হযরত! সেনাপতির দায়িত্ব ছেড়ে সাধারণ সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করা এটা তো আপনার জন্য অপমান। এভাবে কাজ করা আপনার জন্য কঠিন হবে। তিনি উত্তর দিলেন, একাজ আমার জন্য কঠিন কিছু নয়। কারণ, সেনাপতি হয়ে আমি যে মালিকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জিহাদ করেছি, এখনও আমি সেই মালিকের সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই জিহাদ করছি। সুতরাং এতে কোনো পরিবর্তন আসতে পারে না। সুবাহানাল্লাহ!

হযরত হুসাইন আহমদ মাদানি (রহ.)-এর এখলাছ

হযরত লাহোরি (রহ.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। একদা হযরত মাদানি (রহ.) হজের সফর থেকে ফিরে আসার সময় ট্রেনে ছিলেন। গাড়িতে হযরতের পাশে একজন সরকারি হিন্দু কর্মকর্তা বসল। পথে লোকটির টয়লেটের প্রয়োজন হলে সে বাথরুমে গেল। যাওয়ার পর সে অতি দ্রুত চলে এল। কেউ জিজ্ঞাসা করল, এত দ্রুত চলে এলে যে? সে বলল, আর বলো

না। লোকজন টয়লেটে যায়; কিন্তু পরে পানি ঢেলে ময়লা পরিষ্কার করে না। টয়লেট খুবই নোংরা। সেখানে বসার মতো পরিবেশ নেই। তাই প্রয়োজন না সেরেই চলে এসেছি।

একথা বলে লোকটি বসে গেল। কিছুক্ষণ পর শায়খে তরীকত হযরত মাদানি (রহ.) টয়লেটে গিয়ে তা পরিষ্কার করে এসে বললেন, জনাব! আমি টয়লেটে গিয়ে ছিলাম। দেখলাম, এখন পরিষ্কার আছে। একথা তিনি এজন্যই বললেন, যাতে তাঁর কথা শুনে লোকটি বাথরুমে গিয়ে তার প্রয়োজন সেরে মনে শান্তি পায়। ফলে লোকটি শৌচাগারে গিয়ে তার প্রয়োজন শেষ করে এসে বলল, সত্যিই তো এখন খুবই পরিষ্কার! মনে হয় কেউ পরিষ্কার করেছে।

মানুষ ভাবতে লাগল, এ কাজ কে করল। সেখানে খাজা নিজামুদ্দীন নামে একজন আলেমও ছিলেন। তিনি অনুপস্থিতিতে হযরত মাদানি (রহ.) সম্পর্কে বিভিন্ন অশুভ ধারণা পোষণ করতেন। শেষমেশ যখন জানা গেল, হযরত মাদানি (রহ.) নিজেই টয়লেট পরিষ্কার করেছেন, তখন মোটা কাপড় পরিহিত খাজা নিজামুদ্দীন (রহ.) করজোরে হযরত মাদানি (রহ.)-এর কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন, হুজুর! আমি দূরে থেকে আপনার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার কথা শুনে সারা জীবন আপনার গীবত করেছি। আপনি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন। আজ আমি বুঝতে পেরেছি, সত্যিই আপনি একজন মহৎ লোক। একজন হিন্দু লোকের কষ্টের প্রতি লক্ষ করে আপনি এমন কাজ করলেন। আপনার বিনয়ের তুলনা হতে পারে না। হযরত মাদানি (রহ.) বললেন, জনাব! আমি আমার মাহবুবের সুন্নতের ওপর আমল করেছিমাত্র। লোকেরা হতবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হুজুর এটা কীভাবে? তিনি উত্তর দিলেন–

একদা এক ইহুদি নবীওজ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে মেহমান হয়ে গিয়েছিল। লোকটি অধিক আহারকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। তাই তার মেহমানদারী করানোর জন্য সাধারণত কেউ রাজি হচ্ছিল না। পরিশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিয়ে এসে তার চাহিদামতো আপ্যায়ন করলেন এবং মনোরম বিছানায় শুতে দিলেন। লোকটি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় মাত্রাতিরিক্ত আহার করলে তার পেট খারাপ হয়ে যায়। ফলে সে রাত্রিকালে বিছানার মধ্যে পায়খানা করে দেয়। সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে কেউ জানার আগে সে এখান থেকে পালিয়ে যায়।

এদিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালের খাবারের ব্যবস্থা করে তার শয়নকক্ষে গিয়ে দেখলেন, লোকটি নেই আর বিছানা ময়লা হয়ে আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বিছানা নিয়ে নিজের হাতে ধুতে লাগলেন। লোকটি কিছুদূর যাওয়ার পর বুঝতে পারল, তড়িগড়ি করতে গিয়ে সে তার কোনো মূল্যবান বস্তু সেখানে ফেলে এসেছে। সুতরাং তার রেখে যাওয়া বস্তু নেওয়ার জন্য পুনরায় এখানে এল। এসে দেখল, তার নোংরাকৃত বিছানা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজহাতে পরিষ্কার করছেন। তাকে দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভাই! আপনার অমুক জিনিস এখানে ফেলে গেছেন। এত তাড়াহুড়া করে চলে গেলেন কেন? সকালের খাবার খেয়ে গেলে ভালো হতো না?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন আচরণ দেখে ইহুদি বলল, সত্যিই আল্লাহ আপনাকে মহান চরিত্রের অধিকারী করে প্রেরণ করেছেন। একথা বলতেই তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এল। বলতে লাগল, হুজুর! পৃথিবীর কোনো সৃষ্টির কাছে এমন চরিত্র থাকতে পারে না। তাই আমি ও সেই চরিত্রের অংশীদার হতে চাই। আমাকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে নিন।

হযরত মাদানি (রহ.) বলেন, ভাই! আমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহমানের সম্মানার্থে এমন কাজ করেছেন। তাই আমি আমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত পালন করেছি। সুবাহানাল্লাহ!

হযরত আবদুল মালিক সিদ্দিকী (রহ.)-এর এখলাছ

বন্ধুগণ! যখন অন্তর থেকে রিয়া নামের আত্মবিধ্বংসী জানোয়ারটা বেরিয়ে যাবে, তখন আমিত্ব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে উড়ে যাবে আর মানুষের স্বভাবে বিনয় ও নম্রতা স্থান পাবে। তারপর মানুষের বিস্বাদ ও তিক্ত কথা ধৈর্যের সাথে শ্রবণ করবে।

হযরত আবদুল মালিক সিদ্দিকী (রহ.)-এর সামনে আল্লাহ তা'আলা দীনের কোষাগার খুলে দিয়েছিলেন। শেষকালে দুনিয়ার কোষাগার খুলে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং তাঁর অনেক বিজয় অর্জন হয়েছিল। তিনি অনেক সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। সমকালীন ওলামায়ে কেরাম তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয় সমাধান করে নিতেন। তারা বলতেন, হুজুর! এত বড় মসজিদ বানিয়ে নিন। এখান থেকে, ওখান থেকে টাকা এসেছে। আল্লাহপাকের শান দেখুন। মসজিদ নির্মাণ করবে একজন আর সেই মসজিদ নির্মাণের জন্য মনে

পাক খাচ্ছে আরেকজনের। হযরত সিদ্দিকী (রাযি.) শুধু নীরব থাকতেন। এমনিতেই তাঁর সমস্ত কাজ সমাধা হয়ে যেত।

একদা কোনো এক শহর থেকে এক শিষ্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসছিল। পথে ওই শহরের এক প্রসিদ্ধ আলেম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, আমার মুরশিদ হযরত শায়খ আবদুল মালিক সিদ্দিকীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। তিনি বললেন, ঠিক আছে; তোমার মুরশিদকে আমার পক্ষ থেকে এ সংবাদটা দিয়ো যে, 'দুনিয়া ও আখেরাত হলো দুই সতিন। যখন একজনকে বিবাহ করা হয়, তখন অপরজন ক্ষুদ্ধ হয়ে চলে যায়।' তার কথার উদ্দেশ্য হলো তাকে কটাক্ষ করা। কারণ, তিনি বর্তমানে অনেক সম্পদের মালিক হচ্ছেন। এতে দুনিয়া ধরা দিয়েছে। তাই দীনকে যেন রাজি করে রাখেন।

ওই লোক হযরতের খেদমতে আসার পর হুজুর তার সঙ্গে কুশলবিনিময় করে সম্মানার্থে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা! তোমাদের শহরের অমুক বড় আলেম কেমন আছেন। বলল, ভালো আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর সঙ্গে তোমার কবে সাক্ষাৎ হয়েছে? হুজুর আজ এখানে আসার পথে। বললেন, আচ্ছা ভাই! তিনি কি কিছু বলেছেন? বন্ধুগণ! বুযুর্গগণ অন্তরের গুপ্তচর হন। তিনি একথা বলার পর আগন্তুক চুপ করে থাকল। এবার হযরত সিদ্দিকী সাহেব অনুভব করলেন, অবশ্যই তিনি কিছু একটা বলেছেন। তিনি বললেন, ভাই! ওই আলেম যা কিছু বলেছেন, তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্ভুলভাবে শোনাও। এবার সে হতভম্ব হয়ে গেল। এখন কী করি। ফলে সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হলো। বলল, হুজুর! আমি আসার সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ। আমি বললাম, আমার মুরশিদের কাছে যাচ্ছি। আমার কথা শুনে তিনি মুচকি হেসে বললেন, ঠিক আছে; সেখানে গিয়ে তুমি আমার পক্ষ থেকে তাকে সংবাদ দেবে, 'দুনিয়া ও আখেরাত দুই সতিন। বান্দা একটাকে বিয়ে করলে অপরটা অভিমান করে চলে যায়।'

তার কথা শুনে হযরত আবদুল মালিক সিদ্দিকী সাহেব (রহ.) অবনত মস্তকে দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরাতে শুরু করলেন। এমন কাঁদলেন যে, চোখের পানিতে তাঁর বুক সিক্ত হয়ে গেছে।

এবার লোকটি অস্থির হয়ে গেল। হায়! আমি কী বললাম, হুজুর এত বিষন্ন হচ্ছেন কেন? যথেষ্ট সময় পর হুজুর স্বভাবিক হলে লোকটি বিনয়ের

স্বরে জিজ্ঞাসা করল, হুজুর! আমার পক্ষ থেকে কোনো ভুল হয়ে থাকলে মাফ করবেন। তিনি বললেন, না, না। তোমার পক্ষ থেকে কোনো ভুল হয়নি। আমি আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করতে কেঁদেছি। আলহামদুলিল্লাহ! এখনও পৃথিবীতে এমন লোক বিদ্যমান আছেন, যারা আমাদের সোজা পথে চলার জন্য চিন্তা করেন। আর তারা উপদেশ দিয়ে আমাদের সংশোধন করেন।

ভেবে দেখুন বন্ধুগণ! তিনি জবাবে আরও কী যেন বলতে থাকলেন। এক্ষেত্রে আমরা হলে কী বলতাম? আমরা বলতাম, আরে এমন বহু দেখেছি। নিজের প্রতি খেয়াল নেই; অপরকে উপদেশ দেন। এটা দেখেন না, ওটা দেখান না। আরও কত কিছু বলতেন। কিন্তু আল্লাহওয়ালাদের ব্যাপারস্যাপার ভিন্ন হয়ে থাকে।

মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ জলন্ধরি (রহ.)-এর এখলাছ

হযরত মাওলানা জলন্ধরি (রহ.) হযরত থানভী (রহ.)-এর খলীফা ছিলেন। একবার তিনি হাদীছের দরস দেওয়ার সময় একস্থানে তার মনে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হলো। তিনি যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। কিতাবের টীকা দেখেছেন। কিন্তু প্রশ্নের সমাধান পাচ্ছেন না। কিছুক্ষণ পর ছাত্রদের বলে দিলেন, এস্থানে আমার অন্তরে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে; কিন্তু এর জবাব আমার বুঝে আসছে না। ভাই! আমাদের মতো লোক হলে গোঁজামিল দিয়ে পাশ কেটে চলে যেতাম। যেস্থান থেকে বুঝে আসে, সেখান থেকে পড়িয়ে দিতাম। আর যেখান থেকে বুঝে আসে না, সেখানে এমনিতেই একটা বলে দিতাম। ছাত্ররা যদি প্রশ্ন করে, হুজুর! এটা কীভাবে হলো? তখন বলেন, এর জবাব সামনে আসবে। আর পরে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, এর উত্তর পেছনে চলে গেছে। কিন্তু তিনি নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। তিনি ছাত্রদের বলে দিলেন, এখানে আমার একটি প্রশ্ন জাগছে এবং এর সমাধান বর্তমানে আমার স্মৃতিপটে নেই। ছাত্রদেরও বলে দিলেন, তোমরাও চেষ্টা করে দেখো; সমাধান পাওয়া যায় কি-না।

তৎকালে ওই মাদরাসায় হযরতের এক ছাত্র ছিল। যে হুজুরের কাছেই দাওরায়ে হাদীছ শেষ করেছে। সে অত্যন্ত যোগ্য ছাত্র ছিল বিধায় তাকে শিক্ষকতার জন্য মাদরাসায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তিনিও হাদীছের ওস্তাদ ছিলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত বললেন, আচ্ছা! আমি তাকে জিজ্ঞাসা করে আসছি। হৃদয়ে এই ভাবনা নেই যে, সে আমাকে কী মনে করবে। শায়খুল

হাদীছ হয়ে ছাত্রের কাছে হাদীছের উত্থাপিত প্রশ্নের সমাধানের জন্য চলে গেলেন।

হযরত বোখারি শরীফ নিয়ে রওনা হচ্ছেন। এমন সময় এক ছাত্র দৌড়ে গিয়ে তাঁকে বলল, হুজুর! এমন বিষয়ে শায়খ আপনার কাছে আসছেন। তিনিও ক্লাসে দরস দিচ্ছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে পড়ানো বন্ধ করে হযরতকে আমন্ত্রণ জানালেন। ছাত্র ও ওস্তাদের সাক্ষাৎ হলো। ওস্তাদ বললেন, মাওলানা সাহেব! এই জায়গায় আমার এমন প্রশ্নের উদ্রেক হচ্ছে। কিন্তু কোনো সমাধান বুঝে আসছে না। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি। একটু দেখুন তো, কোনো সমাধান পাওয়া যায় কি-না। ছাত্র এই হাদীছ দেখার সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহ তার অন্তরে সমাধান ঢেলে দিলেন। সুতরাং তিনি ওস্তাদের খেদমতে আরজ করলেন, হুজুর আমরা পড়ার সময় এই স্থানে আপনি এ মাসয়ালার সমাধান এভাবে দিয়েছিলেন এবং পরে অমুক হাদীছে গিয়ে পরিপূর্ণ জবাব দিয়েছিলেন।

যেমন ওস্তাদ তেমন ছাত্র। ছাত্র একথা বলেননি যে, হুজুর আমার কাছে এ-প্রশ্নের জবাব এমন হবে বলে মনে হচ্ছে; বরং ওস্তাদের কৃতিত্বকেই বজায় রেখে জবাব দিলেন। একে বলে এখলাছ।

মুখলিছ বান্দার কাজে আল্লাহর মদদ

একটি কথা সব সময় স্মরণ রাখবেন যে, এখলাছের মধ্যে আল্লাহপাক কল্যাণ রেখেছেন। বাহ্যিকভাবে দেখা যায়, কাজে বিঘ্নতা আসবে। বাধা আসবে। কিন্তু মুখলিছ বান্দার কাজ কখনও আটকে থাকে না। আল্লাহ তা'আলা তার কাজ সমাধা করে দেন। এর কতিপয় উদাহরণ শুনুন–

(১) কোনো এক জিহাদ চলাকালে হযরত আলী (রাযি.) এক কাফেরকে ধরে হত্যা করার জন্য তার বুকের ওপর বসে যান। এমন সময় ওই কাফের হযরত আলী (রাযি.)-এর মুখমণ্ডলে থুতু নিক্ষেপ করে। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি তার বুকের ওপর থেকে নেমে পেছনে চলে আসেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে সে হতবাক। এবার তো আলী আমাকে আরও দ্রুত হত্যা করার কথা ছিল। কিন্তু সে দূরে সরে গেল কেন? জিজ্ঞাসা করল, আমি তোমাকে থুতু মারার পর তুমি আমাকে হত্যা না করে দূরে চলে গেলে কেন? হযরত আলী (রাযি.) উত্তর দিলেন, আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম আমার মালিকের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। কিন্তু তুমি যখন আমার মুখে থুতু মারলে, তখন তোমার ওপর আমার ব্যক্তিক্রোধ এসে গেল। আর আমি ব্যক্তিগত

আক্রোশে কাউকে হত্যা করতে চাই না। এখন তোমাকে হত্যা করলে আমার মালিকের সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হবে না। হবে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ। তাই আমি তোমাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকি।

একথা শুনে কাফের এমন প্রভাবিত হলো যে, সে বলছে, আলী! আগে আমি কাফের হয়ে মরতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার এখলাছ আমার এত পছন্দ হলো যে, এখন আর আমি কালেমা পাঠ না করে পারছি না। তুমি আমাকে পড়িয়ে দাও لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

দেখুন বন্ধুগণ! এখানে বাহ্যত দেখা যাচ্ছে, হযরত আলী (রাযি.) পেছনে সরে এসেছেন। এখন আর হত্যা করা হবে না। কিন্তু এখলাছপূর্ণ কাজ আল্লাহপাক অর্ধসমাপ্ত রাখেন না। আল্লাহপাক ওই বান্দাকে কালেমা পাঠ করার তাওফীক দিয়ে দিলেন।

(২) হযরত ওমর (রাযি.)-এর শাসনামলে কোনো এলাকার এক শাহজাদা গ্রেফতার হয়ে এসেছিল। হযরত ওমর (রাযি.) চাইলেন তাকে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হোক। কারণ, সে মুসলমানদের ক্ষতিসাধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এতে মুসলমানগণ কঠিন বিপদের সম্মুখিন হয়েছে। সুতরাং ওমর (রাযি.) তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। জল্লাদ তাকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হলে সে বলল, জাহাঁপনা! আমার মনের শেষ আশা পূরণ করার সুযোগ দিন। তিনি বললেন, কী আশা? সে বলল, আমার তৃষ্ণা পাচ্ছে। আমাকে এক গ্লাস পানি পান করার সুযোগ দিন। তাকে এক গ্লাস পানি দেওয়া হলো। পানির গ্লাস হাতে নিয়ে সে কাঁপতে শুরু করল।

হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, আরে ভাই! এত কাঁপছ কেন? সে বলল, আমার ভয় হচ্ছে, আমি এদিকে পানি পান করব আর অপর দিকে জল্লাদ আমাকে হত্যা করে ফেলবে। তাই আমি পানি পান করতে পারছি না। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, তুমি কোনো চিন্তা করো না। এ পানি পান না করা পর্যন্ত তোমাকে হত্যা করা হবে না। হযরত ওমর (রাযি.) একথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে লোকটি পানির গ্লাসটা মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন! আপনি বলেছেন, আমি এ পানি পান না করা পর্যন্ত আমাকে হত্যা করবেন না। এবার আপনার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখুন। এ পানি আর কখনও আমার পান করা হবে না। এখন আমার প্রতি আপনার আদেশ কী? হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, হ্যাঁ আমি কথা দিয়েছিলাম, এ পানি পান না করা পর্যন্ত তোমাকে হত্যা করা হবে না। এখন যেহেতু এ পানি তুমি আর পান করতে পারবে না। সুতরাং তোমাকে হত্যাও করা হবে না।

এবার লোকটি বলছে জাহাঁপনা! আপনি কথা দিয়েছেন, আমাকে আর হত্যা করা হবে না। এবার আমার কথা শুনুন। আপনি আমাকে পড়িয়ে দিন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ আমি মুসলমান হয়ে যাই।

হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, ভাই! তুমি আগে হত্যার আদেশের সময় মুসলমান হলে না। আর এখন মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি পেয়ে মুসলমান হতে চাচ্ছ কেন? সে উত্তর দিল, আপনি আমাকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। তখন যদি আমি মুসলামান হতাম, তাহলে লোকজন বলত, মৃত্যুর ভয়ে আমি মুসলমান হয়েছি। তাই আমি কোনো অজুহাত খুঁজছিলাম, যাতে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পাই আর মৃত্যুর ভয় অন্তর থেকে চলে যাক। ফলে সন্তুষ্টচিত্তে একমাত্র আল্লাহকে পাওয়ার আশায় মুসলমান হয়ে যাই আর লোকজনও উপলব্ধি করুক, আমি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুসলমান হয়েছি– মৃত্যুর ভয়ে নয়।

তাই বন্ধুগণ! মুখলিছ বান্দার কাজ কখনও অর্ধসমাপ্ত থাকে না। আল্লাহ তা'আলা তা পূর্ণ করে দেন।

(৩) এক বাদশাহর একশ মটকা মদ যাচ্ছিল। এক আল্লাহওয়ালা তা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে মটকাগুলো ভাঙা শুরু করলেন। নিরানব্বইটা মটকা ভেঙে একটা বাকি রাখলেন। বাদশাহ সংবাদ পেয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এগুলো ভাঙলে কেন? তিনি বললেন, এগুলোতে মদ আছে শুনে আমার আত্মসম্ভ্রম তা সহ্য করতে পারেনি যে, আপনি একজন মুসলমান; অথচ মদ পান করছেন। তাই আমি এগুলো ভেঙে ফেলেছি। বাদশাহ বললেন, আচ্ছা! নিরানব্বইটা মটকা তোমার আত্মসম্ভ্রমে আঘাত হানল আর একটা কী করল? সেটা ভাঙলে না কেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি যখন মটকাগুলো ভাঙছিলাম, তখন আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জন আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু নিরানব্বইটা মটকা চুরমার করার পর আমার অন্তরে আনন্দের ঢেউ বয়ে যেতে লাগল। মন বলছিল, দেখো, আমি কত মহৎ কাজ করেছি। তাই পরের মটকাটা ভাঙিনি। কারণ, এখন আর ভাঙলে নিজের আত্মতৃপ্তি উদ্দেশ্য হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হবে না। তাই আর ভাঙিনি। ফলে একটা মটকা অবশিষ্ট থেকে যায়। একথা শুনে বাদশাহ তাকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে মুক্তি দিয়ে দেন। আল্লাহু আকবার!

(৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর পিতার নাম ছিল মোবারক। তিনি একজনের ক্রীতদাস ছিলেন। মালিক তাকে বাগানের প্রহরী

হিসেবে রেখেছিল। কোনো-কোনো কিতাবে এসেছে, ডালিমের বাগান অথবা আমের বাগান ছিল। যাহোক বাগানের রক্ষক ছিলেন। এ দায়িত্ব তিনি তিন বছর পালন করেন।

একদিন তার মালিক বাগানে গিয়ে বলল, মোবারক! আমাকে ফল খাওয়াও। তিনি একটি ফল এনে কেটে দিলেন। দেখা গেল, ফলটি অত্যন্ত টক। মালিক বলল, মিয়া! এটা তো টক ফল, মিষ্টি ফল আনো। তিনি খুব চিন্তা করে আরেকটি ফল আনলেন। সেটিও টক হলো। তৃতীয় আরেকটি সরবরাহ করলে সেটিও প্রচুর টক হলো। এবার মালিক ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, মিয়া! তিন বছর যাবৎ বাগানে থাকছ; অথচ কোন গাছের ফল মিষ্টি আর কোন গাছের ফল টক বলতে পার না? মালিকের ক্ষুব্ধভাব দেখে মোবারক বললেন, জনাব! আপনি আমাকে বাগানের রক্ষক বানিয়েছেন। ফল খাওয়ার দায়িত্ব দেননি। তিন বছরের মধ্যে আমি আপনার বাগানের কোনো গাছের ফলই খাইনি। তাই আমি বলতে পারব না, কোন গাছের ফল মিষ্ট আর কোন গাছের ফল তিক্ত।

মোবারকের একথা শুনে মালিক অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাকে আযাদ করে তার সঙ্গে নিজের অপরূপা কন্যাকে বিবাহ দিলেন। এদেরই ঔরসে জন্ম নেন যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক। একেই বলে এখলাছ।

হযরত ইবনে আকীল (রহ.) বলেন, আমি খুব দরিদ্র লোক ছিলাম। একবার হজের সময় তওয়াফ করতে একটি মূল্যবান হার আমার চোখে পড়ল। আমি তা উঠিয়ে নিলাম। এবার শুরু হলো আমার নফস বনাম আত্মার বির্তক। নফস বলল, উঠানোর সময় কেউ দেখেনি। সুতরাং গোপন করে নেব। পক্ষান্তরে আমার অন্তর বলছে, না; একাজ সম্ভব নয়। এটা চুরির সমতুল্য। পরিশেষে আমি নফসের আবেগ প্রত্যাখান করে অন্তরের ফয়সালা গ্রহণ করি। মাতাফে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলাম, কেউ একটি হার হারিয়ে থাকলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নিয়ে যাবেন। আমার ঘোষণা শুনে এক অন্ধ লোক বলল, হারটি আমার। আমার থলে থেকে হারটি পড়ে গেছে। এবার নফস আমাকে আরও দোষারোপ করতে লাগল, একজন অন্ধ লোকের হার ছিল। গোপন করলে কে কার খবর রাখত। কিন্তু আমি নফসকে তিরস্কার করে হারটি তাকে দিয়ে দিলাম। লোকটি অত্যন্ত খুশি হয়ে আমাকে দু'আ দিয়ে চলে গেল।

তিনি বলেন, আমি সর্বদা আল্লাহপাকের দরবারে প্রার্থনা করতাম, হে আল্লাহ! আমাকে হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দাও। আমার আর্থিক দৈন্য দূর করে দাও। আল্লাহপাকের অশেষ দয়া যে, আমি সেখান থেকে 'হাল্লা' নামাক স্থানে গেলাম। সেখানে এক মসজিদে নামায পড়ার জন্য গেলাম। ঘটনাক্রমে কয়েক দিন পূর্বে ওই মসজিদের ইমাম সাহেব মৃত্যুবরণ করলেন। নামাযের সময় মুসল্লীরা আমাকে নামায পড়ানোর জন্য অনুরোধ করলে আমি সেখানে ইমামত করি। তারা আমার কুরআন তেলাওয়াত শুনে ওই মসজিদে ইমামতের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করল। আমি তা গ্রহণ করে নিলাম। আমি এই মসজিদের ইমামতের দায়িত্ব চালিয়ে যাচ্ছি।

কয়েকদিন পর মুসল্লীরা বলল, হুজুর! আমাদের মসজিদের পূর্বের ইমাম সাহেবের একটা মেয়ে আছে। সে অতিশয় ধার্মিক। অপরূপ সুন্দরীও। তিনি মারা যাওয়ার সময় অসিয়ত করে গেছেন, তার মেয়েকে যেন একজন দীনদার পাত্র দেখে বিবাহ দেওয়া হয়। আপনি যদি অনুগ্রহ করে সেই এতিম মেয়েটিকে গ্রহণ করতেন, তাহলে আমরা খুশি হতাম। আমি বললাম, ঠিক আছে; আমি আপনাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যায়। আমি তাকে নিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছিলাম। হঠাৎ একদিন আমি দেখতে পেলাম, ওই হারটি আমার স্ত্রীর গলায়, যেটা আমি হজের সময় সেখানে পেয়েছিলাম। পরে এক অন্ধ লোক দাবি করে আমার কাছে থেকে নিয়েছিল। আমি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ হার তুমি কোথায় পেলে? তিনি বললেন, এটা আমার আব্বু আমাকে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম তোমার আব্বু কে? বলল, আমার আব্বু একজন বড় আলেম ছিলেন। তিনি অন্ধ ছিলেন। আপনি যে মসজিদে ইমামত করছেন, সেখানে তিনি ইমামত করতেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেন।

এখন আমি বুঝতে পারলাম, তার আব্বু সেই অন্ধলোক ছিলেন, যাকে আমি হার ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাকে বললাম, আপনার আব্বু এ হারটি হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমি পেয়েছিলাম। আমি একজন নিঃস্ব লোক হওয়া সত্ত্বেও তা গোপন করিনি। মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। সাথে-সাথে আল্লাহপাকের দরবারে দু'আ করেছি, হে আল্লাহ! আমাকে হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দাও। আমার কথা শুনে আমার স্ত্রী বলল, মহান আল্লাহ আপনার দু'আও কবুল করেছেন এবং আমার আব্বুর দু'আও কবুল করেছেন। আমি বললাম, কীভাবে? আমার স্ত্রী বলল, হজ থেকে আসার পর আব্বু এ ঘটনাটি আমাদের বলেছেন এবং দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ!

একজন বিশ্বস্ত লোক আমার হারটি ফিরিয়ে দিয়েছে। আপনি তার মতো একজন বিশ্বস্ত পুরুষ আমার মেয়ের স্বামী হিসেবে ব্যবস্থা করে দিন। সুতরাং আপনিও বাড়ি পেয়েছেন, পরিবার পেয়েছেন, হালাল রুজির ব্যবস্থা পেয়েছেন আর আমার আব্বুর দু'আও কবুল হয়েছে; আমি আপনাকে আমার স্বামী হিসেবে পেয়েছি।

সুতরাং বন্ধুগণ! মুখলিছ বান্দার কাজ আল্লাহপাক আটকে থাকতে দেন না; বরং তাদের তরি সর্বদা তীরে এসেই ভিড়ে।

(৬) হযরত আহমাদ বলগ্রামি (রহ.) একদিন উজু করার পর ক্ষুধা ও দুর্বলতার দরুন মাথায় চক্কর খেয়ে পড়ে যান। যে-শিষ্য উজু করাচ্ছিল, সে জিজ্ঞাসা করল, হুজুর কী হয়েছে? এমন সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে গেল, বাবা! আজ তিন দিন যাবৎ অনাহারে আছি। তাই ক্ষুধার জ্বালায় মাথায় পাক খাচ্ছে। তাই আমি পড়ে গেছি। ছাত্র তাকে নামাযের মুসল্লায় রেখে খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে এসে বলল, হুজুর খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে; এবার খেয়ে নিন। তিনি বললেন, না আমি এ খাবার খাব না। শিষ্য জিজ্ঞাসা করল, কেন খাবেন না? তিনি বললেন, বাবা! আমি যখন তোমাকে বলি, আজ তিন দিন যাবৎ অনাহারে আছি, তখন আমার মন বলছিল, সম্ভবত তুমি খাবার সংগ্রহ করবে। এই যে, সৃষ্টির প্রতি এই আকর্ষণ, এই লালসা এও এক প্রকার লিপ্সা। আমি এটা পছন্দ করি না। আমি একমাত্র আল্লাপাকের ওপর নির্ভর রাখতে চাই। সুতরাং তিনি আহার করলেন না। কিন্তু ছাত্রও এমন নাছোড়বান্দা ছিল যে, হুজুর যখন এ খাবার খেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন, তখন সে বলল, ঠিক আছে; আমি খাবার নিয়ে গেলাম। পাঁচ-দশ মিনিট সে ওস্তাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে এসে বলল, হুজুর! আমি ওই খাবার নিয়ে চলে গিয়েছিলাম। এবার হয়ত খাবারের প্রতি আপনার আকর্ষণ দূর হয়েছে। সুতরাং এই খাবার গ্রহণ করুন। ফলে তিনি এ খাবার আহার করলেন। এতে প্রতীয়মান হয়, আমাদের বুযুর্গগণ প্রত্যেক কাজ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিমতো আদায় করেন এবং আল্লাহ তা'আলাও বান্দার নিয়ত অনুসারে তাদের সঙ্গে আচরণ করেন।

(৭) তালোন নামে একজন ধার্মিক বাদশাহ ছিলেন। বর্তমানে দুনিয়াদার বাদশাহদের মধ্যেও কিছু-কিছু দীনদার বাদশাহ রয়েছেন। তিনি একবার একটা লা-ওয়ারিশ শিশু পেলেন। বাচ্চাটি দেখেই তিনি অনুভব করলেন, এ বাচ্চাটা তার মা অবৈধভাবে জন্ম দিয়ে এখানে ফেলে গেছে। তিনি

ছেলেটিকে নিয়ে গেলেন। তার নাম রাখলে আহমাদ। কালক্রমে তার নাম 'আহমাদ এতিম' বলে প্রসিদ্ধি পায়। তিনি এ ছেলেটিকে পিতৃস্নেহ দিয়ে প্রতিপালন করলেন। শিক্ষা-দিক্ষা দিলেন। পরিশেষে তাকে নিজের সঙ্গী বানিয়ে নিলেন। সে-ও অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও পরহেজগার যুবক ছিল।

প্রতিবেশী লোকজন আহমদ এতিমের সঙ্গে প্রচণ্ড ঈর্ষা করত। তারা জানত, এ ছেলেটি বাদশাহর ঔরসজাত নয়। সে তার পোষ্যপুত্র।

কিছুদিন পর বাদশাহর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তার আপন সন্তান আবুল জায়েশকে ডেকে সমস্ত রাজ্যের ভার তার ওপর ন্যস্ত করলেন এবং বললেন, বাবা! আহমদ এতিম তোমারই ভাই। আমি তাকে লালনপালন করেছি। আমার মৃত্যুর পর তুমিও তার প্রতি সুদৃষ্টি রাখবে। একথা বলার পরই তিনি ইন্তেকাল করলেন। আবুল জায়েশ সবকিছু নিয়ন্ত্রণে এনে আহমদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার চালিয়ে যাচ্ছে।

একদা আবুল জায়েশ কোনো প্রয়োজনে আহমদকে ডেকে বলল, যাও! এই চাবিটা নিয়ে অমুক রাস্তায় আমার কক্ষে প্রবেশ করে ওই বস্তুটা নিয়ে এসো। সে দিনের বেলায় দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। সেই কামরায় আবুল জায়েশের এক অপরূপ সুন্দরী দাসি ছিল। সে অন্য এক খাদেমের সঙ্গে ব্যভিচার করছে। দাসি এ ধারণাই করেনি, দিনের বেলায় অন্য কোনো পুরুষ এ কামরায় আসতে পারে। তিনি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকার সঙ্গে-সঙ্গে খাদেম পালিয়ে গেল। এবার দাসি আহমদ এতিমকে তার ফাঁদে আবদ্ধ করতে চাইল। সে বলল, ওই খাদেম আমার সঙ্গে যে অপকর্ম করছিল। এখন তুমি সে কাজ করতে হবে। কিন্তু আহমদ এতিম অত্যন্ত খোদাভীরু যুবক ছিলেন। তিনি সেই কথাটি বললেন, যা ইউসুফ (আ.) যুলায়খার প্ররোচনার সময় বলেছিলেন–

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّیْٓ اَحْسَنَ مَثْوَایَ

'সে বলল, আল্লাহপাক রক্ষা করুন। নিশ্চয় তিনি আমার মালিক। তিনি ৰযত্নে আমাকে তার কাছে আশ্রয় দিয়েছেন।'[১৬৪]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর নেক বান্দাদের চরিত্র এমনই হয়। আহমদ এতিম ওই চরিত্রহীন নারীর থাবা থেকে বেরিয়ে আদিষ্ট বস্তুটা নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন।

---

১৬৪. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২৩

এবার দাসির মাথায় একটা বিষয় ঘুরপাক খেতে শুরু করল। যদি একথা তিনি প্রকাশ করে দেন, তাহলে তো আমার মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু তিনি মহিলার ইজ্জত-সম্ভ্রম ঢেকে রাখলেন। দরবারে এসে সেই বস্তু দিয়ে বিষয়টা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। এর কিছু দিনের মধ্যেই আবুল জায়েশ আরেকটি বিবাহ করলেন। ফলে নতুন স্ত্রীর সঙ্গে সময় দিতে গিয়ে আগের স্ত্রী বা দাসিদের সঙ্গে যথেষ্ট সময় দিতে পারছেন না। এতে মহিলা বুঝে গেল, সম্ভবত আহমদ এতিম সেদিনের ঘটনা বাদশাহকে বলে দিয়েছেন। তাই আমার মালিক এখন আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে আছেন।

বন্ধুগণ! মহিলাদের অন্তরে হিংসা এলে কী চক্রান্ত করতে পারে দেখুন। সে ভাবতে লাগল, যেকোনো কৌশলে আমি আহমদ এতিমকে রাস্তা থেকে সরাতে হবে।

একদা বাদশাহ আবুল জায়েশ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। মহিলা দেখল, আবুল জায়েশ তার প্রতি প্রেমাবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন এবং অতিশয় আকৃষ্ট হয়ে তাকে ভালোবাসা দিচ্ছেন। এই মুহূর্তে মহিলা কাঁদতে শুরু করল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কী হয়েছে? সে বলতে লাগল, জাহাঁপনা একদিন আহমদ এতিম আমার কক্ষে এসে ছিল। তখন রুমে অন্য কেউ না থাকায় সুযোগ পেয়ে সে আমার সঙ্গে অপকর্মের চেষ্টা করে। ফলে আমি অনেক কষ্টে ও কৌশলে তার থাবা থেকে মুক্তি পাই। একথা শুনেই আবুল জায়েশের স্মরণ হয়ে গেল, হ্যাঁ, আমি একদিন তাকে চাবি দিয়ে আমার কক্ষে পাঠিয়েছিলাম। সেদিন সে এমন কাজ করতে পারে। তা ভেবে বাদশাহর মাথায় খুন চড়ে গেল যে, আমি অবশ্যই আহমদ এতিমকে মৃত্যুদণ্ড দেব।

তিনি রাজ দরবারে এসে নিজের একজন বিশেষ লোককে ডেকে বললেন, আমি একটি পাত্র দিয়ে একজনকে তোমার কাছে পাঠাব। সে গিয়ে তোমাকে বলবে, বাদশাহ এ পাত্রটি মেশক (মৃগ নাভি) ধারা ভরে দিতে বলেছেন । তারপর তুমি ওই পাত্র বহনকারীকে হত্যা করে তার শির এ পাত্রে করে আমার সামনে উপস্থিত করবে।

তারপর তিনি আহমদ এতিমকে ডেকে কথাবার্তা বলেছেন। কিন্তু তার ক্রোধ স্তিমিত হয়নি। ফলে তিনি আহমদ এতিমকে বললেন, যাও এ পাত্রটি নিয়ে অমুকের কাছে গিয়ে বলো, সে যেন মেশক দ্বারা পাত্রটি ভরে আমার কাছে নিয়ে আসে। আহমদ এতিম তো কথার গভীরতা কিছুই বোঝেননি।

তিনি পাত্রটি নিয়ে রওনা করেছেন। পথে রাজ দরবারের ওই খাদেমের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো, যাকে সেদিন দাসির সঙ্গে অপকর্ম করা অবস্থায় আহমদ দেখেছিলেন। সেদিনের ভয়ে আহমদ এতিমের মন জয় করার জন্য বলল, ভাই! আপনার একাজ আমি করে দেব। পাত্রটি আমার হাতে দিন। আপনি চলে যান। সে পাত্রটি নিয়ে রাজার আদিষ্ট ব্যক্তির কাছে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে তাকে হত্যা করে তার মাথাটা পাত্রে করে নিয়ে বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হলো। এদিকে আহমদ এতিম বাদশাহর সামনে উপস্থিত হতে না হতেই লোকটি তার মাথা নিয়ে বাদশাহর দরবারে হাজির। এখন বাদশাহ আহমদকে জীবিত এবং তার পরিবর্তে আরেক খাদেমের মাথা সামনে উপস্থিত দেখে হতবাক। আহমদ এতিমও অস্থির, এ লোকটিকে হত্যা করা হলো কেন? মেশকের পরিবর্তে এ পাত্রে তার মাথা কেন?

এবার আবুল জায়েশ বললেন, আমি তো তোমাকে হত্যা করার জন্য এ কৌশল আবলম্বন করেছিলাম। তখন আহমদ এতিম বুঝতে পারলেন, উক্ত দাসির চক্রান্তেএমন হয়েছে। এবার তিনি মুখ না খুলে পারলেন না। বললেন, হুজুর! ঘটনা এরকম। কিন্তু আমি আপনার প্রিয় মানুষের ইজ্জত ঢেকে রেখেছিলাম। আজ তার মিথ্যা ষড়যন্ত্রে আপনি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহপাকের অসীম কুদরত যে, এ পাপের শাস্তি যার পাওয়ার কথা সে পেয়ে গেছে। একথা শুনে বাদশাহ উক্ত দাসিকে তলব করলেন। তাকে জেরা করার পর সে তার কৃত অপরাধ স্বীক্ষার করল। বাদশাহ দাসিকেও হত্যার নির্দেশ দিলেন। তারা উভয়ে তাদের পরিণাম ভোগ করল।

এখন আবুল জায়েশের দৃষ্টিতে আহমদের সম্মান বেড়ে গেল। তিনি অসীয়ত করলেন। আমার মৃত্যুর পর আহমদকে যেন বাদশাহ নিযুক্ত করা হয়। আল্লাহু আকবার!

বন্ধুগণ! দেখুন, এখলাছের বিনিময়ে আল্লাহপাক কী করেছেন। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আহমদকে বাঁচিয়ে দিলেন। অপরাধীরা তাদের পাপের শাস্তি পেল। তাই স্মরণ রাখবেন মুখলিছ, বান্দা কোনো কাজের জন্য অগ্রসর হলে আল্লাহ তার শির সমুন্নত করেন।

এখলাছের কারণে (মহব্বতের) বন্ধন সৃষ্টি হয়

এখলাছের দরুন আল্লাহ তা'আলা বিচ্ছেদের স্থলে বন্ধন সৃষ্টি করে দেন। এর কিছু উদাহরণ দেখুন।

(১) হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রহ.) সেমার পক্ষে ছিলেন। তিনি কবিতা, কাছিদা, গজল ইত্যাদি শুনতেন। তবে জেনে রাখবেন, কাওয়ালি ভিন্ন বিষয়। কাওয়ালিতে বাদ্য ব্যবহৃত হয়। কাওয়ালি বর্তমানে গানকে ধর্মীয় রূপ দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা। বাজনা শতভাগ হারাম। সেমা বলা হয়, যে সমস্ত কবিতা, গজল, সঙ্গীত আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের মহব্বতে পাঠ করা হয় এবং শয়তানি উপকরণ হতে খালি হয়।

আল্লামা নিজামুদ্দীন (রহ.) চিশতিয়া তরিকার বুযুর্গ ছিলেন। এ তরিকার বুযুর্গগণ সেমা শ্রবণ করেন। তাই খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া সেমার আয়োজন করে তা শ্রবণ করতেন।

অপর দিকে তৎকালীন বুযুর্গ সেমার শীর্ষ সমালোচক হযরত কাজী জিয়াউদ্দীন সুনামি (রহ.) এ-ধরনের অনুষ্ঠান পছন্দ করতেন না। তিনি এ-ধরনের মাহফিলকে বেদআত বলতেন। তিনি নিজেও সুস্পষ্ট শরীয়তের ওপর অটুট ছিলেন। অন্যদেরও নির্ভেজাল শরীয়তের বিধানের ওপর ঐক্যবদ্ধ রাখার চেষ্টা করতেন। তিনি যখন শুনতেন, অমুক স্থানে সেমার অনুষ্ঠান হচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে মাহফিল ভেঙে দিতেন। এতে কখনও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়নি। যদিও উভয়ে মানসিকভাবে একে অপরকে কিঞ্চিৎ অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখতেন। তবে উভয়ে নিজ-নিজ কাজ এখলাছের সঙ্গে করে যেতেন।

শেষ বয়সে কাজী জিয়াউদ্দীন (রহ.) অসুস্থ হয়ে যান। রোগ তীব্র আকার ধারণ করে। মুমূর্ষ অবস্থা। হযরত কাজী সাহেব জীবনের শেষ প্রহর গুনছেন। আল্লাহপাকের মহিমা দেখুন! হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রহ.) কাজী সাহেবের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তাঁকে দেখতে সেখানে গেলেন। দরজায় কড়া নাড়া দেওয়া পর কাজী সাহেব খাদেমকে বললেন, কে এসেছে দেখো। খাদেম দরজা খুলে খাজা নিজামুদ্দীন (রহ.)কে দেখে কাজী সাহেবকে জানাল। কাজী সাহেব বললেন, সে একজন বেদআতী লোক। আমি এখন মৃত্যুর প্রহর গুনছি। এ অবস্থায় আমি কোনো বেদআতীর মুখ দেখতে চাই না। আমি আমার মাহবুবের সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় আছি। তাকে চলে যেতে বলো। খাদেম এসে খাজা নিজামুদ্দীনকে খবর পৌঁছালেন। তিনি বললেন, কাজী সাহেবকে গিয়ে বলো, সেই বেদআতী তাওবা করার জন্য এসেছে। একথা শুনে কাজী জিয়াউদ্দীন (রহ.) মাথা থেকে পাগড়ি খুলে খাদেমকে বললেন, আমার বিছানা থেকে দুয়ার পর্যন্ত এ পাগড়ি বিছিয়ে দাও এবং খাজা

নিজামুদ্দীনকে বলো, সে যেন পায়ের জুতো না খুলে জুতাসহ এর ওপর দিয়ে হেঁটে আমার কাছে আসে। সুবহানাল্লাহ! উভয় দিক এখলাছে ভরপুর। তখন আল্লাহপাক বিচ্ছেদের স্থলে বন্ধন সৃষ্টি করে দিলেন।

(২) হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর খানকায় প্রশিক্ষণের সময় অধিক কঠোরতা করা হতো। এমনকি কেউ একে অপরের সঙ্গে কথা বললে তাকে খানকা থেকে বের করে দেওয়া হতো। সেখানে নিয়মকানুনের খুব কঠোরতা ছিল।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, শায়খের কাছে কঠোরতা থাকলে সেটা মুরীদের জন্য গুরুত্বের বিষয় হয়। ফলে শায়খ তাদের ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেন এবং শিষ্যগণ অতি তাড়াতাড়ি সংশোধিত হয়ে যায়। অর্থাৎ মুর্শিদের কঠোরতা শিষ্যের জন্য রহমত। তবে হযরত মাদানি (রহ.)-এর দরবার ভিন্ন ছিল। তিনি শিষ্যদের প্রতি কোমল ব্যবহার করতেন। কেউ এলে তাকে আপ্যায়ন করতেন। অনেকবার তাদের পা পর্যন্ত ধুয়ে দিয়েছেন। দুজনের প্রকৃতিতে এতটুকু তফাৎ ছিল যে, উভয়জন ফুল ছিলেন। কিন্তু উভয় ফুলের ঘ্রাণ ভিন্ন ছিল।

কবি বলেন–

ہر گل را رنگ و بوئے دیگر است

'প্রত্যেক ফুলের রং ও সুবাস ভিন্ন।'

এক আলেম হযরত থানভী (রহ.)-এর খানকায় কিছুদিন থাকার পর মাদানি (রহ.)-এর খানকায় আসেন। এখানে কয়েকদিন রাজপুত্রের মতো আরামে থেকে একদা হযরত মাদানি (রহ.)কে বললেন, হযরত! একটি কথা জিজ্ঞাসা করার অনুমতি চাচ্ছিলাম। হুজুর বললেন, বলো কী বলতে চাও? সে বলল, হুজুর! আমি হযরত থানভী (রহ.)-এর খানকায় কিছুদিন থাকার পর এখানে এসেছি। সেখানে দেখলাম, শিষ্যদের অত্যন্ত আঁটসাট করে ধমকিয়ে রাখা হয়। আর এখানে ভালোবাসা দিয়ে রাজপুত্রের মতো রাখা হয়। হুজুর! দুই জায়গার অবস্থা একটু বিশ্লেষণ করে বললে ধন্য হতাম।

এবার ভেবে দেখুন, আপনার-আমার মতো সাধারণ লোক হলে কী জবাব দিতাম। কিন্তু তিনি একজন পরিশোধিত লোক ছিলেন। কী সুন্দর উত্তর দিয়েছেন দেখুন! হযরত মাদানি (রহ.) বললেন, ভাই! সেখানে বড় ডাক্তার রয়েছেন। তিনি বিশেষজ্ঞ সার্জন। আর সার্জন সর্বদা অঙ্গ কাটাচেরা

করেন। ফোড়ার ভেতর থেকে দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা বের করেন। এতে রোগী কষ্ট পায়। এ কারণেই সেখানে থাকতে তোমার কষ্ট অনুভূত হয়েছে। আর আমার অবস্থান হচ্ছে ডাক্তারের কম্পাউন্ডারের মতো। কম্পাউন্ডারের কাজ হলো, ডাক্তার অপারেশন করার পর সেখানে ব্যান্ডেজ করা। ব্যান্ডেজ লাগানোর সময় যেহেতু রোগী আরাম পায়, তাই মনে করে, সে আমার সঙ্গে মায়াময় আচরণ করেছে।

ভেবে দেখুন, এদের অন্তরে এখলাছ ছিল। তাই এমন কথা বলেছেন, যাতে বিচ্ছেদের স্থলে মহব্বতের বন্ধন সৃষ্টি হয়। মানুষ পরস্পরে নিকটবর্তী হয়। আল্লাহপাক আমাদের এমন এখলাছ দান করুন। আমীন।

ধোঁকাবাজের নিদর্শন তিনটি

আমাদের ওলামায়ে কেরাম বলেন, ধোঁকাবাজের নিদর্শন তিনটি, যার দ্বারা মানুষ নিজে পরিমাপ করতে পারবে, আমি কোন অবস্থায় আছি।

এক. নির্জনে অলসতা, জনসমক্ষে তৎপরতা। অর্থাৎ– সে একাকি ইবাদাত করার সময় উদাসীন থাকবে, আলসেমি করবে, সংক্ষিপ্তভাবে নামায আদায় করবে। আর মানুষের সামনে ইবাদাত করার সময় শঠামি করবে। যেহেতু মানুষ দেখছে তাই চাতুরি করে সূফী সেজে শুধু এশরাকের নফল নামাযই পড়ে না; বরং অন্যান্য কাযা নামাযও আদায় করে। আর মানুষ না থাকলে ফরজ নামায আদায় করাও তার জন্য কঠিন হয়ে যায়। এজন্যই কোনো-কোনো ছাত্র মাদরাসায় থাকলে খুব উত্তমরূপে আমল করে আর বাড়িতে গেলে খবর থাকে না । এটা এখলাছের পরিপন্থী। মাদরাসায় থাকা অবস্থায় যেভাবে আমল কর, ফারেগ হওয়ার পর বাড়ি গেলেও সেই রকম আমল করা চাই। কেননা, এখানে যে খোদাকে রাজি করতে চেয়েছিলাম, সেখানেও ওই মালিককেই রাজি করার চেষ্টা করব।

দুই. সে পৃথিবীর মানুষের পক্ষ থেকে প্রশংসা পেতে অনুরাগী থাকে। অর্থাৎ– আকাঙ্ক্ষা থাকে, মানুষ আমার প্রশংসা করুক। আপনি দেখবেন, রিয়াকারেরও প্রশংসা করা হয় এবং নিষ্ঠাবানেরও প্রশংসা করা হয়। তবে উভরের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। লোকমুখে প্রশংসা শুনে রিয়াকার আনন্দিত হয়। কিন্তু নিজের প্রশংসায় নিষ্ঠাবানের হৃদয়ে কান্না আসে।

ইমাম আযম হযরত আবুহানীফা (রহ.) স্রষ্টার দরবারে কাঁদতেন আর বলতেন, হে আল্লাহ! আমার প্রতি জনগণের যে সুধারণা রয়েছে, আপনি আমাকে সে-রকম হওয়ার তাওফীক দিন।

মাতাপিতা ও ওস্তাদগণের পক্ষ থেকে এক প্রকার প্রশংসা পাওয়া যায়। সেটি ভালো। বরং সেটি অনুরাগের বিষয়। যদি কোনো ছাত্র এ-উদ্দেশ্য অধিক লেখা পড়া করে যে, ওস্তাদ আমার প্রশংসা করবেন, আমাকে ভালোবাসবেন, তাহলে এটা প্রশংসনীয় ব্যাপার। কারণ, সে তার শিক্ষককে আল্লাহর প্রিয় বান্দা মনে করে। তাই সে এই অনুভূতি নিয়ে কাজ করে যে, আল্লাহর এই বান্দা আমার প্রতি খুশি হলে আমার আল্লাহ আমার প্রতি খুশি হবেন।

জনৈক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহ.)কে বলল, হুজুর! আপনার শিষ্যরা আপনাকে যে-পরিমাণ ভয় করে, আমার মনে হয় তারা আল্লাহকেও সে-পরিমাণ ভয় করে না। হযরত থানভী (রহ.) তাকে নিজের কাছে বসিয়ে বললেন, ভাই! আমি কি কোনো পুলিশ, না সেনাবাহিনী যে, তারা আমাকে এত ভয় করবে? সে বলল, তারা আপনাকে আল্লাহর ওলী মনে করে। তাই তাদের ভয় হয়, আপনি যদি ক্ষুব্ধ হয়ে যান, তাহলে আল্লাহও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং তাদের পরিণাম খারাপ হয়ে যাবে। এবার হযরত থানভী (রহ.) বললেন, ভাই! তারা যেহেতু আমাকে আল্লাহর বন্ধু মনে করে আর ভয় করে যে, আমি যদি নারাজ হয়ে যাই, তাহলে আল্লাহপাকও নারাজ হয়ে যাবেন; তাই এখানে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাকেই ভয় করা হয়। মহান ক্ষমতাধর প্রভুর ভয়ের একটি আভা তাদের অন্তরে নিপতিত করা হয়। এজন্যই আল্লাহওয়ালা পীর, মুরশিদ, ওস্তাদ ও মাতাপিতার প্রশংসা উত্তম হয়ে থাকে। এদের আশীর্বাদে মানুষ উন্নতির উচ্চ শিখড়ে পৌঁছে যায়।

সাধারণত সৃষ্টির প্রশংসার স্পৃহা হৃদয়ে থাকা দূষণীয়। কিন্তু আজ দেখবেন, বয়ানের মাঝে-মাঝে বলা হয় 'বলেন সুবহানাল্লাহ'। সকলের কাছ থেকে উচ্চৈঃস্বরে বলানো হয়। বন্ধুগণ! এটা বলবেন যে, ভাই! আল্লাহকে স্মরণ করো। নতুবা যদি এমন ইচ্ছা হয় যে, লোকজন বারবার উচ্চৈঃস্বরে সুবহানাল্লা বলবে আর আমার ওয়াজের বাহবা বৃদ্ধি পাবে, তাহলে কয়েকবার সুবহানাল্লাহ পেয়ে তোমার ওয়াজের প্রতিদান তুমি পেয়ে গেছ। পরকালে পাওয়ার জন্য কিছুই বাকি রইল না।

সুতরাং বন্ধুগণ! মানুষের প্রশংসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় থেকো না বরং এ আশা পোষণ করো যে, হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টি চাই। সুতরাং আপনার দরবারে আমি গ্রহণযোগ্যতা চাই।

তিন. মানুষ তার নেক কাজের সমালোচনা করলে সে ওই আমল ছেড়ে দেয়। সামান্য কথার জের ধরে সুন্নতের ওপর আমল করা ছেড়ে দেয়।

আপনারা অবশ্যই শুনে থাকবেন, বিয়ে শাদীতে অধিকাংশ মহিলারা বলে, এভাবে করলে সমাজ কী বলবে? লোকজন কী বলবে? সমাজে মুখ দেখাব কীভাবে? তারা কি কোনো সময় এমন কথা বলছে যে, এভাবে করলে আমার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কী বলবেন? শরীয়ত কী বলবে? ইসলাম কী বলবে? আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সম্পর্কে কোনো চিন্তাই নেই; বরং চিন্তা করে, এভাবে করলে সমাজে আমাদের মানহানি হবে।

ভাইয়েরা! দুনিয়াতে কীসের মানহানি? কেয়ামতের দিন যে মানহানি ঘটবে, তা সমস্ত মাখলুক দেখবে। আজ যদি দু-চারজন এমন কথা বলেও ফেলে যে, অমুকের বিয়ের মধ্যে নাচ-গান হয়নি, বাদ্যযন্ত্র বাজায়নি, তাহলে এটা কোনো মারাত্মক বিষয় নয়। এর জন্য হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। মানুষ বলছে তো বলুক। আমার দেখা দরকার, আমার কাজে আমার মালিক খুশি আছেন কি-না। আমার এ কাজে আমার মালিক কী বলছেন, যার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য আমি কাজ করছি। আল্লাহপাক আমাদের ধোঁকাবাজদের এই তিন আলামত থেকে হেফাযত করুন এবং সারা জীবন নিষ্ঠার সাথে কাজ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

নিষ্ঠাবান বান্দার প্রশংসা অধিক হয়

একটি কথা স্মরণ রাখবেন। ধোঁকাবাজ ও কপটদের আশা থাকে, লোকজন আমার প্রশংসা করুক। আমি শপথ করে বলতে পারি, এমন মোনাফেকমার্কা ধোঁকাবাজদের প্রশংসার চেয়ে আল্লাহপাক ওই বান্দার প্রশংসা বেশি করিয়ে থাকেন, যে লোকমুখে প্রশংসা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তদুপরি আসল মজার বিষয় হলো, এরা চায় তবু পায় না। পক্ষান্তরে ওরা না পাওয়ার জন্য কাঁদে; কিন্তু বেশি পায় এবং আল্লাহর দরবারে প্রতিদানও পায়।

যেমন এখলাছ তেমন প্রতিদান

একটি মূলনীতি স্মরণ রাখবেন, যে-পরিমাণ এখলাছ থাকবে সেই পরিমাণ প্রতিদান পাবে। আমল যতই ছোট হোক এখলাছ থাকলে আল্লাহপাক তাকে মোটা বানিয়ে দেন। আপনারা হীরক দেখে থাকবেন। হীরা দেখতে অতি ছোট। কিন্তু তার মূল্য অনেক। কোটি টাকায়ও পাওয়া যায় না। তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা নিষ্ঠাবানদের আমল হীরার মতো মূল্যবান বানিয়ে দেন।

ইমাম আবুদাউদ (রহ.)-এর এখলাছ

ইমাম আবুদাউদ (রহ.) একজন বিখ্যাত হাদীছবিশারদ ছিলেন। একদা তিনি নৌবিহারে যাচ্ছিলেন। সামনে থেকে আরেকটা জাহাজ আসছিল। এমন সময় তিনি একটি হাঁচি দিলেন। হাঁচির ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম হলো, যে হাঁচি দেবে, সে বলবে الحمد لله যে শুনবে, সে বলবে يرحمك الله তারপর হাঁচিদাতা পুনরায় বলবে يهديكم الله। যাক তিনি হাঁচি দিয়ে الحمد لله বলার পর আগত জাহাজ থেকে একজন বলল, يرحمك الله এখন তিনি يهديكم الله বলতে-বলতে জাহাজটি কিছু দূরে চলে গেল। এতক্ষণে লোকটি يهديكم الله এর আওয়াজ শুনবে না। এতে তিনি অস্থির হয়ে যান। লোকটির জবাব আমি দিতে পারলাম না। ফলে জাহাজ তীরে নোঙর করার পর তিনি এক দেরহামের বিনিময়ে আরেকটি নৌকা ভাড়া করে ওই জাহাজের কাছে গেলেন। বললেন, ভাই! কে আমার হাঁচি শুনে يرحمك الله বলেছিলেন। আমি আপনার জবাব দিচ্ছি يهديكم الله সুবহানাল্লাহ! একথা বলেই ফিরে এলেন। তারপর রাতে শয়নের পর খাবে দেখলেন, কে যেন বলছে, আজ আবুদাউদ এক দিরহামের বিনিময়ে আল্লাহপাকের জান্নাত খরিদ করেছেন। আল্লাহু আকবার!

মুহাদ্দিছীনে কেরাম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এখলাছের সঙ্গে কাজ করতেন। এজন্য তাদের কল্যাণ আজও বিরাজমান। আজ দুনিয়াবাসী তাদের লিখিত কিতাব অধ্যয়ন করছে, শরীয়তমতো জীবন গড়ছে এবং তারা কবরদেশ থেকে এর ছাওয়াব লাভ করছেন। সুতরাং নিষ্ঠাবানের আমল ছোট হলেও এর প্রতিদান মহৎ হয়। তারা স্বল্প আমল করে অল্লাহপাকের পক্ষ থেকে অধিক প্রতিদান পেয়ে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি সন্ধানী

মুখলিছ বা নিষ্ঠাবান বান্দাগণের আলামত হচ্ছে, তাঁরা পুণ্যের কাজ এমনভাবে লুকিয়ে রাখেন যেমনভাবে মানুষ গোনাহের কাজ অপরজন থেকে গোপন রাখে। কেননা, তাঁরা আমল করেন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য। মানুষকে দেখানোর জন্য নয়। আমাদের বুযুর্গগণও এমনভাবে আমল করতেন, যা অন্য কেউ টেরও পেত না। এরকম আমলের বহু প্রমাণ আছে। যথা–

(১) উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর আমল ছিল, তাঁর দরবারে কোনো ভিক্ষুব হাঁক দিলে সেবিকার মাধ্যমে কোনো কিছু পাঠিয়ে দিতেন। তারপর পর্দার আড়াল থেকে শুনতেন ওই ভিক্ষুক কী বলছে। সেবিকাও সে বিষয়টি জানত। একদা কোনো এক সেবিকা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আম্মাজান, আপনি ভিক্ষা আমাদের মাধ্যমে পাঠিয়ে পর্দার আড়াল থেকে কী শোনেন। আম্মাজান জবাব দিলেন, আমি শ্রবণ করি, ওই ভিক্ষুক আমার জন্য কী দু'আ করে। সে যে দু'আ করে, আমি তার জন্য সেই দু'আ করি। সুতরাং আমার দানের বিনিময় তার দু'আ হলো না। তার দু'আর পরিবর্তে আমি তাকে দু'আ দিয়ে দিই। আমার দানের বিনিময় অক্ষুণ্ন থাকল। আমার দানের বিনিময় আমি আল্লাহর দরবারে পাব। দুনিয়ার কারও দু'আ যাতে আমার দানের বিনিময় না হয়।

(২) হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) মাদায়েন শহর জয় করার পর গনিমতের মাল বন্টন শেষে একজন সাধারণ মুজাহিদ তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। তিন কাপড়ের প্যাঁচ থেকে কিছু বের করে বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আমি এ আমানত আপনার কাছে সোপর্দ করার জন্য এসেছি। পোটলাটা খোলার পর দেখা গেল বস্তুটা মাদায়েনের বাদশাহর মুকুট। সোনা দ্বারা তৈরী চতুর্পার্শ্বে অনেক মূল্যবান হীরা-মুক্তা দিয়ে কারুকার্য করা। যদি মুজাহিদ কাউকে অবগত না করে সেটা বিক্রয় করতেন, তাহলে তাঁর সাত সিঁড়ি পর্যন্ত কেউ রুজি করার প্রয়োজন হতো না। বাদশাহ যুদ্ধের ময়দানে নিহত হওয়ার পর তার মুকুটটা কোথাও পড়ে গিয়েছিল। মুজাহিদ সেটা পেয়ে স্বযত্নে লুকিয়ে রাখেন। তিনি সেটা আমীরের কাছে হস্তান্তর করেন। যে মুকুট সম্পর্কে কারও কোনো খবরই ছিল না। তিনি ইচ্ছা করলে সেটা নিজের কাছে রেখে দিলে কেউ টেরও পেত না। কিন্তু না; তাঁর এখলাছ একাজ বরদাশত করতে পারেনি। তিনি সে আমানত আমীরের কাছে হস্তান্তর করেন।

মুকুট দেখে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) অবাক হয়ে গেলেন? কী আশ্চর্য ব্যাপর! এত মূল্যবান মুকুট সে ইচ্ছা করলে তার কাছে গোপন রাখতে পারত। আমীর জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! আপনার নাম কী? সেনাপতি তাঁকে নাম জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি সেনাপতির দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন। জনাব! যে মালিকের সন্তুষ্টির জন্য আমি এত মূল্যবান জিনিস নিজের কাছে লুকিয়ে না রেখে আমানত মনে করে আমীরের কাছে হস্তান্তর করেছি, সেই মালিক আমার নাম জানেন। সুতরাং আমি চলে

গেলাম। একথা বলেই তিনি আমীরের সামনে থেকে চলে গেলেন। কেউ তাকে চিনতেও পারল না। ভাই! একেই বলে এখলাছ।

(৩) মাসলামা ইবনে আবদুল মালিক নামে এক বাদশাহ ছিলেন। একবার তিনি কোনো একস্থানে সেনা-অভিযান চালান। শত্রুরা তাদের ঘাঁটিতে আত্মগোপন করে অবস্থান করে। মুসলিম সৈনিকগণ সেই ঘাঁটি ঘেরাও করে রাখেন। কয়েকদিন পর্যন্ত সেই অবরোধ থাকে। তারা প্রচুর চেষ্টা করেও কোনো উপায় পাচ্ছে না। শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তি প্রাচীরে আরোহণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অপমানসূচক কটূক্তি করতে থাকে। মুসলিম সৈনিকগণ অতি শীঘ্রই বিজয়ের চেষ্টা করলেও কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। কারণ, মুসলিম সৈনিক তাদের ঘাঁটির নিকটবর্তী হলেই তারা ভেতরে থেকে তীরবৃষ্টি বর্ষণ করে। ফলে মুসলিম সৈনিকরা পেছনে সরে আসতে বাধ্য হন। আল্লাহ তা'আলা কুদরত দেখুন! একদা এক মুসলিম যুবক সামনে অগ্রসর হতে লাগল। তার প্রতি শত্রুপক্ষের বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ হতে থাকে। সে ওই তীরের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি। নিজের পাপের ভয় ত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। শত্রুদের তীর তার গায়ে বিদ্ধ হচ্ছে। সে তার মস্তক বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে কোনোক্রমে শত্রুদের ঘাঁটির দেওয়ালের কাছে চলে যায়। সেখানে গিয়ে এমন স্থানে বসে, যেখানে শত্রুদের তীর পৌঁছতে পারেনি। তারপর সে দেওয়ালের নিচে বসে দেওয়াল ভাঙতে শুরু করে। তার এ বীরত্ব দেখে আরও কতিপয় সৈনিক সেখানে গিয়ে তার কাজে যোগ দেয়। সবাই মিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেওয়াল ভেঙে ভেতরে প্রবেশের রাস্তা করে নেয়। ফলে তারা ভেতরে প্রবেশ করে আক্রমণ চালালে আল্লাহপাক তাদের বিজয় দান করেন।

অবশেষে ওই যুবকের বাদাদুরিতে সমস্ত সৈনিক বিচলিত হয়ে গেলেন। সে কেমন করে বৃষ্টির মতো পতিত তীরের মধ্য দিয়ে ঘাঁটিতে যাওয়ার সাহস করল! শরীরের অসংখ্য তীর বিদ্ধ হচ্ছে। তারপরও সেখানে যেতে সক্ষম হয়েছে। ফলে এত মহৎ কৃতিত্ব অর্জন করেছে। তাই প্রত্যেক সৈনিকের আবেগ ছিল, দেওয়াল ভেঙে ঘাঁটিতে প্রবেশের রাস্তা কে বের করল তাকে চিনে রাখা দরকার।

কেল্লা বিজয় হওয়ার পর সবাই একত্রিত হলে সেনাপতি বললেন, ভাই! দেওয়াল ভেঙে রাস্তা নির্মাণকারী কে? আমি আল্লাহ তা'আলার বরাত দিয়ে বলছি, মেহেরবানিপূর্বক আপনি দাঁড়িয়ে যান, যাতে আমি চিনতে পারি, এত

মহান কাজ আল্লাহপাক আপনার মাধ্যমে অর্জন করিয়েছেন। সেনাপতি একথা বলার পর এক যুবক নিজের চেহারা আবৃত করে দাঁড়িয়ে বলল, মাননীয় সেনাপতি! আমিও আল্লাহ তা'আলার বরাত দিয়ে আপনাকে বলছি, আপনার আদেশ পালনার্থে আমি দাঁড়িয়েছি। এরপর মেহেরবানি করে আপনি আমার চেহারা উন্মুক্ত করতে নির্দেশ দেবেন না। আমার নাম জিজ্ঞাসা করবে না। সুতরাং সেনাপতি আর তাকে নাম জিজ্ঞাসা করলেন না। চেহারা আবৃত অবস্থায়ই সে কিছুক্ষণ পর এখান থেকে উধাও হয়ে গেল। আল্লাহু আকবার!

তাঁর এখলাছের পরিমাণ কত? এত মহৎ কাজ করে নিজের নামটি পর্যন্ত প্রকাশ করতে চাচ্ছে না। সেনাপতি তাঁর কাজে এ পরিমাণ খুশি হয়েছিলেন যে, তিনি দু'আর মধ্যে সবসময় বলতেন, হে আল্লাহ! ওই লোকের সাথে আমার হাশর করো। সুবহানাল্লাহ। ভাই! এদের এখলাছের কথা ভেবে দেখুন, আল্লাহপাক আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

(৪) হিজরীর চতুর্থ সনে আবু ওমর মুজাহিদ নামে এক বুযুর্গ ছিলেন। তৎকালীন বাদশাহ জনকল্যাণে একটি চাষাবাদের জমি আবাদ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু এ জমি আবাদ করতে প্রচুর টাকা ব্যয় হবে। এত টাকা তার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে নেই। হযরত আবু ওমর মুজাহিদ (রাযি.) একজন উল্লেখযোগ্য ধনী ছিলেন। তাই বাদশাহ হযরতের কাছে প্রস্তাব দিলেন, জনাব! আমি জনকল্যাণে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে একাজটি করতে চেয়েছি। কিন্তু এত টাকা আমার কোষাগারে নেই। এখন কী করতে পারি।

বাদশাহর আবেদন শুনে হযরত আবু ওমর মুজাহিদ (রহ.) বাদশাহকে দুলক্ষ দিনার দিলেন। বাদশাহ তাঁর পক্ষ থেকে এ অনুদান পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলেন। পরের দিন লোকজন ডেকে কাজের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য উৎসাহ দিলেন এবং বললেন, আমার পক্ষ থেকে এত টাকা নিয়ে কাজ শুরু করো। প্রয়োজন হলে আপনারা সহযোগিতা করবেন। আলোচনান্তে জনগণকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বাদশাহ একথাও বলে দিলেন যে, হযরত আবু ওমর মুহাজিদ সাহেবও দুলাখ দিনার দিয়েছেন। বাদশাহ একথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে আবু ওমর মুজাহিদ (রহ.) দাঁড়িয়ে বললেন, জাহাঁপনা! আমি এ টাকা দেওয়ার সময় আমার আম্মাজানের অনুমতি নিতে ভুলে গেছি। আপনি মেহেরবানি করে আমার টাকাগুলো ফেরত দিন। আম্মাজানের অনুমতি নিয়ে না হয় আবার দেব। এ টাকাতে আম্মাজানের অনুমতি নেওয়া আমার জন্য আবশ্যক।

তাঁর একথা শুনে বাদশাহসহ সবাই হতবাক। কী ব্যাপার এত বড় একজন বুযুর্গ টাকা দিয়ে আবার এখন এতসব মানুষের সামনে ফেরত চাচ্ছেন? আগে জনগণ তার যে প্রশংসা করত, এখন এক কথায় অতীতের সব স্তুতি ধূলিসাৎ হয়ে গেল। যাক শেষ পর্যন্ত বাদশাহকে তাঁর টাকা ফেরত দিতেই হলো। তারপর সবাই চলে গেলে রাতের অন্ধকারে তিনি সেই টাকা নিয়ে বাদশাহর দরবারে হাজির হলেন। বললেন, মহোদয়! আপনি আমাকে জবাই করে দিচ্ছিলেন। মহান আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। আম্মাজানের বাহানা দিয়ে আমি সেই ধ্বংসাত্মক অবস্থা হতে নিস্কৃতি পেয়েছি। এ টাকা আমারই। তবে মায়ের কথা বলে আমি মিথ্যাচার করিনি। কারণ, সন্তানের সম্পদে পিতামাতার অধিকার থাকে। এই নিন আপনার জনহিতকর কাজে আমার পক্ষ থেকে দুলক্ষ দিনার। তবে আমি অনুরোধ করছি, মেহেরবানি করে কারও কাছে আমার নাম প্রকাশ করবেন না। সুবহানাল্লাহ!

(৫) বন্ধুগণ! হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর একটি আমল দিলের কান দিয়ে শুনুন। একদা হযরত ওমর (রাযি.) হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর দরবারে এসে দেখলেন, মদীনার ভূমিহীন, অসহায়, বৃদ্ধ, সর্বহারা লোকদের একটি তালিকা খলীফার সামনে পড়ে আছে। ওমর (রাযি.) সেটা নিয়ে পড়ছেন। কাগজের এক পার্শ্বে হতদরিদ্র অসহায়দের নাম এবং অপর পার্শ্বে তাদের নাম, যারা এদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। যেমন এই বৃদ্ধ আবদুল্লাহ। তার সেবক আবদুর রহমান ইত্যাদি। এর মধ্যে একজন বৃদ্ধা অসহায় মহিলার নামও রয়েছে, যার কেউ নেই। তার ঘর ঝাড়ু দেওয়া বা পানি সরবরাহ করার মতো লোক নেই এবং তার নামের পার্শ্বে কোনো সেবকের নামও নেই। অর্থাৎ তার সেবার জন্য কেউ নাম লেখায়নি। হযরত ওমর (রাযি.) মনে-মনে সংকল্প করলেন, এ মহিলার সেবার দায়িত্ব আমি নেব। তিনি ওই মহিলার নাম নোট করে রাখলেন।

পরের দিন ফজরের নামাযের পর ওই মহিলার দরজায় গিয়ে কড়া নাড়া দিলেন, মা আপনার সেবার জন্য খাদেম এসেছে। ঝাড়ুটা দিন। আমি ঝাড়ু দিচ্ছি। আর কি প্রয়োজন আছে বলুন। হযরত ওমর (রাযি.)-এর কথা শুনে মহিলা বললেন, বাবা! আমার ঘরের প্রয়োজনীয় কাজ করা হয়ে গেছে। কে যেন এসে ঘর ঝাড়ু দিয়ে পানিও এনে দিয়েছে। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, মা একাজ করার জন্য কে আসে? মহিলা বললেন, আমি তার পরিচয় জানি না। প্রত্যহ এসে বলে, খাদেম এসেছে; পর্দা করুন। আমি পর্দার আড়ালে চলে যাই। সে আমার ঘর ঝড়ু দিয়ে পানির ব্যবস্থা করে চলে

যাওয়ার সময় বলে, আমি চলে যাচ্ছি। পর্দা থেকে বের হতে পারেন। ফলে সে চলে যায়। তার চেহারা আমি কোনো দিন দেখিনি। আমি তার নামও জানি না। হযরত ওমর (রাযি.) মহিলার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলেন। কে সেই মহৎ ব্যক্তি?

পরের দিন হযরত ওমর (রাযি.) তাহাজ্জুদের নামায পড়ে মহিলার বাড়ি গিয়ে ঝাড়ু দেওয়ার অনুমতি চাইলে মহিলা বললেন, বাড়ি ঝাড়ু দেওয়া হয়ে গেছে। সেবক এসে সব কাজ সেরে গেছে। তৃতীয় দিন হযরত ওমর (রাযি.) ওই মহিলার বাড়ি যাওয়ার রাস্তায় লুকিয়ে বসে রইলেন, দেখি এমন মহৎ ব্যক্তিটা কে।

রাত গভীর হলো। আঁধার ঘনিয়ে এল। পাড়া-পড়শি সবাই সুখনিদ্রায় মগ্ন রইল। এমন সময় এক লোক চুপিচুপি হেঁটে ওই মহিলার ঘরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তখন হযরত ওমর (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? উত্তর এল, আমি আবুবকর। হযরত আবু বকরের (রাযি.) আওয়াজ শুনেই হযরত ওমর অবাক।

আমীরুল মুমিনীন! এত রাতে আপনি একাকি এখানে? হযরত আবুবকর (রাযি.) জবাব দিলেন, ওমর! ওই মহিলার সেবার দায়িত্ব আমি নিজের হাতে রেখেছি। তাই তার ঘর ঝাড়ু দেওয়ার জন্য নির্জনে এখানে আসি। হযরত আবুবকর (রাযি.) তখন খালি পায়ে এসেছিলেন। তা দেখে ওমর (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার জুতা কোথায়? আবুবকর (রাযি.) বললেন, জুতা পায়ে হাটলে সেই আওয়াজে জনগণের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাই জুতা বাড়িতে রেখে এসেছি। সুবহানাল্লাহ!

তাঁরা ওইসমস্ত লোক ছিলেন, যাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে তাঁদের জান্নাতে সুসংবাদ পেয়েছিলেন। তদুপরি তারা নিজেদের আমল এভাবে লুকিয়ে রাখতেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তাঁদের আমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আজ আমাদের আমলনামা শূন্য হয়ে যায়।

এখলাছের চেকিং

বান্দার আমলের এখলাছ পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্থানে-স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে রেখেছেন। পৃথিবীতে যেভাবে স্থানে-স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে রাখা হয়, চলাচলের পথে পুলিশ মানুষকে চেক করে, এক ঘাট পার হওয়ার পর আরেক ঘাটে চেক করা হয়, তেমনিভাবে আল্লাহপাক বান্দার

আমল চেক করার জন্য সাতটি চেকপোস্ট বসিয়ে রেখেছেন। বান্দা কোনো আমল করলে ফেরেশতারাগণ সেই আমল বহন করে প্রথম আসমানে গিয়ে দরজায় করাঘাত করেন।

ভেতর থেকে দারোয়ান ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করেন, কে এসেছেন? কেন এসেছেন? কিসের জন্য ওপরে যেতে চান? ফেরেশতারা বলেন, এক বান্দার নেক আমল নিয়ে আল্লাহর দরবারে যেতে চাই। দারোওয়ান ফেরেশতা বলেন, আগে আমল দেখাও। সেটা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হলে যাওয়ার অনুমিত পাবে; অন্যথায় নয়। প্রথম আসমানের দারোয়ান ফেরেশতা সেই আমল চেক করে এখলাছ পেলে ওপরে যাওয়ার অনুমতি দেন। পক্ষান্তরে সেই আমলে এখলাছ না থাকলে প্রথম আসমান থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানের দরজায় বান্দার আমলের এখলাছ পরীক্ষা করা হয়। তারপর সাত ঘাট অতিক্রম করে মহান স্রষ্টার দরবারে উপস্থিত করা হলে আল্লাহপাকও সেই আমল নিরীক্ষা করেন। ফলে একমাত্র আল্লাহর জন্য এখলাছের সাথে সেই আমল করে থাকলে তিনি সেটা গ্রহণ করেন। আর তাতে সামান্য পরিমাণ ত্রুটি থাকলে আল্লাহপাক সেই আমল বান্দার মুখ বরাবর ছুড়ে মারেন। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْعَالِمُوْنَ وَالْعَالِمُوْنَ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْعَامِلُوْنَ وَالْعَامِلُوْنَ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْمُخْلِصُوْنَ وَالْمُخْلِصُوْنَ عَلٰى خَطَرٍ عَظِيْمٍ۔

'সকল মানুষ ধ্বংসশীল আলেমগণ ছাড়া। আলেমগণ সবাই ধ্বংসশীল আমলকারীগণ ছাড়া। আমলকারীগণ সবাই ধ্বংসশীল নিষ্ঠাবানগণ ব্যতীত। আর নিষ্ঠাবানরা রয়েছে ভয়ানক ঝুঁকির মধ্যে।'

বন্ধুগণ! ভেবে দেখুন, এই এখলাছের জন্য আমার কীরূপ চিন্তাশীল হওয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট তৈরী করা হয়। মালিক বলে, আমার গ্রাহক কোয়ালিটি চায়। সুতরাং আমার প্রত্যেক বস্তু কোয়ালিটিমতো হওয়া চাই। কোয়ালিটিমতো না হলে তা প্রত্যাখান করা হয়। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহপাকের দরবারে আমলের জন্য কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্ট তৈরী রাখা হয়েছে। প্রত্যেক আমলের এখলাছ চেক করা হয়। যে-আমল নির্দিষ্ট কোটায় পড়বে, তা আল্লাহপাক গ্রহণ করেন।

আর যেগুলো সেই মাপে পড়ে না, তা আল্লাহ্ প্রত্যাখান করে দেন। বন্ধুগণ! দুনিয়ার সাধারণ গ্রাহকের দু-চারটা টাকার আশায় কোয়ালিটির প্রতি এত আকৃষ্ট হন; তাহলে যে মহান মালিক জান্নাত দেবেন, যিনি নিজে সন্তুষ্টি দেবেন, সাক্ষাৎ দেবেন, তিনি বান্দার আমলে এখলাছ চাইবেন না কেন? সুতরাং আমরা নিজের আমলের এখলাছের প্রতি চিন্তাশীল হই। শুধু একই চিন্তায় যেন থাকি যে, আল্লাহপাক আমাদের কাজগুলো তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এবং লৌকিকতা থেকে মুক্ত রেখে করার তাওফীক দান করেন।

মুখলিছের পরিচয়

একদা ফকীহ আবুল লায়েছ (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হুজুর, মুখলিছ (নিষ্ঠাবান) কাকে বলে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, তুমি রাখাল দেখেছ? বলল, দেখেছি! আচ্ছা, সে নামায পড়ার সময় কি তার এরকম আশা থাকে যে, এ সমস্ত বকরিপাল আমার প্রশংসা করবে? না। কস্মিনকালেও রাখালের এমন আশা থাকতে পারে না। তিনি বলেন, বকরি পালের মাঝখানে নামায পড়তে যেমন রাখালের এ আকাঙ্ক্ষা থাকে না যে, এ ছাগলগুলো আমার প্রশংসা করবে, ঠিক তেমনিভাবে নিষ্ঠাবান লোকেরা জনসমক্ষে নামায পড়েও এ প্রত্যাশা করে না যে, লোকজন আমার প্রশংসা করুক। আল্লাহপাক আমাদের এমন এখলাছ দান করুন। আমীন।

আল্লাহ্ দুয়ার, আল্লাহ্র ভয়

দুটি বাক্য স্মরণ রাখবেন– এক. আল্লাহ্ তা'আলার দরবার। দুই. আল্লাহ্র ভয়। এ দুটি বিষয় জীবনে কোনো দিন ভুলে যেয়ো না। আল্লাহ্র দুয়ার থেকেও বিমুখ হয়ো না এবং আল্লাহ্র ভয় থেকেও নিরাপদ থেকো না। আর কখনও এমন আশা পোষণ করো না যে, আমি তো অনেক তাহাজ্জুদ পড়েছি। প্রচুর যিকির, মুরাকাবা করেছি। কলবে লা ইলাহার চোট মেরেছি। সুতরাং ভয়ের কারণ কী। এমন নির্ভয় কখনও হবে না। সারা জীবন এ ভয় রাখতে হবে যে, না জানি কেয়ামতের দিন আমার কী অবস্থা হয়। যদি আল্লাহ্র দুয়ার ও আল্লাহ্র ভয় এ দুটি জিনিসকে জীবনের সঙ্গী বানাতে পার, তাহলে এ আশা করা যায়, আমি নিরাপদ হয়ে আল্লাহ্র পথে অগ্রসর হচ্ছি।

প্রত্যেক কাজেরই মূল্য থাকে

বন্ধুগণ! প্রত্যেক আমলেরই মূল্য থাকে। যদি অন্তরে এ ধারণা থাকে যে, লোকজন আমাকে ভালো বলবে এবং কাজ করার পর মানুষ তাকে ভালো

বলে, তাহলে তার আমলের প্রতিদান হয়ে গেল। যদি অন্তরে এ ইচ্ছা থাকে যে, আমার কাজের ওপর লোকজন আমার প্রশংসা করবে। আমাকে শাবাশ দেবে এবং কাজ করার পর জনগণ তাকে ধন্যবাদ দেয় অথবা তার প্রশংসা করে, তাহলে তার আমলের বিনিময় হয়ে গেল। পরকালে এই আমলের প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখা যায় না।

কেয়ামতের দিন একজন আলেমকে উপস্থিত করে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কী নিয়ে এসেছ? সে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! আমি কুরআন-হাদীছ শিক্ষা করে এর খেদমতের জন্য বড় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলাম। বিরাট মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, জি আপনি সেগুলো করেছিলেন, যাতে লোকে আপনাকে বড় আলেম বলে। আর তা বলা হয়ে গেছে। এখন আপনার আমলনামায় কিছুই অবশিষ্ট নেই। তারপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের বলবেন, ওই লোককে উবু করে জান্নামে নিক্ষেপ করো। ফলে তা-ই করা হবে।

আমার বন্ধুগণ! এবার ভেবে দেখুন, আমরা যা কিছু করে থাকি, সেগুলো কি লোকমুখে প্রশংসার একটি বাক্য শোনার জন্য করি? যদি এটাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। কেয়ামতের দিন এমন ব্যক্তির বড়-বড় আমল পেশ করা হবে। কিন্তু ফয়সালা আসবে, তার আমলের প্রতিদান দুনিয়াতে দেওয়া হয়ে গেছে। সে জনগণের প্রশংসার জন্য করেছিল। মানুষ তার অনেক প্রশংসা করেছে। সুতরাং তার আমলের বিনিময় হয়ে গেছে। আজ তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। বন্ধুগণ! জানি না, কেয়াতের দিন কী অবস্থা হবে। যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আমল না করতে পারি, তাহলে কেয়ামতের হিসাব আমাদের জন্য কঠিন হবে।

আমি তোমাকে হাজী বলব, তুমি আমাকে কাজী বলো

যদি সত্য কথা বলি ভাই! আমাদের আকাবিরের আমলের প্রতি দৃষ্টি দিলে মনে হয়, হায়! লোকে আমাকে পীর বলে। অথচ আমি পীর হওয়ার যোগ্যতা রাখি না। এমনকি মুরীদ (শিষ্য) হওয়ার যোগ্যতাও রাখি না। আমাদের অবস্থা তো ওই সমস্ত লোকের মতো হয়ে গেছে, যারা লাঞ্ছনার গ্লানি বহন করে একে অপরকে বলে 'আমি তোমাকে হাজী বলব, তুমি আমাকে কাজী বলো।'

আমি তোমাকে খোদাপ্রেমিক বলব, তুমি আমাকে পীর বলো। আল্লাহ মালুম পরকালে আমাদের কী পরিণাম হবে। এখনও সময় আছে; মহান স্রষ্টার দরবারে ক্ষমা চাও। হে আল্লাহ! আমাদের কোনো আমলে লৌকিকতা থাকলে দয়া করে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে খুশি করার জন্য সবকিছু করতে চাই। হে আমার মালিক! কেয়াতের অসহায়ত্ব থেকে মুক্তি দাও। কেয়ামতের দিন দারিদ্র থেকে নিস্কৃতি দাও। কেয়ামতের দিন অনুতপ্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এখলাছের সাথে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তাওবায়ে তাওবা

'শয়তান গোনাহকে তুচ্ছ ও হালকা করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। এটা তার বিরাট কৌশল। সে গোনাহের ব্যাপারে মানুষের অন্তরে এই ধারণা সঞ্চার করে–

এমন গোনাহ তো অধিকাংশ মানুষই করে থাকে।

এমনটা সাধারণত হয়ে থাকে।

এ সমস্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকা কঠিন।

বর্তমানে পর্দা ছাড়া চলাফেরা ব্যাপক হয়ে গেছে। তাই দৃষ্টির হেফাযত করা দুরূহ বিষয়। শয়তান এ সমস্ত গোনাহকে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট আকারে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে মানুষ এ সমস্ত অপরাধ করতেই থাকে। এজন্যই পাপিষ্ঠরা গোনাহকে এমন তুচ্ছ্য মনে করে যেন গায়ে কোনো মাছি বসে আছে আর তাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ মুমিন বান্দা গোনাহকে এমন মনে করে যেমন কোনো পাহাড় তার মাথার ওপর রাখা হয়েছে।'

তাওবায়ে নাসূহা বা আন্তরিক তাওবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ.

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ - اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ۝

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

গোনাহের প্রভাব

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের বাইরে চলা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ করা এবং ধর্মের নামে মনগড়া ইবাদাতের প্রচলন করাকে গোনাহ বলে। আল্লাহপাক আমাদের এ সমস্ত গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব প্রভাব থাকে। গোনাহের প্রভাব হলো মানুষকে অপমান করা। এটা বুঝে নেবে যে, গোনাহ করা মানে লোহার মধ্যে মরিচা ধরা। মরিচা যেভাবে লোহাকে ধ্বংস করে দেয়, তেমনিভাবে গোনাহ মানুষকে অপদস্থ করে। মানুষ গোনাহের পরিণামে পায় লাঞ্ছনা আর নেকির প্রতিদানে পায় সান্ত্বনা। যদিও মানুষ অতি সফলতার সাথে গোনাহ করে, তাকে নিষেধ করার মতো কেউ না থাকে এবং গোনাহ করার সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত থাকে আর সে তার ইচ্ছামতো গোনাহ করতে থাকে, তবু এ গোনাহ তার জন্য ইহকাল ও পরকালের লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার কারণ হবে। এজন্যই আমাদের ওলামায়ে কেরাম বলেন, মুমিন বান্দা গোনাহকে এরূপ ভয় করে, যেরূপ মানুষ বিচ্ছুকে ভয় করে। আপনি দেখে থাকবেন, বিচ্ছু ছোট হোক কিংবা বড় সবাই তাকে ভয় করে। জীবনে এমন কোনো লোক পাবেন না যে

বিচ্ছু ধরার চেষ্টা করে। কারণ, বিচ্ছু ছোট হোক বা বড় তার মধ্যে বিষ থাকবেই। তদ্রূপ গোনাহ ছোট হোক বা বড় হোক তার মধ্যে অপমান থাকবেই। আমাদের ওলামায়ে কেরাম বলেন, গোনাহ জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো। অঙ্গার ছোট হোক বা বড় হোক হাতে নিলে সে হাত জ্বালিয়ে দেবে। এমনকি ছোট অঙ্গারও অনেক সময় অবহেলার কারণে বিরাট আকার ধারণ করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। তাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন–

كُلُّ مَانُهِيَ عَنْهُ فَهُوَ كَبِيْرٌ

শরীয়ত যে সমস্ত কর্ম থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছে, সেগুলোই কবীরা গোনাহ।

তাওবায়ে নাসূহ কাকে বলে?

তাওবায়ে নাসূহ বা আন্তরিক তাওবা কাকে বলে? এ প্রশ্নের জবাবে মুফাসসিরীনে কেরাম লেখেন–

تَنْزِيْهُ الذَّنْبِ عَنِ الْقَلْبِ

'অন্তর থেকে গোনাহ মিটিয়ে দেওয়া।'

অর্থাৎ– গোনাহের নিয়ত অন্তর থেকে মুছে দেওয়া। যদি চিন্তা করেন, তাহলে বিষয়টা খুবই কঠিন। কারণ, অন্তর থেকে গোনাহের ধারণা দূর করা মানবজাতির জন্য সুকঠিন। কেননা, কতক লোক এমন আছে, যারা গোনাহ করার সুযোগ পায় না; তাই করে না। যদি সুযোগ পেত, তাহলে সেই গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন হতো।

হযরত হাসান বসরি (রহ.) বলেন, তাওবায়ে নাসূহ হচ্ছে গোনাহকে এ পরিমাণ ঘৃণা করা, যে-পরিমাণ আগ্রহ ছিল ওউ গোনাহের প্রতি। তারপর গোনাহের কল্পনা এলে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাওয়া।

আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) তাফসীরে মাযহারীতে লিখেছেন, চারটি জিনিসের সমষ্টিকে তওবায়ে নাসূহ বলে।

(১) জবানে ইস্তেগফার করা

(২) শরীরের অঙ্গকে গোনাহের কাজ থেকে দূরে রাখা

(৩) পুনরায় এমন গোনাহে লিপ্ত না হওয়ার অঙ্গীকার করা

(৪) দুষ্টু সাথীদের সংশ্রব ত্যাগ করা।

এতে প্রতীয়মান হয়, তাওবায়ে নাসূহ হলো এরপরে অন্তর দ্বারাও গোনাহের কল্পনা না করা। তাওবা করার সময় সংকল্পবদ্ধ হওয়া যে, আজকের পর আর কোনো দিন এমন অপরাধ করব না।

গোনাহকে হালকা ও সজ্জিত করে উপস্থাপন করা

শয়তান গোনাহকে তুচ্ছ ও হালকা করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। এটা তার বিরাট কৌশল। সে গোনাহের ব্যাপারে মানুষের অন্তরে এই ধারণা সঞ্চার করে–

এমন গোনাহ তো অধিকাংশ মানুষই করে থাকে।

এমনটা সাধারণত হয়ে থাকে।

এ সমস্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকা কঠিন।

বর্তমানে পর্দা ছাড়া চলাফেরা ব্যাপক হয়ে গেছে। তাই দৃষ্টির হেফাযত করা দুরুহ বিষয়। শয়তান এ সমস্ত গোনাহকে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট আকারে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে মানুষ এগুলো করতেই থাকে। এজন্যই পাপিষ্ঠরা গোনাহকে এমন তুচ্ছ্য মনে করে যেন গায়ে কোনো মাছি বসে আছে আর তাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ মুমিন বান্দা গোনাহকে এমন মনে করে যেমন কোনো পাহাড় তার মাথার ওপর রাখা হয়েছে।

এমনকি কোনো-কোনো সময় শয়তান গোনাহের কাজকে সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করে। আল্লাহপাক বলেন–

وَ قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

'আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর সঙ্গীরা তাদের সামনে ও পেছনে আমল তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছিল। তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হলো, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের ব্যাপারে। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত।'[১৬৫]

ছোট গোনাহকে ছোট মনে করো না

এখানে এসে খোদাপ্রেমিকগণ নিজেকে সর্তক করা আবশ্যক। যেন আল্লাহর আদেশকে আদেশ হিসেবেই মেনে নেওয়া হয় এবং আল্লাহর

---

১৬৫. সূরা হা-মীম আস-সাজদা : আয়াত ২৫

মাহাত্ম্যকে যেন এমনভাবে অন্তরে বদ্ধমূল করা হয় যে, আল্লাহর আদেশের পরিপন্থী ধারণাও যেন অন্তরে ঠাঁই না পায়। এজন্য বলা হয়েছে–

لَاتَحْقِرَنَّ صَغِيْرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصٰى

ছোট গোনাহকে তোমরা তুচ্ছ্য মনে করো না। কারণ, বড়-বড় পাহাড় ছোট-ছোট পাথরকণার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষ ছোট গোনাহ বারবার করতে থাকলে ধীরে-ধীরে সেটা কবীরা গোনাহ পরিণত হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁরা একে অপরের সঙ্গে আলোচনান্তে এ বাক্যটি পাঠ করতেন–

لَاصَغِيْرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَلَا كَبِيْرَةَ مَعَ الْإِسْتِغْفَارِ

'পুনরাবৃত্তি হলে কোনো গোনাহ ছোট থাকে না আর তাওবা করলে কোনো গোনাহ বড় থাকে না।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ

'তোমরা একে হালকা মনে করছ; অথচ আল্লাহর কাছে এটা অনেক বড় বিষয়।'[১৬৬]

বনী ইসরাঈলে দামুস নামে একজন পাদরি (ধর্মযাজক) ছিলেন। তার এলাকায় একটি বিরান পাহাড় ছিল। সেখানে গাছপালা-তৃণলতার কোনো নাম-গন্ধও ছিল না। একদা তিনি পায়চারি করতে বের হলে ওই পাহাড়ের ওপর তার দৃষ্টি পড়ে। পাহাড়ের বিরান অবস্থা দেখে তার মনে একটি কল্পনা জাগল। আহ! যদি এ পাহাড়ে ঝরনা থাকত, চার পাশে তৃণভূমি থাকত, তাহলে কতই-না মনোরম দৃশ্যের বিকাশ হতো।

যদিও তিনি মনে-মনে একথা ভেবেছিলেন; কিন্তু যারা নৈকট্যশীল হন, তাদের সাধারণ ব্যাপারেও জবাবদিহি করতে হয়। সুতরাং সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার নিন্দাবাদ এল। তার অন্তরে এ কথার সঞ্চার করা হলো– 'ইবাদাত ছেড়ে দিয়ে তুমি আমার উপদেষ্টা হয়ে গেলে? এখন তোমার দৃষ্টিতে আমার সৃষ্টির ত্রুটি ধরা পড়েছে।' তারপর অন্তরে এতটুকু কথার সঞ্চার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি নিজের ভুল উপলব্ধি করলেন যে, এটা তো দাসত্বের শিষ্টাচার পরিপন্থী। একথা ভেবে তিনি কাঁদতে শুরু

---

১৬৬. সূরা নূর : আয়াত ১৫

করলেন। আমি এমন কল্পনা করলাম কেন? বন্ধুগণ! সঙ্গে-সঙ্গে নিজের ভুল অনুভব করা এটাও আল্লাহ তাওফীকের মাধ্যমে হয়ে থাকে। নিজের ভুল অনুধাবন করে তিনি এ নিয়ত করলেন যে, আমার ভুলের ক্ষমার ঘোষণা স্পষ্টরূপে না পাওয়া পর্যন্ত আমি পানাহার ছেড়ে কাঁদতে থাকব। এটা আমার নফসের (আত্মার) শাস্তি।

একদিন ওই গ্রামে কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে। পাদরি দামুস সেখানে উপস্থিত হলেন। আহারের সময় হলে লোকজন তাঁকে আহ্বান করল, হুজুর! খাবার প্রস্তুত; অনুগ্রহপূর্বক আসুন। তিনি বললেন, আমি খাবার খাব না। তিনি বললেন, রোযার কোনো ব্যাপার নয়। আমি খাব না। কিন্তু তারা মেনে নিতে পারছে না। কোনো-কোনো সময় কতিপয় নাছোড়বান্দা আঁঠার মতো লেগে থাকে। তারা আপনার অপরাগতা না বুঝে নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে ব্যস্ত থাকে। সুতরাং এমন কিছু লোক বরাবার অনুরোধ করছে। একদিকে অনুরোধ, অপর দিকে অস্বীকৃতি। পরিশেষে তাদের কেউ জোর দিয়ে বলল, হুজুর! আপনি কেন খাবেন না বলতে হবে। তিনি আহার না করার কারণ প্রকাশ করে দিলেন, আমি অমুক কারণে পানাহার ছেড়ে দিয়েছি। একথা শুনে তারা বলল, হুজুর! এটা কি কোনো বিষয় হতে পারে? তারা হাসতে লাগল। এমনকি মূর্খরা সম্মিলিতভাবে বলে ফেলল, হুজুর! আপনি আহার করবেন না বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ এতে কিছু আসে যায় না। আজকের খাবারে আপনার অঙ্গীকার ভঙ্গের গোনাহ হলে এর শাস্তি আমরা সকলে মিলে ভাগ করে নেব। তবু আপনি আহার করুন।

তারা আল্লাহর শাস্তি ভাগ করে নেবে কথাটা বলার সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পাদরি দামুসের অন্তরে এলহাম (ঐশী বার্তা ঢেলে দেওয়া) করে দিলেন, দামুস! এ গ্রামবাসী আমার শাস্তিকে তুচ্ছ্য মনে করেছে। সুতরাং তুমি অতি শ্রীঘ্র এখান থেকে চলে যাও। আমি এ গ্রামবাসীকে ধ্বংস করে দেব। আল্লাহু আকবার! মানুষ সাধারণ বিষয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। কিন্তু বোঝে না, আল্লাহর পকাড়াও কেমন ভয়াবহ হবে।

ভয়ানক বিষয়

মানুষ কোনো গোনাহকে তুচ্ছ্য মনে করা ভয়াবহ বিষয়। আমাদের বুযুর্গগণ বলেন, মানুষ যে গোনাহকে ছোট ভাবে, সেটা আল্লাহর দরবারে অনেক বড়।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, ভাই! গোনাহকে ছোট বড় মনে করো না বরং গোনাহ করার সময় ওই মহান সত্তাকে সামনে রেখো যার অবাধ্যতা তুমি করছ।

কোনো এক বুযুর্গ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে ইলহাম করেছেন, তুমি মানুষদের বলে দাও, তারা গোনাহ করার সময় দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টিজীবের দেখার দরজা বন্ধ করে দেয়; কিন্তু সেই দরজাটা বন্ধ করতে পারে না, যার মাধ্যমে তাদের মালিক দেখে থাকেন। তারা দুনিয়ার সমস্ত দরজা হতে আমার দরজাকে তুচ্ছ্য মনে করে।

ইকমালুশ শিয়াম নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার বিচারের সামনে কোনো গোনাহ ছোট নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহপাকের দয়ার সামনে কোনো গোনাহ কবীরা নেই। সুতরাং আমার বন্ধুগণ, আল্লাহপাকের অনুগ্রহের দৃষ্টি আমাদের প্রতি পতিত হলে যেকোনো গোনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু যদি ইনসাফের আদালতে বিচারের সম্মুখিন হতে হয়, তাহলে মুক্তি পাওয়া কঠিন।

বিশ্বাসঘাতকতা করো না

এক বুযুর্গ তাঁর শিষ্যদের সর্বদা একটি কথা বলতেন,

جفا نہ کیا کرو

বিশ্বাসঘাতকতাকে جفا বলা হয়। কোনো শিষ্য জিজ্ঞাসা করল, হুজুর বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা উদ্দেশ্য কী? তিনি বললেন, বিশ্বাসঘাতকতা তিনভাবে হয়ে থাকে। (১) আল্লাহর সঙ্গে (২) মাখলুকের সঙ্গে (৩) নিজের আত্মার সঙ্গে। তারপর বিশ্লেষণ করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের আহারসহ অসংখ্য নেয়ামত দেন। আমরা যদি আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামত ভোগ করে তার সঙ্গে অন্যকে শরীক করি, তাহলে এটা হবে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। তারপর বললেন, মানুষ বা যেকোনো প্রাণীকে অহেতুক কষ্ট দেওয়া মাখলুকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ডিঙ্গিয়ে গোনাহের কাজ করা নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। কারণ, গোনাহের দরুন মানুষ নিজেকে জাহান্নামের উপযোগী বানিয়ে দেয়। এতে তার দেহ জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। তাই এটা নিজের সত্তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।

উদাহরণ জগতে মানুষের অনুরূপ আকার

বন্ধুগণ! যদি গোনাহের মধ্যে দুর্গন্ধ থাকত, তাহলে আমরা এ সমস্ত মাহফিলে বসার যোগ্য হতাম না। এটা মহান আল্লাহর সাত্তার (গোপনকারী) গুণের বৈশিষ্ট্য। এ গুণের বরকতে আমরা সম্মানের জীবন কাটাচ্ছি। তাই কোনো বুযুর্গ বলেন– বন্ধুগণ! যেব্যক্তি আপনার প্রশংসা করল, সে প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর 'সাত্তার' গুণের প্রশংসা করছে। সে আপনার অপরাধ গোপন রেখে সম্মান প্রকাশ করছে।

অবশ্যই যদি তিনি আমাদের আসল রূপ প্রকাশ করতেন, তাহলে আমরা মুখ দেখাতে পারতাম না। মানুষের প্রকৃত একটি অবয়ব আছে এবং উদাহরণ জগতে আরেকটি আকৃত রয়েছে। মানুষ যেরকম আমল করে, তার আকৃতি সেই রকম হয়। যদি জানোয়ারদের চরিত্র তার মধ্যে থাকে, তাহলে তার আকৃতি জানোয়ারের মতো হয়ে যায়। যেমন–

কারও মধ্যে লোভ বেশি থাকলে উদাহরণ জগতে তার আকৃতি কুকুরের মতো হয়ে যায়। কারণ, কুকুরের মধ্যে লালসা বেশি থাকে।

যার মধ্যে নির্লজ্জতা বেশি থাকে, উদাহরণ জগতে তার আকৃতি শূকরের মতো হয়। কারণ, শূকরের মধ্যে বেহায়াপনা বেশি থাকে।

যারা মানুষকে অহেতুক কষ্ট দেয়, উদাহরণ জগতে তার আকৃতি বিচ্ছুর মতো হয়ে যায়। কারণ, বিচ্ছু মানুষকে কষ্ট দেয়।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ) হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর সন্তান এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত হাদীছবিশারদ ছিলেন। যুগের বড়-বড় ওলামায়ে কেরাম তাঁর ছাত্র ছিলেন। এক সময় গোটা ভারতবর্ষে তাঁর ফতুয়া চলত। দিল্লির জামে মসজিদ থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে তাঁর মাদরাসা ও বাসা ছিল। তিনি নিজের বাড়িতেও একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তাকে মসজিদে বায়েত বলা হতো। শিক্ষাদানের ব্যস্ততায় অধিকাংশ নামায সেখানেই পড়তেন। তবে পবিত্র জুমার নামায দিল্লির জামে মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন। শাগরেদগণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অস্থির থাকতেন। আল্লাহপাক তাকে অসাধারণ সৌন্দর্য দান করেছিলেন। তার চেহারা এতো সুন্দর ছিল যে, লোকজন তার প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। শিক্ষাদানের ব্যস্ততার কারণে লোকজন সাধারণত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারত না। তাই শুক্রবারে সাক্ষাতের জন্য জনগণ ব্যাকুল থাকত। ফসীহ উদ্দীন নামে তাঁর এক খাদেম ছিল। সে হযরতকে জুমার নামাযের জন্য নিয়ে যেত।

তারপর এক সময় এমন হলো যে, তিনি জুমার নামায পড়ানোর জন্য বাজারের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় অবগুণ্ঠনের মতো রুমাল দ্বারা মুখ ঢেকে রাখতেন। এখন আর লোকেরা তাঁর চেহারা দেখতে পারে না। ফলে মানুষ খাদেমকে বলল, জনাব! আপনি একটু সুপারিশ করুন। সারা সপ্তাহ আমরা তাঁকে দেখতে পারিনি। কারণ, তিনি ইল্‌ম শিক্ষাদানের ব্যস্ত থাকেন। সপ্তাহে একদিন আমরা তাঁকে দেখার প্রতীক্ষায় থাকি। এখন সেই একদিনও তিনি মুখ ঢেকে রাখেন। এতে আমরা তাঁর দীদার হতে বঞ্চিত হচ্ছি।

প্রবীণ খাদেম হলে সে নির্দ্বিধায় শায়েখকে অনেক কিছু বলতে পারে। সুতরাং খাদেম ফসীহ উদ্দীন একদিন শাহ আবদুল আযীয (রহ.)কে বলল, হুজুর! জনগণ আপনার চেহারা দেখার জন্য অস্থির। আপনি মেহেরবানিপূর্বক সপ্তাহে একদিন জুমার নামায পড়াতে যাওয়ার সময় আপনার মোবারক চেহারা উন্মুক্ত রাখার জন্য তারা অনুরোধ জানাচ্ছে। এবার শাহ আবদুল আযীয (রহ.) তাঁর মাথা থেকে রুমাল খুলে খাদেমের মাথায় দিলেন। সেই রুমাল মাথায় দিয়ে খাদেম কয়েক কদম হাঁটার পরই হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় এবং অজ্ঞান হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এলে কেউ জিজ্ঞাসা করল, তোমার কী হয়েছে? তুমি পড়ে গেলে কেন? খাদেম বলল, ভাই! শায়খ আমার মাথায় রুমালটা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমি দেখলাম, বাজারের মধ্যে অল্প কয়েকজন মানুষ ছাড়া বাকি সবাই কুকুর, বিড়াল ও শূকরের মতো। তাই আমি আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে গেছি।

বন্ধুগণ! আল্লাহপাক কাশ্‌ফ (অন্তরদৃষ্টি)-এর মাধ্যমে তাঁকে জনগণের আসল রূপ দেখিয়েছেন। গোনাহের মধ্যে দুর্গন্ধ রাখেননি এটা মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ দয়া। সেই অনুগ্রহ ভোগ করে আমরা এ সমস্ত মাহফিলে রাজকীয়ভাবে উপবেশন করছি।

মূর্খ ও অতি মূর্খের মধ্যকার পার্থক্য

দুনিয়ার সাধারণ স্বাদ ভোগ করার জন্য বা তুচ্ছ্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়া জঘন্য বিষয়। মানুষ সাধারণত স্বাদ ভোগ করার জন্য অথবা সামান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য গোনাহের কাজ করে। হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রহ.) একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলেন। একদা তিনি হযরত ওমর (রাযি.)-এর মাহফিলে উপস্থিত হলে হযরত ওমর (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, অজ্ঞ কাকে বলে? তিনি উত্তর দিলেন, হযরত! যেব্যক্তি দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত ধ্বংস করে দেয়, তাকে অজ্ঞ বলে। তারপর

হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, অতি অজ্ঞ কাকে বলে, সেটা কি আমি বলব? তিনি বললেন, বলুন। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, অন্যের জন্য দুনিয়া অর্জনের বিনিময়ে যেব্যক্তি নিজের আখেরাত ধ্বংস করে দেয়, তাকে অতি অজ্ঞ বলে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার বাগ্মিতা ও অলংকার

বিদায় হজের সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

'সত্যিকারের মুসলমান ওই ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। অর্থাৎ– সে মুখের দ্বারাও কাউকে কষ্ট দেবে না এবং হাতের দ্বারাও দেবে না। সাধারণ মানুষ একে অপরকে হাতের দ্বারাই কষ্ট দিয়ে থাকে। তবে এখানে হাতের সঙ্গে মুখেরও আলোচনা করা হয়েছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, হাতের আগে মুখের কষ্টের কথা বলা হয়েছে। হাদীছবিশারদগণ বলেন, এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীতে বাগ্মিতা ও অলংকার প্রস্ফুটিত হয়েছে। মুখকে হাতের আগে উল্লেখ করার মাঝে গভীরতা আছে। যথা–

যদি কোনো মানুষ কাউকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করে, তাহলে সেই আঘাত শুকিয়ে যায়। পরে তার চিহ্নও থাকে না। কিন্তু মুখের দ্বারা যে আঘাত অন্তরে করা হয়, তা নির্মূল হয় না।

হাতের দ্বারা আঘাত করা কঠিন; কিন্তু মুখের দ্বারা আঘাত করা সহজ।

হাতের দ্বারা শুধু উপস্থিত লোকদের আঘাত করা যায়। কিন্তু মুখ এমন একটা অস্ত্র, যার দ্বারা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে আগত সকল শ্রেণির মানুষকে আক্রমণ করা যায়। বর্তমানে বহু লোক রয়েছে, যারা অতীতে চলে যাওয়া লোকজনকে দোষারোপ করে তাদের কষ্ট দেয়।

গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ

আমাদের এ তরিকায় দীর্ঘ নেকি ও নফল ইবাদাতের এ-পরিমাণ সুযোগ পাওয়া যায় না। যে-পরিমাণ সুযোগ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য পাওয়া যায়। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করুন। মনে করুন দুজন মানুষ। একজন তাসবীহকে গলার মালা বানিয়েছে। অর্থাৎ সর্বদা

তাসবীহ পাঠ করে, দীর্ঘ নামায পড়ে। অন্যান্য আরও কত ইবাদাত করে, যার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সাথে-সাথে গোনাহেও লিপ্ত হয়। চোখও হেফাযত করতে পারে না, জবানও কন্ট্রোল করতে পারে না। নেকিরও হিসাব নেই; গোনাহের সীমা নেই। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়জন দীর্ঘ নামাযও পড়তে পারে না, অযীফাও ঠিকমতো আদায় করতে পারে না। তবে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। সর্বদা চেষ্টা করে, আমার হাত, পা, মুখ, বিবেক কোনো কিছু দ্বারা যেন আল্লাহপাকের কোনো বান্দা কষ্ট না পায়। আমাদের বুযুর্গগণ বলেন, প্রথম ব্যক্তি হতে দ্বিতীয় ব্যক্তি অধিক মর্যাদার অধিকারী। কেননা, লম্বা চওড়া অযীফা ও দরূদ পাঠকারী বাহ্যত পড়ে লা-ইলাহা আর মূলত পড়ে কালি বালা।

জ্ঞান ও সংকল্পের মাধ্যমে গোনাহ পরিত্যাগ করার পুরস্কার

গোনাহের কাজ পরিত্যাগের মাধ্যমে দ্রুত আল্লাহপাকের নৈকট্য অর্জন করা যায়। একটি কথা স্মরণ রাখবেন– যেব্যক্তি নিজের ইল্‌ম ও সংকল্পের মাধ্যমে গোনাহের কাজ ছেড়ে দেবে। আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ প্রত্যাখান করা ছেড়ে দেবেন। তাকে সিদ্দীকদের (সত্যবাদীদের) মধ্যে শামিল করবেন। অভ্যন্তরে অনিচ্ছায় যে সমস্ত গোনাহ সংঘটিত হয়, সেগুলো শীঘ্রই মাফ হয়ে যায়। তবে ক্ষতিকারক হয় ওই গোনাহ, যা সংঘটিত হয়ে গেলে সঙ্গে-সঙ্গে তাওবা করা আব্যশক। কেননা, মানুষ উদাসীনতার কারণেই গোনাহ করে। গোনাহ করার সময় মানুষের বিবেকে আবরণ পড়ে যায়।

গোনাহের প্রতি ঘৃণা ঈমানে লক্ষণ

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন–

وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

'তোমাদের অন্তরে কুফরি, গোনাহ ও অবাধ্যতার প্রতি ঘৃণা সঞ্চার করা হয়েছে।'[১৬৭]

সুতরাং ঈমান যে-পরিমাণ শক্তিশালী হবে, গোনাহের প্রতি ঘৃণা সেই পরিমাণ জোরালো হবে। যদি গোনাহতে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে ওই সময় তার ওপর উদাসীনতার পর্দা পড়ে যায়। ওই মুমিন বান্দা অবস্থার কাছে পরাজয় বরণ করে যদি গোনাহের কাজ করেও ফেলে, তবু গোনাহ করার পর অনুতপ্ত

---

১৬৭. সূরা হুজরাত : আয়াত ৭

হয়। ফলে সর্বদা নিজেকে নিজে শাস্তি দেয়, আহ! আমি কী করলাম। গোনাহ করার সময় উদাসীনতার পর্দায় আচ্ছাদিত ছিল। আর করার পর তার আসল রূপ উদ্ভাসিত হয় এবং আক্ষেপ করে, আহ! এ কাজটি করা আমার জন্য উচিত হয়নি। স্মরণ রাখবেন, গোনাহের কাজ করার পর গোনাহের অনুভূতি আসা। কৃতকর্মের জন্য অস্থিরতা উপলব্ধ করা। ওই লোকের ভেতরে ঈমান নিরাপদ থাকার জ্বলন্ত প্রমাণ। যেব্যক্তি নিজের ইচ্ছা পরিহার করে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় জীবন গড়তে চায়, তার জন্য উচিত নিজের জীবনের চলমান দিনসমূহকে গোনাহ থেকে মুক্ত করা, গোনাহ ত্যাগ করার জন্য চেষ্টা করা। এই চেষ্টা সত্ত্বেও যখন আবার গোনাহে লিপ্ত হবে, পরদিন পুনরায় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে, তখন দেখবে, সে আগের দিনের চেয়ে কম গোনাহ করেছে। পরের দিন আরও কম অনুভব করছে। এভাবে একদিন দেখবে, সারা দিনেও তার একটি গোনাহ হয়নি। তারপর গোনাহ ত্যাগ করে চলার চেষ্টা করলে আল্লাহপাক তাকে গোনাহ থেকে হেফাযত করে এমন জীবন দান করবেন যে, ওই ব্যক্তি গোনাহ নামক জানোয়ারের পিঠ থেকে নেমে আসবে।

ইমামে রাব্বানি হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেন, এ উম্মতের মধ্যে এমন সত্যবাদী ব্যক্তিবর্গও অতিবাহিত হয়েছেন, যাঁদের আমলনামায় গোনাহ লেখক ফেরেশতাগণ বিশ বছর যাবৎ কলম বসাতে পারেনি। সুবহানাল্লাহ! আমাদের হৃদয়ে একটি অস্থিরতা ও আকাঙ্ক্ষা এমন থাকা প্রয়োজন, হে আল্লাহ! আমাদের ওই রকম জীবন গড়ার সৌভাগ্য দান করুন।

গোনাহ পরিত্যাগ করা পুণ্যের কাজ করা চেয়ে অধিক মর্যদাবান। এটি একটি মূলনীতি। স্মরণ রাখবেন, গোনাহের কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা নেকির কাজের চেয়ে অধিক বৈশিষ্ট্যময়।

চারটা বিষয় গুনাহের চেয়েও নিকৃষ্ট

গোনাহ অত্যন্ত ঘৃণিত বিষয়। কিন্তু চারটি বিষয় এর চেয়েও জঘন্য–

(১) গোনাহকে হালকা মনে করা। যদি কোনো বান্দা বিবেকের উদাসীনতায় গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়, তবু তার জন্য উচিত গোনাহকে গোনাহ মনে করা, তাওবা করা। গোনাহকে তুচ্ছ্য মনে করা গোনাহে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে জঘন্য অপরাধ।

(২) গোনাহের কাজ করে উল্লসিত হওয়া। যে মহিলা বলে, দেখছ আমি তার গায়ে জ্বালা ধরানোর জন্য এমন কথা বলেছি। অর্থাৎ তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য। এমন কথা গোনাহের কাজে আনন্দিত হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। অথবা যদি কোনো গোনাহের কাজের সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে খুশি হয়ে বলে যে, এখন আমার জন্য এ কাজ করা অতি সহজ, তাহলে এটাও গোনাহের কাজ করার চেয়ে জঘন্য বিষয়।

(৩) গোনাহের পুনরাবৃত্তি। অর্থাৎ– গোনাহ ছোট হোক কিংবা বড় হোক বারবার এ কাজ করা মহা অপরাধ।

(৪) গোনাহের কাজ করে গর্বিত হওয়া। গোনাহের কাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বা সেই কাজে সফল হয়ে গর্ব বোধ করা গোনাহের চেয়েও বড় অপরাধ।

কবীরা গোনাহের কুফল ১০টা

হযরত আবুল লায়েছ সমরকন্দি (রহ.) তাম্বীহুল গাফিলীন নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, প্রত্যেকটি কবীরা গোনাহের ১০টি কুফল রয়েছে। যথা–

(১) ওই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা নারাজ হন। যেব্যক্তিই এমন অপরাধে লিপ্ত হবে, সে তার মালিককে অসন্তুষ্ট করবে।

(২) ওই ব্যক্তি শয়তানকে খুশি করে। কারণ, গোনাহের কাজ সংঘটিত হলে মানবজাতির শত্রু শয়তান খুশি হয়।

(৩) সে জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়।

(৪) জান্নাত থেকে দূরে সরে যায়।

(৫) ওই ব্যক্তি নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। সে যেন নিজেকে নিজে জাহান্নামে জ্বলার উপযোগী বানিয়ে নিল।

(৬) সে নিজের আত্মাকে অপবিত্র বানিয়ে দেয়। কারণ, প্রত্যেক গোনাহ অদৃশ্য নাপাক। বাহ্যিক নাপাক যে-রকম পানির দ্বারা দূরীভূত হয়, তেমনি অদৃশ্য নাপাক (গোনাহ) তাওবার দ্বারা দূরীভূত হয়।

(৭) সে তার দেহরক্ষী ফেরেশতাদের কষ্ট দেয়। তারা তাকে পাহারা দেয় আর সে তাদের কষ্ট দেয়।

(৮) সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবরজগতে চিন্তিত করে। বলা হয়, আমাদের আমলনামা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত হরা হয়। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের গোনাহের কাজ দেখে বিষণ্ন হন।

(৯) সেই ব্যক্তি সমস্ত সৃষ্টজীবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। কেননা, গোনাহের কারণে আল্লাহপাকের রহমত অবতরণ হয় না। ফলে সমস্ত সৃষ্টি কষ্ট পায়। যেমন– বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। এতে দুনিয়া বিরান হয়। ফলে সমস্ত সৃষ্টি কষ্ট পায়।

(১০) মানুষ যেস্থানে গোনাহ করে, ওই স্থানকে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী বানায়। কারণ, ওই স্থান কেয়ামতের দিন তাঁর বিপক্ষে তার কৃত গোনাহের সাক্ষ্য দেবে।

বর্তমান যুগ ভিডিও ক্যামেরার যুগ। ব্যবসায়ীরাও মালামাল সংরক্ষণের জন্য ভিডিও ক্যামেরা স্থাপন করে নিয়েছে, যাতে কেউ চুরি করতে সক্ষম না হয়। এই ক্যামেরা চালু অবস্থায় কেউ চুরি করলে তার সম্পূর্ণ ছবি রেকর্ড হয়ে যায়। ফলে ওই চোরকে গ্রেফতার করা সহজ হয়। তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা জমিনকে ভিডিও ক্যামেরার মতো স্থাপন করে রেখেছেন। মানুষ যা-যা অপরাধ করে, সব রেকর্ড হচ্ছে। কেয়ামতের দিন নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করা হবে। আল্লাহপাক বলেন–

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝

'সেদিন জমিন তার সমস্ত সংবাদ প্রকাশ করবে। কারণ, তোমার প্রভু তাকে আদেশ দেবেন।'[১৬৮]

একটি আশ্চর্য বিষয় হলো, অনেক লোক বারবার গোনাহ লিপ্ত হয়; অথচ নিজেকে তরীকতের পথিক বলে দাবি করে। মানবপ্রকৃতি হলো, অন্যরা গোনাহ করেছে বলে সন্দেহ হলে তাকে ঘৃণার চোখে দেখে। আর নিজের গোনাহের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও নিজেকে ভালোবাসে। হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া (রহ.) একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ লিখেছেন। তিনি বলেন, নিজেকে অন্যের দৃষ্টিতে পতিত করা সহজ; কিন্তু নিজের চোখে নিজেকে পতিত করা কঠিন। অর্থাৎ– আপন চোখে নিজেকে দোষী মনে করা কঠিন। আমরা দেখতে পাই, অনেক লোক ফরজের ধারেকাছেও নেই; অথচ সে বলে, ভাই! অমুক বুযুর্গ আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন। তারপর ওই বুযুর্গের নামে সে দেওয়ানা হয়ে যায় আর বলে, আমি খুব ভালো-ভালো স্বপ্ন দেখি। স্মরণ রাখবেন, যেব্যক্তি স্বপ্নের রাজপুত্র সাজে তার ধ্বংস অনিবার্য।

---

১৬৮. সূরা যিলযাল : আয়াত ৪,৫

গোনাহগার বান্দা আল্লাহ দৃষ্টি থেকে পতিত হয়ে যায়

আমাদের বুযুর্গগণ বলেন, গোনাহের কারণে মানুষ আল্লাহপাকের দৃষ্টি থেকে দূরে সরে যায়। তার কাছ হতে আল্লাহপাক নেক আমলের তাওফীক হরণ করে নিয়ে যান। এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে নেয়ামতটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তা হচ্ছে আল্লাহর রহমতের সময় শেষ রাতের মোনাজাত তার মনঃপূত হয় না। আপনি দেখে থাকবেন, কতিপয় বান্দা অনেক সময় তাহাজ্জুদে জাগ্রত হয়; কিন্তু মোনাজাতের প্রতি তার আকর্ষণ থাকে না। বরং মোনাজাতে সে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এটা নয় যে, তার মেজাজ চায় না বরং সে তার স্বভাবকে চলতে দেয় না। দিনের গোনাহের ফসল হিসেবে বান্দা রাতের ইবাদাত থেকে বঞ্চিত হয়।

হযরত হাসান বসরি (রহ.)কে এক লোক জিজ্ঞাসা করল, হুজুর তাহাজ্জুদের নামায পড়া আমার সৌভাগ্য হয় না। অর্থাৎ– পড়তে পারি না। তিনি বললেন, ভাই! তোমার দিনের আমল সংশোধন করে নাও। আল্লাহপাক তাহাজ্জুদ পড়ার সৌভাগ্য নসিব করবেন।

ঈমান হতে বঞ্চিতকারী অপরাধ

আমাদের বুযুর্গগণ বলেন, আমাদের গবেষণার নির্যাস এই যে, তিনটি অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তি মরণকালে পবিত্র ঈমান হতে বঞ্চিত হয়। এই হিসাবে ওই গোনাহগুলো মারাত্মক।

(১) শরীয়তের বিধানকে ভারী মনে করা। শরীয়তের বিধানকে ভারী মনে করে এর ওপর আমল করা কঠিন মনে করা মৃত্যুকালে ঈমানহারা হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, মহিলা হলে পর্দা তার জন্য বোঝা হয়ে যায়। পুরুষ হলে সুদ-ঘুষ ত্যাগ করে চলা তার জন্য কঠিন হয়ে যায়। অনেক লোক একথা বলে যে, বর্তমানে শরীয়তের বিধানমতো চলা দুষ্কর। আমার ভাইয়েরা! শরীয়তের বিধান পালনে সংকোচ প্রকাশ পেলে সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে গোনাহগার মনে করবে। গোনাহের কাজ করে সেটাকে দলিল দ্বারা প্রমাণিত করা নির্বোধের কাজ।

জনৈক ব্যক্তির অন্তিমকালে তাকে কালেমা পাঠ করতে তাকলীন দেওয়া হচ্ছিল। সে বলল, আমি কালেমা পাঠ করব না। এ কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রাণবায়ু বের হয়ে যায়। একথায় তার নিকটতম এক আলেম অত্যন্ত হতাশ হলেন। তিনি তার পরিবারের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ

ব্যক্তির জীবদ্দশার এমন কোনো আমলের কথা আপনারা খুলে বলুন, যা তার জন্য মহাবিপদ হয়েছে। ফলে সে বিদায়কালে ঈমানহারা হয়ে যেতে হয়েছে। তার স্ত্রী বলল, তিনি প্রকৃতিগতভাবে অলস ছিলেন। তাই অধিকাংশ সময় তিনি ফরজ গোসল করার সময় বলতেন, কী এক মসিবত! বনী ইসরাঈলদের মধ্যে এ কাজের পর গোসল ছিল না; সেটা কত সুবিধা ছিল। আর ইসলামের মধ্যে এর বিধান চালু করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয়, ফরজ গোসল তার জন্য বোঝা হয়েছিল। এই অপরাধের দরুন আল্লাহপাক তাকে মরণের সময় ঈমানের দৌলত হতে বঞ্চিত করেছেন।

(২) শেষ বিদায় (মৃত্যু) অশুভ হওয়ার ভয় না থাকা। যেব্যক্তি তার শেষ বিধায় খারাপ হওয়ার ভয় রাখে না, সে মৃত্যুকালে কালেমা থেকে মাহরুম হয়। মানুষ যত বড় নেককার হোক না কেন তার অন্তরে এ ভয় থাকতে হবে যে, না জানি আমার মৃত্যুর সময় কী অবস্থা হয়। একথা স্মরণ করে তাকে কাঁদতে হবে। মৃত্যুর ভয় সব সময় রাখা অব্যশক। আল্লাহপাক বলেন–

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ

'আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে এসেছে।'[১৬৯]

সুতরাং কোনো মুমিন বান্দা আল্লাহপাকের পাকড়াও থেকে নির্ভয় হতে পারে না। সে সারা জীবন এই অস্থিরতায় থাকতে হবে যে, জানি না আমার পরিণাম কী হয়।

(৩) ইসলামের মতো অপূর্ব নেয়ামত পেয়ে অকৃতজ্ঞ হওয়া। যদি মানুষ ইসলামের মতো নেয়ামত পেয়ে তার শুকরিয়া আদায় না করে, তাহলে মৃত্যুর সময় তার ঈমান হরণ করা হয়। এজন্যই উজু করতে শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং পরে এই দু'আ পাঠ করতে হয় اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ (ইসলাম সত্য আর কুফর মিথ্যা)। নেয়ামতে ইসলামের শুকরিয়াস্বরূপ হাদীছ শরীফে একটি দু'আ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং সকাল-সন্ধ্যা এ দু'আ পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যথা-

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

'আমি আল্লাহকে প্রভু, ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার নবী পেয়ে সন্তুষ্ট।'

---

১৬৯. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৯৯

এ কথায় বোঝা যায়, আল্লাহপাক আমাদের ইসলাম ধর্ম দিয়েছেন; এতে আমরা আনন্দিত।

গোনাহের শাস্তি তিন প্রকার

গোনাহ করলে বিপদ এসে আক্রমণ করবেই। আমাদের বুযুর্গগণ বলেছেন, গোনাহের শাস্তি তিন প্রকার হয়। যথা-

(১) প্রথম প্রকারকে 'নাকীর' বলে। অর্থাৎ একদিকে গোনাহ করবে অপর দিকে মসিবত এসে আগ্রাসন চালাবে। কতিপয় মানুষের ক্ষেত্রে এমন হয়ে থাকে।

জনৈক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল, হুজুর! আমি কারও অন্তরে আঘাত দিলে সাথে-সাথে আমার কোনে না কোনো ক্ষতি হয়ে যায়। এখন সে কারও মনে কষ্ট দিতে ভয় পায়। ভাই! আল্লাহর নাফরমানির আছর মানুষ দুনিয়াতেই অনুভব করে। কখনও বিপদ আসে। কখনও আল্লাহপাক তাঁর অধীনদের তার অবাধ্য করে দেন। যেমন– তার স্ত্রী বদমেজাজি ও জেদি হয়। এতে তার ঘরের শান্তি নামক সোনার হরিণ পালিয়ে চলে যায়। অথবা তার সন্তানদের অবাধ্য করে দেন। ফলে তার ডাগর চোখের পানি যেন শেষ হয় না। কেঁদেও আর পথ পায় না। এটা তার কৃত অপরাধের নগদ শাস্তি। এটাকে 'নকীর' বলে।

(২) কখনও শাস্তি পেতে দেরি হয়। দেরি হওয়ার উদ্দেশ্য কী? এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহপাক তাকে সঙ্গে-সঙ্গে শাস্তি দেন না। বরং কিছু বিলম্বে দিয়ে থাকেন। সে যৌবনকালে গোনাহ করছে আর বার্ধকে তার শাস্তি ভোগ করে এবং সেই বার্ধক্যের শাস্তি ভয়ানক হয়ে থাকে।

বার্ধক্যে যদি তার স্ত্রী অবাধ্য হয়ে যায়, এমন সময় তার সন্তানরা যুবক এবং তারা তাদের মায়ের পক্ষ নেয়, তাহলে বৃদ্ধের জীবন কত দুর্বিষহ হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে কাউকে কিছু বলতেও পারে না। গায়ের জামা দিয়ে অশ্রুর ঝরন শুকিয়ে শান্তি পায় না। অথবা বার্ধক্যে এমন কোনো ব্যাধি এসে আক্রমণ করবে, যার দরুন তাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। এ অবস্থায়ও সে সাজা ভোগ করতে থাকে।

একজন ভদ্রলোক আমাকে বলল, হুজুর! আমি তো কোনো গোনাহ করছি না। তবু আমার হতাশা পিছু ছাড়ছে না। আমি বললাম, আচ্ছা বলুন তো, আপনার জীবনে যা গোনাহ করেছেন, সব গোনাহর জন্য কি সত্য মনে

তাওবা করেছেন? নাকি এমনও কিছু গোনাহ রয়েছে, যার প্রতি অনুতপ্ত হয়ে এখনও তাওবা করেননি? বলল, অবশ্যই এমন কিছু গোনাহ রয়েছে, যার জন্য আমি এখনও তাওবা করিনি। আমি বললাম, ওই সমস্ত গোনাহ আপনার আমলনামায় রেকর্ড রয়েছে। এগুলোর কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদ আসতে পারে।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.) কোথাও যাওয়ার পথে সামনে দেখা গেল, দাড়ি-গোঁফবিহীন এক সুদর্শন খ্রিস্টান বালক আসছে। তাকে দেখে হযরতের এক শিষ্য বলল, হুজুর! এমন সুন্দর চেহারাটাও কি আল্লাহপাক জাহান্নামে দেবেন? হযরত বাগদাদি বুঝতে পারলেন, সে এই স্বল্পবয়স্ক বালকের প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকিয়েছে। তিনি বললেন, তুমি ওই বালকের প্রতি খারাপ দৃষ্টিতে তাকিয়েছ। তাই তাওবা কর। সে বলল, না হুজুর! আমি এমনিতেই বলেছি। তার প্রতি আমার কোনো অশুভ ধারণা হয়নি। ফলে সে তাওবা করল না। তারপর এর পরিণাম এমন হলো যে, লোকটি হাফেজে কুরআন ছিল। কিন্তু ওই গোনাহের অকল্যাণে বিশ বছর পর তার অন্তর থেকে কুরআন মুখস্থ করার নূর দূর হয়ে গেছে। সে কুরআন ভুলে গেছে।

(১) কোনো-কোনো সময় আল্লাহপাকের পাকড়াও অদৃশ্যভাবে আক্রমণ চালাতে থাকে। তা এভাবে যে, মানুষ গোনাহ করার পরও অনেক নেয়ামত পায়। তাদের এ নেয়ামত দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, যাতে প্রচুর নেয়ামত পেয়ে আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে আরও উদাসীন হয়ে আল্লাহর মহা শাস্তির উপযোগী হয়। ফলে পরকালে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। সুতরাং স্মরণ রাখবেন, যে বান্দা গোনাহ করার পরও প্রচুর নেয়ামত ধনসম্পত্তি ইত্যাদি পেয়ে থাকে, তার জন্য সেটা আরও বেশি চিন্তার বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً ﴿٤٤﴾

'তারপর তারা যখন ওই উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদের দেওয়া হয়েছিল। এখন আমি তাদের সামনে সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি যখন তাদের প্রদত্ত বিষয়াদির জন্যে তারা খুব গর্বিত হলো, এখন আমি অকস্মাৎ তাদের পাকড়াও করলাম।'[১৭০]

---

১৭০. সূরা আন'আম : আয়াত ৪৪

কোনো-কোনো মানুষ একে শাস্তি মনেই করে না। অথচ সেটা সবচেয়ে বড় শাস্তি হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ তা অনুভব করতে পারে না। বনী ইসরাঈলের জনৈক আলেম কোনো এক গোনাহে লিপ্ত হওয়ার পর সর্বদা ভয়ে কাঁপতেন, আহ! আমি কী ভুলটা করলাম! না জানি আমার সেই ভুলের কারণে কোন সময় কোন বিপদ এসে আমাকে আক্রমণ করে। এভাবে কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর একদা তিনি আল্লাহর দরবারে দু'আ করছেন, হে আল্লাহ! আপনি কত দয়ালু; আমি আপনার নাফরমানি করেছি। তদুপরি আপনি আমার ওপর সমস্ত নেয়ামত অটুট রেখেছেন।

তখন আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে এলহাম করলেন, 'হে আমার বান্দা! আমার নেয়ামত তুমি ভোগ করছ না; তোমার থেকে নেয়ামত হরণ করা হয়েছে'। এ কথা শুনে সে আরও হতাশ হয়ে বলল, হে আল্লাহ! সেটা কোন নেয়ামত? আল্লাহপাক বললেন, তুমি ভেবে দেখো, যেদিন তুমি গোনাহে লিপ্ত হয়েছিলে, তার পর থেকে তুমি তাহাজ্জুদের সময় কাঁদতে আগের মতো স্বাদ লাগে না। ওই সময়ে কান্নার নেয়ামত থেকে তোমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এবার তিনি চিন্তা করে দেখলেন, বাস্তবিকই গোনাহে লিপ্ত হওয়ার পর থেকে তার তাহাজ্জুদের সময় কাঁদতে আগের মতো স্বাদ অনুভব হচ্ছে না।

সুতরাং ভাই! আল্লাহপাক গোনাহের শাস্তি তিন অবস্থার যেকোনো একটির মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। এজন্যই কোনো কবি বলেন–

عدل وانصاف فقط حشر پر موقوف نہیں

زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے

'সুবিচার শুধু পরকালের জন্য নির্ধারিত নয়, জীবন নিজেও গোনাহের শাস্তি দেয়।'

ছটি কাজ অহেতুক হয়

ছয়টি কাজ অহেতুক হয়ে থাকে–

(১) মানুষ মনে করে, আমার অন্তরে আল্লাহপাকের অধিক ভয় আছে। অথচ সে গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে না। তার সেই ভয় অহেতুক।

(২) যেব্যক্তি বলে, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে আশাবাদী। অথচ নেক আমল করেও না, করার চেষ্টাও করে না। তার সেই আশা অহেতুক। সুতরাং আমল করার চেষ্টা করা আবশ্যক।

(৩) মানুষ আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করে; কিন্তু আল্লাহর প্রতি এমনও বলে যে, আমাদের দু'আর খবর তো আল্লাহপাক জানেনই না। সুতরাং আল্লাহর প্রতি সুধারণা না থাকলে দু'আ কবুল হওয়ার আশা রাখে কীভাবে।

(৪) অনুতপ্ত হওয়া ব্যতীত তাওবা অর্থবহ নয়।

(৫) অন্তর্নিহিত সংশোধনি ব্যতীত বাহ্যিকভাবে উপকৃত হওয়া যায় না।

(৬) এখলাছবিহীন আমলে উপকার নেই।

তাওবায়ে নাসূহের জন্য চার কাজ

সমস্ত কৃতকর্মের জন্য মানুষের তাওবা করা একান্ত জরুরি। তাওবা কীভাবে করবে? গভীর কথা ; একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন!

(১) প্রথম কাজ : যে অপরাধটা হয়ে গেছে, তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে নতশিরে ক্ষমা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে এমন অপরাধ না করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

(২) দ্বিতীয় কাজ : আপন হৃদয়কে হিংসা ও পরনিন্দা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। কেননা, তাওবা করার পরও যদি অন্তর হিংসা ও পরনিন্দায় ভরপুর থাকে, তাহলে তাওবা তাকে কী উপকার পৌঁছাবে? সুতরাং তার হৃদয়ে কোনো মুমিন বান্দার ব্যাপারে প্রতিশোধ, ঘৃণা, শত্রুতা থাকতে পারবে না। আল্লাহর ইচ্ছায় সব কিছু মুছে যাবে।

একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক সাহাবীর আগমন দেখে বললেন, জান্নাতী লোক আসছে। জান্নাতী ব্যক্তি আসছে। একথায় শ্রোতারা অধীর হয়ে গেলেন। এমনকি এক সাহাবী মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর বিশেষ আমল কী আছে তা আমাকে দেখতে হবে, যার দরুন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। এই সাহাবী আগত সাহাবীকে বললেন, আমি আপনার বাড়িতে তিন দিনের জন্য অতিথি হতে চাই। তিনি বললেন, ঠিক আছে ; চলুন। এই সাহাবী তাঁর বাড়িতে গিয়ে তিন দিন থাকলেন। কিন্তু তার বিশেষ কোনো আমল দেখতে পাননি। অন্যান্য লোকের মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন, তাহাজ্জুদ পড়েন। উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোনো আমল নেই।

তিন দিন পর তিনি ওই সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! আপনার ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী জান্নাতের

সুসংবাদ শুনে আপনার এখানে এসেছিলাম, দেখি, কোন আমলের বিনিময়ে আপনি এমন সুসংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু তিন দিনের মধ্যে আমি আপনার কাছে বিশেষ কোনো আমল দেখতে পাইনি।

তাই বলছি, যদি আপনার বিশেষ কোনো আমল থাকে, তাহলে দয়া করে জানালে খুশি হব। তিনি বললেন, ভাই ! আমার বিশেষ কোনো আমল নেই। তবে আমি রাতের বেলায় নিদ্রায় যাওয়ার সময় মনে-মনে চিন্তা করি, আজ সারাদিন আল্লাহর কোনো বান্দার সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হয়েছে কি-না, কোনো বান্দার প্রতি আমার ঈর্ষা-নিন্দা আছে কি-না? যদি থাকে, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিয়ে সব কিছু ভুলে যাই। এছাড়া আমার আর কোনো বিশেষ আমল নেই। সুবহানাল্লাহ!

(৩) তাওবায়ে নাসূহের জন্য তৃতীয় কাজ : সেই ব্যক্তি চরিত্রহীন পাপিষ্ঠদের সঙ্গে ইহজীবন ত্যাগ করতে হবে।

আমরা প্রতিদিন বিতরের নামাযে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে ওয়াদা করি–

وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ

'হে আল্লাহ আমরা পৃথক থাকি; সঙ্গ ত্যাগ করি ওই সমস্ত লোক থেকে যারা চরিত্রহীন পাপিষ্ঠ।'

আমরা প্রতিদিন ঈশার নামাযের সময় দু'হাত বেঁধে আল্লাহপাকের সঙ্গে অঙ্গীকার করি আর দিনে পুনরায় তাদের সঙ্গে দিন কাটাই। এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এদের সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখা যাবে না। যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আন্তরিক ভালোবাসার সম্পর্ক এটা ত্যাগ করতে হবে। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, এখন থেকে এদের আর সালামও করা যাবে না। যে-মূলনীতি শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে, তার পরিধির ভেতরে থাকতে হবে। অন্তরের গভীর ভালোবাসা ত্যাগ করতে হবে এবং খোদাভীরুদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এরপরও যদি পাপিষ্ঠদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, তাহলে তাওবা কবুল হবে না এবং তারা পুনরায় তোমাকে গোনাহে লিপ্ত করবে। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন– কোনো লোক নর্দমায় বসে আছে এবং তার গায়ে ওই নর্দমা থেকেই পানি ঢালা হচ্ছে। এতে তার কোনো পরিবর্তন আসবে না। পক্ষান্তরে যদি তাকে নর্দমা থেকে তুলে তার ওপর পবিত্র পানি ঢালা হয়, তাহলে সে পবিত্র হবে। এজন্য আমরা নিজের অন্তর পবিত্র করতে হলে পাপিষ্ঠ লোকদের

দুর্গন্ধযুক্ত নালা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর যদি তার ওপর আল্লাহর যিকিরের কয়েকটা ফোঁটা পড়ে, তবেই সে পবিত্র হয়ে যাবে।

আমাদের উচিৎ, নিজেদের ওই কথায় অটুট থাকা, যা আমরা প্রতিদিন মহান রব্বুল আলামীনের সঙ্গে করে থাকি।

(২) **তাওবার চতুর্থ কাজ :** মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

যেব্যক্তি এই চার কাজ করতে পারবে, সে বুঝতে পারবে, মহান আল্লাহ আমাকে তাওবায়ে নাসূহের তাওফীক দিয়েছেন।

তওবায়ে নাসূহের পুরস্কার চারটি

বান্দা যখন আন্তরিক তাওবা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে চারটি পুরস্কার দান করেন। যথা–

(১) আন্তরিক তাওবাকারীকে আল্লাহপাক ভালোবাসতে শুরু করেন। হাদীছ শরীফে এসেছে–

اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللهِ

'গোনাহ থেকে তওবাকারী আল্লাহর বন্ধু হয়ে যায়।'

(২) আল্লাহপাক তার তাওবা কবুল করে তার গোনাহগুলো এমনভাবে মুছে দেন, যেন সে কোনো গোনাহ-ই করেননি। হাদীছ শরীফে এসেছে–

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ

'আন্তরিক তওবাকারী একেবারে নিষ্পাপ হয়ে যায়।'

(৩) যেহেতু ওই ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে অনুতপ্ত হয়ে আন্তরিকভাবে তাওবা করে, তাই আল্লাহপাকের সাহায্য তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। ফলে ভবিষ্যতে সে শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে হেফাযত থাকে। আল্লাহপাক বলেন–

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ

'হে অভিশপ্ত! আমার প্রিয় বান্দাগণের ওপর তোর কোনো ক্ষমতা চলবে না।'[১৭১]

শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে হেফাযত রাখবেন কথাটার উদ্দেশ্য কী? সে কি ফেরেশতা হয়ে গেছে? তার থেকে কি আর কোনো গোনাহ হতে পারে না? না, না এর উদ্দেশ্য এটা নয়। এখনও তার থেকে এমন গোনাহ সংঘটিত

---

১৭১. সূরা হিজর : আয়াত ৪২

হতে পারে, যার কারণে সে আল্লাহপাকের দৃষ্টি থেকে পতিত হয়ে যাবে। তারপর তার গলা ধাক্কা দিয়ে আল্লাহর দরবার থেকে বের করে দেওয়া হবে। সুতরাং তাওবা করার পরও যদি ছোটখাট গোনাহ হয়ে যায়। তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

(৪) আন্তরিক তাওবাকারীকে তার মৃত্যুর সময় আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে তার শুভ পরিণামের সুসংবাদ দিয়ে থাকেন। আল্লাহপাক বলেন–

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝٣٠

'তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় বলে তোমরা ভয় করো না। চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত সুসংবাদ শোনো।'[১৭২]

আল্লাহপাক আমাদের সেই নেয়ামত দান করুন। আমার বন্ধুগণ! তাওবা করতে থাকো। এ পরিমাণ তাওবা করো, যাতে শয়তান ক্লান্ত হয়ে বলে এ কেমন বান্দা যে, আমি বারবার পরিশ্রম করে তাকে গোনাহের কাজে লিপ্ত করি। তারপর সে তাওবা করে তাতে নির্বাপণের পানি ঢেলে দেয়।

এটাও স্মরণ রাখবেন যে, বান্দা তার আমলের ওপর ভরসা করতে পারবে না। বরং আল্লাহপাকের রহমত ও দয়ার আশা রাখতে হবে। কেননা, আল্লাহর দয়া ছাড়া মুক্তি পাওয়া কঠিন।

জনৈক মদ পানকারীর পুরস্কারের ঘটনা

একদা হযরত সুফিয়ান ছাওরি (রহ.) স্বপ্নযুগে কোনো এক বুযুর্গের দর্শন লাভ করেন। তিনি বলছেন, সুফিয়ান তোমার অমুক প্রতিবেশী মারা গেছে; তার জানাযা পড়ে আসো। স্বপ্ন দেখে তার নিদ্রা ভেঙে গেল। তিনি অত্যন্ত হতাশ হয়ে গেলেন। কারণ, তিনি জানতেন, লোকটি শরাবখোর ছিল। পরিশেষে তার জানাযা পড়ে পরিবারের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার মৃত্যু কেমন হয়েছে? তারা বলল, তিনি তো দীনের কাজে খুব উদাসীন ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় তার চোখে অঝোর ধারায় অশ্রু বইতে থাকে। তিনি কেঁদে-কেঁদে বলছেন, হে উভয় জাহানের মালিক! তুমি ওই বান্দার প্রতি দয়া করো, যার কাছে দুনিয়া ও আখেরাত কিছুই নেই।' এরপর তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান। আল্লাহু আকবার! সে আল্লাহর দরবারে কাতর স্বরে মিনতি করার কারণে আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

---

১৭২. সূরা হা-মীম আস-সজদা : আয়াত ৩০

বাদশাহর সঙ্গে আলেমের কথন

কোনো এক বাদশাহ জনৈক আলেমকে বললেন, তুমি রাজদরবারে চলে আসো। এখানে থাকবে, এখানে খাবে। রাষ্ট্রীয় ভাতা পাবে। শানশওকতে থেকে দীনের খেদমত করবে। বর্তমানে কাউকে বাদশাহ এমন প্রস্তাব দিলে নতশিরে গ্রহণ করবে। কিন্তু আল্লাহর সেই প্রিয় বান্দা বাদশাহর পক্ষ থেকে এমন প্রস্তাব পেয়ে রাজদরবারে ভরমজলিসে উত্তর দিলেন, বাদশাহ! যদি আমি আপনার দরবারে বাস করি আর ঘটনাক্রমে আপনি দেখতে পান, আমি দরবারের কোনো দাসির সঙ্গে ব্যাভিচার করছি, তারপরও কি আপনি আমাকে এখানে থাকতে দেবেন?

তার কথা শুনে বাদশাহ রেগেমেগে আগুন। বললেন, বেয়াদব কোথাকার! আমার সামনে দাঁড়িয়ে এমন গর্হিত কথা বলার দুঃসাহস পেলে কোত্থেকে? তুমি কি এই চরিত্রের মানুষ যে, আমার দরবারে থেকেও হারাম কাজ করার দুঃসাহস পাবে?

বাদশাহর ক্রোধান্বিত অবস্থা দেখে আলেম সাহেব বলেন, জাহাঁপনা! আমি এখনও গোনাহ করিনি। এতেই আপনি আমার প্রতি এ-পরিমাণ ক্রুদ্ধ হলেন, আমাকে তিরস্কার করছেন, তাহলে আমি ওই মহামহিমের দরবার ছেড়ে কীভাবে আসতে পারি, বারবার অপরাধ করার পরও যিনি আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে আমাকে তাড়িয়ে দেননি? সুবহানাল্লাহ!

এক কাফন চোরের আন্তরিক তাওবা

তাম্বীহুল গাফিলীন নামক গ্রন্থে ফকীহ আবুল লায়েছ সমরকন্দি (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন। তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর (রাযি.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবাবের যাওযার পথে এক যুবককে দেখলেন, সে অঝোরে কাঁদছে। তার কান্না দেখে হযরত ওমর (রাযি.)-এর হৃদয় শিহরে উঠল। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী হয়েছে? এভাবে কাঁদছ কেন? সে বলল, হযরত! আমি এক মহা অপরাধ করে ফেলেছি। তাই অত্যন্ত অস্থিরতায় ভুগছি। আপনি অনুগ্রহপূর্বক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আমার জন্য একটু সুপারিশ করুন।

হযরত ওমর (রাযি.) তাকে নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে তাকে বাইরে রেখে নবীজির সামনে উপস্থিত হয়ে ব্যাকুল হয়ে কান্না শুরু করলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কাঁদছ কেন ওমর? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার দরবারে আসার পথে এক যুবককে পেলাম। হয়ত সে কোনো গোনাহ করেছে। সেই গোনাহে অনুতপ্ত হয়ে ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে। তার আহাজারি শুনে আমারও কান্না আসছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ভেতরে আসতে বলো। ওমর (রাযি.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে যুবক! তোমার কী হয়েছে? বলল, হুজুর! আমি মহা অপরাধ করেছি। আমি কি ক্ষমা পাব? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার অপরাধ বড়, নাকি আল্লাহর আরশ বড়? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গোনাহ বড়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার গোনাহ বড়, নাকি আল্লাহপাকের কুরসি বড়? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গোনাহ বড়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করেছ? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করিনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি কাউকে হত্যা করেছ? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কাউকে হত্যাও করিনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি কেমন গোনাহ করেছ, যাকে তুমি এত বড় ভাবছ?

যুবক বলল, আমি কয়েক বছর যাবৎ কাফন চুরি করে আসছি। কবর থেকে কাফন চুরি করে নিয়ে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করি। কয়েকদিন পূর্বে এক আনসারী যুবতি মেয়েকে দাফন করা হলে আমার অভ্যাস অনুযায়ী রাতে কবর খোদাই করে তার গা থেকে কাফন খোলার পর শয়তান আমাকে পরাজিত করে। তার সৌন্দর্যের মোহে আমার কুবাসনা জাগ্রত হয়ে যায়। আমি ওই মৃত যুবতির সঙ্গে অপকর্মে লিপ্ত হই। আমি কাজ সেরে সেখান থেকে উঠার সময় আচমকা এক আওয়াজ শুনতে পাই, ওই মেয়েটি যেন বলছে, হে আল্লাহর বান্দা! আজ তুমি আমাকে কবরবাসীর সামনে বিবস্ত্র করে দিলে। কাল কেয়ামতের ময়দানে মহান স্রষ্টার দরবারে নাপাক অবস্থায় হাজিরা দেওয়ার জন্য বাধ্য করলে। হে আল্লাহর রাসূল! সেই অকস্মাৎ আওয়াজ শুনে আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গেলাম। আমার হৃদয়ে অস্থিরতা বিরাজ করছে। আমার মতো অপরাধী কেউ হতে পারে না। আমার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। আমি আল্লাহর গ্রেফতারিতে রয়েছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মতো অপরাধী কি ক্ষমা পেতে পারে?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শুনে অবাক হলেন। বললেন, তুমি অনেক বড় গোনাহ করেছ। মৃত নারীর সঙ্গে তুমি ব্যভিচার করেছ। এত বড় জঘন্য অপরাধ তুমি করতে পারলে। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে বললেন, তুমি মহা অপরাধ করেছ, তখন সে কান্নায় ভেঙে পড়ল এবং সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। মনে-মনে ভাবল, আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মায়াময় জবান থেকে এমন কথা কখনও বের হয়নি। তিনিও আমার প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন। এবার আমার ধ্বংস অনিবার্য।

যুবক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে বের হয়ে সোজা পাহাড়ে চলে গেল। সেখানে গিয়ে নামায পড়ল, সেজদা করে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে থাকল। সেখানে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে মহামহিম প্রভুর কাছে অনুনয়বিনয় করে কাঁদতে থাকল, হে আমার মালিক! আপনার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেছেন, আমি মহা অপরাধী। এখন আমি কোথায় যাব? আপনার দরবার ব্যতীত আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আপনার দয়া ছাড়া আমার বাঁচার উপায় নেই। হে আমার মাওলা! আমাকে দয়া করো, আমাকে ক্ষমা করো। আমার প্রতি আপনার রহমতের দৃষ্টি দাও। যেমন কোনো কবি বলেন–

میں تیری سامنے جھک رہا ہوں اے خدا

میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا

'হে আল্লাহ! আমি তোমার সামনে নতশিরে প্রার্থনা করছি। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।'

যুবক যখন চল্লিশ দিন পর্যন্ত পাহাড়ে কাঁদতে থাকল, তার অন্তরে হতাশার আগুন জ্বলছে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিনতি করছে, তখন আল্লাহপাক জিবরাঈল (আ.)কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রেরণ করলেন। জিবরাঈল (আ.) এসে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সালাম জানিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহপাক বলেছেন, আপনি বলুন, এ মহান সৃষ্টি আপনি সৃষ্টি করেছেন, নাকি আমি করেছি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে এবং এই সমস্ত মাখলুককে মহান রাব্বুল আলামীন সৃষ্টি করেছেন। জিবরাঈল (আ.) পুনরায় বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, এ সকল সৃষ্টিজীবকে আহার্য পৌঁছায়

কে? আপনি, নাকি আল্লাহ তা'আলা? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে এবং গোটা সৃষ্টজীবকে মহান আল্লাহ তা'আলা আহার্য পৌঁছিয়ে থাকেন। তারপর জিবরাঈল (আ.) বললেন, আল্লাহপাক বলেছেন, বান্দাকে ক্ষমা করার মালিক কে? আপনি, নাকি আল্লাহ তা'আলা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অপরাধীকে ক্ষমা করার মালিক আল্লাহ তা'আলা। এবার জিবরাঈল (আ.) বললেন, হে আল্লাহর হাবীব! মহান আল্লাহ আমাকে সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছেন, ওই যুবক অনুনয়বিনয় করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পাহাড়ে থেকে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আমাকে রাজি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবাকে যুবকের কাছে পাঠালেন, যাও তাকে সুসংবাদ দাও, মহান স্রষ্টা তোমার আহাজারি কবুল করেছেন। তোমার বিনয়পূর্ণ প্রার্থনা গ্রহণ করে তোমার ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহপাকের দয়া অতুলনীয়। তিনি আত্মসমর্পণকারীকে ক্ষমা করে দেন। এজন্য বলি, হে আমার বন্ধুগণ! এখনও সময় আছে; কৃত গোনাহের জন্য চোখের পানি ঝরাও। আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হও। এমন একটি সময় আসবে, যখন চোখ বন্ধ হয়ে যাবে। জবান দ্বারা কথা বের হবে না। ওই সময়ের সম্মুখিন হওয়ার আগে আল্লাহকে রাজি করার চেষ্টা করো। নিজের আমলনামার অন্ধকার দূর করো। তিনি অত্যন্ত দয়ালু। যখন কোনো বান্দা নিজের গোনাহের ওপর অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে এসে সন্ধি করতে চায়, তখন ওই বান্দার প্রতি তিনি খুশি হয়ে যান। তাই আল্লাহপাক বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর দরবারে তাওবা করো– আন্তরিক তওবা।'[১৭৩]

কুরআন মাজীদের এ আয়াতকে সামনে রেখে আজকের মাহফিল থেকে ফায়দা গ্রহণ করুন এবং নিজের কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত হয়ে খাঁটি নিয়তে তাওবা করে মহান মালিককে খুশি করার চেষ্টা করুন। কে জানে আমাদের এ মাহফিলেও তো এমন কোনো বান্দা থাকতে পারে, যার হাত উত্তোলনকে

---

১৭৩. সূরা তাহরিম-৮

আল্লাহপাক কবুল করে নেবেন, তার উসিলায় আমাদের মতো অধমের আবদারগুলোও গ্রহণ করে নেবেন এবং আমাদের গোনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন। একটি কথা স্মরণ রাখবেন, এই দরবার থেকে বের হয়ে আমরা কোন দুয়ারে যাব? কোথাও যাওয়ার জায়গা আছে কি, যেখানে গিয়ে আমরা ক্ষমা চাইতে পারব। আমার বন্ধুগণ! মসজিদ থেকে চলে যাওয়ার পর কেউ জাহান্নামের পথিক হলে তার জন্য আক্ষেপ নয়। আক্ষেপ হচ্ছে এখন যদি ক্ষমা না পেয়ে কেউ মসজিদ থেকে বের হয় এবং জাহান্নামের উপযোগী হয়ে যায় তার জন্য।

আল্লাহপাকের দরবারে দু'আ করি, তিনি যেন আমাদের ওপর রহম করেন, এ মাহফিল হতে উঠার আগে আমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করেন এবং আমাদের কাকুতিমিনতি গ্রহণ করে তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে আমাদের গণ্য করে নেন। আমীন।

দীনের মধ্যেই সম্মান

'যে ব্যক্তি তার মহান স্রষ্টাকে রাজি করতে পারে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান দান করেন। সে দীনের রাস্তায় থেকে এমন সম্মান পায়, যা দুনিয়ার পেছনে দৌড়েও মানুষ অর্জন করতে পারে না। ইসলাম ধর্মে অপূর্ব স্বাদ রয়েছে। পৃথিবীতে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, সমকালীন বাদশাহ তার রাজত্ব ছেড়ে আল্লাহর রাস্তার ফকীর (দরবেশ) হয়েছে। পক্ষান্তরে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, আল্লাহর পথের ফকির (দরবেশ) তার দরবেশি কাজ ছেড়ে রাজত্ব গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আসল কথা হচ্ছে। এই দরবেশিতে যে স্বাদ রয়েছে, বাদশাহিতে সেই স্বাদ নেই।'

দীনের মধ্যেই সম্মান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ.

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

প্রত্যেক অবস্থায়ই পরীক্ষা করা হয়

এ পৃথিবী হচ্ছে কর্মস্থল আর পরকাল হচ্ছে প্রতিদানস্থল। এ পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী আর পরকাল চিরস্থায়ী। এ পৃথিবী হচ্ছে ধোঁকাবাজির ঘর আর পরকাল হচ্ছে সুখের ঘর। এখানে আমরা সবাই মুসাফির। আমরা আনন্দের জগতে থাকি কিংবা চিন্তার সাগরে থাকি, সুস্থ থাকি কিংবা অসুস্থ থাকি, ব্যস্ত থাকি কিংবা অবসর জীবন কাটাই, আমাদের অনুভূতি থাকুক কিংবা উদাসীন থাকুক। সর্বাবস্থায় আমাদের সফর চলমান। জীবন অতিবাহিত হচ্ছেই। আমাদের গন্তব্যের দিকে আমরা অনবরত চলছিই। প্রতিদিন গন্তব্যের দিকে এগুচ্ছি।

এর সাথে দুনিয়া আমাদের জন্য পরীক্ষার মহল। সুতরাং এখানে সবাইকে যাচাই করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ কাউকে ঐশ্বর্য দিয়ে পরীক্ষা করেন, কাউকে অভাব-অনটন দিয়ে পরীক্ষা করেন। কেউ সুস্থ অবস্থায় পরীক্ষার সম্মুখিন হয়, কেউ ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় পরীক্ষার সম্মুখিন হয়। তবে সফল মানুষ ওই ব্যক্তি, যে সর্বাস্থায় মহান স্রষ্টার নির্দেশ এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের ওপর আমল করে।

প্রকৃত অর্থে মানুষ নির্বোধ

আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে এমন ফাঁদ পেতে রেখেছেন যে, মানুষ তাতে প্যাঁচিয়ে থাকে। বড়-বড় বুদ্ধিজীবীরা ধোঁকা খাচ্ছেন। বলা হয়, উচ্চ

শিক্ষা লাভ করেছেন। কিন্তু নামাযের সুযোগ পাওয়া যায় না। বলা হয়, অনেক জ্ঞান; কিন্তু আল্লাহর ঘরের দরজা দেখার সৌভাগ্য হয় না। এরকম বুদ্ধিজীবীরা প্রকৃত পক্ষে এক নম্বরের বোকা। এজন্যই আল্লাহপাক কাফেরদের সম্পর্কে বলেছেন–

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ

'তারা এমন বকেটা সম্প্রদায়, যাদের বিবেক নেই।'

তারা আসল অবস্থা বোঝে না। মানুষ মানসিক ভোগবিলাসের প্রতি মত্ত হয়ে এমনভাবে প্যাঁচিয়ে যায় যে, মূল উদ্দেশ্য হতে সরে যায়।

মর্যাদা ও যৌবনের গোনাহ

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, গোনাহ দুই প্রকারের হয়ে থাকে। (১) মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত গোনাহ। মর্যাদার গোনাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে সমস্ত গোনাহ সম্মান ও মর্যাদার সাথে সম্পর্ক রাখে। যেমন– এমন করলে আমাকে বড় আলেম বলা হবে। আমার মধ্যে যে-গুণ রয়েছে, তা অন্য কারও মধ্যে নেই। আমাকে চিনতে পারছ? অর্থাৎ– আমার মতো কেউ নেই। প্রকৃতি পক্ষে সে বলে, আমার মতো বড় কেউ নেই।

(২) দ্বিতীয় গোনাহ যৌবনের গোনাহ। অর্থাৎ– যৌনশক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত গোনাহ। এর মধ্যে প্রথম প্রকার গোনাহ মারাত্মক ক্ষতিকর। কেননা, সাধারণত মানুষ রতিশক্তির গোনাহে লিপ্ত হলে তার অন্তরে লজ্জার বেদনা থাকে। সে মনে-মনে নিজেকে অপরাধী ভাবে। তাই তার এই অনুতাপ কোনো সময় ক্ষমা পাওয়ার কারণ হতে পারে। কিন্তু মর্যাদার গোনাহ এমন হয় যে, মানুষ নিজেকে সঠিক মনে করে। হিংসা, আত্মপূজা ও অহংকার মর্যাদার গোনাহ। এমন গোনাহ মানুষের অন্তর থেকে মুছে ফেলা কঠিন। অহংকার ও আত্মম্ভরিতা সম্পর্কে মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

'যার অন্তরে অণুপরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'

অণুকে ইংরেজিতে এটম বলা হয়। এজন্যই আমি অধম বলি, অহংকার একটা এটমি গুনাহ। কেননা, এটমি অস্ত্র যেভাবে ধ্বংস বিস্তার করে,

তেমনিভাবে আত্মম্ভরিতা জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে। তবে এটা অনেক বিলম্বে ফাটে।

হাদীছ শরীফ ধ্বংসকারী কাজগুলোর মধ্যে এটাও একটা বলা হয়েছে–

وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ

'মানুষের নিজের ওপর অহংকার করা।'

সুতরাং এটাও তার আত্মসত্তা ধ্বংসের কারণ। স্মরণ রাখবেন, নেকির সাথে-সাথে অহংকার-আত্মম্ভরিতাও চলে। মানুষ একদিকে পরহেযগারির জীবন গড়ে, অপরদিকে নিজের মতো আমলকারী কাউকে মনে করে না। জেনে রাখবেন, নিজেকে অন্যের চোখে পতিত করা সহজ। কিন্তু নিজের চোখে নিজেকে পতিত করা কঠিন বিষয়। মানুষ তখনই আল্লাহর বন্ধু হতে পারে, যখন নিজের দোষ নিজে দেখতে পারে। নিজের চোখে নিজেকে ছোট মনে করবে। নিজেকে অপরাধী মনে করবে। এজন্যই হযরত ওমর (রাযি.) দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيْرًا

'হে আল্লাহ! আমার নিজের সত্তাকে আমার চোখে ছোট বানিয়ে দাও।'

কতিপয় সুন্নতের ওপর আমল করলেই সে তার আমলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। আমি অনেক আমল করি। এ সমস্ত মাহফিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মপূজার মূর্তিটাকে চুরমার করে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া। আত্মা এমন কোনো প্রাণী নয় যে, নিজের ভেতরে খণ্ডিত কুপ্রবৃত্তিকে নিজের কবজায় এনে সাবধানে চলবে। খোদার বিধানমতো জীবন গড়বে।

আখেরাতকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশ

বন্ধুগণ! দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। তার প্রকৃত রূপ ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছু নয়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ؕ

'এবং এ দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বই কিছুই নয়।'[১৭৪]

সুতরাং মানুষের জন্য উচিত হলো, তার হৃদয়ে দুনিয়ার মোহকে শিথিল করে মহান স্রষ্টার ভালোবাসায় অন্তরকে অধীর রাখা। দুনিয়াকে আখেরাতের

---

১৭৪. সূরা আনকাবুত : আয়াত ৬৪

ওপর প্রাধান্য দেওয়া মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে মহা অপরাধ। আগেকার কিতাবসমূহেও এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। সর্বশেষ কুরআন মাজীদেও আল্লাহপাক এ ঘোষণা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন–

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝١٦ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝١٧

'তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দাও। অথচ আখেরাতের জীবন উত্তম ও চিরস্থায়ী।'[১৭৫]

এটি এমন একটি ঘোষণা, যা মানবসৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝١٨ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝١٩

'নিশ্চয় এ ঘোষণা পূর্বের আসমানি ছোট কিতাবসমূহেও ছিল। ইবরাহীম ও মূসার কিতাবসমূহেও।'[১৭৬]

এ সমস্ত আয়াতে আমাদের পরকালকে ইহকালের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং পৃথিবী যদি ধ্বংসশীল সোনা হয় আর পরকাল চিরস্থায়ী কাচ হয়, তবু বিবেকের চাহিদা হচ্ছে আমরা দুনিয়ার ওপর পরকালকে প্রাধান্য দেব। অথচ বিষয় এর বিপরীত। পৃথিবী ধ্বংসশীল কাচের মতো। আর পরকাল চিরস্থায়ী সোনার মতো। আমরা সেই আখেরাত ভুলে যাই এবং দুনিয়ার চাহিদা পূরণের পেছনে লেগে যাই। দুনিয়া হতে বিমুখ হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে দীনকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দেওয়া। যেব্যক্তি দীনকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দেওয়া শুরু করবে, সে যেন দুনিয়া হতে বিমুখ হওয়া শুরু করে দিল।

পৃথিবীর মধ্যে এত পরিমাণ ফাঁদ রয়েছে যে, তাতে প্যাঁচিয়ে নির্মূল হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। বরং আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ-সমস্ত ফাঁদ থেকে গা বাঁচিয়ে পরকালের দিকে যাত্রা করা।

কোনো এক বুযুর্গ বলেন, আমার অবাক লাগে, যে দুনিয়া বিনা পরিশ্রমে দেওয়ার জন্য আল্লাহপাক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; অথচ এ দুনিয়া পাওয়ার জন্য আমরা কঠোর পরিশ্রম করি। আর আখেরাত অর্জনের জন্য শ্রম দেওয়া শর্ত লাগিয়েছেন; অথচ তাকে পাওয়ার জন্য সাধনা করি না।

---

১৭৫. সূরা আ'লা : আয়াত ১৬, ১৭

১৭৬. সূরা আ'লা : ১৮, ১৯

স্মরণ রাখবেন, এ পৃথিবীর সবাই স্বার্থের বন্ধু। আর প্রকৃত বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা, তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ। তারা নিঃস্বার্থে আপনাকে ভালোবাসেন। এদের ছাড়া সবাই স্বার্থপর বন্ধু। তারা কোনো না কোনো লিপ্সায় তোমার নিকটে আসে। আহার করতে দাও; তবু তারা সন্তুষ্ট হবে না।

দুনিয়ার হাকীকত

দুনিয়ার হাকীকতের প্রতি তাকিয়ে দেখো। পৃথিবীর মানুষের সবচেয়ে প্রিয় ও মূল্যবান পোশাক হচ্ছে রেশমি পোশাক। আর এটি তৈরি হয় এক প্রকার কীটের মল থেকে। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় পানীয় হচ্ছে মধু আর তা তৈরি হয় মৌমাছির থুতু থেকে। অথচ এ দুটি বস্তু পৃথিবীর মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। এটিই হলো দুনিয়ার আসল হাকীকত। সুতরাং এমন হাকীকতপূর্ণ দুনিয়ার মোহে পড়ে যে তার প্রকৃত মালিককে ভুলে যায়, সে কেমন ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে!

বাদশাহীতে এমন স্বাদ নেই

যে ব্যক্তি তার মহান স্রষ্টাকে রাজি করতে পারে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান দান করেন। সে দীনের রাস্তায় থেকে এমন সম্মান পায়, যা দুনিয়ার পেছনে দৌড়েও মানুষ অর্জন করতে পারে না। ইসলাম ধর্মে অপূর্ব স্বাদ রয়েছে। পৃথিবীতে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, সমকালীন বাদশাহ তার রাজত্ব ছেড়ে আল্লাহর রাস্তার ফকীর (দরবেশ) হয়েছে। পক্ষান্তরে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, আল্লাহর পথের ফকির (দরবেশ) তার দরবেশি কাজ ছেড়ে রাজত্ব গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আসল কথা হচ্ছে। এই দরবেশিতে যে স্বাদ রয়েছে, বাদশাহিতে সেই স্বাদ নেই।

খোদাপ্রেমিকদের খাদেম

পৃথিবীর বাদশাহগণের খাদেম হয় সাধারণ মানুষ। আর আল্লাহ ওয়ালাদের খাদেম হন সমকালীন বাদশাহগণ। যেমন দেখুন–

সমরকন্দে আমি বিশ্ববিখ্যাত বাদশাহ তইমুরের কবর দেখেছি। তার কবরের গেটে امیر عالم (বিশ্বনেতা) উপাধি লিপিবদ্ধ রয়েছে। তৎকালীন যুগে তাকে বিশ্বজয়ী বলা হতো। আমি দেখলাম, তার কবরের ঠিক মাথার দিকে কিছু ওপরে আরেকটি কবর। দেখে আমি আশ্চর্য হলাম, বিশ্বজয়ী বাদশাহর

মাথার ওপর আবার কার কবর রয়েছে? লোকেরা বলল, এটা তার মুরশিদের কবর। তিনি মৃত্যুর সময় অসিয়ত করেছিলেন, আমার মুরশিদের ঠিক পায়ের নিচে আমার মাথা রেখে আমাকে দাফন কোরো।

হযরত খাজা মুহাম্মদ মাসুম (রহ.)-এর কবর সেরহিন্দ শহরে অবস্থিত। তাঁর কবরস্তানে যেতে প্রশস্ত একটি রাস্তা আছে। সেই কবরের অদূরে রাস্তার মাঝখানে একটি কবর এবং কবরের দুপাশ দিয়ে রাস্তা নিয়ে পুনরায় একত্রিত করা হয়েছে। আমি শায়খের কবরের খাদেমকে প্রশ্ন করলাম, এই কবরটি আগে হয়েছে, নাকি রাস্তা আগে হয়েছে? তিনি বললেন, রাস্তা আগে হয়েছে। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে রাস্তার মাঝখানে কবর দেওয়ার আবশ্যকতা কী? তিনি বললেন, এই কবরের সমাহিত ব্যক্তি হচ্ছেন আফগানিস্তানের বাদশাহ। তিনি হযরত খাজা মুহাম্মদ মাসুম সাহেবের মুরীদ ছিলেন। তিনি মৃত্যুর সময় অসিয়ত করেছিলেন, আমার শায়খের কবরে যাওয়ার রাস্তায় আমাকে দাফ কোরো। তাই সেই বাদশাহকে এই রাস্তার মধ্যখানে দাফন করা হয়েছে। আল্লাহু আকবার! বুযুর্গদের কদমে বাদশাহদের সমাধি!

আল্লাহওয়ালাদের রাজত্ব

স্মরণ রাখবেন, রাজা-বাদশাহদের সম্মান সাময়িক হয় আর আল্লাহ ওয়ালাদের সম্মান হয় স্থায়ী। বাদশাহদের রাজত্ব হয় মানুষের দেহে আর আল্লাহওয়ালাদের রাজত্ব হয় মানুষের অন্তরে। জনৈক ইংরেজ ব্যক্তি আজমির শরীফ এসেছিল। এখান থেকে যাওয়ার পর অভিমত ব্যক্ত করেছিল, জীবিত মানুষের রাজত্ব আমি বহু দেখেছি। কিন্তু আমি এমন এক শহরে গিয়েছিলাম, যেখানে এক ব্যক্তি কবরে থেকে জীবিত মানুষদের অন্তরে শাসন করছে।

উত্তম ধৈর্য উত্তম বিচ্ছেদ

দুটি জিনিসের কারণে মানুষ দুনিয়ার সমস্ত বিষয় অতি তাড়াতাড়ি গুছিয়ে ফেলে। ১. উত্তম সবর (ধৈর্য) ২. উত্তম বিচ্ছেদ।

صبر جميل বা উত্তম ধৈর্য বলা হয়, যেকোনো প্রকার বেদনায়ক কাজ সংঘটিত হলে মানুষ তার ওপর ধৈর্য ধারণ করে এবং কোনো প্রকার অভিযোগ প্রকাশ করে না। আমাদের ওলামায়ে কেরামও সবরের সংজ্ঞা এভাবে লিখেছেন–

اَلصَّبْرُ الَّذِیْ لَاشَکْوٰی فِیْهِ

সবর বা ধৈর্য বলা হয় যাতে কোনো প্রকার অভিযোগ থাকে না।

যদি কেউ কোনো প্রকার আঘাত দেয় তাহলে সে এর ওপর ধৈর্য ধারণ করে এবং কোনো প্রকার অভিযোগ পেশ করে না। দুনিয়ার স্বার্থে মানুষ পাল্টা আক্রমণ করে। কিন্তু না সে প্রতিশোধ নিতে ব্যস্ত হয়, না হিংসা-বিদ্বেষ রাখে। কেউ তাকে কষ্ট দিলেও সে উত্তমরূপে ধৈর্য ধারণ করে। কারও সঙ্গে একান্ত প্রয়োজন হলে তার সঙ্গে উত্তম বিচ্ছেদ গ্রহণ করে। উত্তম বিচ্ছেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কারও সঙ্গে একান্ত সমস্যা হলে ধীরে-ধীরে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। বর্তমান দুনিয়ার অবস্থা তো এমন যে, বাহ্যিক সম্পর্কও থাকে আবার তলে-তলে শত্রুতাও থাকে। দুশমনির পোশাকে হিতৈষী লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। বর্তমানে বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে গেছে।

তাই বলছিলাম, বন্ধুগণ! এ পৃথিবীর মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা হয়। আনন্দের মধ্যেও পরীক্ষা করা হয়, বেদনার মধ্যেও পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু আল্লাহপাক চান, আমার বান্দা সর্বাবস্থায় ধৈর্যশীল হবে। সুখের সময় শুকরিয়া আদায় করবে। দুঃখের সময় ধৈর্য ধারণ করবে, যার ফলে সে আমার প্রিয় বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হবে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীও জান্নাতী, ধৈর্যধারণকারীও জান্নাতী।

হক ও বাতিলের যুদ্ধ

এ পৃথিবী বৈপরীত্বের সমষ্টি। এজন্যই আমাদের ওলামায়ে কেরাম বলেন-

وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْاَشْيَاءُ

'প্রত্যেক বস্তু তার বিপরীত বস্তুর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।'

রাত না থাকলে দিনের মূল্যায়ন হতো না। অন্ধকার না থাকলে আলোর মর্যাদা বৃদ্ধি পেত না। রোদ না থাকলে ছায়া মূল্যহীন হতো। রোগ না থাকলে সুস্থতার মূল্য বোঝা যেত না। মৃত্যু না থাকলে জীবনের মূল্য অনুভব হতো না।

তেমনিভাবে হক ও বাতিল পরস্পরবিরোধী। আল্লাহ মানুষকে হকের প্রতি আহ্বান করেন। আর শয়তান মানুষকে বাতিলের দিকে ডাকে।

এবার দেখার বিষয় হচ্ছে, মানুষ কার হুকুম মেনে জীবন গড়ে। নিজের নফস ও শয়তানের চাহিদার মোহে পড়ে জীবন গড়ছে, নাকি শয়তানি কুপ্রবৃত্তি প্রশমিত করে নিজের মালিকের অনুসরণের মধ্য দিয়ে কাটায়। হক ও বাতিলের এই যুদ্ধ গোপনীয়ভাবে মরণ পর্যন্ত চলতে থাকে। তবে কেয়ামতের নিকটবর্তী সময় আল্লাহ তা'আলা হক ও বাতিলের আলামত প্রকাশ করে দেবেন। যেমন– হযরত ঈসা (আ.)-এর শুভাগমন হবে। দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। এর মাধ্যমে হক ও বাতিলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হবে। চিন্তা করলে দেখবেন, এর মধ্যে এক প্রকার সুন্দর সমশ্রেণিতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন–

(১) আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মধ্যে রয়েছে মানবাকৃতি ও ফেরেশতা প্রকৃতি। পক্ষান্তরে দাজ্জালকেও সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে মানবাকৃতি এবং শয়তানি প্রকৃতি।

(২) হযরত ঈসা (আ.)কে আল্লাহপাক হেদায়াতের উপাধি দিয়েছেন আর দাজ্জালকে ভ্রষ্টতার উপাধি দিয়েছেন। বোঝা যায়, একজনের পক্ষ থেকে হেদায়াত আর অপরজনের পক্ষ থেকে ভ্রষ্টতা।

(৩) আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)কে আকাশে রেখেছেন। কেয়ামতের সন্নিকটে তিনি ফিলিস্তিনের বায়তুল মাকদিস মসজিদের মিনারায় অবতরণ করবেন। ঈসা (আ.) সম্পর্কে হাদীছ শরীফে ينزل শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে, তিনি অবতরণ করবেন, নেমে আসবেন। পক্ষান্তরে দাজ্জালকে একটি দ্বীপের মধ্যে বন্দি করে রেখেছেন। হাদীছ শরীফে তার সম্পর্কে يخرج ও يظهر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে, সে বের হবে, আত্মপ্রকাশ করবে।

(৪) ঈসা (আ.)-এর আগমনের সময় তিনি মধ্যবয়সি লোক হবেন। পক্ষান্তরে দাজ্জালও মধ্যবয়সি লোক হবে।

(৫) ঈসা (আ.) জন্মের পরই দাসত্বের দাবি করেছেন। পবিত্র কুরআন একথার সাক্ষী। ঈসা (আ.) বলেছিলেন–

إِنِّيْ عَبْدُ اللهِ

'নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা।'

পক্ষান্তরে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে-সঙ্গে খোদায়ি দাবি করবে।

(৬) হযরত ঈসা (আ.) আগমনের পর ধনসম্পদে এত বরকত হবে যে, যাকাত গ্রহণ করার মতো কেউ থাকবে না। অপর দিকে দাজ্জালের কাছে

মালের এমন প্রাচুর্য থাকবে যে, দুনিয়ার ধনভান্ডার তার সাথে চলতে থাকবে।

(৭) আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)কে মৃত মানুষ জীবিত করার অলৌকিক ক্ষমতা দেবেন। পক্ষান্তরে আল্লাহর হুকুমে দাজ্জাল তার জাদুবিদ্যার মাধ্যমে অল্পক্ষণের জন্য মানুষকে জীবিত করতে পারবে।

(৮) হযরত ঈসা (আ.)-এর দাওয়াত সারা বিশ্বে প্রচারিত হবে। এমনকি কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে। সকল মানুষ ঈমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হবে না। পরিশেষে হক-বাতিলের যুদ্ধে হযরত ঈসা (আ.) বিজয়ী হবেন। তিনি লুদ নামক স্থানে নিয়ে দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

অদৃশ্যভাবে এ-যুদ্ধ আমাদের জীবনেও চলছে। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা মোতায়েন করে দিয়েছেন। সে মানুষের অন্তরে নেক কাজের উৎসাহ দিয়ে থাকে। অপর দিকে হাদীছ শরীফে এসেছে, শয়তান প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে জাল পেতে বসে আছে। আল্লাহপাক মানুষদের কল্যাণের প্রতি আহ্বান করেন। আর শয়তান তাদের শিরক তথা আল্লাহর সঙ্গে অংশীবাদের দিকে প্রবঞ্চনা দিতে থাকে। দুস্কৃতির প্রতি উৎসাহী বানিয়ে দিচ্ছে। এবার দেখার বিষয় হলো, তার মধ্যে কোন জিনিস প্রাধান্য প্রায়। কল্যাণের দিকে আহ্বান, নাকি দুস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ। তাই বলি, মানুষ আল্লাহওয়ালাদের মজলিসে বসলে তার অন্তর থেকে শয়তানি আচরণ দূরীভূত হয় আর কল্যাণ এসে আসন বাঁধে। এমনিভাবে দুনিয়ার মহব্বত পলায়ন করে। আর সেই স্থানে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত বদ্ধমূল হয়।

নবীজির দারিদ্র্যকে মনোনীতকরণ

স্মরণ রাখবেন, মৃত্যুর পর আমরা সবাই মাটির পথের যাত্রী। এজন্যই উত্তম কাজ হলো, মরণের আগেই মাটির সাথে মিশে যাওয়া এবং নিজের নফসকে নিজেই নির্মূল করে দেওয়া। যেব্যক্তি নিজেকে মাটির মতো গড়তে পারে, তাকে মিসকিন (নিঃস্ব) বলে। আর মিসকিন বান্দা আল্লাহর তা'আলা প্রিয়পাত্র হয়। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অসহায় মুহাজিরদের দারিদ্রের জিন্দেগি ছিল। দুনিয়ার ধনসম্পদ তাদের কাছে স্বল্প ছিল। গায়ে ছেঁড়া কাপড় ছিল। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহফিলে গেলে একজন আরেকজনের পেছনে চুপ করে বসে থাকতাম। কী জানি ওঠাবসা করলে আমাদের গায়ের ছেঁড়া কাপড়ের ফাঁক

দিয়ে শরীরের কোনো অঙ্গ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিগোচর হয়ে যায় কিনা। কিন্তু ওই সকল অসহায় মুহাজিরদের সম্মান আল্লাহর দরবারে অনেক ছিল। কোনো-কোনো সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে দু'আ করার সময় তাঁদের আলোচনা করতেন, হে আল্লাহ! ওই সকল অসহায় মুজাহিরগণের উসিলায় আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় একটি আশ্চর্য দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ

'হে আল্লাহ! আমাকে মিসকিনদের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখুন। মিসকিনদের মাঝে মৃত্যু দান করুন। আমার হিসাব-নিকাশ মিসকিনদের সাথে করুন।' সুবহানাল্লাহ!

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আর সময় একথা বলেননি, হে আল্লাহ! আমাকে সত্যবাদীগণের সঙ্গে জীবিত রাখুন। নেককারদের সঙ্গে জীবিত রাখুন। পরহেযগারদের সঙ্গে জীবিত রাখুন। কেননা, এ সমস্ত বাক্য দ্বারা দু'আ করলে সত্যবাদী, নেককার ও পরহেজগারদের দাবির প্রকাশ হতো। তাই মিসকিন শব্দ পছন্দ করেছেন। সুবহানাল্লাহ!

গরিবদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্রদের মাহফিলে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে গরিব সম্প্রদায়! আল্লাহপাক তোমাদের এমন তিনটি জিনিস দান করবেন, যা ধনীদের ভাগ্যে জুটবে না।

(১) আমার উম্মতের গরিবদেরকে ধনীদের হতে পাঁচশ বছর আগে জান্নাতে দেওয়া হবে এবং সেখানকার একদিন বর্তমান পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে।

(২) গরিবদের তাসবীহ পাঠের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা এমন প্রতিদান দেবেন, যা ধনীরা মাল খরচ করেও অর্জন করতে পারবে না।

(৩) আল্লাহ তা'আলা গরিবদের জান্নাতে এত উচ্চ মর্যাদা দান করবেন যে, ধনীরা তাদের জাঁকজমকপূর্ণ ভবন এভাবে দেখবে, যেভাবে দুনিয়াতে মানুষ আকাশের তারকাসমূহ দেখে থাকে। সুবহানাল্লাহ! গরিবদের এমন আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

হযরত হাসান বসরি (রহ.) বলেন, তোমরা গরিবদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করো। কেননা, কেয়ামতের দিন আল্লাহপাক তাদের বলবেন, তোমাদের যারা ভালোবেসেছে অথবা তোমরা যাদের ভালোবেসেছ, তাদের নিয়ে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। হাদীছ শরীফে এসেছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহপাক একজন গরিব লোককে জিজ্ঞাসা করবেন, জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? সে বলবে, আমার শরম লাগে। কারণ, আমাকে জান্নাতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; অথচ আমাকে যারা খাওয়াল, পরাল তারা এখনও পেছনে রয়েছে। তার কথাটি আল্লাহপাকের খুব পছন্দ হবে। তাই আদেশ দেবেন, যাও তোমার সঙ্গে যাদের মহব্বতের সম্পর্ক রয়েছে, তাদের সবাইকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। সুবহানাল্লাহ!

উৎসাহ দিতে হলে এভাবে দাও

যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত সুলাইমান দারানি (রহ.) বলেন, যদি কোনো অসহায় বান্দা তার দরিদ্রতা ও বাহ্যিক উপকরণের স্বল্পতার কারণে তার কোনো নেক মাকছাদ পূর্ণ করতে না পারে এবং এজন্য সে আক্ষেপের দীর্ঘ শীতল নিঃশ্বাস ছাড়ে, তার সেই নিঃশ্বাস ধনীদের শত বছরের ইবাদাতের চেয়ে অধিক মূল্যবান হয়। তাছাড়া আমাদের ওলামায়ে কেরাম বলেন–

اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ

'বিপদের সময় আল্লাহর রহমতের অপেক্ষা করা উত্তম ইবাদাত।'

অধিকাংশ লোক বলে, হযরত! অনেক প্রার্থনা করি; কিন্তু অবস্থায় পরিবর্তন আসে না। অনেক দিন যাবৎ বিভিন্ন হতাশায় ভুগছি। এ হতাশা যেন পিছু ছাড়ছে না। তারা কি এই হাদীছ শোনেনি, যেব্যক্তি মসিবতে গ্রেফতার হয়েছে এবং দু'আ করছে, হে আল্লাহ! এ বিপদ থেকে আমাকে নিস্কৃতি দাও। তাহলে ওই বান্দা তার এই প্রতীক্ষার দরুন এমন প্রতিদান পায়, যা ইবাদাতকারীগণ ইবাদাতের মাধ্যমেও পাননি। যদিও দুনিয়ার প্রেক্ষিতে কোনো কল্যাণ পাওয়া যায় না, তবু ধৈর্যের সাথে জীবন কাটাতে হবে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ওপর রাজি থাকতে হবে।

হৃদয়বান কাকে বলে?

একটি জ্ঞানগর্ভ সূক্ষ্ম কথা শুনুন। আপনারা দেখে থাকবেন, মাছিরও পালক থাকে। কিন্তু তাকে ফড়িং বলা হয় না। কারণ, তার লক্ষ্যবস্তু হয়

নাপাক। যেহেতু নাপাক ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু তার লক্ষ্য হয়, তাই পালক থাকা সত্ত্বেও তাকে ফড়িং বলা হয় না। তেমনিভাবে দুনিয়াদার ব্যক্তির অন্তর থাকা সত্ত্বেও তাকে হৃদয়বান বলা হয় না। কারণ, তার লক্ষ্যবস্তু হয় দুনিয়া। আর দুনিয়া হচ্ছে নাপাক। হৃদয়বান তাদেরকেই বলা হয়, যাদের হৃদয় আল্লাহপাকের ভালোবাসায় সজীব থাকে।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

বন্ধুগণ! স্মরণ রাখবেন, কোনো গরিব অথবা কোনো গোনাহগার মানুষকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখবেন না। কেননা, আপনি কি জানেন, ওই গরিব ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে ধনীদের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হতে পারে? ওই গোনাহগার আল্লাহর দরবারে এমন তাওবা করতে পারে, যার দরুন মহান আল্লাহ তার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে তার গোনাহকে নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দিতে পারেন।

একদা হযরত ঈসা (আ.) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে একজন গোনাহগার লোককে দেখলেন। সে তার গোনাহের ওপর খুব অনুতপ্ত হচ্ছে। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তমি কী চাও? সে বলল, হে আল্লাহর নবী! আমি অনেক বড়-বড় গোনাহ করছি। আমার ইচ্ছা আল্লাহপাক যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি আরেকজন ইবাদাতগোজার বান্দাকে দেখতে পেয়ে বললেন, তুমি কী চাও? সে ওই গোনাহগার বান্দার প্রতি ইশারা করে বলল, আমি চাই আল্লাহপাক যেন আমার হাশর তার সঙ্গে না করেন। সাথে-সাথে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করে জানিয়ে দিলেন, হে আমার প্রিয় বান্দা! তুমি এদের উভয়কে জানিয়ে দাও, আমি তাদের উভয়ের দু'আ কবুল করেছি। অর্থাৎ ওই গোনাহগার বান্দার সকল গোনাহ ক্ষমা করে আমি তাকে জান্নাতের ফয়সালা দিয়ে দিলাম আর ইবাদাতগোজার বান্দা আমার আরেক বান্দাকে তাচ্ছিল্য করার কারণে আমি তাকে ওই বান্দার সাথে একত্রিত না করে জাহান্নামের ফয়সালা দিলাম।

বন্ধুগণ! এ ঘটনায় আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করব যে, কোনো বান্দার ইবাদাত দেখে তার ওপর আনন্দ প্রকাশ করব না এবং কোনো গোনাহগারকে ঘৃণার চোখে দেখব না।

গরিবের আহ!-এর আগুন থেকে বেঁচে থাকো

ধনীদের ভয় করো না বরং গরিবের আহ! শব্দ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, ধনীর দরজা থেকে ফিরে এলে অন্য ধনীর দুয়ারে যেতে পারবে। কিন্তু গরিবের অন্তর থেকে আহ! বের হলে সেটা আল্লাহপাকের দরজায় করাঘাত করবে।

একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে কোরাইশদের কিছু বিশেষ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিল। নবীজির আকাঙ্ক্ষা ছিল, এরা মুসলমান হলে দীনের অনেক উপকার হবে এবং এদের দেখাদেখি অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে। সুতরাং নবী করীম (আ.) তাদের নসীহত শুরু করলেন। ঠিক তখন একজন অন্ধ সাহাবী উপস্থিত হয়ে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিলে সে ভেতরে গিয়ে বলল, হুজুর! আমাকে নসীহত করুন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, এ লোকটি সব সময় এখানে আসে; একে কিছু পরেও উপদেশ দেওয়া যাবে। পক্ষান্তরে এখানে অবস্থিত কোরাইশ নেতাদেরকে সব সময় পাওয় যায় না। সুতরাং এখন অন্যদের প্রসঙ্গ আপাতত স্থগিত। এখন এদের সঙ্গেই কথা হবে।

কিন্তু ওই অন্ধ সাহাবী বারবার বলছেন, হুজুর! আমার প্রতি একটু লক্ষ্য করুন। ফলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বিরক্তিভাব দেখালেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পেল। তিনি বললেন, ভাই বিষয়টি বুঝতে পারছেন না কেন? এখন আমি কোরাইশ নেতাদের সঙ্গে আলাপ করছি। আপনি একটু ধৈর্য ধরুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় ক্রোধের ভাব প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে আল্লাহপাক আয়াত নাযিল করলেন। মহব্বতের সাথে সম্বোধন করে বললেন–

عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى ۝١ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۝٢ وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤى ۝٣ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝٤ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝٥ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝٦ وَ مَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝٧ وَ اَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝٨ وَ هُوَ يَخْشٰى ۝٩

'তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তার কাছে এক অন্ধ আগমন করল। আপনি কি জানেন, হয়ত সে পরিশুদ্ধ হতো অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশ তার উপকার করত। পরন্তু যে

বেপরোয়া। আপনি তার চিন্তায় ব্যস্ত। সে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোনো দোষ নেই। যে আপনার কাছে দৌড়ে এল এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে।'[১৭৭]

আল্লাহ সেই অন্ধ সাহাবীর দুটি গুণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন-

(১) وَأَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعَىٰ

'যে তোমার কাছে দৌড়ে এল।'

(২) وَهُوَ يَخْشَىٰ

'তার অন্তরে ভয় রয়েছে।'

সেই সাহাবী হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযি.)। এতে প্রতীয়মান হয়, সত্যিকারের জানার আগ্রাহ থাকলে মানুষ দীনের মাহফিলে দৌড়িয়ে যাবে। বয়ান শোনার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে উপস্থিত হবে। আর দ্বিতীয় আলামত হলো, তার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে। আল্লাহপাক এমন বান্দাদের অনেক ভালোবাসেন। তাদের মর্যাদা আল্লাহর দরবারে অনেক বেশি।

অবশেষে আল্লাহপাক ওই অন্ধ সাহাবীর মর্যাদা এমন বৃদ্ধি করলেন যে, পরবর্তী কালে ওই সাহাবী এলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসার জন্য নিজের চাদরখানা বিছিয়ে দিতেন। উক্ত সাহাবীর মর্যাদার তুলনায় নবীর দরবারে আগন্তুক কোরাইশ নেতাদের মর্যাদা দশভাগের এক ভাগও নয়।

ইজ্জতের মানদণ্ড

আল্লাহপাকের দরবারে সম্মানের মানদণ্ড হলো, বান্দার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে, জানার আগ্রহ থাকবে। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা থাকবে। বাহ্যিক দৈন্য থাকলেও আল্লাহর দরবারে তার সম্মানে কোনো প্রকার পার্থক্য থাকবে না। কিন্তু বর্তমানে সেই পাল্লা পরিবর্তন হয়ে গেছে। বর্তমানে মাল থাকলেই মানুষ বলে, হ্যাঁ; তিনি খুব বড় লোক। বড়-বড় বিল্ডিং থাকলে বলে, এখানে বড় সাহেব থাকেন। তার অন্তরে দুনিয়ার অহংকার থাকে। দুনিয়ার বড়ত্ব মুখ্য হয়। স্মরণ রাখবেন, তারা বড় লোক নয় বরং তারা বড়

---

১৭৭. সূরা আবাসা : আয়াত ১-৯

বোঝা বহনকারী লোক। হিসাব দিতে কত সময় লাগবে সেদিকে তার কোনো চিন্তা আছে? যেব্যক্তি অর্থশালীদের সম্মান করবে, তাদের বড় লোক বলবে, তার ঈমানের এক তৃতীয়াংশ চলে যাবে। সুতরাং আমাদের দৃষ্টি শরীয়ত ও নেক আমলের ওপর থাকবে এবং সেসব লোকের সম্মান থাকবে, যারা আল্লাহকে ভালোবাসে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্মতা

একটি সূক্ষ্ম বিষয় মনে রাখবেন। আমরা যে-পরিমাণ আমল করি, মুক্তি পাওয়ার জন্য তা কম নয়। কিন্তু এখলাছের অভাবে তাতে ত্রুটি দেখা দেয়। যদি এখলাছের ত্রুটি না হতো, তাহলে যিকিরকারীদের আমল মুক্তির জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখলাছ না থাকার কারণে এবং লৌকিকতা ছেয়ে বসার কারণে বড়-বড় আমল করেও আমরা তার কল্যাণ ভোগ করতে পারি না। আল্লাহর দরবারে এখলাছের মূল্যায়ন রয়েছে। মুখলিছ বান্দা দু-রাকাত নামায পড়ে এমন প্রতিদান পাবে, যা লৌকিকতাপূর্ণ উদাসীন নামাযীর এক হাজার রাকাতের মাধ্যমেও পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্যই হাদীছ শরীফে এসেছে, পরহেযগার লোকের দু-রাকাত নামাযের প্রতিদান আল্লাহপাক এ পরিমাণ দিয়ে থাকেন, যা অজ্ঞদের এক হাজার রাকাতেও দেন না।

লৌকিকতার দরুন প্রতিদান হতে বঞ্চিত

একদা হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (রহ.) সূরা তাহা তেলাওয়াত করেছিলেন। রাতে স্বপ্নে দেখলেন, একখানা কুরআন শরীফে সূরা তাহা স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। তিনি স্বপ্নজগতেই সূরা তাহা আবার তেলাওয়াত করলেন। এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দি হলেন যে, আমার আমলনামার প্রতিদান আল্লাহর দরবারে লেখা হয়েছে। অতি আবেগের সাথে দেখতে-দেখতে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল, এক পৃষ্ঠার কয়েকটা লাইন খালি রয়েছে। সেখানে কোনো কিছু লিপিবদ্ধ নেই। দেখে তিনি অস্থির হয়ে গেলেন। এই জায়গাটি খালি কেন? ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ আল্লাহর তা'আলার সাহায্য এসে গেল। তিনি স্বপ্নের মধ্যেই বুঝতে পারলেন, আমি কুরআন তেলাওয়াতের সময় হঠাৎ আমার পাশে দিয়ে একজন বিজ্ঞ লোক যাচ্ছিলেন। তাকে দেখে আমার অন্তরে এ আনন্দের উদ্রেক হয়েছিল যে, এই বিজ্ঞ লোক আমার তেলাওয়াত শুনে অবশ্যই খুশি হবেন যে, এই ছেলেটির তেলাওয়াত খুব সুন্দর। সুতরাং এই সামান্য ধারণার কারণে আল্লাহপাক তাকে কুরআন তেলাওয়াতের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করেছেন।

আমলের ওজন এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

ইমাম বোখারি (রহ.) সহীহ বোখারি শরীফের শেষ হাদীছ উল্লেখ করেছেন–

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

'দুটি বাক্য আল্লাহ তা'আলার কাছে অতি প্রিয়। পড়তে খুব হালকা, মিযানের পাল্লায় ওজনে অধিক ভারী। তাহলো–

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

এই হাদীছে আমলের ওজনের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং বোখারী শরীফের খতমের সময় হাদীছ শিক্ষাদানকারী ওলামায়ে কেরাম দীর্ঘ আলোচনা করেন যে, কেয়ামতের দিন আমলের ওজন করা হবে।

প্রথম যুগে প্রশ্ন করা হতো, আমল কীভাবে ওজন করা হবে? তখন ওলামায়ে কেরাম উত্তর দিতেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমলের ওজন করা হবে। আমাদের মেনে নেওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

এখন বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের দরুন কিছু-কিছু বিষয় উপলব্ধি করা অতি সহজ। বর্তমানে সর্বপ্রকার বস্তু পরিমাপের জন্য মাপযন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে। যেমন– থার্মোমিটারের মাধ্যমে জ্বর ও ঠান্ডা মাপা যায়। ব্যারোমিটারের মাধ্যমে আবহাওয়া ও তার গতি পরিমাপ করা যায়। এটাও মাপা যায় যে, বাতাসের মধ্যে নিম্নচাপ কী পরিমাণ রয়েছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে অতি সহজেই বোঝা যায় আমলের পরিমাপ কীভাবে হবে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে যেকোনো বস্তু মাপার দুটি মৌলিক বিষয় রয়েছে। (১) পরিমাণ (২) আকর্ষণ। মৌলিক নিয়মকানুনে পরিমাপের ক্ষেত্রে M এবং আকর্ষণের ক্ষেত্রে G লেখা হয়। তারপর এ দুটিকে সমন্বয় করলে যেকোনো বস্তুর ওজন বেরিয়ে আসে। সুতরাং কোনো মানুষ জমিনে থাকলে জমিনের আকর্ষণ (নিম্নচাপ) অনুযায়ী তার ওজন নির্ধারিত হয়। পক্ষান্তরে ওই ব্যক্তিই চাঁদের দেশে থাকলে তার ওজন হ্রাস পায়। কারণ, চাঁদের দেশে নিম্নচাপ বা জমিনের আকর্ষণ কম থাকে। আবার সে মঙ্গল গ্রহে থাকলে তার ওজন স্বাভাবিক থেকে অনেক বেশি হয়ে যায়। কারণ, সেখানে নিম্নচাপ বেশি

থাকে। পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তিই মহাশূন্যে থাকলে তার ওজন শূন্য হয়ে যায়। কারণ, সেখানে নিম্নচাপ বা জমিনের আকর্ষণ মোটেও থাকে না। সুতরাং মহাশূন্যে গেলে মানুষের পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও তার ওজন তুলার মতো হয়ে যায়। কারণ, সেখানে জমিনের আকর্ষণ নেই। তাই তার ওজন নেই। সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয়, পরিমাণ ও আকর্ষণ উভয়ের সমন্বয়ে ওজন প্রমাণিত হয়। আর যেখানে আকর্ষণের পরিমাণ যত বেশি থাকবে, সেখানে তার ওজনের পরিমাপের তারতম্য হবে।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক উক্তি একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কেয়ামতের দিন যে বান্দার ভেতরে ঈমানের আকর্ষণ থাকবে, তার আমলের ওজন হবে। আর যে বান্দার ভেতরে ঈমানের আকর্ষণ থাকবে না, তার পাহাড় পরিমাণ আমল থাকলেও সেই আমলের কোনো ওজন থাকবে না। তার আমলকে ওজনই করা হবে না। এজন্য কেয়ামতের দিন কোনো কাফেরের আমল ওজন করা হবে না। এটা বলা হয়নি যে, তাদের আমল উপস্থিতই করা হবে না। বরং বলা হয়েছে, তাদের আমল ওজন করা হবে না।

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا

'কেয়ামতের দিন কাফেরদের আমলের মাপদণ্ডই স্থাপন করা হবে না।'[১৭৮]

কেয়ামতের দিন কাফেরদের আমল উপস্থিত করা হবে। কারণ, হয়ত সে কারও প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে বা কোনো অসহায়কে সাহায্য করেছে বা কোনো হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে তাদের আমল পরিমাপ করা হবে না। কারণ, তাদের আমলের মধ্যে ঈমানের আকর্ষণ নেই। যেহেতু তাদের আমলের G আকর্ষণ চিহ্ন শূন্য থাকবে। তাই সেই আমলের M পরিমাপচিহ্ন পৃথিবীর সমান হলেও তার কোনো ওজন থাকবে না।

ওপরের আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, ঈমান ও এখলাছ মধ্যাকর্ষণ শক্তির মতো। আমরা একে যত বৃদ্ধি করব, তত বেশি প্রতিদান পাব। আর ঈমান ও এখলাছে যে-পরিমাপ বিঘ্নতা থাকবে, তার প্রতিদানও সেই পরিমাণ হ্রাস পাবে।

হেদায়াত খোদাপ্রেমিকদের জন্য

আমাদের এ সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজের জীবনে এখলাছ বৃদ্ধি করা। আপনারা সবাই নিজের আমলের প্রতি দৃষ্টি রেখে চিন্তা করবেন,

---

১৭৮. সূরা কাহ্‌ফ : আয়াত ১০৫

আমার এই আমল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য হয়েছে, নাকি দুনিয়ার বাহবা শোনার জন্য হয়েছে। এটি মহৎ চিন্তা। এই চিন্তা নিয়েই আপনারা এখানে এসেছেন।

এখানে অবস্থানের সময় আপনারা দুনিয়ার চিন্তা-ফিকির পরিহার করবেন। এজন্যই তো দুনিয়ার প্রসঙ্গকে এ-পরিমাণ খুলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ-পৃথিবীকে মহান আল্লাহ খুবই অপছন্দ করেন। এইমর্মে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنٌ

'দুনিয়াটা অভিশপ্ত।'

আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো দিন তার প্রতি খুশি মনে তাকাননি।

শয়তান সর্বদা চেষ্টা করে, আপনি যে কক্ষে বসে আছেন, তাতে কোনো প্রকার গল্পে আপনাকে লিপ্ত করা। এতে দীনের কথাবার্তা শ্রবণে বিঘ্নতা আসবে। তাই এদিক-সেদিককার কথাবার্তা থেকে সাবধান।

এখানে থাকাকালীন আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করবেন, অন্তরের উপস্থিতি আল্লাহর প্রতি রাখবেন। আল্লাহর প্রতি টান রেখে সময় কাটানোর চেষ্টা করবেন। এতেকাফকারীগণ যেমন মনে করেন যে, কায়েকটা দিন আমি আল্লাহপাকের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলাম। তেমনিভাবে আপনারাও ভাববেন, এখানকার কয়েকটা দিনের সময় আমি আল্লাহর জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলাম। সুতরাং মসজিদে থাকাবস্থায় এবং মাদরাসায় খাবার খাওয়ার জন্য যাওয়ার সময় সর্বদা তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখবে। এভাবে যদি আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হতে পার, তাহলে দেখবে, দুনিয়ার মহব্বত তোমার অন্তর থেকে হ্রাস পাবে। আর আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা হৃদয়ে বদ্ধমূল হবে।

মনোনীত লোকদের সমাবেশ

এটা আমাদের সৌভাগ্য যে, এক বছর পর আমরা এ মাহফিলের দু'আয় অংশ গ্রহণ করতে পারি। ভাই! আমরা যদিও গোনাহগার; আমাদের দু'আ কবুল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, তদুপরি এ-মাহফিলে নিষ্ঠাবান নেক বান্দারা উপস্থিত হন। হতে পারে তাদের বরকতে আমরা অধমের দু'আও কবুল হয়ে যাবে।

এ মাহফিলে এমনও লোক আছেন যারা দৈনিক পাঁচ হাজার বার কালেমার যিকির করেন। সাত হাজার বার কালেমা পাঠ করেন।

এখানে এমন লোকও আছেন, যারা দৈনিক এক পারা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করেন।

এমন লোকও আছেন, যারা দৈনিক পনেরো পারা তেলাওয়াত করেন।

এমন লোকও আছেন, যারা দৈনিক এক খতম পড়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

কিছু লোক এমনও আছেন, যারা একবার নয়, দুবার নয়; বরং ডজন খানেকবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছেন।

আমার এক বন্ধু বলেছেন, আমার জীবনে এমন কোনো সপ্তাহ ফাঁকা যায়নি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করিনি।

আরেক এক বন্ধু বলেছেন, বিগত এগারো বছরের মধ্যে আমার একটি রাতও তাহাজ্জুদের নামায বাদ যায়নি।

এ সমস্ত কথা তিনি জানতেন আর তাঁর শায়খ জানতেন। আলহামদুলিল্লাহ! এটি মনোনীত ব্যক্তিগণের সম্মেলন। একথাটি সাধারণত বলা হয় না। তবু আপনাদের প্রেরণার জন্য বলছি, যাতে আপনারা অনুভব করতে পারেন, আমরা কীরূপ সমাবেশে উপস্থিত হয়েছি। কাদের সঙ্গে সময় ব্যয় করছি। সুতরাং এ সময়টাকে গনিমত মনে করুন। আপনার আমলে ত্রুটির অভিযোগ থাকলে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করুন, হে আল্লাহ! আমাকে আমলের ওপর স্থায়ী রাখুন। নিজের নফসের কাছে যদি নিজেকে দুর্বল মনে করেন, তাহলে তাহাজ্জুদে উঠে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করুন।

নতুন অঙ্গীকার করুন

মাহফিলের এই দিনটি এক বছর পর ফিরে আসে। যার সৌভাগ্য হয় সে নতুন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। আজ আমরা এ অঙ্গীকার করব যে, আমাদের জীবনে দীনদারি গ্রহণ করব। প্রত্যেক কাজ শরীয়ত ও সুন্নতমতো করব। তাহলে আমরা দুনিয়াতেও সম্মান পাব এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতেও আমরা প্রিয় হব। দু'আ করি, আল্লাহপাক আমাদের এখানে সমবেত হওয়াকে কবুল করুন এবং আমাদের এর প্রতিদান দিন। আমরা অসহায়দের ত্রুটিপূর্ণ আমল কবুল করুন। আমাদের মূল হাকীকতের প্রতি আমাদের সতর্ক করুন। আমীন।

ইসলামে বিবাহের ধারণা

'সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম বিবাহ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

'হে আমার হাবীব! আমি তোমার পূর্বে অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানাদি দিয়েছি।'[১৭৯]

চিন্তার বিষয় হলো, নবী-রাসূলগণ যেহেতু বিবাহ-শাদী করে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পেরেছেন, তাহলে বর্তমানে আমরা বিয়ে-শাদী করে আল্লাহর মাকবুল বান্দা হতে পারব না কেন?'

---

১৭৯. সূরা রা'দ : আয়াত ৩৮

ইসলামে বিবাহের ধারণা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ.

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

وَقَالَ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰاثَ وَرُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে উপকার হাসিল করার নিয়ম

পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তু থেকে উপকার হাসিল করার নিয়ম রয়েছে। আগুন, পানি, মাটি, বাতাস, জমিন প্রত্যেকটি থেকে উপকার হাসিল করার ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম রয়েছে। এবার প্রশ্ন হয়, মহান আল্লাহর সত্তা থেকে উপকার হাসিল করার নিয়ম কী? একথাটা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আম্বিয়ায়ে কেরাম আগমন করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকে এসে একথার ঘোষণা দিয়েছেন, 'হে মানব সম্প্রদায়! যদি তোমরা আমার নির্দেশিত পথে জীবন গড়তে পার, তাহলে তোমরা আল্লাহ তা'আলার রহমত দ্বারা অধিক উপকৃত হবে। দুনিয়াতে পাবে শান্তি আর আখেরাতে পাবে মুক্তি। এতে প্রতীয়মান হয়, ইসলাম আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের সম্মান দেওয়ার জন্য এসেছে। এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন–

اَعَزَّنَا اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٰذَا الدِّيْنِ

'আল্লাহপাক এই দীনের মাধ্যমে আমাদের সম্মান দিয়েছেন।'

কোনো মানুষ দীনের ওপর চলবে, তার ওপর আমল করবে, দীনের পোশাক গায়ে পড়বে, তার জীবন-মরণ দীনের জন্য হবে আর সে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান পাবে না তা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন–

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

'সম্মান আল্লাহর জন্য ও তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুমিন বান্দাদের জন্য।'[১৮০]

তাকওয়ার বরকত

সৌভাগ্যবান ওই সমস্ত লোক, যাদের জীবনের উদ্দেশ্য দীনের শানশওকত হয়ে যায়। যদি আমাদের জীবনের সকল আমল শরীয়ত, সুন্নত, তাকওয়া ও পরহেযগারি অনুযায়ী হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের ওপর রহমত ও বরকত নাযিল হবে। আল্লাহপাক বলেন–

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرٰى آمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

'যদি গ্রামবাসী ঈমান আনে, তাকওয়া গ্রহণ করে, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের সকল কল্যাণের দ্বার খুলে দেব।'[১৮১]

যেব্যক্তি নিজসত্তাকে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে সর্ম্পণ করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা ওই বান্দাকে কল্যাণময় বানিয়ে দেন। তার জীবন, তার মরণ, তার ক্ষণ, তার কথন, তার আহার, তার সুস্থতা, তার প্রার্থনা সবকিছুতে শুধু বরকত আর বরকত আসতেই থাকে। সুতরাং আমরা যদি সুখে-দুঃখে সর্বদা শরীয়ত ও সুন্নতকে আঁকড়ে ধরি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ইহকাল ও পরকালে আমাদের শির সমুন্নত করবেন।

আজকের আলোচ্য বিষয়

বিবাহ ও তার প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে আজ আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ এ বিষয়টি যুবকদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী হবে। যেহেতু জুমার খুতবায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যায় না এবং বিবাহ

---

১৮০. সূরা মুনাফিকূন : আয়াত ৮

১৮১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৯

অনুষ্ঠানও সর্বদা হয় না, তাই সাধারণত এ বিষয়ের যথেষ্ট জ্ঞান সবার থাকে না। সুতরাং একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

প্রত্যেক জিনিস জোড়া-জোড়া থাকে

আল্লাহ প্রত্যেক বস্তু জোড়া-জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন–

سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا

'মহা পবিত্র ওই সত্তা, যিনি প্রত্যেক বস্তু জোড়া-জোড়া সৃষ্টি করেছেন।'[১৮২]

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ও আল্লাহর দরবারে ইবাদাত হিসেবে গণ্য হয়। ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য দেখুন। মানুষ নিজের চাহিদা পূরণ করে আর আল্লাহপাক তার বিনিময়ে প্রতিদান দেন। সুবহানাল্লাহ!

ইসলাম একটি প্রকৃতি

ইসলাম একটি প্রকৃতি। ইসলাম মানুষকে বৈরাগি জিন্দেগির অনুমতি দেয় না। বিবি-বাচ্চা ছেড়ে পাহাড়, জঙ্গলে ও গুহায় বসবাসের শিক্ষা ইসলাম সমর্থন করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

'তোমরা বিবাহ করো মহিলাদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে– দুই, তিন ও চারটি পর্যন্ত। আর যদি তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করার ব্যাপারে তোমাদের আশঙ্কা থাকে তাহলে একটিই।'[১৮৩]

সাথে-সাথে শরীয়ত এ নির্দেশও দিয়েছে যে, তোমরা স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একে অপরের হক আদায় করো। আল্লাহপাক বলেন–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪

'মহিলাদের হক পুরুষদের ওপর রয়েছে; যেমন সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী পুরুষের হক রয়েছে মহিলাদের ওপর।'[১৮৪]

---

১৮২. সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৩৬

১৮৩. সূরা নিসা : আয়াত ৩

১৮৪. সূরা বাকারা : আয়াত ২২৮

সুতরাং শরীয়তের নির্দেশমতো স্বামী-স্ত্রী একে অপরের দায়িত্ব আদায় করলে দুনিয়াতেই জান্নাতের শান্তি ভোগ করবে।

উত্তম স্ত্রী কে?

ইসলাম মিথ্যাচার ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছে। হাদীছ শরীফে এসেছে–

خَيْرُ الْأُمُوْرِ اَوْسَطُهَا

'সবচেয়ে উত্তম ইবাদাত হচ্ছে যা, মধ্যম পন্থা হয়।'

মানুষ যখন নিজের বিবেকের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তখন সে উগ্রতা ও শিথিলতার শিকার হয়। অথচ ইসলাম একটি উত্তম সফল জীবন যাপনের প্রতি নির্দেশনা দেয়। এমনকি নিজের জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলাম সর্বোত্তম দিশারী।

বোখারি শরীফে হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

'চারটি বিষয়ের ভিত্তিতে মহিলাদের বিবাহ করা হয়। (১) তার সম্পদের কারণে (২) তার বংশ মর্যাদার কারণে (৩) তার সৌন্দর্যের কারণে (৪) তার ধার্মিকতার কারণে। তোমার হাত ধুলামলিন হোক। তুমি দীনের দ্বারা সম্মান লাভ করো।'

এতে প্রতীয়মান হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ধার্মিকতার দিকে লক্ষ রেখে আত্মীয়তা করো।

স্মরণ রাখবেন, যারা ধার্মিকতা ব্যতীত অন্য কোনো কারণে আত্মীয়তা করে, তারা সুখের জীবন যাপন করতে পারে না। কেননা, সুন্দর রূপ দেখে চোখ খুশি হয় আর স্ত্রীর উত্তম চরিত্র দেখে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। বাহ্যিক অবয়ব সুন্দর হয়ে যদি চরিত্রহীন হয়, তাহলে সুখের জীবন গড়ার আশা করা যায় না। মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্যের পরিমাণ হচ্ছে, মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য তার চামড়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এবার নিজেই ভেবে দেখুন, মানুষের চামড়া কতটুক গাঢ় হয়। তদুপরি যৌবনে সামান্য সৌন্দর্য দেখা গেলেও বার্ধক্যে চামড়ায় ভাঁজ পড়ে খেজুরের মতো হয়ে যায়। সুতরাং ক্ষণিকের সৌন্দর্যের সার্থকতা কী? যৌবনে তার চেহারা হরিণীর মতো মসৃণ দেখা গেলেও বাধর্ক্যে তা গাধার মতো হয়ে যায়।

তাই কোনো কবি বলেন–

حسن صورت چند روز حسن سیرت مستقل

اس سے خوش ہوتی آنکھ اس سے خوش ہوتی دل

'বাহ্যিক সৌন্দর্য ক্ষণিকের এবং উত্তম চরিত্র স্থায়ী। এটার দ্বারা চোখ খুশি হয় এবং ওটার দ্বারা অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।'

আম্বিয়ায়ে কেরামের চারটি সুন্নাত

তিরমিযী শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে। চারটি জিনিস নবীগণের সুন্নত–

اَلْحَيَاءُ وَالْعِطْرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

'লজ্জা, সুগন্ধি, মেসওয়াক, বিবাহ।'

(১) লজ্জা ও আত্মসম্ভ্রম

পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যত নবী-রাসূল আগমন করেছেন, তারা সবাই লাজুক ছিলেন। ইউরোপ-আমেরিকা বলে, Shiness is asickness 'লজ্জা এক প্রকার ব্যাধি'। তারা যেন একথা বলতে চাচ্ছে, মানুষ যত বেহায়া ও নির্লজ্জ হলো, ততই তারা সবচেয়ে সুস্থ রইল। অপর দিকে ইসলাম লজ্জাকে মহিলাদের সৌন্দর্য বলে ঘোষণা দিয়েছে। এমনকি হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে–

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ

'লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।'

সুতরাং চিন্তা করে দেখুন, ইসলামি দৃষ্টিকোণ ও বর্তমান কুফরি জীবনের মধ্যে কতটুকু পার্থক্য রয়েছে। স্মরণ রাখবেন, যে-জিন্দেগির ভিত্তি নির্লজ্জতার ওপর হয়, সেখানে মাতাপিতা স্বাধীন থাকলেও মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকে না; বরং তাদের মধ্যে পশুত্ব এসে যায়।

(২) সুগন্ধি : সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। ইসলাম সূচনালগ্ন থেকেই পবিত্রতার ঘোষণা দিয়ে আসছে। আল্লাহপাক বলেন–

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

'আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালোবাসেন।'[১৮৫]

---

১৮৫. সূরা তাওবা : আয়াত ১০৮

আপনারা শিখ সম্প্রদায়কে দেখবেন। অপরিচ্ছন্ন থাকা তাদের ধর্মীয় রীতি। তাদের শরীরের কোনো অঙ্গের চুল তারা পরিষ্কার করে না। এবার নিজেই চিন্তা করে দেখুন চুলের মধ্যে কী পরিমাণ নোংরামি ও অপরিচ্ছন্নতা থাকতে পারে। এমনিভাবে যোগী ব্যক্তিরা গোসল পর্যন্ত করে না। পক্ষান্তরে ইসলামের পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য দেখুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلطُّهُوْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ

'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।'

সুতরাং যেব্যক্তি তার জাহেরি অংশ পরিষ্কার রাখতে পারে না, সে তার বাতেনি অংশ কীভাবে পরিষ্কার রাখবে?

মেসওয়াক : সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম মেসওয়াক করতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ভারী হয়ে যাবে মনে না করলে আমার উম্মতের জন্য মেসওয়াক করা ফরজ করে দিতাম।'

হযরত আয়েশা (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ঘরে আসতেন, তখন মুচকি হেসে ঘরে প্রবেশ করতেন এবং ভেতরে আসার পর মেসওয়াক করতেন, যাতে পরিবাবেরর লোকদের সঙ্গে কথা বলতে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের না হয়।

অন্য এক হাদীছে এসেছে 'যে নামায মেসওয়াক করে আদায় করা হয়, সেই নামায মেসওয়াকবিহীন নামাযের ওপর সত্তর গুণ বেশি ফযিলত রাখে।'

অপর এক হাদীছে এসেছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা আপন মুখ পরিষ্কার রাখো। কারণ, নামাযের তেলাওয়াত ফেরেশতারা শোনে। এমনকি তারা এত নিকটবর্তী হয় যে, নামাযী ব্যক্তির ঠোঁটের সঙ্গে তাদের ঠোঁট মিলিয়ে রাখে। এ ফযিলত মেসওয়াক করে নামায আদায় করলে পাওয়া যায়। মেসওয়াকবিহীন নামাযে নয়।

অন্য হাদীছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– 'তোমরা তোমাদের মুখ পরিষ্কার রাখলে তোমাদের স্ত্রীগণ অপকর্মে লিপ্ত হবে না।'

স্মরণ রাখবেন, মুখ পরিষ্কার রাখার দুটি সুন্নত রয়েছে। পরিষ্কার রাখা একটি সুন্নত আর মেসওয়াক দ্বারা ঘর্ষণ করা আরেক সুন্নত। কেউ-কেউ গাছের ডাল দ্বারা মেসওয়াক করে সত্য; কিন্তু মুখ পরিষ্কার রাখে না। যার

ফলে দুর্গন্ধ আসতে থাকে। এতে মেসওয়াকের সুন্নত আদায় হয় বটে; কিন্তু মুখ পরিষ্কার রাখার সুন্নত আদায় হয় না।

আগেকার যুগে খাদ্যসামগ্রী সাদাসিধে ছিল। তারা রুটি, ছাতু ইত্যাদি খেতেন। তারপর পানি অথবা দুধ পান করলেই মুখ পরিষ্কার হয়ে যেত। বর্তমান যুগের মতো তখন ঘৃতপক্ব সুস্বাদু খাবার ছিল না। বিভিন্ন প্রকার আইসক্রীম ছিল না। এখন অত্যন্ত উন্নতমানের খাবারের আবিষ্কার হয়েছে। এগুলো খাওয়ার পর শুধু মেসওয়াক করলে যদি পরিপূর্ণ পরিষ্কার না হয়, তাহলে ব্রাশের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ওষুধ ব্যবহার করে পরিষ্কার রাখা ইসলামের শিক্ষা। সুতরাং শুধু মেসওয়াক দ্বারা পরিষ্কার না হলে পরিষ্কারের সুন্নত আদায়ের জন্য আপনি সেটা ব্যবহার করতে পারেন। এটা ইংরেজদের নিয়ম হবে কেন? এটা আমাদের বুযুর্গদের নিয়ম। আমাদের নিয়ম পালনের জন্য তাদের তৈরী অসংখ্য জিনিস আমরা ব্যবহার করছি। তাই বলে তাদের রীতি মেনে নেওয়া হয়নি; বরং তাদের তৈরী বস্তু দিয়ে আমরা আমাদের উপকার হাসিল করছি। সুতরাং মুখ পরিষ্কার রাখা যে-সুন্নত, আমরা সেই সুন্নত পালন করছি।

বর্তমান যুগে মহিলারা মনে করে, মেসওয়াক করা শুধু পুরুষদের জন্য সুন্নত। এটা তাদের ভুল ধারণা। ভালো করে স্মরণ রাখবেন, মেসওয়াক ব্যবহার করা নারী-পুরুষ সবার জন্য সুন্নত। মহিলারা ডালের পরিবর্তে বাবলা, বাদাম, আখরুট ইত্যাদি বাকল দ্বারা মেসওয়াক করতে পারে। আখরুটের ছাল দাঁতকে এমন পরিষ্কার করে যে, দাঁতে যেকোনো রকম ময়লা থাকলেও আখরুটের সবুজ বাকল দিয়ে ঘষা দিলে এক মিনিটে দাঁত এমন ধবধবে সাদা হয়ে যায়, যেমন কোনো ডেন্টাল ক্লিনিক থেকে পরিষ্কার করে এসেছে।

(৪) বিবাহ : সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম বিবাহ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

'হে আমার হাবীব! আমি তোমার পূর্বে অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানাদি দিয়েছি।'[১৮৬]

চিন্তার বিষয় হলো, নবী-রাসূলগণ যেহেতু বিবাহ-শাদী করে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পেরেছেন, তাহলে বর্তমানে আমরা বিয়ে-শাদী করে আল্লাহর

---

১৮৬. সূরা রা'দ : আয়াত ৩৮

মাকবুল বান্দা হতে পারব না কেন? অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلنِّكَاحُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ

'বিবাহ ঈমানের অর্ধেক।'

অবিবাহিত লোক যতই মুত্তাকী, পরহেজগার হোক না কেন। আল্লাহর রাসূলের হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী তার ঈমান অপরিপূর্ণ। যখন বিবাহ-শাদীর মাধ্যমে নিজের জিম্মাদারি পালন করার যোগ্য হবে, তখন তার ঈমান পরিপূর্ণ হবে। বর্তমানে দীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরিণাম এ হলো যে, দেখবেন, ঘরের মধ্যে যুবক-যুবতিরা দশ-পনেরো বছর যাবৎ বিবাহযোগ্য হয়ে আছে। কিন্তু তার বিবাহের কথা হচ্ছে না। তাদের পিতামাতারা বলে, এদের জন্য যোগ্য পাত্র পাচ্ছি না। স্মরণ রাখবেন, ওই সমস্ত যুবক-যুবতিরা তোমাদের জন্য অবশ্যই অবশ্যই জাহান্নাম খরিদ করছে।

বুযুর্গগণের সতর্কতা

আমাদের বুযুর্গগণের সতর্কতা দেখুন! আমাদের অনেক বুযুর্গের জীবনী আমি পাঠ করেছি। তাদের অবস্থা ছিল, যদি কোনো লোকের ঘরে কয়েক বছর যাবৎ কোনো যুবতি থাকে আর পিতা তাদের বিবাহের ব্যবস্থা না করে, তাহলে তার কূপ থেকে বুযুর্গগণ পানি পান করতেন না। কারণ, সে যুবতি মেয়েকে ঘরে বসিয়ে রেখেছে। যে সমস্ত লোক ঋণ নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিশোধ করতে বিলম্ব করে, আমাদের বুযুর্গগণ এমন লোকের ঘরে দাওয়াত খেতেন না। কারণ, তাদের ঘরের খাবার পরিশুদ্ধ নয়। যদি তার সম্পদ এ পরিমাণই থাকে যে, সে অন্যকে দাওয়াত খাওয়াতে পারে, তাহলে সে অন্যের ঋণ পরিশোধ করছে না কেন?

বিবাহ এমনও হতো

যেখানে বিবাহ সস্তা, সেখানে ব্যাভিচার দুর্লভ। আর যেখানে বিবাহ কঠিন হবে, সেখানে যিনার বাজার সস্তা হবে।

এটি ইসলাম ধর্মের একক কৃতিত্ব যে, মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য ইসলাম বৈধ পন্থা রেখেছে। এমনকি এ বিষয়ে তাগিদ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা বিয়ে-শাদীর কাজ তাড়াতাড়ি সম্পাদন করো। শরীয়ত বলে তোমরা বিবাহের বিষয়টি ব্যাপক ও সস্তা করে দাও; তাহলে মানুষ অতিসহজে এ কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হবে।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)-এর মধ্যে বিবাহের অবস্থা এমন ছিল যে, কোনো সাহাবী কারও মেয়েকে বিবাহ করতে চাচ্ছেন। তখন তিনি তার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বলতেন, ভাই! অমুক পরিবারে তোমার ভালো সম্পর্ক আছে। আমি সেই পরিবারের মেয়েকে বিবাহ করতে চাই। সুতরাং আপনি আমার পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যান। তিনি তার কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে সেই পরিবারে তার বন্ধুর জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তাদের সামনে পেশ করতেন। তারপর ওই পরিবারের কর্তা বলছেন, আমরা তার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাচ্ছি না। তবে আপনি গ্রহণ করলে আমরা আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা করতে ইচ্ছুক। ফলে তিনি নিজেই রাজি হয়ে গেলেন যে, ঠিক আছে; তাহলে আমার সঙ্গে বিয়ে দাও। তখনই ঘরের পুরুষ লোকজন সমবেত হয়ে দুজনকে বিয়ের সাক্ষী নির্ধারণ করে বিয়ে সম্পন্ন করে ফেলল।

বিয়ে করে বেরিয়ে এলেন। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। তার কাছে ওজর পেশ করলেন, ক্ষমা চাইলেন, বন্ধু! আমি আপনার জন্য প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তারা গ্রহণ করেনি। ফলে তারা আমার কাছে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। সুতরাং আমি নিজেই বিয়ে করে নিয়ে এলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। এই বন্ধু বলছেন, ভাই! আমাকে ক্ষমা করবেন। কারণ, সে আপনাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। অথচ আমার সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য আমি আপনাকে পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার ভুল হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! বন্ধুত্বও স্বস্থানে বহাল থাকল আর বিয়েও হয়ে গেল। সুতরাং বিয়ে কত সস্তা ছিল! এ কারণে তখন যিনার বাজার বন্ধ ছিল।

যুবতি মেয়েকে ঘরে রাখার সমস্যা

আমরা যখন শরীয়তমতো জীবন গড়ব, তখন গোনাহ থেকে বাঁচতে পারব। আর যখন শরীয়তকে দৃষ্টির আড়ালে রাখব, তখন গোনাহে লিপ্ত হব।

বর্তমান অবস্থা তো এমন যে, বড় মেয়ের এখনও বিয়ে হয়নি। তাই ছোট আরও চার মেয়ে যুবতি হয়ে বসে আছে। তাদের বিয়ের কোনো ভাবনাও থাকে না। কোনো-কোনো জায়গায় এমনও দেখা যায় যে, বড় মেয়েকে এংগেজ করে রেখেছে আর বছর দুয়েক পরে উঠিয়ে দিচ্ছে। স্মরণ রাখবেন, এমন করা ভুল যে, টাকা-পয়সার অভাবে যৌতুক দিতে পারনি বলে মেয়েকে ঘরে বসিয়ে রাখবেন। যোগ্য পাত্র পেলে যৌতুকসহ বিয়ে দেবেন বলে যুবতি মেয়ের বিয়েতে বিলম্ব করবেন এটা শরীয়ত সমর্থন করে না।

শরীয়তে যৌতুকের কোনো বাধ্যবাধ্যকতা নেই। বরং শরীয়ত একটি মূলনীতি নিধারণ করে দিয়েছে যে, মেয়ে সাবালিকা হওয়ার সাথে-সাথে যোগ্য পাত্র দেখে তাকে বিয়ে দিয়ে নিজের মাথা থেকে ফরজ বোঝা হালকা করো।

একটি কথা স্মরণ রাখবেন, মেয়ে সাবালিকা হওয়ার পর যতদিন ঘরে থাকবে, এসময় যদি আল্লাহ না করুন সে কোনো গোনাহে লিপ্ত হয়, তাহলে ওই গোনাহের বিপদ তার পিতা বা অভিভাবকদের ওপর পড়বে, যারা নিজের ফরজ দায়িত্ব আদায় করতে অলসতা করছে।

বিবাহ ও ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য

যিনা ও বিবাহের মধ্যে পার্থক্য হলো, যিনা শুধু দৈনিক চাহিদা পূরণের নাম। পক্ষান্তরে বিয়ের মাধ্যমে ওই মহিলার দায়িত্ব নিতে হয়। দেনমহর আদায় হয়। স্মরণ রাখবেন, যেখানে ব্যভিচারের জীবন চলবে, সেখানে শুধু দৈহিক চাহিদা পূরণ হয়।

ফ্রান্সের এক ইঞ্জিনিয়ার ছিল। আপনাদের বোঝানোর জন্য কথাটা বলছি। নতুবা একথা পুনরাবৃত্তি করার যোগ্য নয়। সে কোনো এক স্থানে এক ফ্যাক্টরির সহযোগী হয়ে এসেছিল। সেখানের ইঞ্জিনিয়াররা কৌতুক করে তাকে বলত, আপনি এক মাসের জন্য এখানে এসেছেন। আমরা জানি না, আপনি এখান থেকে ফিরে গেলে আপনার স্ত্রী আপনার কাছে থাকবে কি-না? প্রত্যুত্তরে সে কিছু আগে বেড়ে বলল, চিন্তার কোনো কারণ নাই। কেননা, Womem are like buse if you missaone. teke another onm. 'মহিলারা হলো গাড়ির মতো। তুমি একটা মিস করলে আরেকটায় উঠে যাবে।' আস্তাগফিরুল্লাহ! যে-সমাজে শিক্ষিত লোকের এমন অবস্থা হয়, সেখানে মহিলাদের কী মূল্যায়ন হবে। ইউরোপে মহিলারা নিজের সম্মান নিজে খর্ব করেছে।

একদা লন্ডনে এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। সে বলল, আপনার সন্তান কজন? আমি তাকে সঠিক জবাব দিলাম। এবার আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ছেলেমেয়ে কজন? সে বলল, আমি এখনও বিবাহই করিনি। আমি বললাম, তোমার বয়স তো অনেক দেখা যাচ্ছে তবে... । সে বলল, আমার বয়স ৫২ বছর। আমি বললাম, আপনি একজন প্রকৌশলী। বয়সও অনেক হয়েছে। তবে বিয়ে করেননি কেন? সে উত্তর দিল, If you find milk in the market. there is no need to

have a cow in your hove 'বাজারে যখন তুমি উত্তম দুধ পাবে, তখন গাভি কিনে ঘরে তোলার প্রয়োজন নেই।'

চিন্তা করুন, সে কত বড় বেহায়া ও নির্লজ্জের জীবন কাটাচ্ছে। তার সমাজের শিক্ষিত লোকের মস্তিষ্ক এমন হয়ে গেছে।

ইসলাম বেহায়াপনার জিন্দেগির বিরোধিতা করে আসছে এবং এর বিপরীতে লজ্জাময় জীবন গড়ার শিক্ষা দিয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখে এমন লাজুকতা দেখেছি, যা মদীনার কুমারী মেয়েদের চেহারায়ও দেখা যেত না। শরীয়ত বলে, তোমার জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন করতে হলে Long time Deseition (দীর্ঘ দিনে ফয়সালা নিতে হবে) অল্পদিনের সাথী তো অনেক পাওয়া যায়। তবে জীবনের সাথি কমই পাওয়া যায়।

বিবাহের প্রচার-প্রসারের নির্দেশ

হাদীছ শরীফে এসেছে–

اَفْشُوْا النِّكَاحَ بَيْنَكُمْ

'বিবাহের কথা তোমরা একে অপরের কাছে প্রচার করো।'

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, গোপনীয়ভাবে বিবাহ হয় না। যেমন কেউ-কেউ شِيْعَة বা সাময়িক বিবাহের বৈধতা দাবি করেন। মূলত তারা যিনার অপর নাম মুতা রেখে নিয়েছেন। যেখানেই মানুষ বিবাহের কথা গোপন রাখবে, বুঝতে হবে যে, এখানে কোনো প্রকার সমস্যা অবশ্যই আছে।

জুমার দিন আছরের পর মসজিদে বিবাহ পড়ানো সুন্নত। কারণ, মসজিদে অনেক লোক জমায়েত হয়। আর শরীয়তের নির্দেশও হচ্ছে, অধিক লোকের মধ্যে প্রচার করা। এর মধ্যে অনেক ছাওয়াবও রয়েছে।

বর্তমানে জায়েয অনুষ্ঠানে লোকজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয় না। কিন্তু জন্মদিন পালন করার জন্য বিশাল আয়োজন করা হয়। একটি মূলনীতি স্মরণ রাখবেন। শরীয়তে যে-সমস্ত অনুষ্ঠান জায়েয রেখেছে, সেগুলো আনন্দচিত্তে পালন করো। এগুলো খুশি মনে পালন না করলে নাজায়েয অনুষ্ঠান পালন করতে বাধ্য হবে।

মসজিদে বিবাহ পড়ানোর উপকারিতা

মসজিদে বিবাহ পড়ানোর বিশেষ ফায়দা থাকে। কারণ, ঘরে বিবাহ পড়ালে কেউ গল্প করবে, কেউ সিগারেট টানবে, কিউ ছবি অঙ্কন করবে। সবাই যেন উদাসীনতার মধ্যে মত্ত থাকে। অথচ তখন বিবাহ হচ্ছে, যাতে দুজন নবদম্পতির জীবনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এই ভিত্তি স্থাপনের মধ্যে দু'আ করা জরুরি। বিবাহে অধিক মানুষকে আমন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সবাই মিলে নবদম্পতির জন্য দু'আ করবে। এজন্যই ঘরে ও মসজিদে বিবাহ পড়ানোর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। আপনারা দেখে থাকবেন, মসজিদে বিবাহ পড়ানো হলে সবাই উজু অবস্থায় থাকবে। ধূমপান থেকে মুক্ত থাকবে। অন্তরে আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ থাকবে। সাথে দু'আও করবে, যেন এই নবদম্পতিকে দু'আর সুরতে আল্লাহর কাছে হাদিয়া করা হচ্ছে।

আজ যেহেতু ইজতেমার দিন; সুতরাং অনেক বন্ধু দু'আ নেওয়ার জন্য এ-মাহফিলে বিবাহ পড়ানো পছন্দ করেন। এ মাহফিলে হাজারো ওলামায়ে কেরাম রয়েছেন, হাজারো হাফেজ রয়েছেন। শত-শত শায়খুল হাদীছ রয়েছেন। অসংখ্য মাদরাসার মুহতামিম সাহেবান রয়েছেন এবং বলা যাবে না কত তাহাজ্জুদগোজার বান্দা রয়েছেন। তারা এ সমস্ত লোকের দু'আ পাবেন এবং এ দু'আর বিনিময়ে তাদের সারা জীবন সুখময় হবে।

বিবাহের অনুষ্ঠানে ইসলাম গ্রহণ

আমরা ইউরোপ-আমেরিকায় দেখেছি, বিবাহের মাহফিলে বহু নর-নারী মুসলমান হয়েছে। আমি একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে বয়ান করে পরে বিবাহ পড়িয়েছিলাম। যে-মেয়ের বিবাহ হচ্ছিল, সে এক অফিসের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ছিল। তার বিয়েতে অফিসের আরও অনেক মেয়েরা আসে। এদের মধ্যে কিছু বিধর্মী মেয়েও ছিল। তারা বিবাহের অনুষ্ঠানে প্রভাবিত হয়ে বলল, ইসলামে এত সুন্দর পদ্ধতিতে বিবাহ হয়! সুতরাং আমরা কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম।

উগ্রতা ও শিথিলতা থেকে বেঁচে থাকো

ইসলাম যেহেতু ফিতরাতের ধর্ম, তাই ইসলাম আমাদের ভারসাম্য শিক্ষা দেয়। কিন্তু মানুষ যখন নিজের বিবেক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে উগ্রতা ও শিথিলতার শিকার হয়, যার দরুন সে হতাশার শিকার হয়। এজন্য মানুষ লক্ষ্য টাকা ব্যয় করে মেয়েদের স্বামীর সঙ্গে বিদায় করে আর পরের

দিন কাঁদতে-কাঁদতে বাবার বাড়িতে আসে। এতে প্রতীয়মান হয়, বিয়ের আসল আত্মা যা ছিল, তা এখন চলে গেছে এবং তার মরদেহ বর্তমানে পড়ে রয়েছে। স্মরণ রাখবেন, যে ভবনের ভিত্তি দীনের ওপর হয়েছে, আল্লাহপাক তার স্থায়িত্ব সুদৃঢ় করবেন।

একটা দুঃখজনক ঘটনা

লাহোরের জনৈক ভদ্রলোক তার কন্যাকে বিবাহ দেবেন। এক বছর পূর্ব থেকে প্রস্তুতি শুরু করলেন। বিয়ের কার্ড ছাপিয়েছেন। অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন। এমনকি এ আয়োজনও করেছেন যে, বিয়েতে আগত প্রত্যেক বরযাত্রীর জন্য এক হাজার টাকার হার বানিয়েছেন। যে-প্লেটে বরযাত্রীরা খাবার খাবে, সেগুলো পাথর দ্বারা বিরল প্রকৃতির অমূল্য প্লেট নিজে অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে বিয়ের স্মারক লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। প্রত্যেক বরযাত্রীর জন্য অনুমতি ছিল যে, যার যার সামনে উপস্থিত প্লেট ব্যবহারের পর বিয়ের স্মারক হিসেবে নিয়ে যেতে পারবেন।

এদিকে পাত্রপক্ষও বিশাল আয়োজন করেছে। চিড়িয়াখানা থেকে ভাড়া করে হাতি এনেছে। হাতির ওপর আরোহণ করে বর শ্বশুরালয়ে পৌঁছল। বোঝা যায়, তিনি যুদ্ধ করার জন্য যাচ্ছেন। এ ছাড়াও পানির মতো টাকা ব্যয় করেছেন।

মেয়েকে বিদায় দেওয়ার পর পিতা ঘরে এলে মহিলারা জিজ্ঞাসা করল, বিয়েতে দেনমহর কত টাকা ধার্য করেছেন? তখন তার স্মরণ হলো, হায়! আমি তো মেয়ের বিবাহই পড়াইনি! সঙ্গে-সঙ্গে লোক পাঠালেন, বরযাত্রীসহ সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো, যাতে বিবাহ পড়িয়ে দেওয়ার পর এদের নতুন ঘরে প্রবেশ করে।

এবার চিন্তা করুন, এক বছর পূর্ব থেকে বিয়ের প্রস্তুতি নিয়ে সকল আয়োজন করা হয়েছে আর আল্লাহর নির্দেশের কথা মনে নেই। এটা হচ্ছে দীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার কুফল। পক্ষান্তরে যারা দীনের ভিত্তির ওপর নতুন সংসারের ভিত স্থাপন করে, তাদের সবকিছু সুসংহত হয়। তারা সুখের জীবন যাপন করে এবং দুনিয়াতেই জান্নাতের সুখ লাভ করে।

দুনিয়াতে জান্নাতের স্বাদ

হযরত আহমদ আলী লাহোরি (রহ.) শিখ পরিবারের লোক ছিলেন। যৌবনকালে তিনি কালেমা পাঠ করে মুসলমান হন। তারপর দেওবন্দ

মাদরাসায় এ ঘটনা তিনি নিজেই বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার শশুরকে ঘর থেকে জানানো হলো, আজ থেকে আমাদের মেয়ে সাবালিকা হয়েছে। সুতরাং কোনো যোগ্য পাত্র দেখে বিয়ে দেওয়া আবশ্যক। তখন তিনি পাঞ্জাবের প্রত্যেকটি মাদরাসায় ঘুরে-ঘুরে নিজের মেয়ের জন্য আলেম ফাযিল যোগ্যপাত্র সন্ধান করেছেন। শেষ পর্যন্ত দেওবন্দ মাদরাসায় এলেন। দাওরায়ে হাদীছের দরসে প্রবেশ করেই আমার ওপর তাঁর দৃষ্টি আটকে যায়। তিনি আমাদের ওস্তাদ হযরত মাওলানা শাহ হাসান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ছেলেটি কে? কী তার পরিচয়? তিনি উত্তর দিলেন, এ হচ্ছে শিখ পরিবারের ছেলে। সে মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে কুরআন-হাদীছ শিক্ষা করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি বিয়ে করেছে? আমার ওস্তাদ বললেন, না। জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে কি সে বিয়ে করবে? তখন আমার ওস্তাদ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত? আমি বললাম, হুজুর! আমি মুসলামন হয়েছি। আমার পরিবার সবাই কাফের। এমতাবস্থায় আমার নিঃসঙ্গ জীবনে কে মেয়ে দেবে? তখন আমার শ্বশুর বললেন, কেউ তার কন্যা তোমাকে দিতে চাইলে এতে তোমার মতামত কী? আমি বললাম, আমি সেই সুন্নত স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করব। সেই সুন্নত ছেড়ে থাকার গোনাহ আমার মাথায় রাখতে চাই না। সুতরাং আমার শ্বশুর বললেন, ঠিক আছে আগামীকাল আছরের নামাযের পর বিয়ে হবে।

তিনি বলেন, তারপর আমার বন্ধুদের কাছে এসে বললাম, বন্ধুরা! আগামীকাল আমার বিয়ে। ছাত্র তো ছাত্রই হয়। তারা আমার কথা শুনে বিভিন্ন প্রকার রসিকতা করল। যথেষ্ট সময় পর আমার এক বন্ধু বলল, আগামীকাল বিয়ে করবেন। আপনার পোশাকগুলো খুবই ময়লা। সুতরাং কারও কাছে থেকে একটি পোশাক ধার নিয়ে আসো, যাতে ভালো পোশাক পরিধান করে বিয়ে মজলিসে বসতে পার। আমি বললাম, এটা আমার আত্মসম্ভ্রম সহ্য করবে না। আমার যা আছে যথেষ্ট। কারও কাছে থেকে ধার নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ছাত্ররাও তর্কশাস্ত্রের পণ্ডিত। তারা বলল, আচ্ছা! কারও কাছে থেকে ধার না নিলে নিজের জামাটাই একটু ধুয়ে নাও। আর পরিষ্কার জামা নিয়ে আপন বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হও ।

তার নিজের ভাষ্য– আমার দুর্ভাগ্য এসে গেল। আমার বন্ধুদের কথায় আমি পরের দিন ধুতি পরে গায়ের জামাটা ধুয়ে নিলাম। শীতের মৌসুম, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। আছরের সময় হয়ে গেল। আমি মসজিদের এক পার্শ্বে কাপড় শোকাতে দিয়েছি। সাথে-সাথে দু'আ করছি, হে আল্লাহ! আমার

জামাটা শুকিয়ে দাও। আবহাওয়ার দুর্যোগের কারণে জামা শোকানোর যোগ্য হয়নি। আছরের আযান হয়ে গেছে। আমি শীতের মৌসুমে হালকা ভেজা জামা পরে মজলিসে এসে বসে গেলাম। কিন্তু আমার শ্বশুরের অন্তরও সোনা দ্বারা বাঁধাই ছিল। তিনি এ দিকে একটু ভ্রূক্ষেপও করলেন না যে, গতকালও তার গায়ে এ জামা ছিল। আজও এই জামাটাই ভেজা দেখছি; তার কাছে কী অন্য কোনো জামা নেই? যাক, তিনি তাঁর মেয়ে আমার কাছে বিয়ে দিয়ে দিলেন। দিনকতক পর তাকে উঠিয়ে দিলেন।

প্রাথমিক অবস্থায় কিছু দিন প্রায়ই অনাহারে কাটাতে হয়েছে। কারণ, আমি ছাত্র ছিলাম। সদ্য ফারেগ হয়েছি। আহার্য জোগানোর তেমন ব্যবস্থাও ছিল না। কিছুদিন পর্যন্ত আমার স্ত্রী আমার বাড়িতে থাকার পর তাদের বাড়িতে গেলেন। আমার শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, মা! তোমার নতুন ঘরের অবস্থা কেমন পেলে? তিনি বলেন, আমার স্ত্রী একজন ধার্মিক ও পুণ্যবতী ও সতী-সাধবী রমণী ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি আমার ধার্মিকতায় মুগ্ধ ছিল। সুতরাং সেদিকে দৃষ্টি রেখে তার সম্মানিতা মাতাকে বললেন, আম্মাজান! আমি ভাবতাম, মৃত্যুর পর জান্নাতে যাব। কিন্তু আমি জীবিত থাকতে জাগ্রত অবস্থায় জান্নাতে পৌঁছে গেছি। সুবহানাল্লাহ!

হযরত লাহোরি (রহ.) বলতেন, আমার শশুর আমাকে ওই সময় চিনেছিলেন, যখন আহমদ আলী আহমদ আলী ছিল না। আজ তো আমি আহমদ আলী লাহোরি হয়েছি।

পুণ্যবতী নারীদের নিদর্শন চারটি

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেককার মহিলাদের চারটি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন।

প্রথম নিদর্শন : স্বামী তাকে কোনো বিষয়ের আদেশ করলে সে মাথা পেতে মেন নেয়, সেটা পালন করে। জেদি হয় না। তাই মা-বাপের জন্য উচিৎ নিজের মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া এবং বোঝানো যে, তোমরা স্বামীর ঘরে যেতে হবে। সেখানে জেদি হতে পারবে না। আপন দাবি আদায়ের পরিবর্তে তার আদেশ মেনে চলতে হবে। এতে তোমার জীবনে কল্যাণ নেমে আসবে। এ-ধরনের তালিম অবশ্যই দেবেন। কারণ, স্বামী-স্ত্রীর আমোদ-প্রমোদের একটি ধরন থাকে আর মহিলারা সাধারণত কথায় অনেক জেদি হয় যায়।

দ্বিতীয় নিদর্শন : স্বামী তার প্রতি তাকালে স্বামীর হৃদয় তার প্রতি খুশি হয়ে যায়। একথার মর্ম কী? মর্ম হচ্ছে, সে ঘরের মধ্যে পরিষ্কার কাপড় পরে

মনোমুগ্ধকর সাজে থাকবে। এটা নয় যে, বাইরে যাওয়ার সময় ফ্যাশন করে বের হবে আর ঘরের মধ্যে চাকরানির মতো থাকবে। এমনও যাতে না হয় যে, ঘরের মধ্যে নোংরা অবস্থায় থাকবে আর তার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হবে আর বাইরে যাওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হবে। শরীয়ত একে পছন্দ করে না। এক হলো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। দ্বিতীয়ত স্বামীর সামনে তার চেহারায় হাসি থাকবে। এমন যেন না হয় যে, সব সময় মুখ গোমরা করে রাখবে।

তৃতীয় নিদর্শন : স্বামী যদি কোনো বিষয়ে শপথ করে, তাহলে এমন কাজ করবে যে, স্বামী তার কসম পূর্ণ করে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ দেখায়।

চতুর্থ নিদর্শন : স্বামী বাড়িতে না থাকলে সে তার স্বামীর সম্পদ ও নিজের সম্ভ্রম হেফাযত করবে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হওয়ার কারণ

স্বামী-স্ত্রী একাত্ম থাকার জন্য শরীয়ত আশ্চর্যপূর্ণ ফর্মুলা ব্যক্ত করেছে। মধ্যখানে অন্য কিছু লোক তাদের বিচ্ছেদের কারণ হয়। এমন লোক থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক। একটি মূলনীতি স্মরণ রাখবেন। সাধারণত স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে ঝগড়া করে না। বরং সর্বদাই তৃতীয় পক্ষ তাদের ঝগড়ার মূল কারণ হয়। সেই তৃতীয় পক্ষ হয়ত স্বামীর মা-বাপ, ভাই-বোন অথবা স্ত্রীর মা-বাপ, ভাই-বোন প্রমুখ হয়ে থাকে।

একটি বিদ্যাগত সূক্ষ্মতা

একটি বিদ্যাগত সূক্ষ্মতা এখানে আলোচনা করছি। আপনারা তালেবে ইল্‌ম হওয়ার কারণে কথাটা এখানে বলা সমীচীন মনে করছি। ফেকাহবিদগণ বলেন, কোনো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য থাকলে কেউ যদি সেটা মীমাংসা করার ইচ্ছায় বাস্তবের বিপরীত কোনো কথাও বলে; অর্থাৎ মীমাংসার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে, তাহলে এই মিথ্যাচারের দরুন সে আল্লাহর দরবারে পাকড়াও হবে না। সেটা মিথ্যা হলেও তার নিয়তের পরিশুদ্ধির কারণে মুক্তি পেয়ে যাবে।

এখানে চিন্তা করা দরকার, স্বামী-স্ত্রীর মীমাংসার স্বার্থে যখন আল্লাহপাক নিজের হক ক্ষমা করে দেন, তাহলে মাতাপিতা নিজের হকের স্বার্থে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেওয়ায় সার্থকতা কী? বর্তমানে শাশুড়ি বলে, আমি মা। ছেলেকে বলে, তুমি আমার কথামতো চলো আর তোমার বউটাকে

শায়েস্তা করো। ঠিক আছে; আপনি মা-ই বটেন। আপনি আপনার জায়গায় আছেন। আর সে-ও তার স্ত্রী। সুতরাং তারও একটা স্তর আছে। স্ত্রীকে স্ত্রীর স্থানে রাখুন এবং মাকে মায়ের জায়গায় রাখুন।

হাদীছ শরীফে এসেছে– 'শবে কদরে সকল প্রকার লোকদের ক্ষমা করা হয়। কিন্তু কিছু-কিছু লোককে ক্ষমা করা হয় না। অথচ বাকি সকলকে মাফ করা হয়। তাদের একজন হচ্ছে, যার অন্তরে হিংসা থাকে। আরেকজন, যেব্যক্তি কোনো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে তাদের বিচ্ছেদ ঘটায়।

ঘরোয়া বিবাদের সহজ মীমাংসা

বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে এ সিদ্ধান্ত নেবে যে, স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনকে খুশি রাখার দায়িত্ব স্বামী নেবে এবং স্বামীর আত্মীয়-স্বজনকে খুশি রাখার দায়িত্ব স্ত্রী নেবে। আর যদি ছেলে তার স্বজনকে খুশি রাখার চেষ্টা করে এবং এ মেয়ে তার স্বজনকে খুশি রাখার চেষ্টা করে, তাহলে কোনো উপকার হবে না। বরং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লেগে থাকবে। সুতরাং এ মীমাংসার সহজ পন্থা হলো, স্ত্রীর আত্মীয়কে স্বামী খুশি করার চেষ্টা করবে এবং স্বামীর আত্মীয়কে স্ত্রী খুশি রাখার চেষ্টা করবে। এতে উভয়ের সুখের জীবন গড়তে পারবে।

সহনশীল মেজাজের প্রয়োজন

হাদীছ শরীফে এসেছে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে দেখে মুচকি হাসি দিলে দেখে আল্লাহ তা'আলাও মুচকি হাসেন। অর্থাৎ– আল্লাহপাক চান, আমার বান্দা আমোদ-প্রমোদের জীবন যাপন করুক। স্বামী-স্ত্রী যতই ভালোবাসার জীবন গড়বে, আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান পাবে। এজন্যই স্বামী-স্ত্রী উভয় সহনশীল হওয়া আবশ্যক। সহনশীল মেজাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ কোনো বিষয় শুনলে বা দেখলে প্রথমে চিন্তা-ফিকির করবে তারপর এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেবে।

বর্তমান অবস্থা হচ্ছে, আগে কাজ করে ফেলে; পরে চিন্তা করে, হায়! আমি তো ভুল করে ফেলেছি! তাই কতিপয় লোক এসে বলে, জনাব! আমি তো বন্ধুবান্ধবের কাছে ভালই থাকি। কিন্তু ঘরে গেলে আমার মস্তিষ্ক কী করে আমি বলতে পারি না। আমার মাথা সব সময় গরম থাকে। মূলত তোমার পেছনে শয়তান লেগে আছে আর তোমার মস্তিষ্ক গরম করছে।

সুন্নত আমলের কল্যাণ

একদা আমার কাছে দুজন স্বামী-স্ত্রী এল। তারা উভয় আমাদের তরিকায় আমার কাছে মুরীদ ছিল। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, উভয়ে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। তারা দুজনই শিক্ষিত যুবক-যুবতি ছিল। তাদের অনুভূতি হলো, যদি আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই, তাহলে আমাদের মুরশিদকে কী জবাব দেব। সুতরাং আগে হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

ভাই! হক্কানি পীরদের সঙ্গে পরামর্শ করা অনেক সময় হেদায়াতের কারণ হয়ে যায়। এ ঘটনার দ্বার বোঝা যায়, যাদের সঙ্গে হক্কানি পীরের সম্পর্ক রয়েছে, তারা অনেক সময় আকিদা ইত্যাদির ফেতনা থেকে হেফাযত থাকে। যে সমস্ত লোক ধর্মত্যাগী হয় বা হাদীছকে অস্বীকার করে। হক্কানি পীরদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক থাকে না। এতে প্রতীয়মান হয়, হক্কানি পীরের সাথে সম্পর্ক রাখলে মানুষ বিভিন্ন প্রকার ফেতনা থেকে হেফাযত থাকে।

তারা উভয়ে তাদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করল, হুজুর! আমরা সন্তুষ্টচিত্তে পরস্পর বিচ্ছেদ হতে চাচ্ছি। সাথে-সাথে আমি বুঝে নিলাম, অবশ্যই এদের মধ্যে ছোট-ছোট কিছু বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে আর সেটা মীমাংসা করার জন্য তৃতীয় পক্ষের কোনো পদক্ষেপ নেই। আমি তাদের এ অবস্থা অনুভব করে বললাম, ঠিক আছে; তবে সিদ্ধান্তটা ছয় মাসের জন্য মুলতবি রাখো আর আমার একটি উপদেশ মেনে চলবে বলে ওয়াদা করো। ছয় মাস পর যা মন চায় কোরো। তারা উভয়ে ওয়াদা করল, ঠিক আছে; আমরা আপনার উপদেশ মেনে চলব।

আমি ছেলেকে বললাম, তুমি কর্মস্থল থেকে এসে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই মুচকি হাসি দিয়ে তোমার স্ত্রীর প্রতি তাকাবে।

বন্ধুগণ! কথাটি ছোট হলেও এটি আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ঘরে আসতেন, তখন মুচকি হেসে ঘরে প্রবেশ করতেন।

আমি দেখলাম, লোকটি ব্যবসায়ী ছিল। সারাদিন ব্যবসার ঝামেলায় মাথা গরম থাকে। ঘরে এলে মুখে বিষণ্নতার ভাব প্রকাশ পায়। এ দিকে তার স্ত্রী দুঘন্টা যাবৎ ক্ষুধায় কষ্ট করে স্বামীর প্রতীক্ষায় থাকে। স্বামী এসে হাসিখুশি কোনো কথা না বলে ব্যবসার চিন্তা মাথায় রেখে খেতে বসে খাবারে ত্রুটি বের করতে শুরু করে। ফলে মহিলাদের মন আর কী করবে? এখান থেকে চলে গিয়ে বিষণ্নভাবে দূরে বসে থাকে।

যখন আমি বললাম, হাসি মুখে ঘরে প্রবেশ করবে, তখন সে বলল, হুজুর! এটা তো সাধারণ ব্যাপার। আমি বললাম, সাধারণ কথা-ই। তবে ওয়াদা করো; সব সময় পালন করবে। সে ওয়াদা করে চলে গেল। আল্লাহর কুদরত দেখুন। ছমাস তো দূরের কথা একমাস পরই সে আমাকে ফোন করল, হুজুর! আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, জীবনে আর কোনোদিন বিচ্ছেদের কথা বলব না। সুখের জীবন আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে।

দেখুন, স্বামী মুচকি হেসে ঘরে প্রবেশ করলে হাসির দ্বার খুলে যায়। এ-ধরনের নির্দেশনা হক্কানি পীরগণই দিয়ে থাকেন। তাঁরা জানেন, তোমাদের কোন আমল তোমাদের বিপদ সেজে সামনে দাঁড়াচ্ছে। আল্লাহ আমাদের বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রেম-ভালোবাসার কথা

স্ত্রীকে হাসিখুশি রাখার জন্য তার সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসার কথা বলা প্রয়োজন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী আয়েশা (রাযি.)কে একবার এগারো মহিলার গল্প শোনালেন। তারা একত্রে বসে নিজ-নিজ স্বামীর বিভিন্ন প্রকার গুণগান করছিল। এটা অনেক দীর্ঘ কাহিনি। তিনি বিভিন্ন মহিলার কথা বললেন, সে এমন বলেছে, সে এমন বলেছে ইত্যাদি। এই গল্প বলার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা! এদের মধ্যে যে-মহিলার স্বামী তার কাছে সবচেয়ে ভালো, আমি তোমার জন্য এর চেয়ে অধিক উত্তম। বন্ধুগণ! আপনারাও কি নিজের স্ত্রীকে খুশি করার জন্য এমন গল্প করেন? আমাদের অবস্থা হলো আমাদেরকে খুশি রাখা তার জন্য ফরজ। আর তাদেরকে বিষণ্নতায় রাখা আমাদের দায়িত্ব। অবস্থা এমন হলে দম্পত্যজীবনে সুখের আশা করি কীভাবে?

মেয়েদের তিনটি সূরা শিক্ষা দাও

একটি কথা স্মরণ রাখবেন। মাতাপিতার জন্য নিজের মেয়েদেরকে সূরা হুজুরাত, সূরা নূর ও সূরা নিসা শিক্ষা দেওয়া একান্ত জরুরি। কেননা, সূরা হুজুরাতে চরিত্র-সৌন্দর্যের শিক্ষা রয়েছে, সূরা নূরে লজ্জা ও পবিত্র জীবন গড়ার শিক্ষা আছে এবং সূরা নিসায় উত্তরাধিকার ও সন্তানাদির ব্যাপারে মাসায়েল রয়েছে। আরও স্মরণ রাখবেন, যে-ঘরের পুরুষরা মহিলাদের দ্বীনি শিক্ষা দেয় না, সেই ঘরের পুরুষ ও মৃত পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

সংযমের জীবন যাপন করো

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য উচিত সংযমের জীবন যাপন করা। কতক লোক এমন হয়, যারা আপন স্ত্রীদের সংকোচে ফেলে রাখে। আসবাবপত্রের মতো ব্যবহার করে। তারা নিজের স্ত্রীদের এমন সংকীর্ণমনা করে রাখে যে, বেচারী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না। এটা উচিত নয়। এমন স্বাধীন করেও ছেড়ে দেবে না যে, গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। আর এমন সংকোচেও ফেলে দেবে না যে, সে অধৈর্য হয়ে মৃত্যু কামনা করে। স্বামীর জন্য উচিত, সে তার সাধ্যানুযায়ী স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে। আমার পরীক্ষিত বিষয় হচ্ছে, মুসলিম পরিবারের মেয়েরা বাবার বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় তার ভবিষ্যৎ ঘরকে সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা নিয়ে বের হয়। তারপর, স্বামী যদি তাকে সঠিকভাবে পরিচলানা করে, তাহলে সে এসে তা আবাদ করতে পারে। আর যদি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে না পারে, তাহলে সেই ঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।

মহিলাদের মধ্যে হুর-গেলমানের গুণ

আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, হুরগণের (বেহেশতি রমণী) কিছু গুণ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো-কোনো সময় পৃথিবীর মহিলাদের মধ্যেও এমন গুণ পরিলক্ষিত হয়।

(১) عُرُبًا তারা স্বামীভক্ত হয়। স্বামীকে অধিক ভালোবাসে। মুসলিম মেয়েরাও বাবার বাড়ির থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় স্বামীর ভালোবাসা হৃদয়ে বদ্ধমূল করে বের হয়। তারা স্বামীর জন্য হৃদয়নিংড়ানো ভালোবাসা দানকারিণী ও আত্মোৎসর্গকারিণী হয়।

(২) قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ তারা পরপুরুষ থেকে নিজের দৃষ্টি হেফাযত করে। মহিলাদের তুলনায় পুরুষের দৃষ্টি অধিক ঘৃণিত হয়। মহিলাদের দৃষ্টি এমন হয় না যে, যাকে দেখবে, তাকে নিয়েই কল্পনা করতে থাকবে। আহ! যদি সে আমার হতো। পুরুষদের জন্য এটা খুবই খারাপ অভ্যাস। তারা যে-মহিলাকে দেখবে– চাই সে কালো হোক কিংবা সাদা , শ্যামলা হোক কিংবা নীল হোক যেরকমই হোক তাকে নিয়ে কল্পনা করতে থাকে, আহ! যদি সে আমার কাছে থাকত, তবে কত মজা হতো।

নিষিদ্ধ ভাবনা থেকে বেঁচে থাকো

তুচ্ছ বিষয়ে নিষিদ্ধ ভাবনা মানুষকে অনেক ক্ষতির সম্মুখিন করে। এর দ্বারা মানুষ সংশয় প্রকৃতির হয়ে যায়। স্মরণ রাখবেন, যত্রতত্র সংশয়ের ব্যাধি যাকে আক্রমণ করেছে তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে গেছে। তার এ সন্দেহ তো এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, কোনো মেয়ে তার আপন ভাইয়ের সঙ্গে হাসিখুশির কথা বললেও সে এদের ব্যাপারে সন্দেহ করতে থাকে। এমন সন্দেহ থেকে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় চাও।

মহব্বতের নাম

সাইয়্যেদা হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর উপনাম ছিল উম্মে আবদুল্লাহ। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নাম ধরেও ডাকতেন না। উপনাম দিয়েও ডাকতেন না। বরং তিনি তাকে আদর করে 'হুমাইরা' বলে ডাকতেন। এতে প্রতীয়মান হয়, স্বামী যদি স্নেহভরে তার স্ত্রীকে কোনো নামে ডাকতে পছন্দ করে এবং স্ত্রীও সেটা পছন্দ করে, তাহলে এটা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার সার্টিফিকেট বলে প্রমাণিত হয়। যদি স্বামী তার স্ত্রীকে এভাবে ডাকতে পারে, তাহলে তারা যেন পরস্পরে ভালোবাসার সুসংবাদ গ্রহণ করে। এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত।

ভুল ধারণা দূর করো

যদি কোনো কারণে কোনো প্রকার ভুল ধারণার সঞ্চার হয়, তাহলে সেই ধারণা যতক্ষণ পর্যন্ত দূরীভূত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি শান্তি পাবে না। একে অপরকে বোঝানো ও রাজি করার জন্য প্রতিবন্ধক কী হয়? কোনো কথায় জেদ করবে না। কোনো সময় যদি স্ত্রী তোমার কোনো কথা না মানে, তাহলে উত্তেজিত হবে না। দেখবে, কিছুক্ষণ পর সে তার ভুল অনুভব করে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবে। তোমার আদেশ পালন করবে। তেমনিভাবে নারীরাও চিন্তা করবে। কোনো সময় তোমার স্বামী তোমার কোনো কথা না শুনলে সঙ্গে-সঙ্গে অভিমান করে ঝগড়া বাঁধাবে না, ধৈর্যের সাথে স্বামীর কাজ করে যাবে। দেখবে, এক সময় সে তোমার আবদারও রক্ষা করবে এবং আগের চেয়ে বেশি ভালোবাসবে।

মিথ্যা থেকে দূরে থাকো

মিথ্যা জীবন যাপন থেকে বেঁচে থাকো। স্বামী যদি তার স্ত্রী থেকে কোনো বিষয় গোপন রাখতে শুরু করে অথবা স্ত্রী যদি তার স্বামী থেকে

কোনো বিষয় গোপন রাখতে শুরু করে, তাহলে জেনে রাখবে, সেই ঘরে ধ্বংস হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। কারণ, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তো সৃষ্টিই করা হয়েছে একে অপরের কাছে খোলা মনে অভিপ্রায় প্রকাশ করার জন্যে। স্বামী সারাদিন দুনিয়াবাসীর নির্যাতন সহ্য করে সন্ধ্যায় ঘরে এসে তার জীবনসঙ্গিনীকে সবকিছু খুলে বলবে। তুমি দেখছ না, সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসে নিজের স্ত্রী খাদিজা (রাযি.)কে বলেছেন,

خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي

'খাদিজা! আমার প্রাণের ভয় হচ্ছে আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত করো। আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত করো। তখন খাদিজা (রাযি.) আগে বেড়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন–

وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

'আল্লাহর শপথ! আপনি আত্মীয়তার বন্ধন সংরক্ষণকারী আপনি অসহায়দের ভরসার স্থল। নিঃস্বদের আহার্যদানকারী, অতিথি অপ্যায়নকারী এবং আপনি ভালো বিষয়ে সাহায্যকারী।'

উত্তম স্ত্রীর পরিচয় এটাই যে, সে তার স্বামীকে বিপদে সান্ত্বনা দেবে। তার চিন্তা দূরীকরণের চেষ্টা করবে। তেমনিভাবে উত্তম স্বামীর পরিচয়ও এটাই যে, সে তার স্ত্রীকে বিপদে সান্ত্বনা দেবে। তার অস্থিরতা দূর করার প্রচেষ্টা চালাবে। অনেক সময় আপনার সান্ত্বনামূলক দুটি মিষ্টি কথা বহু লোকের দুঃখ-বেদনা দূরীকরণের কারণ হয়ে যায়। এমন দুটি মিষ্টি কথায় এ পরিমাণ মিষ্টি হয় যে, সারা দুনিয়ার সমস্ত চিনি একত্র করে এমন মিষ্টতা তৈরি করা যায় না। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

স্ত্রীর সঙ্গে দৌড়প্রতিযোগিতা

একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযি.)কে সঙ্গে নিয়ে কোনো এক জিহাদে গিয়েছিলেন। পথে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য পেছনে থাকেন। হযরত আয়েশা (রাযি.)ও পিছে পড়ে যান। তারপর সবাই কিছু দূরে যাওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কৌতূহলস্বরূপ তাকে বললেন, হুমায়রা! 'চলো দৌড় দেই'। ফলে তাঁরা একসঙ্গে কিছু জায়গা দৌড় দিলেন।

এবার ভেবে দেখুন, আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে কী পরিমাপ ভয় করতেন। তা সত্ত্বেও তিনি আপন স্ত্রীকে দৌড় দিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয়, আপন স্ত্রীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদমূলক আচরণ করা আল্লাহর ভয়ের পরিপন্থী নয়, আল্লাহর মারেফত অর্জনের পথেও প্রতিবন্ধক নয়।

দৌড় দেওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রাযি.)কে আগে যাওয়ার সুযোগ দিলেন। আয়েশা (রাযি.) বিজয়ী হয়ে আনন্দে বাগবাগ হয়ে গেলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন। যথেষ্ট সময় পর আবার বললেন, হুমায়রা! চলো আমরা দৌড় দেই। এবার দৌড় দেওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে চলে গেলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, 'প্রথমে তুমি বিজয়ী হয়েছে; এবার আমি বিজয়ী হয়েছি।'

দৌড় দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো স্ত্রীকে খুশি করা। এটাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। যদি জিজ্ঞাসা করি বলুন, কে-কে এ সুন্নতের ওপর আমল করেছেন, তাহলে খুব অল্প সংখ্যক লোককেই উঠতে দেখা যাবে। মিষ্টি খাওয়ার সুন্নত স্মরণ থাকে। এ মাসআলা খুব গুরুত্ব দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মিষ্টি আগে খাওয়া সুন্নত, নাকি পরে খাওয়া। আমার মন চায়, বলি, ভাই! আগে-পরে যখনই খাও তাতে সমস্যা নেই। তবে স্মরণ রাখবে, যার খাও তার গুণ গাও।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভালোবাসাপূর্ণ সুখের জীবনযাপনের সৌভাগ্য দান করুন। আজ যে-ছেলেদের বিবাহ পড়িয়ে তাদের জীবনসঙ্গিনী বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে আল্লাহপাক সফলতার জীবন দান করুন। আমীন।

ধ্বংসাত্মক সংস্কৃতি

'বিজ্ঞানীদের সামনে যখন এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো যে, মানবমস্তিষ্ক ইনফরমেশন গ্রহণ করে থাকে, তখন তারা এ বিষয়ে প্রচুর শ্রম ব্যয় করল যে, আমাদের উদ্দিষ্ট বিষয় মানুষের মস্তিষ্কে কীভাবে প্রবেশ করানো যায়, যাতে তাদের খবরও না হয়। বিশেষ করে কাফের সম্প্রদায় এ বিষয়ে প্রচুর প্রচেষ্টা চালিয়েছে, যাতে তাদের মানোভাবে মানুষ গড়া যায়। রাত-দিন অবিরাম প্রচেষ্টার পর মিউজিক (গান-বাজনা) নামের ধ্বংসাত্মক হাতিয়ারটা তারা আবিষ্কার করল। মুসলমানদের দীনি প্রেরণাকে কবর দেওয়ার জন্য যেন তারা এ বিয়ষটাকে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসেবে পেয়েছে।'

ধ্বংসাত্মক সংস্কৃতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ.

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

যেমন আবেগ তেমন ধারণা

মহান আল্লাহ মানুষকে অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। এর মধ্যে দুটি নেয়ামত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১. অন্তর ২. বিবেক। অন্তর হচ্ছে ভালোবাসার আধার আর বিবেক হচ্ছে জ্ঞানের ঘাঁটি। অন্তর আবেগের নীড় আর বিবেক কল্পনার ঘর। ভালো-মন্দ সকল আবেগ অন্তরে উদ্ভব হয়। পাপ-পুণ্যের সকল কল্পনা বিবেকে সৃষ্টি হয়। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, যেমন আবেগ তেমন কল্পনা। যদি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার আবেগ অন্তরে বিদ্যমান থাকে, তাহলে চিন্তাধারায়ও একাগ্রতা ও পবিত্রতা থাকবে। সবসময় পবিত্র ধ্যান থাকবে। পুণ্য ও পুণ্যবান লোকদের কল্পনা আসবে। নেক কাজ করার অনুপ্রেরণা অন্তরে উদ্রেক হবে। বরং পুণ্যের কাজে বিজয়ী হওয়ার আগ্রহ থাকবে। পক্ষান্তরে যদি আবেগের মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত প্রাধান্য পায়, তাহলে কল্পনাও ঘৃণ্য হবে। তার মনে শয়তানি, কু-প্রবৃত্তি ও বিনোদনমূলক কল্পনা থাকবে। তারপর তার মধ্যে লোভ-লালসা। কুদৃষ্টি, কুপ্রবৃত্তি ইত্যাদি থাকবে। ফলে সে নিজেই অনুভব করতে পারবে, আমার অনুরাগ পবিত্র নয়। এতে বোঝা যায়, কোনো মানুষের ধ্যানধারণা প্রশংসীয় হলে সে কিছু দিনের মধ্যে প্রশংসার পাত্র হয়ে যায়। পক্ষান্তরে তার মধ্যে খারাপ ধারণা সঞ্চার হলে সে কিছুদিন পর ঘৃণার আধার হয়।

এজন্যই কোনো ভালো মানুষ প্রশংসার পাত্র হতে হলে এক-দুদিনে হয় না। বরং দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। কারণ, মানুষ হিসেবে তার মধ্যে ভালো-মন্দ কল্পনা উদ্ভাসিত হবে। তারপর তার বাহ্যিক কিছু অশোভনীয় বিষয় প্রকাশ পেলেও অন্তর্নিহিতভাবে সে পরিশুদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে। ফলে তার অভ্যন্তরীণ মানবপ্রকৃতি শোধিত হয়ে যায়।

অন্তরের কেন্দ্রীয় শক্তি

মানুষের দেহে অন্তর একটি শক্তির পদমর্যাদা রাখে। নবীজি বলেন–

إِنَّ فِيْ جَسَدِ بَنِيْ آدَمَ لَمُضْغَةٌ إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

'নিশ্চয় আদমসন্তানের দেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে। সেটি সংশোধিত হলে তার সারা দেহ সংশোধন হবে। আর সেটি বিকৃত হলে তার সারা দেহ বিকৃত হয়ে যাবে। জেনে রাখো সেটি হচ্ছে মানুষের অন্তর।'

ভালোবাসার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। তাই আম্বিয়ায়ে কেরাম পৃথিবীতে এসে মানুষের অন্তরকে নিজের কর্মস্থল বানিয়েছিলেন। কেননা, অন্তর সংশোধন হলে বাকি অঙ্গ এমনিতেই সংশোধন হয়ে যাবে।

বিবেকের গুরুত্ব

বিবেক বা মস্তিষ্ক সম্পর্কে ভালো করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। এটা কিছু জটিল বিষয়। এ-মাহফিলে কিছু শিক্ষিত লোক আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। তাই বিষয়টি একটু খুলে বলতে চেয়েছি। হাদীছ শরীফে এসেছে–

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ

'আল্লাহপাক সর্বপ্রথম বিবেক সৃষ্টি করেছেন।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَذِكْرٰى لِأُولِي الْأَلْبَابِ

'নিশ্চয় এতে রয়েছে বিবেকবানদের জন্য উপদেশবাণী।'

أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

'তোমরা কি বিবেক রাখ না?

অর্থাৎ– তোমাদের কী বিবেক নেই?

একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কবরে প্রশ্ন করার জন্য মুনকার নাকীর আসবে। হযরত ওমর (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেখানে আমাদের বিবেক সুস্থ থাকবে কি-না? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ; বিবেক সুস্থ থাকবে। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, তাহলে কোনো চিন্তা নেই।

বিবেক কী বস্তু?

বিবেক কী জিনিস? বিবেক চিন্তা করার একটা মেশিন। কম্পিউটারে যেমন গণিত প্রসেসিং দেওয়া থাকলে প্রোগ্রামে কোনো প্রকার Equation সমস্যা হলে তার দিকে প্রেরণ করে এবং সেটা Equation কে সংশোধন করে পুনরায় পাঠিয়ে দেয়, তেমনিভাবে যদি তোমার বিবেককে কোন ধারণা দাও, তাহলে সে এ-ধারনার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সব মিলিয়ে দেবে। এই ধারণার পথে পাহারা বসানো তোমার দায়িত্ব। এভাবে মুমিন বান্দা নিজের বিবেকের ওপর অন্তরের পাহারা বসায়। ভালো ধারণা হলে বিবেক যেতে পারে। আর খারাপ ধারণা হলে অন্তর সেটা ছাটাই করে দেয়।

ধারণার স্বয়ংক্রীয় নীতিমালা

আল্লাহপাক ধারণার এমন কিছু নীতিমালা দিয়েছেন, যা স্বয়ংক্রীয়ভাবে মানুষের মস্তিষ্কে আসতে থাকে। এটি আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নীতিমালা। এতে মনুষ্যত্বের অনেক কল্যাণ বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ দেখুন–

মনে করুন, আপনি সবজি কেনার জন্য ঘর থেকে বের হলেন। পথে আপনার স্কুল যামানার এক সাথীর সঙ্গে বিশ বছর পর হঠাৎ সাক্ষাৎ হলো। আপনি তাকে পেয়ে অনেক আনন্দিত। তার সঙ্গে গল্প করতে শুরু করলেন। বাজারে গিয়ে সবজি কেনার কথা একেবারে ভুলে গেলেন। আলোচনার মাঝে তোমার সহসা সবজি কেনার কথা স্মরণ হলো। আমার সবজি ক্রয়ের কথা তোমার স্মরণ না হতো, তাহলে ঘন্টার পর ঘন্টা তোমার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে। চা, পান ইত্যাদি আহার করতে। সন্ধ্যায় বাড়িতে এলে মনে পড়ত, ওহ! আমি সবজি কেনার জন্য গিয়েছিলাম। এটা আমি কী করলাম। তাই গল্পের মাঝখানে স্মরণ হয়ে যাওয়া এটা ধারণার স্বয়ংক্রীয় নীতি। মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহপাক একে স্বয়ংক্রীয় করে দিয়েছেন, যার দরুন বিবেক বারবার এর সিগন্যাল দেয়।

যেমনভাবে ভালো কল্পনা আসে, তেমনিভাবে খারাপ কল্পনাও আসে। পবিত্র শরীয়ত খুব সুন্দর একটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, মন্দ কাজের কল্পনার উদ্রেক হওয়া মন্দ নয়। কারণ, সে তাতে পাকড়াও হয়নি। বরং সেই কল্পনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করা, অন্তরে বদ্ধমূল করা, তার বশীভূত হওয়া দূষণীয়।

সুতরাং আমাদের উচিত, ভালো কল্পনাকে বিবেকে সায় দেওয়া এবং মন্দ ধারণাকে পরিহার করা। এর একটি দৃষ্টান্তবুঝে নাও। যেমন– কোনো চৌমুহনীতে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কোনো দিক থেকে ট্রাক আসছে। কোনো দিক থেকে কার আসছে। কোনো দিক থেকে টাঙ্গা গাড়ি আসছে। কিন্তু ট্রাফিক সবগুলো নিয়ন্ত্রণ করে ছাড়ছে, যাতে রাস্তায় যানজট না লাগে। তার আসল দায়িত্ব তো এটাই যথেষ্ট ছিল যে, দাঁড়িয়ে থাকো। হাইওয়ে রাস্তা খালি রাখো। এ রাস্তায় যারা আসবে, তাদের নির্বিঘ্নে যেতে দাও। কিন্তু না; সে নিয়ন্ত্রণ করে ছাড়ে। কারণ, অকারণে ট্রাফিক জ্যাম লেগে যায়। তার পোশাক বা পরিচয়পত্র খুলে নেওয়া হবে। ভাই! মুমিন বান্দাদের বিবেক চৌরাস্তার মতো। সেখানে ভালো-মন্দ সকল প্রকার খেয়াল আসবেই। কখনও ভালো কল্পনার বাস আসবে। কখনও খারাপ ধারণার গাধার গাড়ি আসবে। মুমিনের জন্য উচিত, খারাপ ধারণা এলে সেটা ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও। পক্ষান্তরে যদি খারাপ ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়ে রাজপথে যানজট সৃষ্টি কর, তাহলে এর জন্য ধরাশায়ী হবে।

বিবেকের তেজস্বীত

বিবেকের কারণে মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টিজীব হতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে। যেমন–

(১) বাহ্যিকভাবে দেখতে হাতি মানুষের চেয়ে অনেক শক্তিশালী । কিন্তু মানুষ নিজের বিবেকের দ্বারা হাতিকে তার অধীন বানিয়ে নেয়।

(২) বাঘ ও সিংহ সাহসিকতা, বীরত্ব ও শক্তিতে মানুষের উর্ধ্বে। কিন্তু বিবেকের চাতুরিতে মানুষ বাঘের গলায় লাগাম পরিয়ে দেয়।

(৩) বিবেকের দ্বারা মানুষ বাতাসে উড়তে শিখেছে। নতুবা কোথায় পাখি আর কোথায় মানুষ। পাখি তো আকাশে উড়তে নড়াচড়া করে; কিন্তু মানুষের বিবেক দ্বারা তৈরি উড়োজাহাজ নড়াচড়া করতেও দেখা যায় না। বাতাসে সাঁতার কাটা বস্তুর মতো উড়োজাহাজ চলতে থাকে। এর মধ্যে কাপড় ধোলাই করলে তার ঝাঁকিও অনুভব হয় না। এটা বিবেকের তেজস্বিতা।

(৪) এই বিবেকের কারণে মানুষ সমুদ্রের তল পর্যন্ত পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুযায়ী ভূখণ্ডের যত প্রকার আশ্চর্য বস্তু রয়েছে। এর চেয়ে অনেক বিস্ময়কর বস্তু সমুদ্রের নিচে রয়েছে। সমুদ্রে যাওয়ার কারও সৌভাগ্য হলে দেখতে পাবে, সেখানে এক অদ্ভূত জগৎ রয়েছে। সুতরাং এই বিবেকই মানুষকে পৃথিবীর মৌলিক ভূ-গর্বস্থ নেয়ামতরাজি প্রদান করেছে। এই দিকে পৃথিবীর সবকিছু অনুধাবন করার যোগ্যতা রাখে। আল্লাহপাক বলেন–

سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

'আসমান জমিনের সবকিছু আমি তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি।'[১৮৭]

এর উদ্দেশ্য কী? অর্থাৎ সবকিছু বোঝার যোগ্যতা তোমাদের দান করেছি।

(৫) বনের রাজা সিংহ। সে গোশত খায়। সবচেয়ে বড় প্রাণী হাতি। সে তৃণলতা খায়। সিংহ গোশত খায়। তবে আজ পর্যন্ত কোনো দিন ভুনা করে খায়নি; বরং কাঁচা খায়। লবণ-মরিচেরও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষকে দেখো মাশাআল্লাহ তারা গোশত খায় তো শিক-কাবাব করতে হয়। রোষ্ট, সোপ, কিমা, সবজি, গোশত এক সঙ্গে পাকিয়ে দিতে হয়। তারপরও অনেক সময় সুস্বাদু হয় না। রান্না খারাপ হয়েছে ইত্যাদি দোষ বের করতে থাকে।

আফগানিস্তানের লোকেরা প্রাণী জবাই করে তার ভেতর থেকে ময়লা পরিষ্কার করে। পরিমাণমতো মসলা দিয়ে আবার চামড়ায় প্যাঁচিয়ে অঙ্গারের মধ্যে রাখে। তারপর হয়ত আঙ্গারসহ মাটি চাপা দেয় নতুবা চুলার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহর কুদরত! এই আস্ত প্রাণীর গোশতের কোনায়-কোনায় মাসলা পৌঁছে যায় এবং খুব সেদ্ধ হয়। ফলে তারা নিজের হাত দ্বারাই গোশত ছিঁড়ে স্বাদ করে খায়। আমি একবার এক দাওয়াত অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখলাম, মেজবান একটি গাভি জবাই করে ভেতরে ময়লা পরিষ্কার করে মসলা-টসলা দিয়ে আবার চামড়া দ্বারা প্যাঁচিয়ে নিয়েছে। তারপর বড় চুলার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। সেখানে আস্ত গাভিটা পূর্ণরূপে পাক হয়ে যাওয়ার পর আস্তই বের করল। তারপর মোটা বাঁশ বেঁধে তাতে আস্ত গাভিটা লটকিয়ে দিল। এখন লোকজন গিয়ে প্রত্যেকের ইচ্ছানুযায়ী গোশত খুলছে আর খাচ্ছে। আল্লাহু আকবার! এত বড় আস্ত গাভি একবারে পাকানো এটা একমাত্র মানুষের বিবেকের কৃতিত্ব।

---

১৮৭. সূরা লুকমান : আয়াত ২০

(৬) বিবেকের দ্বারা মানুষ নতুন-নতুন গবেষণা করে। পরিশেষে বারো মসলা তৈরি করে। কি চাটনি কি সস; তার নাম আচার। এগুলো সহ আরও কত কিছু দিয়ে গোশত খেতে হয়। কিন্তু বাঘ-সিংহ? তারা চাটনি, আচার কি চিনে? এগুলোর নাম তো তাদের বাবারাও শোনেনি।

মানবজ্ঞান ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনেক দূর চলে গেছে। বিশেষজ্ঞরা মানুষের বিবেক আয়ত্ত করার জন্য দিন-রাত এ কাজ করছে। এতে মানুষের বিবেক সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ শিক্ষা দেওয়া হয়, যেগুলো পড়তে ছাত্ররা অনেক পরিশ্রান্ত হয়ে যায়।

মানুষের বিবেক সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা দিলাম, যাতে আপনারাও বুঝতে পারেন, আল্লাহর তা'আলা বিবেক নামে আমাদের কত মহৎ নেয়ামত দান করেছেন।

আমাদের দেহের প্রকৃতি ভিন্ন এবং বিবেকের প্রকৃতি ভিন্ন। দৈহিক প্রকৃতি বিকৃত হলে তা নিজেই পুনরায় সংশোধন হওয়ার যোগ্যতা রাখে। ফলে সে আবার নিজেই নিজেই কাজ করতে পারে। কিন্তু বিবেকের প্রকৃতি Demage হলে তা নিজে নিজে সংশোধন হতে পারে না। তাই সে কাজ করা ছেড়ে দেয়।

দেহের প্রকৃতির আহার্য প্রোটিন। বিবেকের প্রকৃতির আহার্য হচ্ছে কার্বোইড্রেট্স।

মহিলারা অনেক সময় গুলগুলা তৈরি করে। সেটা খুবই কোমল হয়। গুলগুলা যেমন কোমল হয়, তেমনি বিবেকের প্রকৃতিও কোমল হয়ে চামড়া মগজের সবগুলো কোষ পরিবেষ্টন করে রাখে। চামড়া না থাকলে মগজের কোষগুলো বিস্তীর্ণ হয়ে যাবে। সেখানে মস্তিষ্কের মিলিয়ন-বিলিয়ন কণা একত্রিত থাকে।

মানবমস্তিকের উপরিভাগে মস্তিষ্কের অনেক ভাঁজ রয়েছে। নানাযের দীর্ঘ কার্পেট যেভাবে ভাঁজ করে সামান্য জায়গা রাখা যায়, তেমনিভাবে মস্তিষ্কের দীর্ঘ পরিসর ভাঁজ করে সামান্য জায়গায় সংকুলান করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা মানুষের Memory (স্মৃতিপট)কে বৃদ্ধিকরণে উন্মুক্ত জায়গা দেওয়ার জন্য ভাঁজ-ভাঁজ করে সেই মস্তিষ্কের সামান্য জায়গায় গুটিয়ে রেখেছেন। কেননা, চিন্তা-গবেষণা এবং স্মৃতিপটের কর্ম সম্পাদনের জন্য

বিরাট সমতল জায়গার প্রয়োজন হয়। আমার ধারণা, যদি মস্তিষ্কেকর প্রয়োজনমতো সমতল জায়গা দেওয়া হতো, তাহলে মানুষের মাথা কোনো-কোনো সময় মটকার চেয়েও বড় হয়ে যেত। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভাঁজ-ভাঁজ করে স্বল্প পরিসরে গুটিয়ে রেখেছেন। ফলে তার এক ভাঁজ আসে, আরেক ভাঁজ যায়। এভাবে সমস্ত মস্তিষ্কের কর্মধারাও জারি রেখেছেন এবং তার পরিসরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

এবার মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের আলোচনা শুনুন, তার কোন অংশ কোন অঙ্গের সাথে সম্পর্ক রাখে। উদাহরণস্বরুপ মানুষের স্মৃতিপটের সম্পর্ক মস্তিষ্কের পেছনের অংশের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এজন্যই মাথার পেছন দিকে বড় আঘাত হলে বা কেউ জোরে থাপ্পর দিলে অথবা লঠি দ্বারা প্রহার করলে ওই লোকের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়। চোখ অবিকল সুস্থ দেখায় কিন্তু দৃষ্টিশক্তি চলে যায়।

আমাদের ডান পার্শ্বের কন্ট্রোল বাম পার্শ্বের মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে আর বাম পার্শ্বের কন্ট্রোল ডান পার্শ্বের মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। আল্লাহর কুদরত! কারও বাম পার্শ্বে প্যারালাইসিস হলে তার ডান পার্শ্বের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়।

মানুষের চিন্তা-গবেষণার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মাথার সামনের দিক। যেহেতু সমস্ত কল্পনা এখান থেকে সৃষ্টি হয়, তাই আল্লাহ্ তা'আলা সেজদার মধ্যে আমাদের সেই অংশ নত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার! সকল কল্পনার কেন্দ্রবিন্দুকে আল্লাহর সামনে নত করো। অর্থাৎ– হে আল্লাহ! আমার সমস্ত চিন্তা, গবেষণা, কল্পনা তোমার পায়ের নিচে উৎসর্গ করলাম।

মানুষের দৈহিক গঠন কাঠামোর মতো তার মস্তিষ্কের ওপর গঠন কাঠামো থাকে। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো মস্তিষ্কের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি থাকে না। যেমন– মনে করুন বাহ্যিক হাত পা ইত্যাদির মতো মস্তিষ্কেরও হাত-পা ইত্যাদি থাকে। কিন্তু হাত-পায়ের মতো না নয়। সেগুলো ছোট-ছোট হয়ে থাকে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, মানুষের জিহ্বা অনেক লম্বা থাকে। কারণ কী? কারণ হলো, যে অঙ্গ কন্ট্রল করার জন্য যত বড় সিগন্যাল বাজানোর প্রয়োজন হয়, তার এরিয়াটা তত বড় দেওয়া হয়। আর দেখুন, হাত নাড়াচাড়া করার জন্য এত বড় এরিয়া দরকার হয় না। কিন্তু মুখ– মানুষ যখন কথা বলতে শুরু করে, তখন টরটর করে শুধু বলতেই থাকে। যখন

অতি দ্রুত কথা বের হতে থাকে, তখন তার জিহ্বা প্রায় ২৬টি জায়গার সঙ্গে ঘর্ষণ লাগে।

বর্তমানে মস্তিষ্কের অপারেশন খুব সফলতার সাথে করা হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে এমন সূক্ষ্ম অংশ যে তাতে স্পর্শ করলে সেটা বিকৃত হয়ে যায়। কিন্তু বর্তমান যুগে মানুষ সার্জারির মাধ্যমে মস্তিষ্কের অপারেশন করতে সক্ষম হয়েছে। এই অপারেশনের মাধ্যমে মস্তিষ্কের টিউমার, ব্যথা ইত্যাদি দূর করা হয়। কারও মাথায় কাঁপুনি হলে অপারেশন করে সেই মস্তিষ্ক পাল্টিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তার কাঁপুনি রোগ সেরে যায়।

মস্তিষ্কে ইনফরমেশন (সংবাদ) দেওয়া যায় কীভাবে

বর্তমান যুগে মস্তিষ্ক নিয়ে অনেক রিচার্জ হচ্ছে। তবে আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে, এ সমস্ত রিচার্জের উপকারিতা বিধর্মীরা ভোগ করছে। এটি একটি জ্ঞানগত বিষয়। কারও কাছে বিষয়টি কঠিন অনুভব হতে পারে। কিন্তু যারা শিক্ষিত, তারা এ বিষয়ের সূক্ষ্মতা উপলব্ধি করলে অবাক হয়ে স্বীকার করবেন যে, আসলে বিষয়টা এরকমই।

মানুষের মস্তিষ্কে ইনফরমেশন দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এর দৃষ্টান্ত কম্পিউটারের মতো মনে করো। কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রকার ইনপিট থাকে। কীবোর্ড, মাউস ইত্যাদির মাধ্যমে কম্পিউটারে ইনফরমেশন দেওয়া হয়। তা ছাড়া দুই কম্পিউটরের সংযোগ স্থাপন করলে একটা থেকে আরেকটায় ইনফরমেশন বা সংবাদ দেওয়া যায়। মেশিন যদি লেংগুয়েজ কার্ডের মাধ্যমে ভাষায় প্রকাশ করে, তাহলে সেই কার্ড বের করে নিলে ইনফরমেশন চলে যায়। হার্ডডিস্কও একই রকম। কিন্তু তার মধ্যে ইনফরমেশন দেওয়ার পদ্ধতি ভিন্ন। তেমনিভাবে মানুষের মস্তিষ্কে ইরফরমেশন দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন– আমরা যা কিছু দেখি, সেই দেখার মাধ্যমে মস্তিষ্কে ইনফরমেশন চলে যায়। যা শুনি তা শোনার মাধ্যমে, যা কল্পনা করি, তার ইনফরমেশন কল্পনার মাধ্যমে মস্তিষ্কে যায়। এমনিভাবে যা স্পর্শ করে অনুভব করি, তার ইনফরমেশন স্পর্শের মাধ্যমে মস্তিষ্কে যায়।

এখন শুনুন, কিছু ইনফরমেশন আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করি আর কিছু ইনফরমেশন অনিচ্ছাবশতও আমরা পেয়ে থাকি।

যেমন–

(১) মনে করুন, আপনি ভ্রমণে যাচ্ছেন। রাস্তায় একটা সাইনবোর্ড দেখলেন, লাহোরের দুরত্ব ৫০০ কিলোমিটার। ততটুকু পড়ে আপনি অনেক দূরে চলে গেলেন। শুধু দূরত্ব জানার জন্য আপনি সেটা পড়লেন। কিন্তু এর সাথে-সাথে আরও অনেক বিষয়ের ইনফরমেশন আপনার মস্তিষ্কে চলে এসেছে। এটা কীভাবে? দেখুন, আপনি সেখান থেকে দুই কিলোমিটার দূরে চলে যাওয়া পর কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি সাইনবোর্ড কোথায় দেখেছেন? বললেন, দুই কিলোমিটার আগে। জিজ্ঞাসা করল, তার সাইজ কেমন ছিল? আপনি একটু চিন্তা করে বললেন, ৪"+৮" হবে। লেখাটার রং কী ধরনের ছিল? নীল। সেটা কতটুকু ওপরে লাগানো হয়েছে? ৮-১০ ফুট। দেখুন, আপনি শুধু দূরত্ব জানার জন্য পড়েছিলেন। কিন্তু সাথে-সাথে আরও কত বিষয়ের ইনফরমেশন আপনার মস্তিষ্ক এমনিতেই গ্রহণ করে নিয়েছে।

(২) মনে করুন, আপনি আপনার ঘোড়াটি তার ঘরে বাঁধতে নিলেন। কিন্তু ঘোড়ার ওপরে বসা মাছিগুলো সেই ঘরে প্রবেশ করল। এমনিভাবে মানুষ যখন কোনো জ্ঞাত বিষয় উপলব্ধি করতে চায়, তখন অজ্ঞাতসারে আরও অনেক বিষয় নিজে নিজেই প্রবেশ করে। বোঝা যায়, অজ্ঞাতসারে অন্যান্য বিষয়গুলো বল প্রয়োগে আসন পেতে বসতে যায়। এরূপ অজ্ঞাতসারে প্রবেশকারী বিষয়সমূহ অনেক সময় ক্ষতিকর হিসেবে প্রমাণিত হয় এবং সেগুলো মানুষের মস্তিষ্কে অনেক প্রভাব বিস্তার করে।

বিজ্ঞান একথা প্রমাণিত করছে যে, শিশু মায়ের গর্ভে সপ্তম মাসে পদার্পণ করার সাথে-সাথে তার মস্তিষ্কে ইনফরমেশন প্রবেশ করতে থাকে। শিশু এখনও ভূমিষ্ট হয়নি; অথচ তার মা যা কিছু কল্পনা করে, যা কিছু দেখে, যা কিছু বলে, তার মস্তিষ্কে এর প্রভাব বিস্তার হতে থাকে। একথাটি আমাদের ওলামায়ে কেরাম আরও শত-শত বছর আগে বলেছেন যে, স্বামীর দায়িত্ব হলো, তার গর্ভবতী স্ত্রীকে বিষণ্নতা থেকে মুক্ত রাখা। তার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখবে। সম্ভাব্য সবকিছু করার চেষ্টা করবে, যাতে সে চিন্তিত না হয়। কারণ, গর্ভবতী মহিলা মানসিক হতাশায় থাকলে সেই অস্থিরতার প্রভাব গর্ভস্থ শিশুর মস্তিষ্কেও প্রবেশ করে।

মানুষ বলে থাকে, মায়ের কোল সন্তানের প্রথম পাঠশালা। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, না মায়ের কোল নয় বরং মায়ের পেট সন্তানের প্রথম পাঠশালা। কারণ, আমদের ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, গর্ভবতী অবস্থায় মা

হারাম খাওয়া, গোনাহের কাজ করা ইত্যাদি কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। কেননা, এমতাবস্থায় মা যে আমল করবে, সন্তানের ওপর তার প্রভাব পড়বে। সুতরাং মায়ের চিন্তাভাবনা পুণ্যময় হলে এর প্রভাব শিশুর মধ্যে পড়বে। সেই শিশু সৎ ও ভদ্র হবে।

শরীয়ত বলে, শিশু ছোট হলেও তার সামনে যেন মাতাপিতা যৌনাচার না করে। কারণ, সে ছোট হওয়ার কারণে যদিও বোঝে না। তবে দেখার কারণে এর প্রভাব তার মস্তিষ্কে আশ্রয় নেয়। যখন সে বড় হবে তখন এ বিষয়ের Analysis (বিশ্লেষণ) স্বয়ংক্রীয়ভাবে তার মধ্যে আসতে থাকবে। এতে বোঝা যায়, শরীয়ত যেন আপনাকে-আমাকে আত্মসম্ভ্রমবোধ শিক্ষা দিচ্ছে। সে তোমরা স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময় ছোট শিশু থেকেও পর্দা কর। বর্তমানে ছোট শিশুদের সামনে আমোদ-প্রমোদে মানুষ বিষয়টার প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না। তারা আরও বলে, এ তো অবুঝ শিশু; এতে কী হলো। ভাই! সে যদিও কিছু বলতে না পারে, তবে দেখছে তো। সুতরাং এই দেখার প্রভাব তার মস্তিষ্কে ইনফরমেশন দেবে এবং বড় হলে তার বিকাশ ঘটবে। তাই এ-ধরনের শিশু ভবিষ্যতে নির্লজ্জ হয়ে থাকে। কারণ, মা-বাবা শিশুকালেই তার লজ্জাকে গলা টিপে হত্যা করেছে। অবশেষ ওই মাতাপিতা নিজের মাথায় হাত মেরে কাঁদে। হায়! আমার মেয়েটা এ কাজ করতে পারল! আমার ছেলেটা বংশের পায়ে কুড়াল মারল! মেয়ের এ অবস্থা দেখার আগে আমার মরণ হলো না কেন? ভাই! ওই ছেলেমেয়েরা এখন তোমার কান কাটেনি; বরং অনেক আগে তুমি নিজেই নিজের কান কেটেছিলে। নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরেছিলে। শিশু অবস্থায় তার সামনে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়েছিলে। এতে তুমি শরীয়তের ওপর আঘাত করেছিলে। সেই আঘাতের বদলা এখন তোমার পেতেই হবে।

মিউজিক (গান-বার্জনা) কাফেরদের ধ্বংসাত্মক হাতিয়ার

বিজ্ঞানীদের সামনে যখন এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো যে, মানবমস্তিষ্ক ইনফরমেশন গ্রহণ করে থাকে, তখন তারা এ বিষয়ে প্রচুর শ্রম ব্যয় করল যে, আমাদের উদ্দিষ্ট বিষয় মানুষের মস্তিষ্কে কীভাবে প্রবেশ করানো যায়, যাতে তাদের খবরও না হয়। বিশেষ করে কাফের সম্প্রদায় এ বিষয়ে প্রচুর প্রচেষ্টা চালিয়েছে, যাতে তাদের মানোভাবে মানুষ গড়া যায়। রাত-দিন অবিরাম প্রচেষ্টার পর মিউজিক (গান-বাজনা) নামের ধ্বংসাত্মক হাতিয়ারটা তারা আবিষ্কার করল। মুসলমানদের দীনি প্রেরণাকে কবর দেওয়ার জন্য যেন তারা এ বিয়ষটাকে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসেবে পেয়েছে। গান-

বাজনা শোনার সময় কী হয়? গান-বাজনার আওয়াজ শুনলে সেই আকর্ষণ মানুষের মস্তিষ্কে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের মতো দ্রুত সঞ্চারিত হয়। একে কম্পিউটারে ইলেকট্রিক্যাল টেলিগ্রাফের আকৃতিতে দেখা যায়। সুতরাং বর্তমানে যেসমস্ত অনুষ্ঠান হয়, সেগুলোকে সিডি বা ক্যাসেট করে কম্পিউটারের মাধ্যমে সারেন্দার সুরের মতো দেখানো হয়। আসলে তো সেটা গানই। কিন্তু কম্পিউটারে এটাকে চিত্তাকর্ষণ সুরের মতো দেখায় এবং সেই ক্যাসেটে যেখানে-যেখানে মাইকের গুনগুন শব্দ বা কারও বাঁশির আওয়াজ থাকে, সেগুলোও দেখা যায়। ফলে কম্পিউটারের মাধ্যমে এ সমস্ত বিঘ্নকর বিষয় মুছে দেওয়া হয়। যখন এগুলো মুছে দেওয়া হয়, তখন তার আওয়াজ খুবই সুমধুর হয়। এবার শ্রোতারা বলতে থাকে,আহ! কী মধুর কণ্ঠ। এর চেয়ে সুন্দর কণ্ঠস্বর আর হতে পারে না। এর আওয়াজ এবার বাড়ানো-কমানো যায়।

আপনারা শুনে অবাক হবেন, আমি একটি মেশিন দেখেছি। সেই মেশিন উপস্থিত করে আমাকে বলল, জনাব আপনি কিছু বলুন। ফলে আমি সামান্য আলোচনা করলাম। কিছুক্ষণ পর সে তার এ্যাডজাস্টমেন্ট পরিবর্তন করে আমাকে বলল, জনাব এবার আপনার কথা শুনুন। আস্তাগফিরুল্লাহ! আমি শুনে হতবাক। আমি যা বলেছি, তা-ই শোনা যাচ্ছে; কিন্তু কণ্ঠস্বর অবিকল মহিলার কণ্ঠের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছে, যেন কোনো মহিলা কথা বলছে।

বাক্যধ্বনি বা গলার আওয়াজ কম্পিউটারের জন্য বাম হাতের খেলনা। আপনি যেকোনো লোকের আওয়াজ রেকর্ড করে কম্পিউটারে প্রবেশ করালে কম্পিউটার এটা নির্ণয় করে নেবে যে, তার বর্ণ উচ্চারণ বা বাচনভঙ্গি কীরূপ। এভাবে যখন কম্পিউটার কারও শব্দধ্বনি জানতে পারে, তখন সে যেকোনো শব্দ ওই কণ্ঠে প্রকাশ করতে পারে। একটি কথা আপনি বলেননি। কিন্তু আপনার পূর্ণ আলোচনা সেই কথার সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে। আপনি বুঝতেও পারবেন না, এটা আপনার কথা নয়।

এবার তাদের ইচ্ছাধীন শব্দ আপনার কণ্ঠে প্রকাশ করবে। এজন্যই টেলিফোনে কথা বলার সময় কম্পিউটার কোনো-কোনো লোকের কথা হুবহু পুনরাবৃত্তি করে। এটা কেন হয়? কারণ, তারা ওই লোকের কথা কম্পিউটারে রেকর্ড করে রেখেছে। সুতরাং যখনই কথা বলবে, ওই কণ্ঠ ভেসে আসবে। তাই কিছু-কিছু লোকের প্রতি মানুষের নজরদারি রয়েছে। এদের কণ্ঠে তারা কম্পিউটারে রেকর্ড করে রেখেছে। তখন ওই লোক পৃথিবীর যে কোথাও

কথা বলবে, অটোমেটিক তার কণ্ঠ ভেসে উঠবে। কম্পিউটার তার আওয়াজ পরিচয় করে নেবে এবং সেটা রেকর্ড করতে থাকবে।

যেভাবে আমাদের আওয়াজ কম্পিউটারে প্রবেশ করে বিদ্যুদ্গতিতে তার কণ্ঠ পাল্টিয়ে দেয়, তেমনিভাবে গান-বাজনা বিদ্যুতাকারে মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনা পাল্টিয়ে দেয়। সুতরাং যদি স্ক্রীনে (টিভি ইত্যাদির পর্দায়) দেখা হয়, তাহলে আরও আকর্ষণীয় হয়ে সেটা যেন আত্মবিনাশীরূপে পরিণত হয়। স্মরণ রাখবেন, বর্তমান সংস্কৃতিতে এক-দুই প্রকারের বাজনা ব্যবহৃত হয় না; বরং কত ধরনের বাদ্যযন্ত্র যে ব্যবহার হয়, তার সীমা নেই। পি. এই.ডি বিশেষজ্ঞরা কম্পিউটারে বসে তার ফর্মুলা তৈরি করে এবং গানের সঙ্গে সেটা ঢুকিয়ে দেয়। সেই ফর্মুলাকে ইনগোরটম বলে। সাইন্স বিভাগের শিক্ষিত লোক বিষয়টি সহজে বুঝতে পারে। ইনগোরটম পরিচালনার সময় তার আওয়াজ কম-বেশি হতে থাকে।

এবার শুনুন, যা আজ আমি বলতে চেয়েছিলাম। সংস্কৃতি যখন স্ক্রীনের ওপর তরঙ্গের মতো ভেসে আসতে শুরু করে, তখন তারা ভাবল, এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাবনা মানুষের মস্তিষ্কে কীভাবে প্রবেশ করাতে পারি। তারা যেন ঘোড়ার ওপর মাছি বসিয়ে দিচ্ছে। কেননা, ঘোড়ার জন্য তো দরজা খোলা হবে। তখন আমাদের মাছিগুলো অনায়াসে প্রবেশ করবে। ভাই! যুবকরা তো গান শোনার জন্য বসে। কিন্তু তারা উপলব্ধিও করতে পারে না, এর মাধ্যমে অজ্ঞতাসারে কী-কী বিষয় তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে। উপস্থিত তো সে ওই বিষয় সম্পর্কে কিছুই টের পায় না। সে তো বুঝছেই না। কিন্তু তার মস্তিষ্ক যেমন সংবাদ পাচ্ছে সেই রকম হতে শুরু করছে। এই সংবাদকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে Back Track বলে। শ্রোতারা তো গান শুনছে। কিন্তু Back Track তাকে আরও অনেক জিনিসের সংবাদ দিচ্ছে। আচ্ছা! এবার শুনুন, এই Back Track এর কিছু পরীক্ষিত বিষয়। তারা প্রকাশ করছে–

(১) একটা গান তারা সংকলন করেছে এবং এর Back Track তে এই প্রোগ্রাম ঢুকিয়েছে–

Hate your mom – মাকে ঘৃণা করো।

Hate your mom – মাকে ঘৃণা করো।

Hate your mom – মাকে ঘৃণা করো।

বিষয়টি তারা বারবার পরীক্ষা করে দেখেছে, যারা এই গান শোনে তারা তাদের মাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। কেননা, গানভক্তরা গান শুনে যদি সেটা তার ভালো লাগে, তাহলে সেই গান বারবার শুনতে থাকে। ঘরে, বাইরে, চলতে, ফিরতে, গাড়িতে, বাড়িতে, টেপ, রেড়িও, সি.ডি, ভি.সি.ডি ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বদা শুনতে থাকে। ওয়াকমেন সর্বদা তার কানে লাগানো থাকে। এভাবে শতবার সেই গান শোনে এবং এর অকল্যাণ তার মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হতে থাকে।

(২) যখন তারা হাজারো লোকের মধ্যে এর বাস্তব প্রমাণ পেল, তখন সামনে অগ্রসর হলো। এবার দ্বিতীয় টেস্ট করল। একটি হিট গান সংকলন করল। তারপর এর মধ্যে Back Track তে আরেকটি প্রোগাম ঢোকাল–

Kill your dad – বাবাকে হত্যা করো।

Kill your dad – বাবাকে হত্যা করো।

Kill your dad – বাবাকে হত্যা করো।

এই গানের ধারা তারা পরীক্ষা করে পেয়েছে, অনেক যুবক তার পিতাকে হত্যা করেছে এবং অনেক যুবক ডাক্তারকে সংবাদ দিচ্ছে, আমার অন্তরে আমার বাবাবে হত্যা করার ইচ্ছা জাগছে।

(৩) দ্বিতীয় ধাপেও তারা সফল হওয়ার পর আরও অনেক কিছু করল। এদিকে কাফেরদের অন্তরে উদ্রেক হচ্ছে, এই প্রোগ্রাম যেহেতু সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে; সুতরাং এর মাধ্যমে আমাদের প্রচারণা করা দরকার। তাই তারা আরেকটা গান আবিষ্কার করে এর Back Track তে এই প্রোগ্রাম ঢুকিয়েছে–

There is no God – খোদা নেই।

There is no God – খোদা নেই।

There is no God – খোদা নেই।

এবার এই গান শুনে অসংখ্য মানুষ ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং মনে ধর্মের প্রতি অন্তরে ঘৃণার সঞ্চার হলো।

(৫) তারপর আরেকটা গানের Back Track তে তারা প্রোগ্রাম দিল–

Worshi the devil – শয়তানের পূজা করো।

Worshi the devil – শয়তানের পূজা করো।

Worshi the devil – শয়তানের পূজা করো।

(৫) আরেকটা গান আছে। আমি তার শিল্পীর নাম নিতে চাচ্ছি না। এই মসজিদের বসে সেই অপদার্থের নাম নেওয়া উচিত নয়। তবে তার কণ্ঠস্বর সারা দুনিয়া পছন্দ করত। সেই গানের Back Track তে এই প্রোগ্রাম দেওয়া দেশে হয়ত আপনারা সেই দেশের নাম শুনে থাকবেন। যুবকদের একটা দল নিজেদের 'শয়তান' বলে উল্লাস করত। তারা স্পষ্ট বলত, আমরা শয়তান।

তারপর তারা যখন বুঝতে পারল, আমাদের সংবাদ অতি সহজে অন্যের মস্তিষ্কে স্থান পাচ্ছে এবং আমাদের দাবি তারা গ্রহণ করছে। তখন এ কাজ তাদের জন্য সহজ হয় গেল যে, এবার গোটা পৃথিবীর মানুষের ভাবনা আমাদের ভাবনা অনুযায়ী করে নেব। সুতরাং তারা এ পদ্ধতি গ্রহণ করল যে, আমাদের এ সংস্কৃতি প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব। তাই আপনারা দেখে থাকবেন, বিভিন্ন প্রোগ্রাম শুনছেন; কিন্তু তার ব্যাকগ্রাউন্ড গানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বর্তমানে তো এমন হয়েছে যে, আপনি হামদ-নাত শুনছেন। কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে গানের বাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আজ এ-ধরনের বাজনার আওয়াজ মসজিদেও বেজে উঠছে। বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করছেন; কোনো বাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন; কোনো বাজনার শব্দ কানে আসছে। কোনো মুসলিম যুবক এমন নেই, যার অন্তরে এই স্পৃহা আসবে যে, আমি রিচার্স করে-করে এই টোনকে আসসালামু আলাইকুম দ্বারা পরিবর্তন করে দেব, যাতে ফোন এলে উচ্চৈঃস্বরে আসসালামু আলাইকুম বলতে থাকে। তাই বলছিলাম, ভাই! সারা দুনিয়া একই চিন্তায় বিভোর আছে যে, দীনদার মানুষের কল্পনা কীভাবে বিকৃত করা যায়। আর এর জন্য তারা বর্তমানে একটি বিষয়ই নির্বাচিত করেছে যে, বাজনার মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃত করা যায়। সেই কাজই তারা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যিনি তার সুদূরপ্রসারী জ্ঞানের মাধ্যমে বলেছিলেন, গান-বাজনার হাতিয়ার চুরমার করার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে।

একটা সময় এমন ছিল, যখন গান-বাজনা শুধু কানের আনন্দের বিষয় ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই গান-বাজনা দীনবিধ্বংসী এবং ঈমানের জন্য ক্ষতির কারণ হয়েছে। সুতরাং সংস্কৃতি আগের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষতির কারণ হয়েছে।

ভিডিও গেমস-এর মাধ্যমে কাফেরদের প্রচেষ্টা

আপনি যদি ছোট বাচ্চাদের খেলনার জন্য কোনো গেমস প্রোগ্রাম কিনে দেন যে, হো এটা তো Lion king এর প্রোগ্রাম। সুতরাং এতে সমস্যা কী। ভাই! এর ওপর গান-বাজনা চলছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই মিউজিক মানুষের মস্তিষ্কে এমন প্রভাব ফেলে। যেব্যক্তি একবার এটা শুনবে, সে তার অভ্যস্ত হয়ে যায়। এটা আর ছাড়তে পারে না।

আপনি চিন্তা করছেন? বাচ্চাদের এই খেলনাসামগ্রী ভিডিও গেম্স এবং প্রোগ্রাম নির্মাণ করতে তিনশ পি.এইচ.ডি,ও মেডিকেল অফিসার এবং সার্জন ডাক্তার মিলে কাজ করে। মানুষ একথা শুনে হতভম্ব হবে যে, সাধারণ একটি বস্তু বাচ্চাদের একটি খেলনা প্রোগ্রাম। এটা নির্মাণ করতে এত বড় টিমের প্রয়োজন কী? মূলত এই বাহিনী এ চিন্তায় আছে যে, আমরা একটি প্রোগ্রাম তৈরি করে দেব, যা বাচ্চাদের খেলনা হিসাবে একবার বসে গেলে সে আর এটা থেকে বিমুখ হবে না। এর নেশায় থাকবে। দীন থেকে দূরে সরে যাবে।

শিশুরা ভিডিও গেমস খেলার সময় তার চোখ, মস্তিষ্ক, কান ও হাত ব্যবহার হয়। বরং বর্তমানে এমনও গেমস আবিষ্কার করেছে, যেগুলো খেলতে দুপা পর্যন্ত নাড়াচাড়া করতে হয়। একটা ছেলেকে আমি দেখলাম, সে গেমস খেলছে। নয় ঘন্টা খেলার পরও বলছে, আমাকে এখান থেকে উঠাবেন না। আমি খেলতেই থাকব। কী বুঝলেন? কেমন আকর্ষণ হয়েছে? রাত্রিকালে নয় ঘন্টা খেলার পরও তা ছাড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না। কোনো অঙ্গও ক্লান্ত হচ্ছে না। এখনও খেলতে চাচ্ছে। বলছে, আমাকে স্কুলে যাওয়ার জন্য বলবেন না। আমি খেলব। তার মস্তিষ্ক কন্ট্রোল করে ফেলছে। অন্তরে আকর্ষণ সৃষ্টি করছে। খাওয়াদাওয়ারও কোনো তোয়াক্কা নেই। লেখাপড়ার প্রতিও টান নেই। সে শুধু খেলার নেশায়ই আছে।

চিন্তার বিষয়

বন্ধুগণ! এখন আমাদের চিন্তার বিষয় হচ্ছে, সন্তান আমাদের। তাদের প্রতিপালন করছি আমরা। কিন্তু গান-বাজনা শুনে তারা মানসিকভাবে তাদের সন্তান হয়ে যায়। একটি কথা স্মরণ রাখবেন, সমস্ত লোক গান-বাজনার প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। তারা কুদরতিভাবে পশ্চিমা সভ্যতার হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে যায়। আপনারা বিষয়টা পরীক্ষা করে দেখবেন। সেই যুবক তো বলে, আমি সামান্য গান শুনেছি। জি এই যে, শো-শো শব্দ শুনছেন। এই সুরের দরুন

ইসলামের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয় এবং পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি আকর্ষণ জন্ম নেয়। সুতরাং আপনি অনেক মানুষ দেখবেন, তাদের সামনে একবার ইউরোপিয়ান সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কথা বলে দেখুন। আপনার কথা শুনে তারা শিউরে উঠবে। আরে কী বলছেন?

আসল ব্যাপার হচ্ছে, কুদরতিভাবে এদের অন্তরে ইসলামের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার হয়েছে। দ্বীনি কথাবার্তা, সভ্যতা এদের মোটেও পছন্দ হয় না। আল্লাহওয়ালা মানুষকে দেখতে পারে না। জিজ্ঞাসা করবেন, আচ্ছা! ইসলাম সম্পর্কে তোমার মনে কোনো কষ্ট আছে কি? ইসলাম তোমাকে কোনো প্রকার আঘাত করছে? বলবে, না। তারপর জিজ্ঞাসা করুন, তবে ইসলামের প্রতি এত অনীহা কেন? বলবে, বুঝতে পারি না। আসল ব্যাপার হচ্ছে, ওই গান-বাজনার মাধ্যমে তার মস্তিষ্কে ধর্ম ও ধার্মিকতার প্রতি ঘৃণা সঞ্চারিত হয়েছে।

আজ আমরা রেডিও, টিভি ক্রয় করে ঘরে রাখি আর আমাদের স্ত্রী-সন্তান ঘরে বসে-বসে গান-বাজনা শুনছে। আমাদের এ অনুভূতি নেই যে, এই গান বাজনার মাধ্যমে আমার স্ত্রী-সন্তান ইসলামের গণ্ডি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। শুনুন! মনের কানে শুনুন! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, গান-বাজনার আওয়াজ শুনে হৃদয়ে যেনার কথা এরকম উদয় হয় যেরকম বৃষ্টির মাধ্যমে জমিনে ফসল উৎপন্ন হয়। স্বামী অফিসে চলে যায় আর স্ত্রী টি.ভি চালু করে দেয়। এখন সেই মহিলা সারাদিন শো-শো সুর শুনল। এবার ভেবে দেখুন, ওই মহিলার মস্তিষ্ক কতটুকু নিষ্কলুষ রইল। বর্তমানে তো ছেলেমেয়েদের রুমে আলাদা টি.ভি দেওয়া হয়।

ভাই! ভেবে দেখুন, তাদের প্রচার ও দীনি তাবলীগের মধ্যে পার্থক্য কী? পার্থক্য হচ্ছে, দীনের পথে আহ্বানকারী তো তাকে ডেকে মসজিদে আনতে চাচ্ছে। দীনের কথাবার্তা শোনাতে চাচ্ছে। সে মসজিদ থেকে গাশতে বের হয়ে বড়জোর তার দরজা পর্যন্ত যাবে। দরজায় কড়া নাড়া দেওয়ার পর মালিকের ইচ্ছা হলে দ্বার খুলবে। না হয় খুলবেই না। তার কথাবার্তা শুনলে শুনবে, না শুনলে নাই। দীনের আহ্বানকারী কথাবার্তা বললেও শুধু পুরুষের সঙ্গে বলবে। মহিলাদের সঙ্গে কথা বলার তো সুযোগ নেই। সুতরাং দীনের পথে আহ্বানকারীর Limitation (সীমানা) নির্ধারিত। মালিকের দরজা পর্যন্ত। আর কুফরি প্রচারমাধ্যম দেখুন! স্ক্রীন অন করে শয়নকক্ষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। বেডরুমে বসে যুবক বেডরুম পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি পায়। আর দীনের আহ্বানকারীদের জন্য বাইরের ফটকও বন্ধ থাকে। তাই আমরা

বলি, ভাই! কুসংস্কারের প্রচার-প্রসার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ বৃদ্ধির উপকরণ আপনিই হচ্ছেন।

আজ কোনো যুবক যদি বলে, আম্মাজান!, আব্বাজান! আমাদের ঘরে টি.ভি রাখার দরকার নেই, তাহলে ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়ে যাবে। বিরাট ঝগড়া বাঁধে, এ তুমি কী বলছ। ঈমান বোঝার জন্য আমরা টি.ভি এনেছি। এটাও শয়তানের এক প্রকার প্রবঞ্চনা। এটা বুঝে নিও যে, আমরা এক প্লাটুন শয়তান এনে ঘরে বসিয়ে রাখলাম। তারপর কী হচ্ছে? ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করছে না। মাতাপিতার কথা শুনছে না। নামায পড়ছে না। ফলে অভিযোগ করে, ছেলে সব সময় ঘুমিয়ে থাকে। জি, যে ছেলে সারারাত টি.ভি দেখল। সে সারা দিন ঘুমাবে না তো কী করবে।

আগেকার যুগেও গান-বাজনা হারাম ছিল। তবে সেই সময় গান-বাজনা শুধু কানের উপভোগের বিষয় ছিল। বর্তমানে কাফের গোষ্ঠী এই ফলাফল বের করেছে যে, আমরা মুসলমানদের সঙ্গে ইচ্ছামতো ব্যবহার করব। তারা সাময়িকভাবে আমাদের মন্দ বলবে। আমাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। আমাদেরকে অত্যাচারী বলবে। কিন্তু গান-বাজনার মাধ্যমে আমরা তাদের অন্তরে আমাদের ভালোবাসা ঢুকিয়ে দেব। এজন্যই ভাই! আমাদের উচিত আমরা এই ধ্বংসাত্মক সংস্কৃতি থেকে নিজেকে রক্ষা করি। আপন ঘর পবিত্র করি। নিষ্পাপ শিশুদের এই বিপদ থেকে মুক্তি দেই। নতুবা এই ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা গান-বাজনা শুনলে বলা যায় না, তাদের মস্তিষ্কের কী অবস্থা হয়।

কম্পিউটার স্ক্রীনে ছেলেমেয়েদের খেলার অনুমতি দিলে আগে নিজে তার মধ্যে সংযোজন-বিয়োজন করবেন। গান-বাজনা ছাড়াও অনেক খেলা আছে। বর্তমানে কম্পিউটার ইত্যাদি ঘরের প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তাই রাখতে হয়। তবে সাবধানে পরিচালনা করবেন। যদি তা না করেন, তাহলে পরিণামে সন্তানরা ধার্মিকতা হারিয়ে ফেলবে। বরং তাদের চাহিদানুসারে পাগলামির দরুন ভালো কিছু করার সুযোগ পাবে না।

প্রত্যেক যুগে বাতিলের মোকাবেলা করার ভিন্ন পদ্ধতি ছিল। বর্তমানে কাফের গোষ্ঠী বৈজ্ঞানিক রিচার্সের মাধ্যমে আক্রমণের কৌশল পরিবর্তন করেছে। সুতরাং আমাদেরও সতর্কতা অবলম্বন করে নিজেদের ঈমান রক্ষা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঈমান রক্ষা করুন। আমীন।

ইচ্ছাশক্তি

'আমাদের ওলামায়ে কেরাম মানুষদের অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির এবং আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে থাকার উপদেশ দেন। এর মৌলিক কারণ হচ্ছে, এর দ্বারা মানুষের ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি পায়। খরমুজ খরমুজ দেখে রং গ্রহণ করে। এজন্যই যেমন অধঃপতিত ব্যক্তিই হোক আল্লাহওয়ালাদের সাক্ষাৎ ঘটলে তাদের উঠে দাঁড়ানোর সৌভাগ্য হয়। তাদের জীবনে পরিবর্তন নেমে আসে। কয়েক মুহূর্তের সান্নিধ্য তাদের জীবনের গতি পরিবর্তন করে দেয়। এই অটলতা ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে অর্জন হয়। ঈমানদার ও আল্লাহওয়ালাদের ভেতরে কী পরিমাণ অটলতা ও ইচ্ছাশক্তি রয়েছে, তা দেখতে হলে সাহাবায়ে কেরামের (রাযি.) জীবনীতে দৃষ্টি দাও। প্রত্যেকজন সাহাবার দৃঢ়তা ও অটলতা ছবির মতো দেখতে পারবে।'

ইচ্ছাশক্তি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ.

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

وقال الله تعالى فى مقام اخر ـ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

ইচ্ছাশক্তি একটি মহান নেয়ামত

এ পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি। আপনারা আল্লাহ তা'আলার গুণসমূহের বহিঃপ্রকাশ। তিনি মানুষকে অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। যেমন– বিবেকের আলো দিয়েছেন। কথা বলার সামর্থ দিয়েছেন। অন্যান্য জীবের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন। এমন আরও অনেক নেয়ামত দিয়েছেন, যেগুলো মানুষ চেষ্টা করে অর্জন করতে পারে না। সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি। এটি আল্লাহপাকের অনন্য নেয়ামত। এ শক্তি ব্যবহার করে মানুষ অনেক সময় অসম্ভব বিয়ষও সম্ভব করে নেয়। ইচ্ছাশক্তিকে Will Power অথবা Deter minationও বলা হয়। এটি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকে। যদিও ঈমানদারদের মধ্যে এটি অধিক হয়। তবে কাফেরদের মধ্যেও থাকে। এজন্যই অনেক সময় কাফেররাও বিস্ময়কর দুর্লভ কাজ পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত করতে সক্ষম হয়।

বিশ্ববিখ্যাত অনুবাদক ও তার ইচ্ছাশক্তি

ইটালির এক বিজ্ঞানী ছিল। সে আরবি ভাষা শিক্ষা করেছিল। মেডিক্যাল বিষয়ে তার সম্পর্ক ছিল বিধায় সে বিভিন্ন লাইব্রেরিতে ইউনানি

চিকিৎসাবিদ্যার অনেক পুস্তকাদি অধ্যয়ন করত। সেগুলোর মধ্যে দুটি বই তার অনেক ভালো লেগেছিল। সে ইটালিয়ান ভাষায় ওই বইগুলোর অনুবাদ করে। সেগুলো অনেক গ্রহণযোগ্যতা পায়। এজন্যই অনেক দূরদূরান্ত পর্যন্ত তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ওই সময় সে জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। চিকিৎসার জন্য কোনো ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হলে ডাক্তার বললেন, তুমি ক্যান্সার রোগী। আমাদের এখানে তোমার চিকিৎসা সম্ভব নয়। সর্বোচ্চ দু-বছরের মধ্যে তোমার মৃত্যু হবে। কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তি প্রবল ছিল।

সে বলল, এখন তো আমার হাতে সময় অনেক কম। কিন্তু কাজ বেশি। সুতরাং সে লাইব্রেরিতে গিয়ে ইউনানি শাস্ত্রের যত পুস্তক ছিল সেগুলো ভালো করে দেখল। ওই দুটি বই তার পছন্দ হলে সঙ্গে করে নিয়ে এল। বাড়িতে এসে কয়েকজন লোককে তার সহযোগী নিযুক্ত করল এবং তাদের বলল, ভাই! অনুবাদের কাজ তো আমিই করব। তবে রিডিং ও সম্পাদনায় আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন। এভাবে সে দু-বছরে উক্ত দুটি বইয়ের অনুবাদ আরবি ভাষা থেকে ইটালি ভাষায় করে নিল। ফলে বিশ্বরেকর্ডে তার নাম বিশ্ববিখ্যাত অনুবাদক হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হলো। দেখুন! একজন ক্যান্সারের রোগী এমন কাজ করেছে, যা আমরা সুস্থ অবস্থায়ও করতে সক্ষম হই না। এটা কী? এটা হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি।

জনৈক নোবেল বিজয়ীর ইচ্ছাশক্তি

একদা এক নোবেলবিজয়ীর সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, আপনি নোবেল পুরস্কারের উপযোগী হলেন কীভাবে? তিনি বললেন, আমি খুব পরিশ্রম করতাম। লোকেরা বলল, মেডিকেল সাইন্সের ছাত্ররা সবাই পরিশ্রমী হয়। তারা সকাল-সন্ধ্যা বই নিয়েই বসে থাকে। তিনি বললেন, তারপরও আমি অনেক পরিশ্রমী ছিলাম। লোকেরা বলল, তাহলে বলুন, আপনি অন্যদের চেয়ে অধিক পরিশ্রমী কীভাবে হলেন। তিনি বললেন, শুনুন; আমার একটি কথার ওপর আপনারা অনুমান করুন। পদার্থ বিজ্ঞানের একটি বই আমি একবার পড়লাম; বুঝে এল না। দুবার পড়লাম; তাও বুঝে এল না। তিনবার, চারবার পাঁচবার নয় বইটি আমি একটানা ৬৩ বার পাঠ করেছি। ফলে বইটি আমার মুখস্থ হয়ে যায়। তারপর লোকেরা বলল, ঠিক আছে; তাহলে বাস্তবেই আপনি নোবেল বিজয়ের অধিকার রাখেন। বর্তমানে এমন ছাত্র সম্ভবত কমই পাওয়া যাবে, যারা সারা বছর পুরো কোর্স সমাপ্ত করে। পূর্ণ একবার যদি পড়ে নেয়,

তাহলে সেটা শিক্ষকদের প্রতি অনেক বড় দয়া মনে করে। আর যদি দুবার পড়ে নিতে পারে, তাহলে তো সোনায় সোহাগা হয়ে যায়। এর চেয়ে বেশি হতেই পারে না। আর তিনি একটা বই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তেষট্টিবার পড়েছেন। সুতরাং নোবেল বিজয়ের অধিকারী তিনি হবেন না তো কে হবেন?

বিজ্ঞানী নিউটন-এর ইচ্ছাশক্তি

বিজ্ঞানী নিউটন যখন গতিসূত্র প্রণয়ন করেছিলেন, তখন এর জন্য তিনি অনেক প্রশ্রিম করেছিলেন। কেননা তাতে চেষ্টা-সাধনা অনেক বেশি করতে হয়েছে। তার লিখিত কাগজে কক্ষ ভরে গিয়েছিল। যখন তার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে গেল, তখন তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে টয়লেটে গেলেন। এখনও তিনি ওয়াসরুমে রয়েছেন এমন সময় তার কুকুর রুমে ঢুকে বাতিটা ফেলে দিল। ফলে আগুন লেগে তার সমস্ত পাণ্ডুলিপি পুড়ে গেল। তিনি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এ অবস্থা দেখে খুব আক্ষেপ করলেন। আর শুধু এতটুকুই বললেন যে, তুই আমার কাজ বাড়িয়ে দিলি। তারপর পুনরায় পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে শুরু করলেন। পূর্ণ এক বছর পরিশ্রম করার পর পুনরায় পাণ্ডুলিপি তৈরি করলেন। এভাবে মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে অসম্ভবকে সম্ভব করে এবং নিশ্চিত পরাজয়কে বিজয়ের পরিণত করে।

পরমাণু বিজ্ঞানী আইনস্টাইন-এর ইচ্ছাশক্তি

বর্তমান বিজ্ঞানের জগতে আইনস্টাইন এমন একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, যেমন ধর্মের জগতে আম্বিয়ায়ে কেরামের সম্মান হয়। তাঁর জীবনীতে লেখা আছে, শৈশবে স্কুলে যাওয়ার সময় গাড়ির কন্ডাক্টরের সঙ্গে ভাড়ার টাকা নিয়ে প্রতিদিন ঝগড়া হতো। কন্ডাক্টর টাকা ফেরত দেওয়ার পর তিনি প্রতিদিনই বলতেন, তুমি আমাকে টাকা কম দিয়েছ। কিন্তু দ্বিতীয়বার গণনার পর ঠিকই হতো। কয়েকদিন এমন হওয়ার পর একদিন কন্ডাক্টর বলল, তুমি কেমন স্কুলে পড়; এখনও হিসাব জান না? এ কথাটায় তার অন্তরে চোট লাগল। তাই সংকল্প নিলেন, আমাকে হিসাব সম্পর্কে পরিশ্রম করতে হবে। সুতরাং এমন পরিশ্রম শুরু করলেন যে, ফলে Theory of Relativity এর থিওরি প্রণয়ন করেন, যা বর্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক থিওরি বলে মনে করা হয়।

বিধর্মীদের কিছু উদাহরণ এজন্যই দিলাম, যাতে আপনারা বুঝতে পারেন, আল্লাহ তা'আলা এই নেয়ামত সকল মানুষকে দান করেন। তবে

যারা ঈমানদার তাদের বিশ্বাস আল্লাহর ওপর থাকে। তাই তাদের ইচ্ছাশক্তি কাফেরদের তুলনায় অনেক বেশি হয়।

সততায় ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি পায়

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা আল্লাহপাকের অশেষ দয়ায় কালেমা পাঠ করেছি। আমরা মুসলিম। আল্লাহর ওপর আমাদের ভরসা। সর্বদা সততার জীবন গড়তে সচেষ্ট থাকি। মানুষের হৃদয়ে সততা অনড় হলে সে তার আপন কাজে পাহাড়ের মতো অটল থাকে। আরও স্মরণ রাখবেন, সততা ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করে মানুষকে নির্ভীক বানিয়ে দেয়। পবিত্র কুরআনে এসেছে, আল্লাহর নবী হযরত সুলাইমান (আ.)-এর কাছে হুদহুদ নামে একটি পাখি ছিল। সে সুলাইমান (আ.)-এর সৈনিকদের সাথে থাকত। যেখানে তারা তাঁবু স্থাপন করতেন, সেখানে ওই পাখিটা মাটি খুঁড়ে পানির সন্ধান দিত। পানি কতটুক দূরে আছে তা জানিয়ে দিত। তার সংবাদমতো জায়গা নির্ধারণ করে তাঁবু স্থাপন করা হতো। একদনি জিজ্ঞাসা করলেন, হুহুদকে দেখছি না কেন? সে কি অনুপস্থিত? তালাশ করা হলো। সে কোথাও চলে গেছে। সুলায়মান (আ.) বললেন, সে না জানিয়ে কোথায় গেল এর উপযুক্ত জবাব তাকে দিতে হবে। অন্যথায় আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব অথবা মৃত্যুদণ্ড দেব।

কিছুক্ষণ পর হুদহুদ এসে গেল। সুলাইমান (আ.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় গিয়েছিলে? হুদহুদ অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে উত্তর দিল–

أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ

'আমি একটি সংবাদ নিয়ে এসেছি যে সম্পর্কে আপনি অবগত নন। আমি সারা শহর থেকে নির্ভরযোগ্য এক সংবাদ নিয়ে এসেছি।'[১৮৮]

এবার ভেবে দেখুন, এমন এক ব্যক্তিত্বের সামনে জবাব দিচ্ছে, যিনি আল্লাহর নবী ছিলেন। পাশাপাশি রাজমুকুটের অধিকারী ছিলেন। বরং এমন পয়গম্বর ছিলেন, যিনি মানব, দানব, পাখি, প্রাণী, জল, স্থল সমস্ত সৃষ্টির বাদশাহ ছিলেন। এমন একজন নবীর সামনে সামান্য একটা হাড্ডিসার পাখি যার কোনো মূল্যায়নই হয় না যখন সুলায়মান (আ.) বলেছিলেন, আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব অথবা জবাই করব, তখন একথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে সে

---

১৮৮. সূরা নাম্‌ল : আয়াত ২২

কাপতে-কাঁপতে মাথায় পাক খেয়ে হার্টফেল করে মরে যাওয়ার কথা ছিল। যেখানে জিনরা পর্যন্ত শ্বাস ফেলার সাহস দেখাতে পারে না, সেখানে আমি কী? কিন্তু যেহেতু তার মধ্যে সততা ছিল, তাই সুলাইমান (আ.) জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বস্ততার সাথে জবাব দিল, আমি শহর থেকে এমন এক সংবাদ নিয়ে এসেছি, যা আপনি আগে জানতেন না।

বন্ধুগণ! মানুষ তো মানুষই হয়। তার মধ্যে হাজারো সততা থাকলেও তার পায়ের নিচে পাথর থাকে এবং অবিচলতার মধ্যে সেই পা কোনো স্বাদ পায় না। সুতরাং আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করার সময় অন্যান্য নেয়ামতের সাথে ইচ্ছাশক্তির নেয়ামতের জন্যও প্রার্থনা করবেন।

দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন

আজ আমাদের নফসের ওপর আমাদের ক্ষমতা নেই কেন? মসজিদে তো আল্লাহু আকবার (আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বড়) বলে। কিন্তু মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর আত্মপূজা শুরু করে। এভাবে জীবন কাটাতে থাকে। আমরা যাদের খোদাপ্রেমিক বলি, তারাও আমাদের মতোই মাটির মানুষ। আমাদের মতো তাদেরও দুটা হাত দুটা চোখ, দুটা পা এক মস্তিষ্ক থাকে। কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান খুব মজবুত থাকে। তারা কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করলে সেটা বাস্তবে পরিণত করে দেখান। এখানে এসে আমার মতো সাধারণ মানুষও আল্লাহওয়ালাদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা অটলতাকে পছন্দ করেন। তাই তিনি বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

'যারা বলে, আল্লাহপাকই আমাদের প্রভু। তারপর তাতে অবিচল থাকে।'[১৮৯]

যুবকদের মাঝে অটলতার ত্রুটি থাকার কারণে আত্মার গোলাম হয়ে যায়, নিজের নফসকে কন্ট্রোল করতে পারে না। পারবে কীভাবে? এর জন্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। আমাদের অবস্থা দেয়াশালাইয়ের শলাকার মতো। যার মধ্যে আগুন প্রবিষ্ট থাকে। সুতরাং ঘর্ষণ খেলেই জ্বলে ওঠে। তেমনিভাবে আমাদের নফসের ভেতরে নোংরামি ঢুকে আছে। তাই বেগানা নারীদের প্রতি দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঘর্ষণ খেয়ে অন্তরে কুপ্রবৃত্তির আগুন

---

১৮৯. সূরা হা-মীম সাজদাহ : আয়াত ১৩

জ্বালিয়ে দেয়। সামান্য রসালাপ আমাদের উজু ভেঙে দেয়। হালাল হারাম পার্থক্যবোধ থাকে না। আমরা নিজের নফস ও শয়তানের ওপর বিজয়ী হব কীভাবে? এর মূল রহস্য ইচ্ছাশক্তির মধ্যে লুকিয়ে আছে।

কাঠ আগুনের খাদ্য হলো কীভাবে?

হযরত জুনাইদ বাগাদাদি (রহ.)-এর মামা শায়খ সিররি সাকতি (রহ.) কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। পথে একটা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিলেন। জাগ্রত হওয়ার পর শুনলেন, গাছ থেকে আওয়াজ আসছে–

يَا سِرِّيُ كُنْ مِثْلِيْ

'হে সিররি! আমার মতো হয়ে যাও।'

গাছের কথা শুনে তিনি অস্থির হয়ে গেলেন। এবার গাছকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন–

كَيْفَ اَكُوْنُ مِثْلَكَ

'আমি তোমার মতো কীভাবে হব?'

গাছ জবাব দিল–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَنِيْ بِالْاَحْجَارِ فَاَرْمُوْهُمْ بِالْاَثْمَارِ

'হে সিররি! আমার প্রতি যারা পাথর ছুড়ে মারে, তাদের প্রতি আমি ফল নিক্ষেপ করি।'

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, গাছ এত পরোপকারী যে, তার প্রতি কেউ পাথর মারলে তার প্রতি সে ফল হাদিয়া করে। তবে আল্লাহ তা'আলা এই বৃক্ষকে আগুনের ইন্ধন বানালেন কেন? ডালপালা, কাঠ জ্বলে আর আগুনের খোরাক হয়। সুতরাং তিনি গাছকে জিজ্ঞাসা করলেন–

كَيْفَ مَصِيْرُكَ اِلَى النَّارِ

'হে গাছ! তুমি এত হিতৈষী; তাহলে তুমি আগুনের খোরাক হলে কেন?'

তিনি একথা বলার পর গাছ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে উত্তর দিল, আহ! সিররি! আমার মধ্যে যেমন পরোপকারিতা রয়েছে, তেমনিভাবে একটা ত্রুটিও রয়েছে। সেই ত্রুটিটা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় হয়ে যায়। তাই আমার

সমস্ত গুণের মধ্যে যেন পানি ঢেলে দেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, সেই ত্রুটিটা কী? গাছ উত্তর দিল–

فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هٰكَذَا

যে দিকে বাতাস বয়, আমি সেদিকে ঝুঁকে পড়ি। এটাই আমার অপরাধ আমার মধ্যে অটলতা নেই। আর এটা আল্লাহর পছন্দ নয়। এজন্যই আমার শত গুণ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহপাক আমাকে আগুনের ইন্ধন বানিয়েছেন।

ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করার রহস্য

আমাদের ওলামায়ে কেরাম মানুষদের অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির এবং আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে থাকার উপদেশ দেন। এর মৌলিক কারণ হচ্ছে, এর দ্বারা মানুষের ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি পায়। খরমুজ খরমুজ দেখে রং গ্রহণ করে। এজন্যই যেমন অধঃপতিত ব্যক্তিই হোক আল্লাহওয়ালাদের সাক্ষাৎ ঘটলে তাদের উঠে দাঁড়ানোর সৌভাগ্য হয়। তাদের জীবনে পরিবর্তন নেমে আসে। কয়েক মুহূর্তের সান্নিধ্য তাদের জীবনের গতি পরিবর্তন করে দেয়। এই অটলতা ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে অর্জন হয়। ঈমানদার ও আল্লাহওয়ালাদের ভেতরে কী পরিমাণ অটলতা ও ইচ্ছাশক্তি রয়েছে, তা দেখতে হলে সাহাবায়ে কেরামের (রাযি.) জীবনীতে দৃষ্টি দাও। প্রত্যেকজন সাহাবার দৃঢ়তা ও অটলতা ছবির মতো দেখতে পারবে।

দুই কিশোরের ইচ্ছাশক্তি

জনৈক সাহাবী বলেন, বদর যুদ্ধের সময় আমার ডানে-বামে কে আছে তা আমি জরিপ করছিলাম। দেখলাম, একদিকে এক যুবক সাহাবী এবং অপর দিকে দুজন কিশোর। এ দৃশ্য দেখে আমি ভাবলাম, হায়! যদি ওদিকেও কোনো যুবক থাকত, তবে কতই-না ভালো হতো। আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামনে অগ্রসর হতাম এবং শত্রুদের ওপর জোরদার আক্রমণ চালাতাম। এতক্ষণে দুই কিশোর আমার সামনে উপস্থিত হয়ে বলছে, চাচাজান! আবুজাহল কোথায় আছে বলতে পারবেন? তিনি বলেন, আমি ওই দুই কিশোরের বয়সের প্রতি লক্ষ করে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম যে, এরা আবুজাহল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে কেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কী বেটা? আবুজাহল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ কেন? তারা বলল, চাচাজান! আমরা শুনেছি, সে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

গালমন্দ করে এবং মক্কায় থাকাকালীন সে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। আজ যদি সে এসে থাকে, তাহলে আমরা সংকল্প করেছি, হয় সে সুস্থরূপে ফিরে যেতে পারবে না অথবা আমরা জখমবিহীন নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করব না। আমি তাদের কথা শুনে অবাক হলাম। অল্প বয়স, ক্ষীণ দেহ আর তাদের টার্গেট কত উচ্চ। আমি তাদের ইশারা করে দেখালাম, ওই দেখো, যুদ্ধাস্ত্র পরিহিত সৈনিকদের মাঝখানে উঁচালম্বা লোকটাই আবুজাহল। তারা তাদের লক্ষ্যবস্তু ভালো করে চিনে নিল।

জিহাদ শুরু হলো। উভয় পক্ষের যুবক সৈনিকরা মুখোমুখী হলো। কিশোরদ্বয় ছোট ছিল। তাই বাহন ব্যতীতই দৌড়াতে লাগল। কাফেরদের কাছ দিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু কাফেররা তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করছে না। এভাবে তারা কাফের সৈনিকদের সারির ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর আস্তে-আস্তে তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছে গেল। ছোট ছিল বিধায় আবুজাহলের ঘোড়ার পাশে গিয়েও ঘোড়ায় উপবিষ্ট দুশমনের ওপর মাটি থেকে আঘাত করতে পারছে না। সুতরাং তাদের একজন ঘোড়ার পায়ে আঘাত করল। পা কেটে যাওয়ায় ঘোড়া মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সাথে-সাথে আবুজাহলও জমিনে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তারা বাজপাখির মতো আবুজাহলের ওপর আক্রমণ করল। তারা এত বলহীন কিশোর ছিল যে, আবুজহলের গলায় আঘাত করেও তার গলা কাটতে পারছে না। এতক্ষণে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) যার ইল্‌ম আমাদের ইমাম হযরত আবুহানীফা (রহ.) গ্রহণ করেছেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে আবুজাহলের গলা কেটে আল্লাহর দুশমনকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন।

বন্ধুগণ! যে-জাতির কিশোরদের ইচ্ছাশক্তি এমন হয়, তাদের যুবকদের বীরত্ব ও সাহসিকতা কেমন হবে মনে করেন?

একজন মাজুর সাহাবীর সংকল্প

সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এমন সময় একজন মাজুর সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবদার করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনার চার ছেলে জিহাদে অংশ নিয়েছে। ওপরন্তু আপনি পঙ্গু মানুষ। তাই আপনি

বাড়িতে থাকলে ভালো হয়। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু! আমার মন চায়, এই লেংড়া পা নিয়ে আমি জান্নাতে চলে যাই। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিহাদে যাবার অনুমতি দিলেন। তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘরে গেলেন। স্ত্রীকে বললেন, আমিও যাচ্ছি; তাই তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো। তাঁর স্ত্রী তাকে প্রস্তুত করছেন এবং রসিকতার সাথে বলছেন, আমি দেখছি, আপনি যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেছেন। স্ত্রীর একথা শুনে তিনি দু'আ করলেন–

اَللّٰهُمَّ لَاتُعِدْنِىْ اِلٰى اَهْلِىْ

'হে আল্লাহ! জিহাদের ময়দান থেকে আমাকে পরিবারে কাছে ফিরিয়ে এনো না।'

হাদীছ শরীফে এসেছে, তিনি জিহাদের ময়দানে গেলেন। জিহাদে অংশ নিলেন এবং কাফেরদের হত্যা করতে-করতে শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহর কুদরত দেখুন! মুসলমান আত্মীয়-স্বজন তাদের আপনজনের লাশ নিয়ে মদীনার পথে যাত্রা করেন। ওই সাহাবীর স্ত্রীও তার লাশ উটের মধ্যে করে নিয়ে লোকজনের সঙ্গে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কাফেলা রওনা হলো। কিন্তু ওই সাহাবীর লাশবাহী উট সামনে অগ্রসর হচ্ছে না। বারবার চেষ্টা করার পরও উট সামনে যাচ্ছে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করা হলো। তিনি বললেন, এই সাহাবী ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কিছু বলছিল কি? তার স্ত্রী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি জিহাদের জন্য বের হওয়ার সময় আমার রসিকতার জবাবে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! জিহাদের ময়দান থেকে আমাকে পরিবারে কাছে ফিরিয়ে এনো না।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তাঁর লাশ মদীনায় নেওয়া যাবে না। সুতরাং শহীদগণের সরদার হযরত হামযা (রাযি.)-এর সঙ্গে তাঁকেও উহুদের ময়দানে দাফন করা হলো। আল্লাহু আকবার! যে-জাতির মাজুর লোকদের এমন প্রেরণা থাকে, তাদের সুস্থ বাহাদুরগণের সাহসিকতা কেমন হতে পারে!

আবুবকর (রাযি.)-এর মেয়ে আসমা (রাযি.)-এর ইচ্ছাশক্তি

হযরত আসমার (রাযি.) হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর বড় মেয়ে এবং আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর বড় বোন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের সময় আসমা (রাযি.)-এর বয়স তেমন

একটা বেশি ছিল না। হযরত আবুবকর (রাযি.) তাঁকে বলেছিলেন, আসমা! তুমি ছোট আছ। তাই তোমাকে কেউ সন্দেহ করবে না। সুতরাং তুমি অমুক জায়গা আমাদের খাবার পৌঁছাবে। তিনি প্রথম দিন খাবার পৌঁছালেন। দ্বিতীয় দিন খাবার নিয়ে যাওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মধ্যে বিষণ্নতার ছাপ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আসমা! তোমার কী হয়েছে? তোমাকে ভারাক্রান্ত দেখাচ্ছে কেন? তার ললাটে আঘাতের চিহ্নও রয়েছে। আসমা (রাযি.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গতকাল আমি খাবার পৌঁছিয়ে দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় মক্কার অদূরে আবুজাহল আমাকে দেখতে পায়। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আসমা! বলো, তোমার পিতা কোথায়? অবশ্যই তোমার পিতার সন্ধান পেলে তোমাদের নবীর সন্ধান পাওয়া যাবে। তারা উভয়ে একসঙ্গেই আছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন আমি তাকে সত্য কথা বলেছি। আমি বললাম, নবী ও আমার আব্বাজানের খবর আমি জানি। তবে তোমাকে বলব না। এবার সে আমাকে শাসাতে শুরু করল। বলল, আসমা! তোমার বাবা কোথায় আছে তাড়াতাড়ি বলো। আমি বললাম, না; আমি তোমাকে বলতে পারব না। ফলে সে আমার কেশ ধরে আমার গালে একটা থাপ্পর মারল। তার প্রহারের আঘাতে আমি মাটিতে ছিটকে পড়ি। আমার মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে শুরু করল আর চোখ দ্বারা অশ্রু ঝরছে। এবার আবুজাহল বলল, আসমা! তোমার বাবার সংবাদ তাড়াতাড়ি বলো; নতুবা তোমাকে মেরে ফেলব। তখন আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর দুশমন! আমাকে তো তুই আধমরা করেই ফেলছিস। তবে শুনে রাখ আমার পূর্ণ জানটা তোর হাতে তুলে দিতে পারি। তুই আমাকে যা ইচ্ছা তা করতে পারিস। কিন্তু আমার নবীকে তোর হাতে সমর্পণ করতে পারি না। আরে ভাই! যে-জাতির একটা কিশোরী মেয়ের এমন সাহস হতে পারে, সেই জাতির বীর মুজাহিদগণের বীরত্ব কেমন হওয়া চাই? এ হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।

ফাতেমা বিনতে খাত্তাবের ইচ্ছাশক্তি

হযরত ওমর (রাযি.) কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন? লম্বা ঘটনা। আমি শুধু আমাদের আজকের আলোচনার উদ্দেশ্যটা বয়ান করছি। তার বোন ফাতেমা (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। খবর শুনে তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তাঁর বাড়িতে গিয়ে শুনছেন, তিনি কুরআন তেলাওয়াত করছেন। বোনের চুল ধরে উপর্যুপরি আঘাত করতে লাগলেন। মার খেয়ে

ফাতেমা মাটিতে লুঠিয়ে পড়ে বললেন, ভাই! তুমি যে মায়ের দুধ পান করেছ, আমিও সেই মায়েরই দুধ পান করেছি। প্রাণে মেরে ফেলত পারেন; কিন্তু ঈমান ছাড়তে পারব না। বোনের কথা ওমরের হৃদয়ে বিদ্যুতের মতো প্রভাব ফেলল। তার অন্তরকে মোমের মতো গলিয়ে দিল। জিজ্ঞাসা করলেন, ঠিক আছে; তুমি যা পাঠ করছিলে, আমাকে দেখাও। বোন বললেন, তুমি অপবিত্র; এটি স্পর্শ করতে হলে গোসল করে এসো। তিনি গোসল করলেন। বোন ফাতেমা সূরা ত্বাহার কিছু অংশ পড়ে শোনালেন। তেলাওয়াত শুনে হযরত ওমর বললেন, আমাকে মুহাম্মদের কাছে নিয়ে চলো, আমি কালেমা পাঠ করে মুসলমান হব। শিকার করতে এসে নিজেই শিকার হয়ে গেলেন।

ভাই! যে-জাতির মহিলাদের ইচ্ছাশক্তি এমন হয়, তাদের পুরুষদের ইচ্ছাশক্তি কেমন হওয়া দরকার?

একজন ইউরোপিয়ান লোকের স্বীকারোক্তি

একজন পশ্চিমা লোক বলেছে, মুসলমানদের নবী আশ্চর্য পরিশ্রম করেছেন। সে বলল–

After the death of muhammad (PBUH). the land of ardiq became the nursery of Heroes

অর্থাৎ– মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আরব কান্ট্রি বীরদের নার্সারিতে পরিণত হয়েছে। নার্সারির ছোট-ছোট গাছ যেভাবে একসময় বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়ে যায়, তেমনিভাবে প্রতিজন সাহাবা আকাশের নক্ষত্রের মতো ঝলমল করছেন।

এই ইচ্ছাশক্তিই ওই বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের ঈমান গ্রহণের হেতু ছিল। তারা মনের দিক থেকে পাকা এবং অন্তরের দিক থেকে সত্য ছিলেন। তারা যা বলে ফেলতেন, তা বাস্তবে পরিণত করতেন। আজ সেই অবিচলতা আমাদের কাছে নেই। তাই আমরা গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাই। নতুবা যেকোনো পরিবেশে আমরা সুন্নতের ওপর আমল করে চলতে সক্ষম হতাম। বর্তমানে অশ্লীলতা ও পর্দাহীনতা ব্যাপক হয়ে গেছে এমন অজুহাত অহেতুক। আল্লাহর বান্দাগণ যেকোনো পরিবেশে শরীয়ত ও সুন্নত অনুযায়ী জীবন গড়তে পারেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের নৈকট্যের দ্যোতি দান করেন। তারাও এ সমস্ত অলিগলিতে, হাটে-বাজারে চলাফেরা করেন। তবে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হচ্ছে অটলতা। যদি দৃঢ় সংকল্প করে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করব না, তাহলে মানুষ তার নফসের ওপর জয়ী হয়ে যাবে।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সংকল্প

সংকল্প ও অটলতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত দেখতে হলে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর জীবনীতে দৃষ্টিপাত করুন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহধাম ত্যাগ করার পর ইসলামের অনেক বিধানের ওপর যুক্তি-তর্ক উত্থাপন হতে লাগল। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যাকাত অস্বীকার করা। সেই অস্বীকারকারীরাও মুসলমান ছিলেন। তারা বললেন, আমরা যাকাত দেব; তবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে নয়। আমাদের এলাকার হতদরিদ্রদের প্রদান করব। এজন্যই তাদের যাকাত অস্বীকারকারী বলা হতো। যদিও তারা নিজ-নিজ এলাকায় গরিবদের মধ্যে যাকাত দিতে চাচ্ছেন। তবে এর দ্বারা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের অবমাননা হচ্ছে। তাই হযরত আবুবকর (রাযি.) চাচ্ছেন, তাদের যাকাতের মাল কেন্দ্রীয় কোষাগারে হস্তান্তর করতে হবে।

মুসায়লামাতুল কায্যাব নামে এক লোক নবুওয়াতের দাবি করল। সাজাহ নামে একমহিলাও নবুওয়াতের দাবি করল। এদিকে ইহুদিরা মদীনায় আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মোটকথা চতুর্দিকে যেন ভয়ানক অবস্থা ধারণ করছে। সকল সাহাবায়ে কেরামের মতামত ছিল, আমরা আগে ইসলামবিদ্বেষী আগ্রাসন প্রতিহত করি। তারপর অভ্যন্তরীণ বিষয় নিরসন করব। কিন্তু হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) বললেন, না; আমি আগে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে তলোয়ার উঠাব। যাকাতদানে তাদের বাধ্য করব। যেহেতু সমস্ত সাহাবাবায়ে কেরামের ঐক্যমত ছিল, এদের বিরুদ্ধে পরে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। সুতরাং তারা সকলে হযরত ওমর (রাযি.)কে প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠালেন, আপনি খলীফাতুল মুসলিমীনকে বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করুন। আমরা আগে বহিরাগত ফেতনা দমন করি। তারপর আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করব।

হযরত ওমর (রাযি.) সাহাবায়ে কেরামের মুখপাত্র হয়ে আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর দরবারে এসে বলছেন। আমীরুল মুমিনীন! এ সমস্ত লোক কালেমা পড়েছে, নামায পড়ে, রোযা রাখে। এদের ব্যাপারে সামান্য কমনীয়তা প্রকাশ করা ভালো। ওমর (রাযি.)-এর কথা শুনে আবুবকর (রাযি.) দুই হাত দ্বারা তাঁকে এমনভাবে ধাক্কা দিলেন যে, তিনি পেছন দিকে পড়ে গেলেন। বললেন–

اَجَبَّارًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَخَوَّرًا فِى الْاِسْلَامِ

'জাহেলি যুগে তুমি বীর পুরুষ ছিলে আর মুসলমান হয়ে কাপুরুষ হয়ে গেলে?'

তারপর বললেন–

اَيُنْقَصُ الدِّيْنُ وَاَنَا حَيٌّ

'আমি জীবিত থাকতে ইসলামের বিধানে ত্রুটি আসবে?

এটা কীভাবে হয় যে, দীনের বিধানে আমি নমনীয়তা দেখাব? হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, একথা শুনে আমার অন্তর খুলে গেল এবং আল্লাহ তা'আলা ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দিলেন।

কেউ বলেছিলেন, আমীরুল মুমিনীন! হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা ইবনে যায়েদের নেতৃত্বে যে মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, এখন আপাতত তাদের বারণ করুন। তিনি উত্তর দিলেন, যে বাহিনী স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরণ করেছেন, এখানে তাদের বারণ করতে আবুবকর কে? কেউ বলল, তারা অন্যত্র জিহাদে চলে গেলে মদিনায় শুধু মহিলারা থাকবে আর ইসলামবিরোধী আগ্রাসীরা মহিলাদের ওপর আক্রমণ চালাবে। তিনি বললেন, আমি যদি নিশ্চিত জানতে পারি, বনের হিংস্র প্রাণীরা মহিলাদের ওপর আক্রমণ করছে, তবু আমি আবুবকর জিহাদ করার জন্য তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যাব। আল্লাহু আকবার। একে বলে অবিচলতা। তাঁর এই অবিচলতা দেখে মুফাসিসরীনে কেরাম লিখেছেন–

فَقَامَ مَقَامَ الْاَنْبِيَاءِ

'হযরত আবুবকর (রাযি.) এমন অটলতা দেখাচ্ছেন, যেমনটি আম্বিয়ায়ে কেরাম দেখাতেন।'

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছাশক্তি

এর চেয়ে অধিক অবিচলতা দেখতে হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তাঁকে মনুষ্যত্বের সোপানের মতো দেখতে পাবেন। মক্কী জীবনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর সম্মানিত চাচা আবুতালেবের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন, তখন একদিন কুরাইশ গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মিলে আবুতালেবের কাছে আগমন

করল। তারা বিভিন্নভাবে তাঁকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করল। আবুতালেব যখন দেখলেন, সমস্ত মক্কাবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে মেতে উঠেছে। তখন তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে বললেন, মুহাম্মদ! ওই সরদাররা বলছে, তোমার যদি ধনসম্পদের প্রয়োজন হয়, তাহলে তারা তোমাকে প্রচুর ধনসম্পদ দেবে। আর যদি কোনো অনিন্দ্যসুন্দরী রমণীকে বিবাহ করতে চাও, তাহলে তার পরিচয় দাও; তারা তোমার সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করবে। আর যদি আমাদের সরদার হতে চাও, তাহলে সবাই নতশিরে তোমাকে সরদার মেনে নেবে। তবু তুমি আমাদের প্রতিমার, আমাদের খোদার নিন্দাবাদ ছেড়ে দাও। তারপর আবুতালেব বললেন, ভাতিজা! তুমি আমার ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না, যা আমি বহন করতে পারব না।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন, তার চাচাও এ বিষয়ে আতঙ্কিত হয়ে গেছেন, তখন তিনি উত্তর দিলেন– চাচাজান যদি মক্কাবাসী আমার এক হাতে চাঁদ আর আরেক হাতে সূর্যটা এনে দেয়, তবু আমি যে-দায়িত্ব নিয়ে আগমন করেছি, তা প্রচার করা থেকে পিছপা হব না। আল্লাহু আকবার। অটলতা কাকে বলে ভেবে দেখুন।

অটলতার শিক্ষা

এই অটলতা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এসেছিল। তারপর তাবেয়ীনগণও তা গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য এটা আল্লাহর ওলীগণের বিশেষ গুণ হয়ে থাকে। তাঁরা সর্বদা শরীয়ত ও সুন্নতের ওপর অটল থাকেন। আর এ বিষয়টির প্রতি জোর দিয়ে আল্লাহপাক বলেন–

فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ

'হে আমার হাবীব! তুমি ও তোমার সঙ্গে যারা তাওবা করেছে, সবাই এর ওপর অটল থাকো, যা তোমাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে এবং সীমালঙ্ঘন করো না।'[১৯০]

যদি আমাদের মাতৃভাষায় استقامت (অটল) থাকার মর্ম বলি, তাহলে এভাবে বলতে হবে যে, হে আমার হাবীব! আপনি এবং আপানর সাহাবায়ে কেরাম শরীয়তের ওপর চলার ব্যাপারে সুতার মতো সোজা থাকুন। আল্লাহ

১৯০. সূরা হূদ : আয়াত ১১২

তা'আলা ওই রকম অটলতা চান এবং সেই অটলতা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে অর্জন হয়। এজন্যই আমাদের বুযুর্গগণ তাদের কাছে আগমনের প্রাক্কালেই এই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মুজাহিদগণের আলোচনা করেছেন। তাদেরও যিকিরের নির্দেশ দিচ্ছেন। চিন্তা করেছেন? যারা নিজের জীবনের বাজি রেখে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাদের যখন প্রাণের ভয় অন্তরে বিরাজ করছে, আল্লাহপাক ওই সময়ও যিকিরের নির্দেশ দিচ্ছেন। মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আল্লাহপাক বলেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোনো বাহিনীর সঙ্গে জিহাদ কর, তখন অবিচল থাকো এবং আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হও।'[১৯১]

অর্থাৎ– যখন তোমরা শত্রুদের মুখোমুখী হও, তখন তাতে শক্ত অবস্থানে থাকো এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করো। তাহলে বিজয় তোমাদের পদচুম্বন করবে। আল্লাহর যিকিরে বান্দা এক দিকে অবিচলতা পায়, অপর দিকে আল্লাহ তা'আলার রহমত অবিরাম বর্ষিত হতে থাকে। তাই নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে আমাদের অটল থাকা আবশ্যক। আমরা শক্ত ইরাদা করি যে, এটা করব না, ওটা করব না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সেটা করতে থাকি। চেষ্টা করতে হবে, আমাদের ঢিলেঢালা বিশ্বাসপূর্ণ অবস্থা সংশোধিত হয়ে যাক। তাহলে আমাদের মধ্যে মজবুত ইরাদা ও অটলতা আসবে। আমরা আল্লাহপাকের দরবারে অন্যান্য দু'আর সাথে-সাথে এ দু'আও করব যে, হে আল্লাহ! শরীয়ত ও সুন্নাতের ওপর চলতে আমাদের অটলতা ও ইচ্ছাশক্তি দান করো। যখন আমরা ওইরূপ সংকল্প করব, তখন যেন এর ওপর আমরা স্থির থাকতে পারি। স্মরণ রাখবেন, যখন পানি প্রবহমান হয়, তখন তাতে ওই বস্তুই ভেসে যায়, যা ওজনে হালকা হয়। শুকনা ঘাস, খরখুটা ও কাগজের মতো বস্তু পানিতে ভাসে। আর যদি শিলা হয়, তাহলে সেটা পানিতে ভাসে না। সুতরাং বর্তমানে যদিও সর্বপ্রকার গোনাহের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, তবু আমরা খরখুটা, কাঠ ইত্যাদির মতো ভেসে যাব না। বরং পাথরের মতো শক্ত অবস্থানে থাকব, যাতে পথহারাদের গতি রোধ করে পথের দিশা দেখানো যায়।

---

১৯১. সূরা আনফাল : আয়াত ৪৫

কোনো কবি বলেন–

یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو * روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانو کو

যুগ ওই সমস্ত মানুষের কথা স্মরণ করে, যারা প্রবল ঝড়-তুফানের গতি রোধ করতেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক দান করুন, আমরা যেন এই উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার উত্তেজিত বন্যার বিরুদ্ধে পাথর হই, আত্মসম্ভ্রম ও পবিত্র জীবন গড়তে পারি এবং শরীয়ত ও সুন্নাতের ওপর অটল থেকে আমল করে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা হতে পারি। আমীন।

হেদায়াতের জ্যোতি

'বিশেষ অতিথি আগমনের সময় অনুষ্ঠান নিজের উত্থানে উপনীত হয়। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সময়ও পৃথিবীতে কল্যাণের উত্থান হয়েছিল। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

'সমস্ত যুগের চেয়ে আমার যুগ শ্রেষ্ঠ। তারপর এ যুগের সাথে মিলিত যুগ। তারপর সে যুগের সাথে মিলিত যুগ।'

এতে বোঝা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পৃথিবীতে আগমনের সময় যেন হেদায়াতপূর্ণ জ্যোতিসমূহ উত্থানে ছিল। এমনকি সেকালে কাফেরদের মধ্যেও কতিপয় সৌকর্ষ পাওয়া যেত।'

হেদায়াতের জ্যোতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ.

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهٖ إِلَّا الْفَاسِقِيْنَ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

দুনিয়ার বিশেষ মেহমান

পৃথিবীতে কেউ কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে এর জন্য যেকোনো একজন বা একাধিক বিশেষ মেহমান থাকেন, যার উসিলায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যদি বিয়ের অনুষ্ঠান হয়, তাহলে বর এবং দস্তারবন্দি হলে হাফেজ বা আলেমগণ সেই অনুষ্ঠানের বিশেষ মেহমান থাকেন। আল্লাহপাক পৃথিবীর মানচিত্র প্রস্তুত করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর বিশেষ মেহমান নির্ধারণ করেছেন। সাধারণত নিয়ম হলো, অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সবার পরে আসেন এবং সাধারণ মেহমানগণ আসেন আগে। তাই আল্লাহপাক আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে অনেক নবীর আগমন ঘটিয়েছেন। সর্বশেষ বিশেষ অতিথি আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন।

হেদায়াতের জ্যোতিসমূহের উত্থান

বিশেষ অতিথি আগমনের সময় অনুষ্ঠান নিজের উত্থানে উপনীত হয়। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সময়ও পৃথিবীতে কল্যাণের উত্থান হয়েছিল। তাই নবীজি বলেন–

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

'সমস্ত যুগের চেয়ে আমার যুগ শ্রেষ্ঠ। তারপর এ যুগের সাথে মিলিত যুগ। তারপর সে যুগের সাথে মিলিত যুগ।'

এতে বোঝা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পৃথিবীতে আগমনের সময় যেন হেদায়াতপূর্ণ জ্যোতিসমূহ উথানে ছিল। এমনকি সেকালে কাফেরদের মধ্যেও কতিপয় সৌকর্ষ পাওয়া যেত।

এ সমস্ত কথা দলীলসহ প্রমাণ করা যায়। যেমন–

(১) যখন আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশি কোরাইশ-কাফেলার প্রতিনিধি হিসেবে আবুসুফিয়ানকে ডেকে মুসলিম ও তাদের নবী সম্পর্কে তত্ত্ব জানতে চেয়েছিলেন। তখন আবুসুফিয়ান মুসলমানদের সম্পর্কে সত্য রিপোর্ট দিয়েছিলেন। সেখান থেকে আসার পর কোরাইশ-কাফেলার লোকেরা তাকে দোষারোপ করে বলেছিল, আপনি এমন পরিপূর্ণ সত্য রিপোর্ট দিলেন কেন? মুসলমানরা তো আমাদের শত্রু আর শত্রু সম্পর্কে মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়াটা স্বাভাবিক। তখন আবুসুফিয়ান বললেন, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, আজ মুসলমানদের কিছু দুর্নাম তার কাছে তুলে ধরব। কিন্তু আমি যখন বক্তব্য দেওয়ার জন্য তার সামনে দণ্ডায়মান হলাম, তখন আমার আত্মমর্যাদা আমাকে বাধা দিল যে, লোকে বলবে, একজন কোরাইশ নেতা হয়ে এমন মিথ্যা কথা কীভাবে বলতে পারল? সুতরাং আমি সত্য-সত্যই বলেছি। এতে প্রতীয়মান হয়, সেকালে কাফেররাও মিথ্যা বলতে ভয় পেত। এটা তখনকার ব্যাপক কল্যাণের বহিঃপ্রকাশ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুসলমান সবকিছু হতে পারে; কিন্তু মিথ্যাবাদী হতে পারে না।' আর আজ মিথ্যা এমন মসিবত হয়েছে যে, মিথ্যা ছাড়া কিছু দেখা যায় না। তবে কিছুসংখ্যক ব্যতীত।

পুরোপুরি সত্যবাদী ভাগ্যগুণে পেতে পারেন। কেউ মিথ্যা কম বলে আর কেউ বেশি বলে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে তাকালে দেখবেন, এর ভিত্তিই যেন মিথ্যার ওপর। বোঝা যায়, সত্যের যমানার অবসান ঘটেছে আর মিথ্যার যমানার আবির্ভাব হয়েছে। এটা কেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তো কল্যাণের উথান ছিল। তা থেকে মুসলমানগণ তো অংশ পেয়েছেনই; কাফেরাও এর ভাগ নিয়েছে। কিছু উদাহরণ দেখুন–

(১) হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যখন কোরাইশদের মুখপাত্র হিসেবে সুহাইল নামক ব্যক্তি এসেছিলেন। তিনি বলেন, সন্ধির মধ্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর পরিবর্তে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লেখো। কারণ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লিখলে তো আমরা তাকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনেই নিলাম। তাহলে আমাদের বিরোধ রইল কোথায়? একথা শুনে হযরত আবুবকর

(রাযি.) সুহাইলকে কিছু কটু কথা বললেন। তাঁর কথা শুনে সুহাইল বলল, দেখো, আমার ওপর তোমাদের একটি অনুগ্রহ আছে। সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ না থাকলে আমি আজ তোমাদের কটু কথার জবাব দিতাম। এতে প্রতীয়মান হয়, তখন কাফেররা মুসলামানদের অনুগ্রহের অংশ পেয়েছে, তার নিকমহারামী করতে তাদের মানবতা বাধা দিচ্ছে। আর বর্তমান অবস্থা এমন হয়েছে যে, এক লোক সারা জীবন আরেকজনের অনুগ্রহ ভোগ করছে আর একটা মুহূর্তে রক্ত এমন সাদা হয়ে গেছে যে, এখন এর চেয়ে বড় দুশমন পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

একথা বলা মনে হয় অপাত্রে হবে না যে, মানুষ শুধু আল্লাহকেই ভোলেনি; বরং অনুগ্রহকেও ভুলেছে। এর চেয়ে বেড়ে এটাও বলা যাবে যে, মানুষ আল্লাহকেও ভুলেছে। আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল, তৎকালে কাফেরাও কিছু-কিছু ভদ্র ব্যবহার করত। বর্তমানে তো মানুষ আপন ভাইয়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যেমন কেউ আপন শত্রুর সঙ্গে করে থাকে। আমি এর কারণ বলছি; একটু গুরুত্ব দিয়ে শুনুন, বোঝার চেষ্টা করুন। আল্লাহ তা'আলার দুটি নাম রয়েছে–

(১) هادی হেদায়াতদাতা

(২) مضل বিপথগামী করনেওয়ালা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আল্লাহর هادی নামের প্রভাব ছিল। তাই চতুর্দিকে বল্যাণের জয়জয়কার ছিল। ফলে সমস্ত ধৃষ্টতার অবসান ঘটেছিল। এজন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ

'সাহাবারা সবাই ন্যায়পরায়ণ।'

এতে বোঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন বলতে চাচ্ছেন, আমার শিষ্যত্ব যারা গ্রহণ করবে, তারা সবাই ন্যায়পরায়ণ। এজন্যই তখন পথভ্রষ্টদের মধ্যেও কিছু-কিছু কল্যাণ বিদ্যমান ছিল। যেমন– (১) তারা অঙ্গীকার পুরা করত (২) অনুগ্রহের মূল্যায়ন করত (৩) সত্য কথা বলত (৪) মেহমান আপ্যায়ন করত। তারপর এমন এক সময় এল, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

এটা এমন মনে করুন যে, বিশেষ অথিতি এসেছিলেন তার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। তিনি এসে অনুষ্ঠান আলোকিত করেছিলেন। ফলে তিনি দাওয়াত খেয়ে চলে গেছেন। বিশেষ অতিথি চলে গেলে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার পর কী করা হয়? লোকজন চলে যায়। চেয়ার-টেবিলও গুটিয়ে নেওয়া হয়। বিশেষ অতিথি চলে যাওয়ার পর যেন মাহফিল গুটিয়ে নিতে বিলম্ব হয় না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেছেন, আমি এবং কেয়ামতের মধ্যে দুইআঙ্গুল পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে। অর্থাৎ– এক আঙ্গুল যেভাবে আরেক আঙ্গুলের সঙ্গে মিলিত থাকে, তেমনি আমি ও কেয়ামতের মধ্যে মিল রয়েছে। সুতরাং হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে চলে যাওয়াটাও কেয়ামতের বড় নিদর্শন। কিন্তু সেই আলামত প্রকাশ পাওয়ার পরও আজ চৌদ্দশ বছর চলে গেছে। এখনও বলা যায় না, কেয়ামত কবে আসবে। কিন্তু মানুষের অবস্থা দেখে উপলব্ধি হয়, তারা যেন আস্তে-আস্তে কেয়ামতের অপেক্ষাকারী সেজে আছে।

কুদরতি নিয়মের প্রতিধ্বনি

সাহাবায়ে কেরামের যুগে পৃথিবীর বিস্ময়কর অবস্থা ছিল। তারপর কালক্রমে সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তবু মুসলমানগণ সাতশত বছর পর্যন্ত এ পৃথিবীর রাজত্ব করেছে। চতুর্দিকে ইসলামের বিজয় ঢংকা বেজেছে। বর্তমানে মানুষ বলে, পৃথিবীতে ইসলামের উন্নতি হচ্ছে না কেন? আল্লাহর মাহাত্ম্য দেখুন, মুসলমানগণ সাতশত বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছে। এখন ক্রমান্বয়ে তার অবনতি হওয়া স্বাভাবিক। এটা কুদরতিভাবেই হচ্ছে। এটা আল্লাহর ফয়সালা, যা পুরা হবেই। সুতরাং বর্তমানে যেকোনো দল যতই চেষ্টা করুক চাই তাবলীগী সিস্টেমে করা হোক; চাই পীর-মুরিদী সিস্টেমে করা হোক; চাই ওলামায়ে কেরামের দল সেজে করা হোক; চাই রাজনৈতিক দল হিসেবে করা হোক; যেকোনো রকম চেষ্টার ফলেও দীনের নকশা ওপরের দিকে উঠছে বলে দেখা যাচ্ছে না। বরং অবনতিই হচ্ছে। তবে ফায়দা এতটুকুই যে, পরিশ্রমকারীগণ তাদের প্রতিদান পাবেন। কুদরতি নিয়ম প্রমাণ করে, আস্তে-আস্তে এই অবস্থার অবনতিই হবে। কেননা, কল্যাণের জন্য মুসলমান সামান্য চেষ্টা করলে দুষ্কৃতির জন্য কাফেররা এর চেয়ে বেশি চেষ্টা চালিয়ে যায়।

পর্দার বাধ্যবাধকতা

ইসলামের যখন উত্থান ছিল, তখন পর্দার এমন গুরুত্ব ছিল যে, মহিলারা দিনের বেলায় ঘর থেকে বের হতো না। বের হওয়ার প্রয়োজন হলে আপন পুরুষদের সঙ্গে নিয়ে রাতের বেলায় বের হতো। এমনকি মৃত্যুকালে অসিয়ত করে যেত, আমার লাশ রাতের বেলায় দাফন কোরো, যাতে লোকেরা লাশ দেখে অনুমান করতে না পারে, আমি কত মোটা ও কতখানি লম্বা ছিলাম।

জনৈক সরলপ্রাণ যুবক

ইমাম আজম হযরত আবুহানীফা (রহ.) ১২০ হিজরিতে ফতোয়া সংকলনের কাজ শুরু করেন। তৎকালে পর্দার খুবই গুরুত্ব ছিল। একদা এক যুবক এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, হুজুর! পুরুষের দেহ আর নারীর দেহের মধ্যে পার্থক্য কী? তারা এত আবৃত হয়ে থাকে কেন? আল্লাহু আকবার! একজন যুবক মানুষ। সে বলতে পারে না, নারী আর পুরুষের দৈহিক পার্থক্য কী। এবার চিন্তা করুন, প্রথমযুগে পর্দার কেমন গুরুত্ব ছিল। একটা ছেলে জন্ম নিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছে। অথচ সে একজন নারীর দেহ দেখার সুযোগ হয়নি। আর বর্তমানে অশ্লীলতা ও পর্দাহীনতা এমন রূপ ধারণ করেছে যে, শিশুরা শৈশবেই এ সমস্ত বিষয় জেনে নেয়, যা প্রথম যুগে যুবক-যুবতিরা জানা দুষ্কর হতো।

ইউরোপিয়ান সংস্কৃতি লা-হাওলার উপযোগী

যদি ইউরোপিয়ান পরিবেশ দেখ – আল্লাহর আশ্রয় চাই – একটা সময় এল, যখন মহিলারা ঘর থেকে বের হওয়া শুরু করে দিল। তারপর এমন হলো যে, তারা চেহারা উন্মুক্ত রাখা শুরু করল। তারপর তারা মাথাও খোলা শুরু করল। তারপর পায়ের গোছা খুলে রাখা শুরু হলো। তারপর টাইট জামা বানাতে-বানাতে বর্তমানে পশ্চিমা পরিবেশে কয়েক ইঞ্চি জামা রইল। এমনকি মহিলাদের যে অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি পড়লে পুরুষকে মহিলার প্রতি চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে, সেটা তারা দেহ থেকে আরও বেশি পৃথক করে দেখাতে চায়। তাদের বক্ষের ঔজ্জ্বল্য সুস্পষ্ট দেখা যায়। তাদের বক্ষদেশে এক দুই ইঞ্চির বেশি কাপড় রাখে না।

এখন বলুন, সেই পরিবেশে বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা ও নির্লজ্জতার কী অবস্থা হতে পারে। একলোক আমাকে বলল, কোনো এক জায়গায় স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে তাদের চারজন সন্তান আছে। দুটি সন্তান ছোট এবং এক ছেলে ও

এক মেয়ে যুবক। এদের সামনে তারা স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে জড়িয়ে ধরছে। গলায় গলা মিশিয়ে একে অপরকে চুম্বন-আলিঙ্গনা করছে। নাউযুবিল্লাহ! বেহায়াপনা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে!

ভ্রষ্টতাপূর্ণ জ্যোতির উত্থান

এখন যেহেতু কেয়ামত অত্যাসন্ন, তাই আল্লাহ তা'আলার হেদায়াতপূর্ণ জ্যোতি হ্রাস পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ভ্রষ্টকারী গুণের উত্থান হয়েছে। এটা এ পর্যায়ে যাবে, মিথ্যা ছড়িয়ে পড়বে। হাদীছ শরীফে এসেছে– 'তারপর মিথ্যার বিস্তার হবে।'

এমনিভাবে আরেক হাদীছে এসেছে, এমন এক যুগ আসবে, যখন সবাই সুদ খাবে। যদিবা কেউ না খায়, তবে সুদের বাতাস তার গায়ে অবশ্যই লাগবে।

সুদের উত্থিত হাওয়া আমাদেরও স্পর্শ করছে। যেমন– দেখুন, কোনো লোক সরকারি ডিপার্টমেন্টে অথবা কোনো কারখানায় চাকরি করেছে। যদিও সে পরিশ্রম করে হালাল উপার্জন করছে, তবু তার মধ্যে সুদ শামিল হয়েছে। কারণ, ব্যাংকের সঙ্গে সেই অফিসের লেনদেন রয়েছে। সেভিংস একাউন্টে তার টাকা জমছে। এতে ব্যাংকের সুদ তার হালাল টাকার মধ্যে মিশে যাচ্ছে। এতে তার সমস্ত টাকা সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে। তাই বর্তমানে এমন সন্দেহযুক্ত অবস্থা থেকে বেঁচে থাকা খুবই ভাগ্যবানের কাজ।

বোঝা যায়, বর্তমানে মানুষ হয়ত সরাসরি সুদ খাচ্ছে অথবা সুদের বাতাস তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। এভাবেই ভ্রষ্টতার প্রসার ঘটছে এবং হেদায়াত হ্রাস পাচ্ছে। আর ঈমান ঝুঁকির মধ্যে পতিত হচ্ছে। হাদীছ শরীফে এসেছে, এমন একটা যুগ আসবে, যখন মানুষ সকালে ঈমান অবস্থায় বের হবে এবং বিকালে ইমামহারা হয়ে রাতযাপন করবে। যখন কল্যাণের যুগ ছিল, তখন বিধর্মীদের কাছ থেকেও ভালো গুণ প্রকাশ পেত। আর বর্তমানে যেহেতু ভ্রষ্টতার যুগ; তাই ঈমানদারদের থেকেও শিথিলতা প্রকাশ পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন–

(১) দুই বন্ধু উভয়ে দীনদার। কিন্তু তাদের পরস্পরে হিংসা রয়েছে।

(২) দুজন শিক্ষক একই মাদরাসায় কুরআন হাদীছ শিক্ষা দেন। কিন্তু তাদের মধ্যে বিদ্বেষ লেগেই আছে।

(৩) একজন মুহতামিম, আরেকজন শিক্ষক। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ঠেলাধাক্কা চলেই আসছে।

(৪) দুজন পীর ভাই। কিন্তু পরস্পরে মনোমালিন্য রয়েছে। বিবাদ লেগেই আছে।

দীনদারদের মধ্যে যেখানে এমন অবস্থা, সেখানে সাধারণ মানুষদের কী অবস্থা হবে? এটা কেন? কারণ, আল্লাহপাকের مضل গুণের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর বান্দাগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে তার বিস্তার হচ্ছে।

তালাকদানকারী ব্যভিচারী

ভালো ও সচ্চরিত্রবান মানুষও রাগের বশে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। তারপর গোনাহে লিপ্ত হয়। আমাদের এখানে তো কমই আছে। বহির্বিশ্বে আমি দেখেছি এটা মহাবিপদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সামান্য কথার জের ধরে। পরস্পর ইঙ্গিতবহ কোনো শব্দের মাধ্যমে তালাক দেয়। তারপর পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর মতো জীবন যাপন করে। শয়তান চাবি মেরে দিচ্ছে আর সর্বদা সেই স্ত্রীর সঙ্গে যেনা করছে।

কোনো-কোনো সময় শয়তান রাগান্বিত অবস্থায় মানুষদের মাধ্যমে এমন কথা বলায়, যা কুফরির অন্তর্ভুক্ত। আগে একটি মাসয়ালা শুনে নিন– 'প্রয়োজনে কুফরি কথা উদ্ধৃত করা কুফরি নয়।' এক ব্যক্তি কাউকে বলল, বন্ধু কোথায় থাক? দ্বিতীয়জন বলল, দেওয়ানওয়ালী বস্তিতে থাকি। এবার প্রথমজন বলল, আচ্ছা! আল্লাহর পেছনে থাকছ। অর্থাৎ– আল্লাহ আমাদের দেখবেন না। অথবা দেওয়ান বাবার সাথে আছ। সুতরাং কোনো চিন্তা নেই এমনিতেই মুক্তি পেয়ে যাবে। ওলামায়ে কেরাম বলেন, একথার দ্বারা সেই ব্যক্তি কাফের হয়ে গেছে। এক দিকে কুফরির কারণে পেছনের সমস্ত নেক আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে, অপরদিকে তার স্ত্রীর সঙ্গে তালাক হয়ে গেছে। এবার ঘরে গিয়ে যা করবে সব যেনা হবে। পরে তাওবা করে মুসলমান হলেও বিয়ে তো আর নতুন করে পড়ানো হয় না। তাই সে গোনাহতে লিপ্ত থাকে।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, স্ত্রী স্বামীকে বলল, আপনি খারাপ সাথীদের সঙ্গ ছাড়েন। আর সময়মতো ঘরে আসেন। কারণ, এটা শরীয়তের নির্দেশ। প্রত্যুত্তরে স্বামী বলল, আরে রাখো তোমার শরীয়ত। এতে স্বামী কাফের হয়ে গেছে। কারণ, সে শরীয়তকে তুচ্ছ মনে করেছে। অর্থাৎ– কুরআন ও হাদীছকে অবহেলা করেছে। তাই কাফের হয়ে গেছে। দেখুন, কেমন সাধারণ কথায় কী হয়েছে। তালাকের সমার্থবোধক শব্দ দ্বারাও তালাক

পতিত হয়। যেমন– কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আচ্ছা! আচ্ছা! যাও এখন তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। তো এই ইঙ্গিতবহ শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হয়ে গেছে। এবার বলুন, এ মাসয়ালা জানে কজন। আর এমন মাসয়ালা কজন জিজ্ঞাসা করে।

আপনারা দেখে থাকবেন, বহির্বিশ্বে সম্পদের আধিক্য হয়। তাই স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের মধ্যে আমিত্ব থাকে। আর সেই আমিত্বের ফলে কী যে বলে থাকে তার কোনো খবর নেই। আস্‌তগফিরুল্লাহ। একলোক সুস্পষ্ট তার স্ত্রীকে তালাকের শব্দ বলে দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই আপনি তো আপনার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন। সে বলল, না, এর দ্বারা পূর্ণ তালাক হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে? সে বলল, বিয়ে করতে যেমন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়, তেমনি তালাকেও সাক্ষী লাগে। আর আমার কথা তো অন্য কেউ শোনেনি। সুতরাং তালাক হয়নি। ওই সমস্ত দেশে তালাকের পরও স্বামী-স্ত্রী একত্রে থাকে। আর বলে, আমরা পরস্পরে আপস করে নিয়েছি।

এক জায়গায় আলোচনা করছিলাম। পরে এক মহিলা বলল, তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে আপনি এখানে থাকছেন কীভাবে? বলল, আমরা পরস্পরে আপস করে নিয়েছি। আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দী! তালাক দেওয়ার পর তো তোমার ওপর স্বামীর অধিকার থাকে না। সে বলল, সর্বোপরি আমি তার সন্তানদের মা। সুতরাং এই সন্তানদের খাতিরে আমাকে এখানে থাকতে হয়েছে। এখন তারা এক সঙ্গেই থাকে। তাদের পরস্পর সম্পর্ক রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলে বলে আমরা আপস করেছি। তাদের কথায় প্রতীয়মান হয়, আপস করে নিলে আবার বিবাহ হয়ে যায়। মিয়া বিবি রাজি কেয়া করেগা কাজী। এসমস্ত গর্হিত কাজের ফলাফল কী হয় জানেন? অবশেষে মুসলমানিত্বের প্রতি তার ঘৃণা আসে এবং কুফরিকে ভালোবাসতে থাকে।

স্বদেশের মূল্য ও সম্মান

আমরা নিউইয়র্কের ফ্লাইটে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করছিলাম। P.I.A ল্যান্ড করার পর মালসামানা আসতে কিছু বিলম্ব হচ্ছে। শুনলাম, কিছু লোক বলছে, আমাদের দেশের অবস্থা এমন-এমন। এদের কথা শুনে আমার খুব দুঃখ লাগল। একস্থানে আমার সঙ্গে দাঁড়ানো দুই লোক এমন আলাপ করছে। তাদের কথা শুনে আমার অন্তর জ্বলে উঠছে। কিন্তু ধৈর্য ধরে আছি। এর

মধ্যে তাদের একজন আমাকে সম্বোধন করে বলল, মাওলানা সাহেব আমি কি ঠিক বলছি না? আমি বললাম, তুমি তো তোমার কথাটা আমার মাধ্যমে সত্যায়ন করাতে চাচ্ছ। তোমরা নিজেরা কথা বলছ; তোমরাই বলো। আমাকে জড়াচ্ছ কেন? পরে আমি তাকে বোঝালাম। দেখো! তুমি এখানে জন্মগ্রহণ করেছ। এখানে লালিতপালিত হয়ে বড় হয়েছ। এখানে লেখাপড়া শিখেছ। এদেশের দানাপানি খেয়ে বেঁচে আছ। যখন তৈরি হয়ে গেলে এবার বিদেশে চাকরি পেয়ে গেলে। এখন কি এই মাটির তোমার কাছে কোনো প্রাপ্য নেই? দেশের মূল্যায়ন করো।

আরও বললাম, এখন যদি তোমার পাসপোর্ট কেটে দেওয়া হয় আর সেই দেশের অ্যাম্বাসি বলে, তোমাকে সে দেশে প্রয়োজন নেই, তাহলে এ পৃথিবীতে তোমার সমাধি কোথায় হবে? সে বলল, পাকিস্তানে। একথা বলতেই তার দুচোখ বয়ে অশ্রু নেমে এল এবং বলল, মাওলানা সাহেব! আজ আপনি আমাকে এমন অনুভূতি দিলেন যে, এদেশের অনুগ্রহ আমি কখনও ভুলতে পারব না। কথা শুধু এতটুকুই ছিল যে, মালামাল আসতে দেরি হচ্ছে। এদেশের নিয়ম শৃঙ্খলা ঠিক না। আমি বললাম, দেখো, আমিও সেই দেশ থেকে এসেছি। বলুন তো, সে দেশে যাওয়ার পর বিমানবন্দরে তোমার কত সময় দেরি হয়? সে বলল, এক ঘন্টা। আমি বললাম, সেখানের মেশিন দ্রুত কাজ করে। সে বলল, জি। আমি বললাম, সেখানে কাজ বাস্তবেও সঠিক হয়, তাই না? বলল, জি। আমি বললাম, ভাই! সাড়ে তিনশ মানুষের লাগেজ, মালামাল বেল্টে উঠানো-নামানো এমন সময় লাগবেই। জিজ্ঞাসা করলাম, সেখানে বিলম্ব হলে কিছু বলতে পারেন, জি না। বরং সেখানে এমন নীরব থাকতে হয় যে, শ্বাস-নিঃশ্বাসের শব্দও যেন না হয়। বললাম, তাহলে এখানে এসে এত বলছেন কেন? এতে সে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আমি বললাম, এটা তোমার স্বদেশ; এখানে তুমি স্বাধীন। এখানে তোমার ওপর বলার কেউ নেই।

যদি এই অধিকারও মানুষকে দেওয়া হতো, তাহলে কী হতো

বন্ধুগণ! আমি বলেছিলাম, যাদের অন্তরে গর্হিত বস্তুর ছাপ রয়েছে, দীনদারের প্রতি এমনিতেই তার অনীহা থাকে। না তারা দেশকে ভালোবাসে; না মুসলমানকে ভালোবাসে। কিছু লোক এমনও আছে, যারা ওলামায়ে কেরামকে দেখতেই পারে না। না ওলামায়ে কেরামের রাজনৈতিক কার্যক্রম পছন্দ করে, না পীর মাশায়েখদের কার্যক্রম দেখে শান্তি পায় এবং না দ্বীনি

প্রতিষ্ঠানের প্রতি তারা সুদৃষ্টিতে তাকায়। কিন্তু শুকরিয়া আদায় করছি এজন্য যে, পরকালের সিদ্ধান্ত আল্লাহর হাতে রয়েছে। যদি সেটা কোনো বান্দার অধীন হতো, তাহলে আল্লাহ মালুম সে কী করে ফেলত।

ভাই! আল্লাহপাক যদি তাঁর কালেমা পাঠকারী বান্দাদের ক্ষমা করে দেন, তার প্রতি খুশি হয়ে যান, তাহলে তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ রাখার প্রয়োজন কী? বর্তমানে এমনও লোক আছে, যারা বলে, আল্লাহ মাফ করলে করুন; তবু আমি মাফ করব না। নাউযুবিল্লাহ!

مقام شکر ہے صوفی خدا کے ہاتھ میں ہے روزی

اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا

আল্লাহপাকের অসংখ্য শোকর যে, বান্দার রুজির ফয়সালা তাঁর হাতে। এটা যদি বান্দার হাতে থাকত, তাহলে কী যে অবস্থা হতো!

দীনের কাজে বাধাসমূহ

হাদীছ শরীফের এসেছে– কেয়ামতের সন্নিকটে এমন অবস্থা হবে যে, দীনি কাজ করা কঠিন হয়ে যাবে। কিন্তু এমতাবস্থায় যে-বান্দা সাহসিকতা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে দশ ভাগের এক ভাগের ওপর আমল করবে, সে পূর্ণ কাজের ছাওয়াব পাবে। পূর্ণ কাজের ওপর আমলকারীদের সাথে তাদের হাশর হবে। বর্তমানে আমরা এমন যুগে উপনীত হয়েছি। যদি আপনি দীনের কাজ করেন, তাহলে দেখবেন, চতুর্দিকে বাধা ওত পেতে রয়েছে। যেমন– আপনার মা প্রতিবন্ধক হবেন। পিতা আপনার দীনি কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন। স্ত্রী বাধা দেবে। প্রতিবেশী আপনাকে দীনের কাজ থেকে বারণ করবে। বরং কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই আপনার সামনে বাধা হয়ে মাথা চাড়া দেবে।

যেখানে নিজের নফস ও শয়তানের প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও এতসব বাধা আপনার সম্মুখিন হবে, সেখানে দীনের কাজ করা কেমন কঠিন হবে? উদাহরণস্বরূপ দেখুন–

(১) আমাদের জামাতে এক বন্ধু ছিল। তার এক বোন ছিল আলেমা। কুরআন হাদীছ শিক্ষা করেছে। তার স্বামী তার প্রকৃত কাজিন ছিল। তারা নিজেরাই পছন্দ করে বিয়ে করেছে। সে ওই মেয়েটিকে বলল, আমার সঙ্গে থাকতে হলে বোরকা পরা পরিহার করতে হবে। মেয়ে যেহেতু আলেমা ছিল

এবং তার ব্যক্তিগত রূপও অপূর্ব ছিল, তাই মেয়েটি ঝটপট বলে দিল, যা হবার হবে; আমি বোরকা পরিহার করতে পারব না। শুধু এতটুকু কথার ফলে সে তাকে তালাক দিয়ে পাকিস্তান পাঠিয়ে দিল।

(২) ইন্ডিয়ার এক আলেমা মেয়ে ছিল। কানাডায় এক ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হলো। সে ফোন করে আমাকে জানাল, হুজুর! বিয়ের তৃতীয় দিন আমার স্বামী আমাকে বলল, তুমি পর্দা ত্যাগ করো এবং আমার সঙ্গে নৃত্য একাডেমিতে চলো। মাতাপিতা বাধ্য করে আমাকে এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। এখন ধার্মিকতার দিক থেকে অসহায়ের মতো আমার জীবন কাটাতে হচ্ছে। হুজুর আমার জন্য দু'আ করবেন।

(৩) এক ছেলে যুবক বয়সে দাড়ি রেখেছে, পাগড়ি পরে। সুন্নতের ওপর জীবন যাপন করছে। কিন্তু তার মা এটা পছন্দ করছে না। একবার তারা সবাই ওমরা করার জন্য মক্কা শরীফ গেল। সেখানে এক হোটেলে বসে তারা আলাপ করছে। কথায়-কথায় আলোচনা এল, শুনেছি, কাবা শরীফের প্রতি প্রথম দৃষ্টির সময় দু'আ করলে তা কবুল হয়। আচ্ছা! আপনি কী দু'আ করবেন? বাবা বললেন, আমি অমুক দু'আ করব। ছেলে বলল, আমি অমুক দু'আ করব। মাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কী দু'আ করবেন। মা বলল, আমি তো এই দু'আ করব যে, আমার ছেলে যেন পাগড়ি বাধা ছেড়ে দেয়। নাউযুবিল্লাহ! এবার ভেবে দেখুন– যে-ছেলে আধুনিক সংস্কৃতি পরিহার করে সুন্নাতের ওপর আমল করছে, সে তার নফসের সঙ্গে কেমন জিহাদ করছে। সে এত সাধনা করে দীনদার হতে চাচ্ছে আর তার মা কী তামান্না করছে!

বর্তমানে যেহেতু আল্লাহর ভ্রষ্টতাপূর্ণ গুণের প্রভাব বেশি, তাই দীনের ওপর আমলকারী ও দীনের কাজ সম্পাদনকারীদের মধ্যেও শিথিলতা প্রকাশ পাচ্ছে। তবে এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আজ থেকে আমরা শৈথিল্য শুরু করব। আমাদের দুর্বলতার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিজের পক্ষ থেকে আরও অধিক আমল করার চেষ্টা করা। আমাদের ফায়দা এটাই, যদি আমরা হেঁটে-খেয়েও ঈমান বাঁচিয়ে চলতে পারি, তাহলে আল্লাহপাক আমাদেরকে পরিপূর্ণ ঈমানদারগণের সঙ্গে হাশর করবেন। বাধা তো আসবেই; কিন্তু চেষ্টা করলে আল্লাহপাক আমাদের চলার পথ সুগম করে দেবেন।

অভাবের যুগে বস্তুর মূল্যায়ন

একটি মূলনীতি স্মরণ রাখবেন, যে যুগে, যে মৌসুমে যে বস্তু সচরাচর পাওয়া যায় না, সে সময় ওই বস্তুর মূল্যমান বেশি হয়। আপনারা দেখে

থাকবেন, মৌসুমের সময় আমাদের কাছে টমেটো প্রচুর থাকে। সেগুলো দেখতেও খুব সুন্দর লাগে। মনে হয়, যেন জাপানি কোনো ফল আমদানি হয়েছে। স্বাদও থাকে অতুলনীয়। মেহমানদের অন্যান্য ফলের পরিবর্তে টমেটো দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। আমি বিষয়টি তখন আঁচ করেছি, একদা আমি খাবার খেতে বসলে আমার ছেলেরা বলল, আব্বু! আমরা আপনার সঙ্গে খাবার খাব। বললাম, ঠিক আছে এসো। হাবীবুল্লাহ ও সাইফুল্লাহ আমার কাছে এসে দস্তরখানে বসে গেল। আমরা খাবার খাচ্ছি। এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন কিছু টমেটো দিল। এত সুন্দর টমেটো! দেখামাত্রই খেতে ইচ্ছা হলো। আমরা টমেটো খাওয়া শুরু করলাম। খেতে-খেতে টমেটো খেয়েই আমার পেট ভরে নিলাম। খাবার খাওয়ার আর প্রয়োজনই মনে করছিলাম না।

যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনি খেতেও সুন্দর লাগে। কিন্তু বাজারে নিলে দুই টাকা কেজিও কেউ নেয় না। কোনো-কোনো সময় তো এমনও হয় যে, প্রতি কেজি এক টাকায়ও মানুষ খরিদ করতে চায় না। কারণ, তখন টমেটো প্রচুর ছিল। পরে একদিন টমেটোর মৌসুমের দুমাস পূর্বে আমি বাজারে গিয়ে দেখলাম, প্রতি কেজি টমেটোর দাম একশত টাকা। করাচিতে ১কেজি টমেটো ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আমি অবাক হলাম, টমেটোর এত দাম। একটি টমেটো হাতে নিলাম। বিস্ময়ে অবাক হলাম। এমন আকৃতির টমেটো মৌসুমের সময় ফেলে দেই। যে টমেটো এক টাকা কেজি ক্রয় করতে মানুষ রাজি নয়, তার দাম আজ প্রতি কেজি ১৫০ টাকা। ঠিক তেমনি মনে করুন, কল্যাণের আধার মনীষীগণ বর্তমানে পৃথিবীর থেকে চলে গেছেন। আর আমাদের মতো Rejecte লোকদের আল্লাহপাক প্রতি কেজি দেড়শ টাকায়ও গ্রহণ করবেন। আল্লাহু আকবার!

খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে থাকো

স্মরণ রাখবেন, যে কেউ কালেমা পাঠ করেছে, যতই অলস হোক তাকে ঘৃণার চোখে দেখবেন না। যেখানে আল্লাহপাক তাদের অগ্রাহ্য করে না, সে ক্ষেত্রে আমরা তাদের অপছন্দ করব কেন? আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ يَا عِبَادِيْ

'হে আমার হাবীব বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ!'[১৯২]

---

১৯২. সূরা যুমার : আয়াত ১০

যেখানে আল্লাহপাক তাদেরকে বান্দা বলেন সম্বোধন করছেন, যেখানে আমরা তাদের তুচ্ছ মনে করব কেন? এজন্যই কালেমার অন্তর্ভুক্ত সকল মুলমানের প্রতি ভালোবাসা রাখা আবশ্যক। তাদের সম্মান করা জরুরি। এটা সত্য যে, মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহপাক তাদের তাওবার তাওফীক দিয়ে দেবেন। তাওবা যদি তুমি গ্রহণ করার অধিকার রাখ, তাহলে তো বাস্তবেই ভয়ানক অবস্থানে আছ। আর যদি তাওবা আল্লাহপাক কবুল করেন, তাহলে তোমার সমস্যা কোথায়? আমাদের জন্য উচিত মুসলমানদের প্রতি সুধারণা রাখা। তাদের অলসতাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। ত্রুটি-বিচ্যুতি সবার মধ্যে থাকে। কম-বেশির তারতম্য হওয়া এটা ভিন্ন কথা। কেউ তো ফেরেশতা নয়। এত সূক্ষ্ম বিষয় কেন সন্ধান করো। মানুষের প্রকৃতিই এমন যে, তারা কারও ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাকে ঘৃণা করতে থাকে।

সুতরাং এই ফেতনার যুগে আমরা কোনো মুসলমানদের প্রতি কুধারণা রাখব না এবং ইসলাম ও আলেমদের প্রতিও এমন ধারণা থেকে বেঁচে থাকব। বরং প্রত্যেকের প্রতি সুধারণা রাখব। এই সুধারণা প্রতিদানে আল্লাহ তা'আলা আমাদের শেষ বিদায়ের সময় ঈমানের দৌলত সঙ্গে দিয়ে ধন্য করবেন।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি খারাপ ধারণা

কতিপয় লোক আল্লাহ তা'আলার প্রতিও খারাপ ধারণা রাখে। অবশ্যই অভিযোগকারী লোক আল্লাহর প্রতিও সন্তুষ্ট থাকে না। তারা বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে কীভাবে? এক লোক আমাকে বলল, আল্লাহপাকের মধ্যে স্বজনপ্রীতি বেশি নাইযুবিল্লাহ! আমি বললাম, কেন? সে বলল, তিনি দাড়িওয়ালাদের দু'আ কবুল করেন। অন্যদের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করেন না। আস্তাগফিরুল্লাহ! তার মধ্যে এমন স্পর্ধা এজন্য এসেছে যে, তার মধ্যে দুষ্কৃতি প্রাধান্য পেয়েছে।

সাধারণ নিয়ম হলো, প্রত্যেক লোকের মধ্যে ভালো-মন্দ উভয় দিক থাকে। যদি ভালোর দিক প্রাধান্য থাকে আর মন্দের দিক পরাস্ত থাকে, তাহলে সে ভালো মানুষ হয়ে যায় এবং যদি কারও মধ্যে দুষ্কৃতির দিক প্রাধান্য থাকে আর কল্যাণর দিক পরাস্ত থাকে এবং মানুষের জন্য সে বিপদ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সে নিকৃষ্ট লোকে পরিণত হয়। একথা বুঝে থাকলে সবার প্রতি সুধারণা রাখবেন।

কুধারণাকারীর ব্যর্থ চেষ্টা

হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর কোনো শিষ্য জনৈক মহিলার সঙ্গে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন। তার শত্রুপক্ষ এ বিষয়ে অবগত হয়ে বলল, এখন সুযোগ পেলাম, হাজী সাহেবকে জানাব যে, আপনার শিষ্যের কৃতকর্ম এমন। সে হাজী সাহেবের কাছে গিয়ে নালিশ জানাল, হুজুর! আপনার শিষ্য এরকম কবীরা গোনাহ করেছে।

হাজী সাহেব বললেন, আচ্ছা! মনে হয় ওই সময় আল্লাহপাকের مضل গুণটি তার ওপর প্রভাব ফেলেছিল। তাই এমন করেছে। হাজী সাহেব এই জবাব দেওয়ার পর লোকটা আর কোনো কথা বলার সাহসই পেল না।

আনন্দের সংবাদ

বন্ধুগণ! সর্বশেষ কথাটি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্ম ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা একান্ত জরুরি। বলুন–

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا

'আমি সন্তুষ্ট একথার ওপর যে, আল্লাহ আমার প্রভু, ইসলাম আমার ধর্ম এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নবী।'

যখন আমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট হব, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আর এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য খুশির সুসংবাদ। সুতরাং প্রত্যেক বান্দা কল্যাণের পথে অগ্রগামী হতে চেষ্টা করুন। যদি মৃত্যুর পূর্বে পুণ্যময় জীবন গড়তে পারেন, তাহলে আল্লাহপাক তা গ্রহণ করবেন। দুনিয়ার মানুষ তো ভিক্ষুক দেখে দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু আল্লাহপাক ক্ষমাপ্রার্থীদের জন্য তাঁর রহমতের দ্বার কখনও বন্ধ করেন না। যত বড় অপরাধীই হোক তার জন্য আল্লাহ তা'আলার ক্ষমার দুয়ার উন্মুক্ত রয়েছে। দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেদায়াতের ওপর অবিচল রাখুন। এবং নিরাপদ ঈমানের সঙ্গে দুনিয়া থেকে শেষ বিদায় নেওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

واخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين

[খুতুবাতে যুলফিকার দ্বাদশ খণ্ড সমাপ্ত]